অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

চতুর্দ্দশ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২৩—মাঘ ১৩২৪

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্ এ, বি এল্

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়,

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট—কলিন্গাতা হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস ধর
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা রাধাপ্রসাদ লেন (সুকিয়া ষ্ট্রীট) মণিকা প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা মাত্র

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।] ফাল্গুন ১৩২৩। [প্রথম সংখ্যা।

সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের চিত্র।

[লেখক—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ।]

বিদূষক ও সংস্কৃত নাটকে তাহার কার্য্য।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নয়টী রসের কথা বলা হইয়াছে, হাস্যরস তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রধানতঃ বিদূষকের সাহায্যেই নাটকাদিতে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া বিদূষকের যে আর কোনও মূল্য নাই, তাহাও বলা যায় না। ইংরাজী নাটকের Jesterএর কার্য্য বিদূষক ত করেই, অধিকন্তু নায়কের প্রণয়-ব্যাপারে (love-intrigue) সাহায্য করিতেও এই বিদূষকের প্রয়োজন হয়। সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন "শৃঙ্গার ব্যাপারে চেট, বিট, বিদূষক প্রভৃতি নায়কের সাহায্য করিয়া থাকে।" (১)

বিদূষকের গুণ।

এই চেট, বিট ও বিদূষক প্রভৃতি "প্রভুভক্ত, শুদ্ধচরিত্র উপহাসাদিতে নিপুণ, কুপ্নিত রমণীর মানভঞ্জনে দক্ষ।" (২) ইহাদিগের মধ্যে আবার বিদূষকের নাম হইবে কুসুম, বসন্ত কিংবা এইরূপ একটা কিছু। বিদূষকের শারীরিক-চেষ্টা-যুক্ত অর্থাৎ চটপটে হওয়া এবং কলহে প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। নিজের অদ্ভুত বেশ ও ভাষার দ্বারা

---

(১) শৃঙ্গারেঽস্য সহায়াঃ বিটচেটবিদূষকাদ্যাঃ স্যুঃ।

(২) ভক্তা নর্ম্মসু নিপুণাঃ কুপিতবধূমানভঞ্জনাঃ শুদ্ধাঃ। সাহিত্যদর্পণঃ ৩।৪০

ইহাকে হাসাইতে হইবে। নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিদূষকের জ্ঞান থাকা চাই। (১)

দেখা যাউক প্রকৃত পক্ষে বিদূষকের এই সকল গুণ আছে কি না?

সাহিত্যদর্পণকার বলেন, বিদূষকের নাম হইবে কুসুম, বসন্ত প্রভৃতি। রত্নাবলীর বিদূষকের নাম বসন্তক। কিন্তু বিশ্বনাথ 'আদি' শব্দ ব্যবহার করিয়া জানাইয়াছেন যে ইহা ব্যতীত অন্য নামও বিদূষকের হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 'শকুন্তলা'র বিদূষকের নাম মাধব্য। মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষকের নাম গৌতম। মৃচ্ছকটিকের বিদূষকের নাম মৈত্রেয়। যাহাই হউক নাম লইয়া কিছুই আসে যায় না। এই জন্য আমার মনে হয় বিদূষকের লক্ষণে নামের উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত।

বিদূষকের নাম ও আকৃতি।

বিদূষকের কার্য্য হাস্যরসের উদ্দীপন করা। সুতরাং তাহার আকৃতিও কিছু অদ্ভুত রকমের হওয়া দরকার। ভরত মুনি বলিয়াছেন "বামন (বেঁটে), দন্তুর (দেঁতো), কুব্জ (কুঁজো), দ্বিজন্মা (ব্রাহ্মণ), বিকৃতানন (বিকৃতমুখ বিশিষ্ট), খলতি (টেকো) এবং পিঙ্গলাক্ষ (কটাচোখো) দেখিয়া বিদূষক সাজাইবে।" (২) কিন্তু এখন জানিবার উপায় নাই যে এইরূপ লোক দেখিয়া বিদূষক সাজান হইত কি না? কারণ বিদূষকের আকৃতি সম্বন্ধে কোথাও কিছু উল্লেখ নাই। তবে তাহাকে যে আদর্শ রূপবান্ পুরুষ করা হইত না তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিক্রমোর্ব্বশীতে রাজা পুরূরবা যখন বিদূষকের নিকট উর্ব্বশীর রূপবর্ণনা করিলেন, তখন বিদূষক অবশ্য বলিয়াছিল "কিং তাবৎ তত্রভবত্যা রূপেণ অহমেব দ্বিতীয়ো নিরূপিতঃ?" "রূপের তুলনায় উর্ব্বশীর নীচেই আমি, এই বুঝি আপনার অনুমান?" কিন্তু তাহার এই পরিহাস বাক্য বিপরীত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। জয়দেব কবি (৩) বিরচিত প্রসন্ন-রাঘব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আমরা একজন বামন ও একজন কুব্জ দেখিতে পাই, তথাপি তাহারা বিদূষক নহে, যদিও নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কবি সামাজিকগণকে হাসাইবার জন্যই ইহাদিগকে আসরে নামাইয়াছেন।

---

(১) কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ। সাঃ দঃ ৩। ৪২

(২) বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ॥ নাট্যশাস্ত্রম্ ২৪।১০৬

(৩) এই জয়দেব গীতগোবিন্দকার জয়দেব নহেন।

বামন। (আপনাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) ওঃ আমার চেহারাটা কি লম্বা! এরূপ লম্বা শরীর নিয়ে যদি আমি এখানে চলাফেরা করি তা হ'লে (কে জানে আমার মাথায় লেগে) দরজার মাথাটাই হয়ত ভেঙ্গে যাবে। কাজেই আমাকে একটু হেঁট হ'য়েই চ'লতে হচ্চে।

কুব্জ (প্রবেশ করিয়া)। বলি ও ভায়া বামন, এখন দেখ্‌ছি সব গুণে গুণী হ'য়েছিস্।

বামন। কি রকম?

কুব্জ। আগে ছিলি বেঁটে, এখন হ'লি কুঁজো।

বামন (রাগিয়া)। দূর বেটা মুরু-খ্‌খু। তুই নিজের কুঁজ পরের ঘাড়ে চাপাতে চাস্। তুই-ইত বেটা কুঁজো। আমি বলে পাছে দরজার মাথা ভেঙ্গে যায়, তাই হেঁট হ'য়ে চল্‌ছি।

কুব্জ (হাসিয়া)। হাসালি রে বেটা হাসালি। এক বিঘৎ চেহারা নিয়ে তুই বেটা দরজার মাথা ভাঙ্গবি!! (আবার রাগিয়া) ওরে মিথ্যুক মুখফোঁড়, কে বলে আমি কুঁজো? (১)

বামন। কেন, যোয়ান্ ষাঁড়ের পিঠের মত তোর পিঠে ওই যে মাংসের ডেলা রয়েছে ওই ব'লে দিচ্চে।

কুব্জক। ওরে নির্ব্বুদ্ধি! ওই মাংসের ঢিবিটা কি জানিস্? ওটা আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর তাকিয়া।" (২)

---

(১) বামনঃ। (আত্মানং বিলোক্য সবিস্ময়ম্) অহো অঙ্গানাং মে তুঙ্গত্বম্। অপি নাম ঈদৃশৈরঙ্গৈরত্র সঞ্চরতা ময়া দ্বারশিখরং ভজ্যতে। তৎ কুব্জো ভূত্বা সঞ্চরিষ্যামি।

কুব্জঃ (প্রবিশ্য)। বয়স্য বামনক, ইদানীং সকলগুণসম্পন্নোঽসি!

বামনঃ। কথমিব?

কুব্জঃ। প্রথমমেব বামনঃ ইদানীং পুনঃ কুব্জত্বং প্রাপ্তঃ।

বামনঃ (সক্রোধম্)। অরে মূর্খ কথমাত্মনঃ কুব্জত্বং পরস্মিন্ আরোপয়সি। নন্থ ত্বমেব কুব্জকঃ। ময়া পুনর্দ্বারশিখরভঙ্গশঙ্কিতেন আত্মনি কুব্জত্বমারোপিতম্।

কুব্জ। (বিহস্য) কথং বিতস্তিমাত্রেণ তবাঙ্গেন দ্বারশিখরং ভজ্যতে। (পুনঃ সক্রোধম্) অরে অলীকবাচাল, কেন তব কথিতমহং কুব্জক ইতি?—প্রসন্নরাঘবে তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(২) বামনঃ। নন্থ অনেনৈব দৃপ্তবৃষভককুদসদৃশেন পৃষ্ঠস্থিতেন মাংসস্তবকেন উদ্বাহিতেন।

কুব্জঃ। অরে মতিশূন্য! কথময়ং মাংসস্তবকো মে সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা উপধানগেণ্ডুকঃ।

—প্রসন্নরাঘবে তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

উপরে যে কথোপকথন উদ্ধৃত হইল, তাহা রাজান্তঃপুরচারী দুইটী ভৃত্যের।

বিদূষকের বেশভূষা।

সুতরাং ইহা হইতে বিদূষকের আকৃতি কিছুই বুঝা যায় না। তাহার বেশভূষা ব্রাহ্মণোচিত করা হইত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ ব্রাহ্মণ-সুলভ আদব-কায়দা তাহার দুরস্ত। কেহ প্রণাম করিলে তাহাকে স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করা চাই এবং কেহ যদি প্রণাম না করিল তাহা হইলে তাহাকে ভৎর্সনাও করা আছে। যখন উর্ব্বশী আসিয়া রাজা পুরূরবাকে অভিবাদন করিলেন, তখন বিদূষক তাঁহাকে এইরূপে তিরস্কার করিয়াছিল। "আপনার এ কিরূপ আক্কেল। রাজার প্রিয় বয়স্য ব্রাহ্মণকে বন্দনা করিলেন না?" (১) অতএব যে লোক ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সম্মানের উপর দাবী বসাইতে চায়, তাহাকে ব্রাহ্মণের মত সাজানই সম্ভবপর। একটী বিষয়ে কিন্তু কোনও সন্দেহ নাই, সেটী বিদূষকের হস্তের দণ্ডকাষ্ঠ বা লাঠী। এই দণ্ডকাষ্ঠটী আবার সরল নহে কিন্তু কুটিল। কখনও বা ইহাকে ভাগ্যের মত কুটিল বলা হইয়াছে। (২) কখনও বা খলের হৃদয়ের মত কুটিল বলা হইয়াছে। (৩) কখনও বা এই দণ্ডকাষ্ঠকে কুটিল বলিয়া ভৎর্সনাও করা হইয়াছে। (৪) "আমার মত সরল লোকের লাঠী হইয়া তুই এত কুটিল হইলি কেন?"

বিদূষকের শারীরিক চেষ্টা, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি।

বসিয়া থাকিয়া বক্তৃতা করিলে লোক হাসান যায় না। কাজেই বিদূষককে খুব 'চট্‌পটে' হইতে হইবে। তাহাকে নানারূপে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া লোক হাসাইতে হইবে। তাই বলিয়া সে যে খুব কর্ম্মঠ তাহাও নহে। যে কার্য্যে সাহসের প্রয়োজন সে কার্য্য সে না করিতে পারিলেই বাঁচে। তাহাকে বীরোচিত কার্য্য করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করা হয় নাই, লোক হাসাইয়াই তাহার কর্ত্তব্য শেষ। এই নিমিত্তই মৃগয়া-ব্যাপার তাহার ভাল লাগে না। (৫) এই নিমিত্তই

---

(১) কীদৃশী স্থিতির্ভবত্যাঃ? রাজ্ঞঃ প্রিয়বয়স্যো ব্রাহ্মণো ন বন্দ্যতে?

—বিক্রমোর্ব্বশ্যাম্ ২।

(২) অস্মাদৃশভাগধেয়কুটিলেন—মৃচ্ছকটিকে ১মঃ অঙ্কঃ।

(৩) পিশুনজনহৃদয়কুটিলেন—রত্নাবল্যাম্ ২য়ঃ অঙ্কঃ।

(৪) বিদূষকঃ। ভো অহমপি তাবদ্ এতং দণ্ডকাষ্ঠমুপালপ্স্যে ঋজুকস্য মে কথং ত্বং কুটিলোঽসীতি।—অভিজ্ঞান শকুন্তলে ৬ষ্ঠঃ অঙ্কঃ।

(৫) "বিদূ। এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞঃ বয়স্যভাবেন নির্ব্বিণ্ণোঽস্মি"। শকু ২।

অশ্বের অনুধাবনে তাহার সন্ধিস্থল শিথিল হইয়া যায়। (১) কিন্তু সে লম্ফঝম্প নৃত্য প্রভৃতিতে খুব নিপুণ। (২) "বসন্তক। 'বয়স্য আমিও বধূর পরিজনদিগের মধ্যে নৃত্য করিয়া মদনমহোৎসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।'

রাজা। 'তাই কর।'

বিদূ। 'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য'।

এই বলিয়া চেটীদ্বয়ের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল।" (৩)

কিন্তু সাহসের কার্য্যে' বিদূষক পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ তাহার স্বভাব ভীরুতা। যে বাতাসে কিছু উড়িয়া পড়িতে দেখিলে সাপের খোলস মনে করে। (৪) ভূত দেখিলে বা ভূতের আশঙ্কা থাকিলে যে জ্ঞান-হারা হইয়া যায়, কি করিয়া সে সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে ?

"(শুনিয়া সভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজার হাত ধরিয়া এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া)।

বিদূ। বয়স্য আসুন পলাইয়া যাই।

রাজা। কেন ?

বিদূ। এই বকুল গাছে কোনও ভূত আছে।

রাজা। ধিক্ মূর্খ। বিশ্বস্ত-হৃদয়ে যাও। এরূপ ভূতের প্রভাব এখানে কি করিয়া সম্ভব ?

বিদূ। বেশ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতেছে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আগে গিয়া নিজেই শুনুন।" (৫)

---

(১) "তুরগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ রাত্রৌ নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি"। শকু ২।

(২) "বিদূ। জয়তু, জয়তু, ভবান্। জিতমস্মাভিঃ। (ইতি নৃত্যতি)" রত্না ৩।

(৩) "বসন্তকঃ। ভো বয়স্য অহমপি এতেষাং বধূপরিজনানাং, মধ্যে নৃত্যন্ মদনমহোৎসবং মানয়িষ্যামি।

রাজা। এবং ক্রিয়তাম্।

বিদূ। যদাজ্ঞাপয়তি ভবান্ (ইতি উত্থায় চেট্যোর্মধ্যে নৃত্যতি)" রত্না।

(৪) "কিং ভুজঙ্গনির্ম্মোকঃ খাদিতুং মাং নিপতিতঃ ?"—বিক্রমোর্ব্বশ্যাম্ ২।

(৫) (আকর্ণ্য সভয়ং নিবৃত্য রাজানং হস্তে গৃহীত্বা সসম্ভ্রমম্ ?

বিদূ—ভো বয়স্য এহি পলায়াবহে।

রাজা—কিমর্থম্।

বসন্ত—ভো এতস্মিন্ বকুলপাদপে কোঽপি ভূতস্তিষ্ঠতি।

কিন্তু যখন স্থিরীকৃত হইল সেটা ভূত নহে, একটা শারিকামাত্র তখন তাহার লম্ফঝম্প দেখে কে?

"বসন্তক। যদি তাই হয়। তবে আমাকে বাধা দিবেন না।

(সক্রোধে লাঠী তুলিয়া) আরে দাসীপুত্রী। দাঁড়া মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়া। খলের হৃদয়ের মত কুটিল এই লাঠীর দ্বারা পাকা কৎবেলের মত তোকে গাছথেকে মাটীতে ফেল্‌ব।" (১)

সুতরাং বিদূষককে ভীরু বলাটা ঠিক্ হয় নাই। যেখানে বিপদের আশঙ্কা নাই সেখানে তাহার মত সাহসী আর কে? যখন দুষ্মন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "সখে, শকুন্তলা দর্শনে কৌতূহল আছে কি? বিদূষক বলিল "প্রথমে অবাধ কৌতুহল ছিল, কিন্তু এখন রাক্ষস বৃত্তান্ত শুনিয়া সবাধ হইয়াছে।" কিন্তু বিদূষককে রাজধানীতে পাঠাইতে হইল, রাক্ষসের কবলে আর যাইতে হইল না। তখন বিদূষকের সাহস দেখে কে?

"বিদূ। আপনি তা ব'লে আমাকে রাক্ষসভীরু বলে ঠাওরা'বেন না।

রাজা। হে মহাব্রাহ্মণ, তোমার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা সম্ভব নয়।" (২)

যাহাদের অপকার করিবার কোনও ক্ষমতা নাই তাহাদের উপর সে অতুলনীয় বিক্রম দেখাইতে পারে। আম্রমুকুল, পারাবত, শারিকা—এই সকল পদার্থই তাহার বীরত্বপ্রকাশের স্থান। (৩)

কিন্তু মৃচ্ছকটিকের বিদূষক একটু স্বতন্ত্র ধরণের। বিপৎকালেও তাহার

রাজা—ধিঙ্ মূর্খ। বিস্রব্ধং গম্যতাম্। কুত ঈদৃশানাম্ অত্র প্রভাবঃ?

বসন্তক—স্ফুটাক্ষরমেব মন্ত্রয়তে, যদি মম বচনে ন প্রত্যয়ঃ তদগ্রতো ভূত্বা স্বয়মেব আকর্ণয়।" রত্না ২।

(১) "ভো বদ্যেবং মা খলু মাং নিবারয়। (সরোষং দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য) আঃ দাস্যাঃ পুত্রি * * * তিষ্ঠ, তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্ত্তম্। এতেন পিশুনজনহৃদয়কুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন পরিপক্কমিব কপিত্থফলম্ অস্মাদ্ বকুলপাদপাদ্ আহৃত্য ভূমৌ পাতয়ামি। রত্না ২।

(২) "রাজা। মাধব্য অপ্যস্তি তে কৌতুহলং শকুন্তলাদর্শনং প্রতি।

(৩) "ভো বয়স্য তিষ্ঠ তাবদ্ অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়ামি"। শকু ৬।

"দাস্যাঃ পুত্র দুষ্টপারাবত তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাবদেতেন দণ্ডকাষ্ঠেন সুপক্কমিব চূতফলম্ অস্মাৎ প্রাসাদাৎ ভূমৌ পাতয়িষ্যামি"। মৃচ্ছ ৫।

বিদূ। "প্রথমমপরিবাধমাসীদ্ ইদানীং তু সপরিবাধম্।"

বিদূ। ভো রাক্ষসভীরুং মা মামবগচ্ছ।

রাজা। ভো মহাব্রাহ্মণ, কথমিদং ত্বয়ি সম্ভাব্যতে?"—শকু ২।

সাহস দেখা যায়। বসন্তসেনা যখন অন্ধকারে রাজশ্যালক শকারের হস্ত হইতে পলাইয়া গিয়া চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লইল তখন শকার বসন্তসেনা ভাবিয়া চারুদত্তের দাসী রদনিকাকে ধরিল।

রদনিকা। আর্য্য মৈত্রেয় আমার দুর্দ্দশা দেখ।

*　　*　　*

বিদূষক। (সক্রোধে লাঠি তুলিয়া)। না তা হবে না। আরে নিজের গৃহে কুক্কুরও ভীষণ হয়, আমি ত ব্রাহ্মণ। আমাদের ভাগ্যের মত বাঁকা লাঠীর দ্বারা তোর মাথাটা ঘুণধরা বাঁশের মত প্রহারে প্রহারে চূর্ণ ক'রে, দেব। (১)

বাস্তবিকই সৃষ্টিছাড়া এই মৃচ্ছকটিকের বিদূষক। ইহার কথা পরে আরও বলিব।

বিদূষক মুখর ও কলহপ্রিয়। কোন্দলে তাহার ঋষি নারদের মতই আনন্দ।

বিদূষকের কলহপ্রিয়তা।

তবে পার্থক্য এই যে, নারদ নিজে কলহ করেন না, অপরের মধ্যে কলহ বাধাইয়া থাকেন, বিদূষক নিজেই কলহ করিতে ভালবাসে। তাহার মুখের বুলি "দাস্যাঃ পুত্র"। তবে যদি কেহ ইহা হইতে বুঝিয়া থাকেন যে বিদূষকের কলহ, মারামারিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত। যেখানে মারামারি হয় বিদূষক তাহার নিকট দিয়াও যায় না। তাহার যত বীরত্ব মুখে। এই মৌখিক বীরত্বে সে রাজসেনাপতিকেও পর্য্যস্ত করে। যখন সেনাপতি আসিয়া রাজা দুষ্মন্তকে মৃগয়া সম্বন্ধে উৎসাহিত করিতেছিল, তখন বিদূষক ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল—'যাও আর উৎসাহ বাড়াইতে হইবে না। অনেক কষ্টে ইঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি। একদিন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে নরনাসিকালোলুপ বৃদ্ধ ভল্লুকের মুখে পড়িবে।' (২)

তাহার কলহের প্রধান অস্ত্র—নিন্দা ও গালি। সেটা আমরা তাহার নামের

---

(১) "রদনিকা। আর্য্য মৈত্রেয়, পশ্য মে পরিভবম্।

*　　*　　*　　*　　*

বিদূ। (সক্রোধং দণ্ডকাষ্ঠমুদাস্য) মা তাবৎ। ভো স্বকে গেহে কুক্কুরোঽপি তাবৎ চণ্ডো ভবতি, কিং পুনরহং ব্রাহ্মণঃ? তদেতেন অস্মাদৃশভাগধেয়কুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন দুষ্টস্য শুষ্কবেণুকস্যেব মস্তকং তে প্রহারৈঃ কুট্টয়িষ্যামি।"

—মৃচ্ছকটিকে ১মঃ অঙ্কঃ।

(২) 'অপেহি রে উৎসাহহেতুক। অত্র ভবান্ প্রকৃতিমাপন্নঃ। ত্বং তাবৎ অটবীমাহিণ্ডমানো জীর্ণঋক্ষস্য কস্যাপি মুখে পতিষ্যসি।' শকুন্তলা ২য়ঃ অঙ্কঃ।

ব্যুৎপত্তি হইতেই বুঝিতে পারি। (১) কিন্তু তাহার এই নিন্দাপ্রিয়তা সময়ে সময়ে তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে। রাণী বাসবদত্তার বেশ ধারণ করিয়া রাজার প্রেম-পাত্রীসাগরিকা রাজার সহিত মিলিত হইবে এ কথা জানিতে পারিয়া রাণী-বাসবদত্তা নিজেই সঙ্কেতস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাগরিকাভ্রমে রাজা তাঁহার সহিত প্রেমালাপ আরম্ভ করিলেন। বিদূষক বলিল—'সাগরিকে আপনি নির্ভয়ে প্রিয় বয়স্যের সহিত আলাপ করুন। আপনার মৃদুমধুর বাক্য প্রিয় বয়স্যের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করুক। আজিও তাহা দেবী বাসবদত্তার কটুবাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া আছে।' (২)

বলা বাহুল্য বিদূষকের মুখে নিজের নিন্দা শুনিয়া রাণীর মনে বিশেষ আনন্দ হয় নাই। তিনি জনান্তিকে পরিচারিকা কাঞ্চনমালাকে বলিলেন—'শুন্‌ছিস্ কাঞ্চনমালা আমি হ'লাম কটুভাষিণী আর যত প্রিয়ভাষী ঐ বসন্তক।' (৩) কাঞ্চনমালাও নিজের অঙ্গুলি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'হতভাগা এই কথা তোকে আবার মনে কোর্‌তে হবে।' (৪) পরে বিদূষককে সত্যসত্যই এই কথা মনে করিতে হইয়াছিল, কারণ ক্রুদ্ধা বাসবদত্তার আদেশে কাঞ্চনমালা বিদূষককে লতা-পাশে বাঁধিয়া উত্তম মধ্যম দিয়াছিল।

এরূপ মর্ম্মান্তিক বাক্য বিদূষক ব্যবহার করে যে তাহা শুনিলে শ্রোতার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে। বসন্তসেনার গৃহে গিয়া তাহার মাতাকে দেখিয়া পরিচারিকাকে বিদূষক বলিল—'অহো অস্যাঃ ডাকিন্যাঃ উদর বিস্তারঃ!' 'অহো এই ডাকিনীর কি বিশাল উদর।' মালবিকাগ্নিমিত্রে দুইজন নাট্যাচার্য্যকে রাগাইবার জন্য বিদূষক বলিল—'মিছামিছি ইহাদিগকে বেতন দিয়া লাভ কি'? (৫) রাণী ধারিণী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'তুমি বড়ই কলহপ্রিয়।' (৬) রাণীর এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

---

(১) বিশেষেণ দূষয়তি নিন্দতীতি বিদূষকঃ।

(২) ভবতি সাগরিকে বিশ্রব্ধা ভূত্বা প্রিয়বয়স্যমালাপয়। অদ্যাপি তাবদ্দেব্যাঃ বাসবদত্তায়াঃ দুষ্ট বচনৈঃ কটুকিতৌ কর্ণৌ সুখয়তু মৃদুমধুরবচনোপন্যাসঃ।
—রত্নাবলী তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(৩) 'হঞ্জে-কাঞ্চনমালে, অহমীদৃশী কটুবচনা। আর্য্যবসন্তকঃ পুনঃ প্রিয়ংবদঃ'।
— রত্না, তৃতীয়োঽঙ্কঃ)

(৪) 'হতাশ স্মরিষ্যসি ইদং বচনম্'। (রত্না ৩)

(৫) 'কিং মুধা বেতন দানেন এতয়োঃ'। মালবিকাগ্নিমিত্র—১মোঽঙ্কঃ।

(৬) 'ননু কলহপ্রিয়োঽসি'। ঐ

বিদূষকের পরিহাস-কুশলতা।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় বিদূষক নর্ম্মভাষণে কিরূপ দক্ষ। কথায় কথায় তাহার পরিহাস। এই পরিহাসের পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সে রাজাকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া কথা কয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রত্নাবলী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক একটী শারিকাকে ভূত মনে করিয়া রাজার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু যখন শুনিল সেটা শারি—ভূত নহে—তখন সে রাজার উপরে 'উল্টা চাপ' দিল। সে বলিল—"ভোঃ বয়স্য ত্বং ভয়ালুকঃ যেন শারিকাং ভূত ইতি মন্যসে" "বয়স্য তুমি নিশ্চয়ই ভীরু, যেহেতু একটা শারিকাকে ভূত মনে করিতেছ।"

রাজা উত্তর করিলেন—ধিক্ মূর্খ! তুমি নিজে যাহা করিয়াছ তাহা আমার স্কন্ধে চাপাইতেছ।

মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে বিদূষক এবং চেটের কথোপকথন বড়ই হাস্যোদ্দীপক।

বিদূ—কুম্ভীরক, ভিতরে আয়।

চেট—(প্রবেশ করিয়া) আর্য্য, বন্দনা করি।

বিদূ—আচ্ছা, তুই এ রকম দুর্দ্দিনে অন্ধকারে এসেছিস্ কেন?

চেট—তিনি এসেছেন (এষা সা)

বিদূ—কেরে কে? (কা সা কা)

চেট—তিনি গো তিনি? (এষা সা)

বিদূ—অরে দাসীপুত্র, দুর্ভিক্ষপীড়িত বুড়ো ভিখিরীর মত তুই সাঁ সাঁ কচ্ছিস কেন বল্ দেখি?

চেট—তুমিই বা কাকের মত কা কা কচ্ছ কেন বল দেখি?

বিদূ—খুলে বল্।

চেট—(স্বগতঃ) আচ্ছা এই ভাবেই বলি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি।

বিদূ—তোর মুখে লাথি।

চেট—বলি জান কি আঁবের বোল কবে হয়?

বিদূ—গ্রীষ্মকালে রে বেল্লিক গ্রীষ্মকালে।

চেট—না গো মশায় তা' নয়।

বিদূ—(চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া) ওরে মূর্খ তবে বসন্তে।

চেট—তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করি। সুসমৃদ্ধ গ্রাম কে রক্ষা করে?

বিদূ—রাস্তা রে বেটা রাস্তা।

চেট—না গো তা'নয়।

বিদূ—(চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া) সেনা রে বেল্লিক সেনা।

চেট—এইবার দুটো কথা এক সঙ্গে করে বল দেখি।

বিদূ—সেনা বসন্তে। সেনা বসন্তে।

চেট—না গো ঘুরিয়ে বল।

বিদূষক—(ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) সেনা বসন্তে।

চেট—অরে মূর্খ পদ দুটো উল্টিয়ে বল।

বিদূ—(নিজের পদদ্বয় ঘুরাইয়া) সেনা বসন্তে।

চেট—ওরে নির্ব্বোধ কথা দুটো উল্টিয়ে বল।

বিদূ—(অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) বসন্ত সেনা।

এইরূপে কোথাও বা বুঝিয়া কোথাও বা না বুঝিয়া আপনার নর্মভাষণের দ্বারা বিদূষক সামাজিকগণের হাস্যরস উদ্দীপিত করে।

বিদূষকের চরিত্রে এই সকল লঘুতা থাকিলেও তাহার একটী গুণ আছে—

বিদূষকের প্রভুভক্তি।

সে বড়ই প্রভুভক্ত। প্রভুর কথায় সে উঠে বসে। সেটা যে কেবল তোষামোদ তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়। প্রভুর দুঃখে সে দুঃখী, প্রভুর সুখে সে সুখী। যদি তাহার এই প্রভুভক্তি আন্তরিক না হইত, তাহা হইলে কোথাও না কোথাও সে ধরা পড়িয়া যাইত। যদি তাহার প্রভুভক্তি অকৃত্রিম না হইবে তাহা হইলে রাজাই বা কেন তাহাকে নিজের রহস্যগুলি সব জানাইবেন। যদি সে রহস্য বিদূষক কখন প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া থাকে, সে তাহার প্রভুভক্তির অভাবে নহে,—নির্বুদ্ধিতার জন্য। রাজাও বিদূষককে শুধু বিদূষক বলিয়াই জানেন না, তাহাকে নিজের অন্তরতম বন্ধু বলিয়াই ভাবেন। সেইজন্য যখন বিদূষক দুষ্মন্তকে বলিল—'মহারাজ, আমার আবার সৌন্দর্য্য দেখিবার বাকী কি? আপনিই ত আমার নয়ন সমক্ষে রহিয়াছেন।' তখন দুষ্মন্ত বলিলেন 'সর্ব্বঃ খলু কান্তমাত্মানং পশ্যতি' সকলেই নিজকে (নিজের বস্তুকে) সুন্দর দেখে! রাজার এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি আপনাকে তাঁহার বয়স্য হইতে ভিন্ন মনে করিতেন না। যদি প্রাণে প্রাণে টান না থাকে তাহা হইলে এতটা কি সম্ভব?

এই প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে মৃচ্ছকটিকের বিদূষক। যখন চারু-

দত্তকে ভবযন্ত্রণায় মুক্তি দিবার নিমিত্ত মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন এই বিদূষক—এই মুখর, চপল, অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই চণ্ডালগণকে কি বলিয়াছিল জানেন? "ভোঃ ভদ্রমুখা মুঞ্চত প্রিয় বয়স্যম্ চারুদত্তম্ মাম্ ব্যাপাদয়ত" হে ভদ্রগণ প্রিয়বয়স্য চারুদত্তকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে বধ কর। কি মহান্, কি উদার এই স্বার্থত্যাগ! যখন চারুদত্ত দারিদ্র্যের চরম সীমায়, যখন সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাহার প্রতি একান্ত অপ্রসন্না, যখন বন্ধুরাও তাহার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না তখনও এই চপল ব্রাহ্মণ ছায়ার মতই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, চারুদত্তের আহত গরিমায় সান্ত্বনার পীযূষ ধারা ঢালিয়া দিয়াছে; জননী যেমন পুত্রকে সকল দুঃখ সকল বিপদ্ সকল অমঙ্গল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন, তেমনই করিয়া তেমনই স্নেহের সহিত তেমনই আগ্রহের সহিত সে চারুদত্ত ও তদীয় দুঃখ রাশির মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারুদত্তের দাসী রদনিকা যখন শকারের হস্তে লাঞ্ছিতা হইল, বিদূষকই তাহাকে, সে কথা জানাইয়া ব্যথিত চারুদত্তের হৃদয়ে আরও ব্যথা দিতে নিষেধ করিল।

বিদূষকের শুদ্ধ চরিত্র।

বিদূষকের আরও একটী গুণ তাহার চরিত্রের নির্ম্মলতা। নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাস বড়জোর নিন্দা ইহাতেই তাহার আড়ম্বর-শূন্য দিনগুলি কাটিয়া যায়। লাম্পট্য কাহাকে বলে সে তাহা জানে না। এই জন্যই রাজান্তঃপুরে তাহার অবাধগতি। রাণীরাও তাহার সহিত আলাপ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না।

কিন্তু নিজে প্রণয়-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হইলেও সে রাজার প্রণয়কার্য্যে সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজা অগ্নিমিত্র মন্ত্রীর সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত এমন সময় বিদূষক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অয়মপরঃ কার্য্যান্তরসচিবোঽস্মাকমুপস্থিতঃ" এই আমার কার্য্যান্তরের (প্রণয়-ব্যাপারের) মন্ত্রী আসিয়া হাজির। বস্তুতঃ মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক রাজার প্রণয়-ব্যাপারে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিজের নির্বুদ্ধিতা বশতঃ সহায়তা করা দূরে থাকুক সে নানারূপ বিঘ্নই উপস্থিত করিয়াছে। উর্ব্বশী সংক্রান্ত রহস্য ভেদ করিয়া দিয়া বিদূষক রাজা পুরূরবাকে রাণী ঔশীনরীর বিরাগভাজন করিয়া তুলিল। দুষ্মন্ত অবশ্য এ বিষয়ে কতকটা সাবধান হইয়াছিলেন। যখন বিদূষকের নগর যাত্রা স্থির হইয়া গেল, পাছে সে শকুন্তলা সংক্রান্ত রহস্য ভেদ করিয়া ফেলে এই ভয়ে দুষ্মন্ত বলিলেন—"দেখ বয়স্য, শকুন্তলা সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি

সব মিথ্যা কথা। ভুলিয়া যাও।' নির্ব্বোধ বিদূষকও তাহা এমন ভাবেই বিস্মৃত হইয়াছিল যে যখন শকুন্তলা রাজসভায় নীত হইলেন তখনও রাজাকে মনে করাইয়া দিবার জন্ত তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল না। তথাপি বিদূষক প্রণয়-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। দৌত্যকার্য্য পূর্ব্বপরিণীতা মহিষীগণের চক্ষে ধূলিপ্রদান, নিভৃতে প্রণয়িনীর সহিত প্রভুর মিলন ঘটান ইত্যাদি তাহার ডায়েরী খুঁজিলে পাওয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য, এই দুইটী কথা বিশ্বনাথ বিদূষকের লক্ষণের মধ্যে ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—একটী বিদূষকের নির্ব্বুদ্ধিতা অপরটী তাহার ঔদরিকতা। প্রথমটীর কথা পূর্ব্বেই স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে, অপরটীর কথা এই স্থানে কিছু বলিব।

বিদূষকের ঔদরিকতা।

বিদূষক উদর সর্ব্বস্ব। ভোজন পাইলে তাহার আনন্দ দেখে কে? সকল স্থানেই সে ভোজনের সম্ভাবনা দেখে। (১) ভোজনের মত অনায়াসসাধ্য আর কিছু সে জানে না। (২) বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে সে জগৎকে মোদকময় চিন্তা করে। "হী হী ভো এষঃ খণ্ড মোদক সদৃশঃ উদিতো রাজা ওষধীনাম্" "হাঃ হাঃ মোয়ার মত চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন।" কিন্তু এখানেও মৃচ্ছকটিকের বিদূষক স্বতন্ত্র ধরণের। সূত্রধার যখন তাহার গৃহে ভোজনের জন্ত বিদূষককে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল তখন সে বলিল—"ভোঃ অন্যং ব্রাহ্মণং নিমন্ত্রয়তু ভবান্" "তুমি অন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর।" বিদূষকের পক্ষে নিমন্ত্রণত্যাগ অদ্ভুত নহে কি?

এই সকল দোষগুণ যখন আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করি, তখন দেখিতে পাই, বিদূষকের পক্ষে দোষগুলিও বাস্তবিক গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল দোষ না থাকিলে সে হাস্যরসের অভিনয় করিতে পারিত না। কাজে কাজেই সংস্কৃত নাটক কতকটা বৈচিত্র্যহীন হইত। বৈচিত্র্যই নাটকাদির জীবন। সে বৈচিত্র্য না থাকিলে, জগতের সাহিত্য মধ্যে সংস্কৃত নাটক যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে তাহা সম্ভবপর হইত না। অতএব সংস্কৃত নাটকের পঞ্জর স্বরূপ এই বিদূষক। তার পরে এই যে দোষগুলি সেগুলি তাহার শুদ্ধ চরিত্র, প্রভুভক্তি গুণে ঢাকিয়া যায়। কাজেই আমরা বিদূষককে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না।

---

(১) সর্ব্বত্রৌদরিকস্যাভ্যবহার্য্যমেব বিষয়ঃ—(বিক্রমোর্ব্বশী ৩)

(২) সর্ব্বমপি ঔদরিকস্য অভ্যবহারে এব পর্য্যবস্যতি। (রত্নাবলী ২)

রাজা—বয়স্য একস্মিন্ অনায়াস-সাধ্যে কর্ম্মণি ভবতা সহায়েন ভবিতব্যম্।

বিদূ—কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্।—(শকুন্তলা ২)

রাসলীলা।

["ও পারের কথা"র লেখক]

কালের অনন্ত প্রবাহে কত সহস্র সহস্র পৌর্ণমাসী যামিনীর ঘটনাবলী বুদ্বুদের ন্যায় দেখা দিয়াই বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দ্বাপরের একটী মাত্র লীলা—যাহা ৺বৃন্দাবন ধামে কোন শরৎকালীন এক রজনীতে সাধিত হইয়াছিল —শত শত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও ভারতবাসী উহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু হায়! সেই লীলাকে ধর্ম্মজীবনের কীর্ত্তিস্তম্ভ না করিয়া দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতি নানা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুগণ এক্ষণে উহাকে মলিন হইতে মলিনতর করিয়াছেন। সুতরাং সেই লীলা জাতীয় কলঙ্ক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। মনে হয়, এবম্বিধ আচরণের জন্য ভারতের আজ এই দশা!

এই লীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকাগণ শ্রীমতী রাধা সহ ষোল শত গোপমহিলা। স্থান—সন্নিকটস্থ উপবন। লীলা—প্রত্যেক মহিলা সহ একজন মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এত শত শ্রীকৃষ্ণ আকারে আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি; যে কোন কারণে কোন কোন মহিলা সেই লীলায় যোগদান করিতে পারেন নাই, তাহারাও স্ব স্ব গৃহে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ ও সম্ভাষণ সুখ কখন প্রত্যক্ষ ও কখন বা প্রাণে প্রাণে উপভোগ করিয়াছিলেন।

ভাগবত গ্রন্থ ব্যতীত কোন জাতির ধর্ম্ম বা অন্য পুস্তকে এবপ্রকার ঘটনার উল্লেখ নাই। আধুনিক বিজ্ঞান ও বুধগণ এই রহস্য ভেদে পশ্চাৎপদ। হিন্দুজাতির মধ্যে যাঁহারা এই লীলার পৃষ্ঠপোষক, তাঁহাদের দশাও তদ্রূপ। সুতরাং কোন শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত জীব এই ঘটনা কেবলমাত্র কল্পনা-প্রসূত বা ভাষার অলঙ্কার মাত্র, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি? সুতরাং এই লীলায় প্রশ্রয় প্রদান করা দারুণ বর্ব্বরতা বা ভীষণ অশ্লীলতার পরিপোষক, এ কথা বিদেশীয়গণের সহিত বিদেশীয় প্রণালীতে শিক্ষিত ভারতবাসীও নিঃশঙ্কচিত্তে বলিবেন না কেন? মানবের হৃদয়াকাশে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা মধ্যে এই লীলা সম্বন্ধে যে দুর্ভেদ্য তমসাবরণ রহিয়াছে বা শ্রীকৃষ্ণের সেবক সেবিকাগণের মধ্যে যে দারুণ কুসংস্কার বা কুৎসিত ধারণা কালিমা-অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, উহার জন্য হিন্দুজাতির শিক্ষিত সমাজ ও যাজক শ্রেণী দোষী নহে কি?

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জনসাধারণের যে বিদ্বেষের বা অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়, উহার জন্য বৈষ্ণব-সমাজও দায়ী নহেন কি? ইহা অকর্ম্মবাচ্য নহে কি?

কুমুদিনী-কান্ত শরৎকাল কি মাধুর্য্যপূর্ণ, কি আনন্দপ্রদ ও কি শান্তিদায়ক, প্রকৃতি-সেবক কবিই আপন ভাষায় ব্যক্ত করিতে সক্ষম। উপবনে প্রভাসিত শরৎ-শশীর কিরণজাল ও তত্রস্থ মৃদুমন্দ-সঞ্চারিত পবন কোন্ প্রাণে স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি আনয়ন না করে? জনতা ও মলিনতা পূর্ণ মানব-সমাজের ও মানব-সঙ্গের পরিবর্ত্তে চিত্তরঞ্জিনী-শান্তিময়ী প্রকৃতি দেবীর বিশাল ক্রোড় কি আরাম-প্রদ ও কি প্রকার চিত্তের উৎকর্ষতা সাধক, যাঁহারা কোন দিন—কোন সময়ে ক্ষণেকের জন্য এই অমূল্য সুখ উপভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা এক মুখে নয়—শত কণ্ঠে ইহার গুণানুকীর্ত্তন করিবেন। সুতরাং কাল ও লীলাস্থান নির্ব্বাচন-শক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ—এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক মাত্র—তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

রাসলীলা যথাসম্ভব স্থূলভাবে আদিরসের লীলা মাত্র। অত্যুচ্চ জ্ঞানের ও অপরিসীম প্রেমের সম্মিলনে সূক্ষ্মতম ভাবে যে বিহার সুখ, যে আনন্দ ও যে শান্তি উপভোগ হইয়া থাকে, উহারই নাম আদিরস। জ্ঞানের ও প্রেমের আকার নাই বটে, কিন্তু উহাদের কার্য্যকারিণী শক্তি আছে। এই জ্ঞানের ও প্রেমের সম্মিলনে লৌকিক বা পশুবৎ বিহারকার্য্য না থাকিলেও সূক্ষ্মতম ভাবে সম্ভোগ কার্য্য অহোরহঃ সাধিত হইতেছে। এবম্প্রকার সম্ভোগের সুফল অনন্ত জীবন ও অনন্ত সুখ। ইহাই সচ্চিদানন্দময় বা সচ্চিদানন্দময়ী অবস্থা। আদিরসের অবস্থায় মানব-মন আত্মাসম চৈতন্যময়ী হইয়া শিবলিঙ্গস্থ গৌরীপট্ট ভাবাপন্ন হয়। সেই মন তখন প্রেমময়ী ভাবে জীবদেহস্থিত সর্ব্বগুণাকর আত্মার সহিত সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিয়া অনন্তের খেলায় যোগদান করে। জীব এই অবস্থায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এক্ষণে আদিরসের গতি-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপেই বলা যাউক।

সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অগোচর নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্ম সহ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের উপাদান পূর্ব্বোক্ত অত্যুচ্চ জ্ঞান ও অপরিসীম প্রেম। উভয়ের সম্মিলনে মহা-শক্তির আবির্ভাব। সীমাবদ্ধ ও নানা অগুণে পূরিত জীবের পক্ষে এই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্য ব্রহ্মের সগুণাবস্থাও বাক্য-মনের অগোচর। সগুণ ব্রহ্ম হইতে অবতারগণের অভ্যুদয়। অবতার-

গণের নিম্নাবস্থা দেব-দেবীগণের। তবে ৺কালী, দুর্গা প্রভৃতি যে উদ্দেশে কল্পিত হইয়াছে, উহা সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা। দেবদেবীগণের নিম্নাবস্থা—উপদেবতাগণের। উপদেবতাগণের নিম্নাবস্থা—প্রেতলোকের। তৎপরে জগৎবাসীর। তবে ইহলোকবাসীর অধিকাংশ জীব প্রেতলোক হইতে অধিগমন করিলেও অবতার, দেবতা ও উপদেবতা শ্রেণী হইতেও অল্প সংখ্যায় মর্ত্ত্যধামে আসিয়া থাকেন। আবার ক্রমবিকাশ বিধানে অল্প সংখ্যক জীব পশু হইতে মানব মানবী আকার ধারণ করিতেছে।

সগুণ ব্রহ্মের আত্মাময় অবস্থা ও অবতার-রাজ্য হইতে ইহলোক পর্য্যন্ত মনোময় অবস্থা। মনোময় অবস্থা সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম কিন্তু কালিমা আকার বিশিষ্ট ও স্থূলাকার বিশিষ্ট। সগুণ ব্রহ্মে যেমন আদিরসের খেলা অহোরহঃ চলিতেছে, মনোময় অবস্থায় ও স্থূলত্ব অনুসারে ক্রমশঃ অল্পমাত্রায় কিন্তু স্থূলভাবে সেই একই ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। সুতরাং মানবের সম্ভোগ সুখ অতীব অকিঞ্চিৎকর। মানবের মনে যেমন পশুবৎ উপাদান বিদ্যমান, তেমনি সীমাবদ্ধ জীবের সম্ভবপর অত্যুচ্চ উপাদানও আছে; সুতরাং জীব এ রাজ্যের অল্পক্ষণস্থায়ী, কষ্টপ্রদ ও হেয় সম্ভোগ সুখের তৃষা বর্জ্জন করিলে দেহাবসানে নিঃসন্দেহে উচ্চতম বিহার-সুখের অধিকারী অধিকারিণী হয়। এই বার্ত্তা জ্ঞাপন উদ্দেশে ও কি উপায়ে সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, সেই সেই কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য মহাপুরুষগণ একমাত্র জীবের কল্যাণ-সাধনায় মানব আকারে আবির্ভূত হয়েন। ৺বৃন্দাবন ধামের রাসলীলাও এই মহান্ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। হায় হিন্দু বৈষ্ণব-সমাজ! নারিকেল ফলের অন্তঃস্থ সত্ত্বের (শাঁসের) প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি না রাখিয়া বহিরাবরণের (ছোবড়ার) জন্য লালায়িত! মনে হয়, সত্যের ও চিন্তাশীলতার অভাবে বরং উচ্ছ্বাসের ও বাহ্যাড়ম্বরের আধিক্যবশতঃ অকর্ম্মই ধর্ম্মবাচ্য হইয়াছে! এইজন্য কর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পন্থা জগতের শীর্ষ স্থানে আসন না পাইয়া দিন, দিন অনাদৃত হইতেছে! তাহা হইলে বৈষ্ণব-সমাজের বিধেয় নয় কি, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন না করিয়া আপনাদিগকে সংযত করা? তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শে ভারতবাসী হিন্দুজাতি উন্নত হইবার সম্ভাবনা নহে কি? তাহা হইলে হীনতা নিরসনকারী হিন্দু আখ্যার সমুচিত সম্মান রক্ষা হয় না কি?

এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে, এই লীলায় গোপগণকে যোগদান

করিবার অবসর না দিয়া কেবল মাত্র মহিলাগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন কেন? উত্তর :—

১। বুড়ো শালিক-পাখীকে বিধিমত শিক্ষা প্রদান করা হইলেও সে নিজ সাধা-বুলি সাধিবেই সাধিবে। তেমনই জাগতিক চিন্তায় ও কার্য্যে অভিভূত গোপগণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠা গোপ-রমণীগণ সংস্কার বশতঃ আপন আপন ধারায় চলিবেই চলিবে; সুতরাং তাহাদিগকে নূতন কিছু শিক্ষা প্রদান করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

২। কাঁচা বাঁশই নতশীল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকচ্ছলে গোপ-বালকগণকে আদর্শ দেখাইয়া কত কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু সকল মহিলা সে শিক্ষা লাভের অবকাশ পান নাই।

৩। রমণীকুল সাধারণতঃ ভক্তিময়ী ও সামান্য আদরে বা মিষ্ট কথায় বিগলিতা হয়েন, এই জন্য তাঁহাদিগকে অভিরুচি মত কর্ম্মসাধান সহজসাধ্য।

৪। শত শত নারীর মধ্যে পুরুষগণ থাকিলে নারীগণের সংকোচ আসিবার কথা। ইহা ব্যতীত পুরুষগণের চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বা উৎক্ষিপ্ততার জন্য সেই চিন্তা নারীকুলের প্রতি প্রধাবিত হইয়া নারীকুলের বিশেষ ক্ষতিসাধন করিতে পারে।

৫। নিজ ইষ্টকে কান্তভাবে সাধন বিশেষতঃ পুরুষদিগের পক্ষে বিশেষ শুভকর। এই উপায়ে মানব-মানবীর প্রবল কাম রিপুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বিশেষ সম্ভাবনা।

৬। মানব অযথা চিন্তাকুলতার ও অধীরতার জন্য ইচ্ছাশক্তির হ্রাসে অধিকাংশ জীব নারীশ্রেণীভুক্ত।

৭। প্রকৃত আদর্শ দেখাইয়া মানবকে পাশববৃত্তি হইতে আদিরসের অধিকারী করা।

পুরুষদিগের বদ্ধমূল ধারণা যে, প্রকৃতি-দত্ত বাহ্য অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জন্য তাঁহারা বাস্তবিক পুরুষবাচ্য বা ঐ শ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদের জানা কর্ত্তব্য যে, নিজ নিজ মনের ও কর্ম্মের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা হিসাবে বিধাতার বিধানে তাঁহারা বাহ্যভাবে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, উচ্চ বা নীচ জাতি ও পুরুষ বা ক্লীব অথবা নারীশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন ও হইবেন। সুতরাং জাত্যভিমান বা পুরুষ বাচ্য হইবার সাধ নিজ নিজ মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে ও তীব্র বৈরাগ্য বলে জীব জাগতিক সাধ্যাসাধ্যের, হর্ষ বিষাদের ও অব্য-

বস্থিত চিত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইলে পুরুষবাচ্য হয়েন। বৈরাগ্য অর্থে ইহা বুঝা কর্ত্তব্য যে, কেবলমাত্র গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গৃহত্যাগ করা বৈরাগ্য-বাচ্য নহে। দম্ভে বৈরাগ্য, লোভে বৈরাগ্য, ক্রোধে বৈরাগ্য, হিংসায় (বা ঈর্ষায়) বৈরাগ্য, কুৎসায় বৈরাগ্য, অসত্যে বৈরাগ্য, অধৈর্য্যে বৈরাগ্য, আলস্যে বৈরাগ্য, উল্লাসে বৈরাগ্য, অকর্ম্মে বৈরাগ্য, অভিমানে বৈরাগ্য, অসন্তোষে বৈরাগ্য, অকৃতজ্ঞতায় বৈরাগ্য, স্বার্থপরতায় বৈরাগ্য, আত্মশ্লাঘায় বৈরাগ্য, যা-তা ভাবনায় বৈরাগ্য, যা-তা বাসনায় বৈরাগ্য, যা-তা কর্ম্মসাধনে বৈরাগ্য, সময়ের অসৎ ব্যবহারে বৈরাগ্য, যা-তা বাক্যব্যয়ে বৈরাগ্য, যার-তার সঙ্গ-করণে বৈরাগ্য, ও পরমস্তকে হস্ত বুলাইয়া উদরান্ন বা পাথেয় বা অর্থের সংস্থানে বৈরাগ্য—প্রকৃত বৈরাগ্যবাচ্য। এবম্বিধ বৈরাগ্যে মানব প্রকৃত পুরুষবাচ্য হয়েন—তবেই প্রকৃত কর্ম্মবীর হওয়া ও ধর্ম্মজীবন লাভ করা সম্ভব।

গোপ-মহিলাগণ 'আত্মহারা' অবস্থায় লীলাস্থলে ধাবিতা হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র একজনের নিমন্ত্রণে ধাবিতা হইয়াছিলেন। তিনি কিন্তু এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকমাত্র। অবশ্য স্বীকার্য্য, সে নিমন্ত্রণে এমন কোন অপার্থিব আয়োজন ছিল, যাহার জন্য কুলকামিনীগণের নিকট সংসার-বন্ধন শিথিল হইল, সন্তানাদির স্মৃতি বিলুপ্ত হইল, কাহারও স্বামীর, কাহারও পিতার ও কাহারও অন্যান্য অভিভাবকগণের তাড়না নিষ্ফল হইল। সে নিমন্ত্রণে এমন অলৌকিকতা ছিল যে, সম্পূর্ণ পরাধীনা ও পরমুখপ্রেক্ষিণী মহিলাগণ সমাজের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া নিঃসঙ্কোচের ও নির্ভয়ের বসনে-ভূষণে সজ্জিতা হইলেন। নিমন্ত্রণ-স্থলে উপনীত হইবার জন্য কোন প্রকার যানের বা বাহনের বন্দোবস্ত ছিল না। মহিলা-গণ পদব্রজেই ধাবমানা হইয়াছিলেন, জাগতিক যাহা-কিছুর সহিত নিজ নিজ প্রাণ-মনেরও মমতাশূন্য হইয়া। সেই লীলাস্থলে থিয়েটারের বা গীতাভিনয়ের বা বায়স্কোপের বা সার্কাসের আয়োজন ছিল না; সেই লীলাস্থলে কোন প্রকার মুখরোচক আহার্য্য সামগ্রী ভারে ভারে রাখা ছিল না; সেই লীলাস্থলে নানা দেশীয় মনোহারী সামগ্রীর মেলা বসে নাই; সেই সম্মিলনীতে কোন প্রকার পার্থিব পারিতোষিক পাইবার সম্ভাবনা ছিল না; সেই সম্মিলনীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের মত বিদায় পাইবার বা কাঙ্গালী ভোজনের মত আয়োজন করা হয় নাই; সেই স্থলে কুমারী-ভোজনের বা সধবা-ব্রত-উদ্‌যাপনের কথা ছিল না। কিন্তু সেই লীলাভূমিতে ষোলশত মহিলাকুলে কালিমা দিবার জন্য ছিলেন—একমাত্র বালক শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের কলঙ্ক,

সমাজের কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক, হিন্দুজাতির ও ধর্ম্মের কলঙ্ক—শুধু কলঙ্ক নহে, কলঙ্কের স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজিত—একমাত্র বালক শ্রীকৃষ্ণ! এইরূপ বিচার-বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার জন্য তোমার খুর চতুষ্টয়ে এ অধম বার বার প্রণিপাত করে। তোমার খাতিরে মানিয়া লইলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ বালক নহে, তখন যৌবনারূঢ় হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, কেবল দশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ছয়শত মিনিটে ষোলশত মহিলার সর্ব্বনাশসাধন করা সম্ভব কি? এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিচারকগণের দারুণ মস্তক বিকৃতির লক্ষণ নহে কি? কোন কোন সমালোচকপুঙ্গব বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যাঁহাদের গৃহে ও বাহিরে অশান্তিই সম্বল, তাঁহাদের কর্ত্তব্য নয় কি—আপন আপন উচ্ছৃঙ্খল আত্মীয়-স্বজনের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার বা নিজ নিজ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বা প্রভুকে স্ববশে আনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের গুরুপদে বরণ করা? বুদ্ধিমান্ হইয়া কেন ভ্রাতৃবর্গ হেলায় দিন হারাইতেছ?

'আত্মহারা' চিত্তবৃত্তি নিরোধের অবস্থা। সে অবস্থায় জীবের মন এক চিন্তাকে প্রধানা করে বা এক কার্য্যে নিমগ্ন থাকে। সে অবস্থায় মনের যাবতীয় স্তরগুলি সেই একই চিন্তায় পরিপূরিত থাকে। সে অবস্থায় জীবের মন সেই চিন্তায় বা সেই কার্য্যে এমন ভাবে নিয়োজিত থাকে যে, তাহার জাগতিক সম্বন্ধ বিলীন হইয়া যায়। সে অবস্থায় সেই চিন্তনীয় সামগ্রী বা যাহা কিছু সকলই মনের ভোজ্যসেব্য হইয়া যায়। সে অবস্থায় সেই চিন্তনীয় উপাদান জগন্ময় পরিব্যাপ্ত—ইহাও গোচরীভূত হয়। ইহাই সাধনের একটী উচ্চাবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-কৌশলে ব্রজাঙ্গনাগণ এবম্প্রকার অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়াকাশে শিক্ষাদাতার কোন কথা খোদিত ছিল বা সেই শিক্ষকের মূর্ত্তি মানসপটে জাগরূক ছিল। মানব আপন-আপন মনকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে অক্ষম, কিন্তু সমগ্র বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের পদানত ছিল। কেবল মাত্র মনুই যাহাদের সম্বল, তাহাদের গৃহে ও বাহিরে অশান্তিই প্রাপ্য-গণ্ডা। তাহাদের কাহাকে বশ্যতা স্বীকার করান অসম্ভব। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শ্রীকৃষ্ণ মনের অতীত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া রাসলীলা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আত্মাময় অবস্থাই মনের অতীত অবস্থা। আত্মা—জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিসম্ভূত। যে অবস্থা চক্ষু সত্বেও অন্ধসম ও কর্ণ সত্বেও বধির সম কাল ক্ষেপণ করিতে না হয়, উহাই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা। প্রকৃত

জ্ঞানী ব্যক্তি ত্রিকালজ্ঞ। সুতরাং সাধারণতঃ যাহা জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়, উহা বুদ্ধিমত্তার অবস্থাভেদ মাত্র। **প্রকৃত প্রেম** জ্ঞানের লক্ষ্মী-শ্রী। জ্ঞান-রূপ ফলের বা ফুলের মিষ্টতা বা সৌরভ—প্রেম। ইহা মানব মনকে স্বার্থপরতার ও জাগতিক যাবতীয় আসক্তির পরিবর্ত্তে বিশ্বব্যাপী দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে বিভূষিতা করায়। মনঃপ্রাণ স্নিগ্ধকর ও শান্তিদায়ক অনির্ব্বচনীয় টানের নাম প্রেম। সেই অবস্থায় একজনের সৎগুণগুলি অপরের নিকট বিশেষ ভাবে আদৃত হয়। সেই টানে দৈহিক সম্বন্ধ বা জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া একজনের মনের সহিত অন্যের মনের **(দেহের নয়)** ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরে উভয় মন চিরকালের জন্য অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া উহারা আত্মাসম অবস্থায় উপনীত হয়। পরে উভয়ের শুভ পরিণয় হয়। প্রকৃত জ্ঞানের ও প্রকৃত প্রেমের সম্মিলনে এক **মহাশক্তির** অভ্যুদয় হয়। এই শক্তি হইতে **ইচ্ছাশক্তি** বিকশিত হয়। তৎপরে **ইচ্ছা-ফুল হইতে কর্ম্ম-সুফল** পরিলক্ষিত হয়।

[ক্রমশঃ।

গৃহস্থের বৌ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

আজ্ঞা হ্যাঁ, আমি বাঙ্গালী। ইনি আমার স্বামী। ইনি এ দেশী, তেলেগু। না, লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। অপরিচিত লোকের বিষয় কথা কওয়া মানুষের স্বভাব, বিশেষ যেখানে সমস্যা আছে। বাস্তবিকই বিদেশে আসিয়া দেশের লোকের সাক্ষাৎ পাইলে লোকের কৌতূহল জন্মে।

আমি সাত বৎসর দেশ ছাড়া। সাত বৎসর এই সমুদ্রের খেলা দেখিতেছি, সাত বৎসর দেখিতেছি এই বড় বড় ঢেউগুলা এই পাহাড়টার গায়ে আছড়া-আছড়ি করিতেছে। এ পাহাড়টার নাম ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ। সমস্ত ভিজাগাপটম্ আর ওয়াল্‌টেয়ার সহর পাহাড়ের উপর। অবশ্য এইটিই খুব বড় পাহাড়। প্রায় এক মাইল সমুদ্রের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে তাই ইহার এত শোভা।

কি বলিতেছেন? কোথা বাড়ি? আপনাদের বাড়ী কলিকাতা? পাঁচ বছু

মিলিয়া পূজার ছুটিতে এখানে আসিয়াছেন? আমার পূজা নাই। আমি খৃষ্টান।

বিস্ময় হইতেছে কেন খৃষ্টান হইলাম? খৃষ্টান না হইলে আমার উপায় ছিল না। ইনি খৃষ্টান। ইনি আমায় উদ্ধার করিয়াছেন। ইনি আমার ত্রাণ-কৰ্ত্তা। খুব কাল কুচকুচে চেহারা বটে। না, না, লজ্জিত হবেন না। কালোকে কালো বলিবেন তাহাতে লজ্জা কি? বিশেষ তখন আপনারা বুঝিতে পারেন নাই যে আপনাদের ভাষা আমরা কেহ বুঝিব। ইনি বাঙ্গালা বুঝেন না।

হ্যাঁ! কেন খৃষ্টান হইলাম? ইহাঁকে বিবাহ করিব বলিয়া, ইহাঁর স্ত্রী হইব বলিয়া, সমাজে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান পাইব বলিয়া। তখন কত বাবু, কত রাজা আমার তোষামোদ করিত, আমার ভালবাসা পাইবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিত, কত অর্থ আনিয়া পায়ে ঢালিয়া দিত, কত কাপড়, কত অলঙ্কার, কত জহরৎ উপহার দিত। কিন্তু সব গোপনে। সমাজে কেহ আমাকে স্বীকার করিতে পারিত না। সমাজে আমার স্থান ছিল না, আমি সমাজের উপরে ছিলাম। আমাকে একজন বড় মানুষের ছেলে একখানা বাড়ি দান করিয়াছিল। যে দিন সে রেজিষ্ট্রী করা দানপত্র আনিয়া আমার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—"সুশীলা এখন বুঝলে আমার ভালবাসা কত গভীর", সে দিন আমি হাসিয়া তাহাকে বলিলাম—"তোমার ভালবাসা গভীর হ'তে পারে না, কারণ তুমি মূর্খ। মূর্খ কি ভালবাসিতে পারে?" [illegible] না আমায় ভৎসনা করিলেন। আমি ভয়ে তাহার হাত ধরিলাম, বলিলাম—"ভাই ঠাট্টা কর্‌ছিলাম, আমি তোমা বই কাকেও জানি না।" হতভাগ্য একেবারে স্বর্গ হাতে পাইল! তাহার পরদিন সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর কাণের হীরার টপ্‌ চুরি করিয়া আনিয়া আমার কাণে পরাইয়া দিল।

আচ্ছা বসিতেছি। এ ধ্বজাটা নাকি ওলন্দাজদের। তাহারা প্রথমে এ দেশটা অধিকার করে। ওঃ! আমার কথা? শুনুন। স্বামীকে বাহিতে বলি। উনি ইংরাজী বলেন—তেলেগু বলেন। বাঙ্গালা জানেন না। আমি তিন রকম ভাষাই জানি, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাণের জিনিস, অন্তরের সামগ্রী। এই সমুদ্রের গর্জ্জনের মধ্যে এক একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে পূজার ঢাকের বাজনা শুনি। সত্য কথা, ভাষা জননী, জন্মভূমি জননী। আপনারা দেশে বসিয়া মুখে একথা বলেন বটে কিন্তু আমরা প্রবাসী, আমরা এ সত্য যেমন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি তেমন আপনারা পারেন না।

. বুঝিয়াছেন বোধ হয় আমার কি উপজীবিকা ছিল। আমি কি ঘৃণিত সংসারে বাস করিতাম, কি পাপ-মলিন বৃত্তি শিখিয়াছিলাম। আমার এই রূপের কুহকে কত লোক আত্মহারা হইত, আমার সঙ্গীতে কত যুবক গৃহছাড়া হইত, কত সাধ্বী নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিত, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে! আমি মখমলের শয্যায় শয়ন করিতাম, বহুমূল্য বেনারসি সাড়ি দাসীদের দান করিতাম। এখনি আমার এই কাপড়খানি পোষাকী—ইহার মূল্য মাত্র তের টাকা। কিন্তু এই কাপড়ে—কি বলছেন? এই কাপড়ে আমার রূপ বাড়িয়াছে? না লজ্জিত হইবেন না। হ্যাঁ বাস্তবিক বাড়িয়াছে—কাপড়ের জন্য নয়, মনের সন্তোষের জন্য, তৃপ্তির জন্য।

তখন বহুমূল্য সাজে সজ্জিত থাকিতাম, অন্য বারাঙ্গনারা ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিত, আমার নিজের ভগ্নী হিংসায় আমার সঙ্গে কত ঝগড়া করিত, কত ধনী, কত বিদ্বান, কত উকিল, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি হাকিম আমার মুখে প্রেমের সম্ভাষণ শুনিবার জন্য লালায়িত হইত, কিন্তু তবু আমার প্রাণে তৃপ্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। এই সমুদ্রের ছটফটানি হুড়ুম হুড়ুম অচঞ্চল ভাবটা আমি খুব বুঝিতে পারি। সাগর রত্নগর্ভা, ওর ভাণ্ডারে এত রত্ন এত সম্পদ ওর সমৃদ্ধি অসীম বলিলে চলে, তবু ওর কি চঞ্চল ভাব, কি অশান্ত জীবন। দিন নাই রাত নাই বালুকার উপর হুঙ্কার দিয়া আসিতেছে কিন্তু তরঙ্গগুলা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। সাগর কি চাহে তাহা সে নিজেই জানে না। যাহা পাইয়াছে তাহাতে সে তৃপ্ত নহে, যাহা পায় নাই তাহা পাইতে সে ব্যগ্র। আমারও প্রাণ এমনই ছিল। আমারও মনের তরঙ্গগুলা এমনি উত্তাল, এমনি অশান্ত ছিল। নূতন লোক দেখিলেই জয় করিবার বাসনা হইত; একবার জয়লাভ করিতে পারিলে আর সে বিজিত অপদার্থ গুলার কথা ভাবিতাম না, সেগুলার অসার ভালবাসার উপর ঘৃণা হইত। যাহাকে মা বলিতাম তাঁহার প্ররোচনায় সে অপদার্থগুলার কাণে মুখস্থ-করা প্রেমের কথা ঢালিয়া দিতাম, তাহারা তাহাদের ঘরের ধন সম্পত্তি আনিয়া আমার শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিত; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত, ইঙ্গিতে একটু প্রেমের কথা বলিলে প্রত্যেকে মনে করিত, আমি তাহারি।

হাসিতেছেন? আপনারা শিক্ষিত। জানি না আমার মত কোন পাপীয়সী আপনাদের এরূপ ভাবে নাচাইয়াছে কি না। আমি কত পণ্ডিত, কত বিদ্যা-দিগগজকে বাঁদর নাচাইয়াছি। একজন খুব পণ্ডিত ছিল—বিলাতে সকল পরীক্ষায়—যাক্ ব্যক্তিগত সমালোচনা।

আমরা দুই ভগ্নী ছিলাম—আমি সুশীলা, আর আমার ছোট চপলা। আমাদের মা ছিলেন। পরে শুনিয়াছি তিনি জননী নহেন, বাল্যকালে কোন প্রকারে আমাকে ও চপলাকে হস্তগত করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা কি চণ্ডালের কন্যা তাহা কেহ জানে না। তিনিও জানেন না। তিনি একশত এক টাকায় আমায় কিনিয়াছিলেন। তবু তিনি আমার মা—কারণ বেশ্যা হইলেও আমি ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম তাঁহাকে ভালবাসিয়া। তিনি আমাদের কোন অভাব বোধ করিতে দেন নাই, খুব স্নেহে পালন করিয়াছিলেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, গান বাজনা শিখাইয়াছিলেন। অবশ্য নিঃস্বার্থ ভাবে শিখান নাই—কিন্তু লেখাপড়া না শিখিলে আজ আমি গৃহস্থের স্ত্রী হইতে পারিতাম না, পাপের মাত্রাটা বুঝিতাম না, আমার জীবনের গতিটা সেই পূতিগন্ধের ভিতর আবদ্ধ থাকিত, সে খাত হইতে নূতন খাতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম না। বোধ হয় বিলাসিতার রহস্যটা না বুঝিলে দারিদ্র্যের তৃপ্তিতে প্রাণটা ভরপুর করিতে পারিতাম না, এত সচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারিতাম না। নাটক পড়িতাম, নভেল পড়িতাম, সতীত্বের কথা পড়িতাম, সতীত্বটা কি তাহা প্রথমে বুঝিতাম না; উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রাণের ভিতর যেন কিসের একটা অভাব বোধ হইত। যেন কোন একটা অজানা দেবতা দিব্য মূর্ত্তি বিকাশ করিয়া অর্ঘ্য লইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিত। ভালবাসা পেশা ছিল, মুখে কত ভালবাসার কথা বলিতে পারিতাম, দিবারাত্র কত প্রণয়ের মধুর আলাপ শুনিতাম, কিন্তু ভালবাসার যে একটা প্রকৃত স্বরূপ আছে, তাহা বুঝিতাম না। পুস্তকে ভালবাসার কথা পড়িতাম, ভাবিতাম এ কথাটা যেন কল্পনা। একনিষ্ঠার কথা শুনিয়া হাসিতাম, ভাবিতাম সে সব কথার কথা, একনিষ্ঠা মানুষের স্বভাবের বিরোধী একটা আদর্শ, সে আদর্শ কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না, ভবিষ্যতে কেহ কখনও একেশ্বরের পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে না। কিন্তু তখনও যেন প্রাণের মধ্যে কি একটা অজানা বৃত্তির জন্য একনিষ্ঠ ভাবে ব্যগ্র থাকিতাম। তখন অতটা বুঝি নাই, এখন জানি, জীবনের যত শক্তি সব একটা সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত। লম্পট বহু নারীর ভজনা করে সেই একনিষ্ঠার সম্পূর্ণ সুখটুকু ভোগ করিবার জন্য। সেটুকু পায় না বলিয়াই সে একের পর এক অনেক গণিকার দ্বারস্থ হয়। যে প্রথমেই সেটুকু পায় সে আর অন্যের দিকে তাকায় না।

একটা কথা বড় মনে বাজিত। অত পৃথিবীর সুখ, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে

একটা রহস্য বড় অতৃপ্তির সৃজন করিত। আমি দেখিয়াছি, একেলা থাকিলে প্রায় সকল হিন্দু সন্তান দেব মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দেব দেবীকে প্রণাম করে। কিন্তু আশে পাশে পরিচিত সাহেব বা শিক্ষিত বাবু থাকিলে আর তাহাদের হাত উঠে না, মস্তক নত হয় না। বোধ হয় সে মনে মনে দেবীর আরাধনা করে, কিন্তু প্রকাশ্যে দেবীকে আরাধ্যা বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না। আমারও উপাসনায় আমার ভক্তেরা ঐরূপ ভক্তি দেখাইত। প্রকাশ্যে কেহ আমাকে স্বীকার করিত না। আমি অনেক প্রমোদ-বাসরে নাচ গান করিতে যাইতাম। যাহারা আমার মুখের একটা কথা শুনিলে আপনাদের ধন্য মনে করিত, তাহারা প্রকাশ্যে আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত। বুঝিতাম প্রকাশ্য সমাজে আমার ভালবাসা দোষের। সমাজের চক্ষে আমি হেয় একথাটা বুঝিতাম, কিন্তু একথাটা মর্ম্মে প্রবেশ করিল কবে, তাহা বলিতেছি।

আমাদের পল্লীতে কেবল বারবিলাসিনীরা বাস করিত। আমাদের বাড়ীতে কেবল আমরা দুই ভগ্নী ও আমাদের পালয়িত্রী থাকিতেন। অন্যান্য বাড়িতে একাধিক বেশ্যা পরিবার বাস করিত। আমাদের অনেক অর্থ ছিল বলিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অবধি আমরা অপর বেশ্যার সহিত থাকিতাম না। বৃহৎ অট্টালিকার নিম্নের কতকগুলা কক্ষে হিন্দুস্থানী চাকর থাকিত, কতকগুলা শূন্য থাকিত। আমাদের একবার এক বৃদ্ধা দাসী দেশে গিয়াছিল। তাহার স্থলে একটি যুবতী কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। দাস দাসীর নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য পালয়িত্রী করিতেন, সাংসারিক কোন ছোট কথা আমরা কহিতাম না। দাসী ঘোমটা টানিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মা কথা কহিলেন, বেতন স্থির হইল। আমরা রূপার আলবোলায় সোনার নলে তামাক খাইতেছিলাম, জরির জুতা পায়ে, অঙ্গে রেশমী সাড়ী রেশমী জামা। দাসী বড় সন্ত্রস্ত ভাবে আমাদের প্রতি চাহিতেছিল। কি যেন একটা সন্দেহ, কি যেন একটা সমস্যা তাহার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। সে কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—মা আপনারা কি, বলছিলাম মা আপনারা—

আমার একটু কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হইল। আমি বলিলাম—আমরা কি জাত জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি জাত?

সে বল্লি—মা আমরা সদ্‌গোপ।

আমি বলিলাম—আমরা ব্রাহ্মণ, একেবারে কুলীন। দেখ না, কেমন পোষাক পরিচ্ছদ, আলবোলার কেমন বেনারসী নল।

যুবতী বিস্ময়ে আমাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সেই শঙ্কা-জড়িত বিস্ময়ের ভাবটা মাতার অসহ্য বোধ হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মর মাগী ন্যাকা। জানেন না যেন, এপাড়ায় কাজ করতে এসেছ জান না আমরা কি জাত ?

চপলা বলিল—আমরা নাচওয়ালী, মজ্‌রো করি।

তাহার পর সুর করিয়া সে দাসীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল—আমরা যখন যার কাছে থাকি, তখনই তার মন জোগাই।

চপলাকে অস্পৃশ্য ভাবিয়া যুবতী সরিয়া গেল, সে বলিল—ওমা! তোমরা বেউস্যে ? না বাপু এখানে আমি কাজ করব না।

এই কথাটা বলিবার সময় তাহার মুখে একটা বিষম গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিল। সেই গর্ব্বের জ্যোতিতে তাহাকে অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া মনে হইল। আমার মনের মধ্যে সেই লুকান ভাবটা যেন জাগিয়া উঠিল। যে ভাবটাকে ধরিতে পারি নাই, যে ভাবটা নিজেকে গোপন রাখিয়া আমাকে এত দিন অশান্ত করিতেছিল, আজ যেন সে ভাবটা ধরা দিল। আমার ত গর্ব্ব করিবার-কিছুই নাই, আমি তো একটা নীতির জন্য এমন ভাবে ঐশ্বর্য্যময়ীদের মুখের উপর দম্ভ করিতে পারি না।

চপলা তাহার কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। সে পূর্ব্ব রাত্রে এক এটর্ণি বাবুর সহিত একটু অধিক মাত্রায় সুরা পান করিয়াছিল। গানের রেসের মত মদের নেশার একটা রেশ থাকে। সে সময় মানুষ বড় খিট্‌খিটে হয়, শরীরে সে সময় একটা বেদনা হয়। চপলা বলিল—মাগির যত বড় মুখ তত বড় কথা। পরে আছিস তো ছেঁড়া ন্যাকড়া, আমাদের কাছে কাজ করলে তোর বরাত ফিরে যেত।

দাসীর চক্ষে একটা জ্যোতি ফুটিল। আমি আজও সেটা বিস্মিত হইব না। আপনারা আপনাদের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যার চক্ষে সে জ্যোতি অহরহঃ দেখিতেছেন, আমার মত লোকের পক্ষে সে দিন সে জ্যোতি নূতন ছিল। তাই আপনারা পবিত্রতার জ্যোতি, সতীত্বের তেজ দেখেন না। সে পুণ্য আলো আপনাদের ঘিরিয়া থাকে। আমি সেই পরিচারিকার চক্ষে সেই স্বর্গীয় দীপ্তি দেখিলাম। যে দেশের পরিচারিকা এমন হইতে পারে সে দেশের সীতা দময়ন্তী কি ছিল ? অকস্মাৎ এই কথাগুলা আমার মনে হইল। দাসী বলিল—"থাক্, আমার ছেঁড়া কাপড়। আমার এই হাতের নোয়া, মাথার

সিঁদুর যেন ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা থাকে। আমি তোমাদের কুবেরের ঐশ্বর্য্যি চাই না।"

যুবতী ফিরিয়া সিঁড়িতে নামিতেছে, আমি ছুটিয়া তাহার হাত ধরিলাম। সে ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু পলাইল না। আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত ছিল—আমি সতীত্বের বলে বলীয়ান, আমাকে বেশ্যায় কি করিতে পারে?

আমি বলিলাম—ওগো তুমি যে দেবী। তুমি দাসী বৃত্তি ক'র না। তুমি এই হীরের বালা নাও, এর টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার এস। আমি তোমায় আবার টাকা দ'ব। ওগো তোমার স্বামীকে এনো দেখব।

সে হাসিয়া বলিল—মা ও বালা আমি নব না। কেন বুঝছেন? মা কালী তোমার ভাল করবেন।

আমি বুঝিলাম। সে গণিকার দান লইবে না। হাঃ রে ভারতবর্ষ! হাঃ রে বাঙ্গালা দেশ! আমি বলিলাম—আচ্ছা তোমার স্বামী! তাঁকে একবার দেখাবে! হ্যাগো! সে কি খুব সুন্দর!

সে এবার একটু হাসিল। আহা! কালো রঙ্গে এত সৌন্দর্য্য থাকে। সে বলিল—আমার স্বামী হাঁসপাতালে। মোটরগাড়ি চাপা পড়েছেন। তাই মা খাটতে এসেছি। তিনি মা সামান্য লোক।

মূর্খ রমণী! যাঁহাকে ভগবান এমন স্ত্রীরত্ন দিয়াছেন তিনি সামান্য লোক!

না কাঁদি নাই। একটু দম নিলাম! অন্য কথা বলিব? না; এখন আপনাদের শুনিতেই হইবে। ছাড়িব না। দেশের লোক কি কম দুর্লভ পদার্থ! দেশে থেকে বুঝিতে পারেন না। স্বামী চেয়ে রয়েছেন। কিছু বুঝিতেছেন না। নিল্লু? কোপারকায়াম? কমলাপল্ডু! নেহেরু, নেহেরু! জিজ্ঞাসা করিতেছেন জল পান করিব কি না, ডাব খাইব কি না, কমলা লেবু দিবেন কি না। না কিছু চাহি না।

তখনই আবার বিলাসিতার মধ্যে পড়িলাম। আরসীতে মুখ দেখিলাম। ঢল ঢল লাবণ্য, গোলাপ ফুলের মত বর্ণ। মুখে একটা কিসের অভাব? না, না সে যুবতী সিঁথায় সিন্দুর দিয়া সুন্দরী দেখিতে হইয়াছিল। সিঁথায় সিঁন্দুর দিলাম, উঁহু! হাসিলাম। মাথা মুণ্ড! জগতে কেবল স্ফূর্ত্তির জন্য আসা! সতীত্ব। ছেঁড়া কাপড়, স্বামী হাঁসপাতালে! পরের বাড়ির দাসত্ব!

সীতাদেবীরও সুখের শেষ ছিল না। দময়ন্তীরও তাই! কেবল কষ্ট! কেবল কষ্ট! বিলাসিতার ক্রোড়ে 'গা' ভাসাইলাম। আনন্দের ফোয়ারার তলায় বসিলাম। কিন্তু—

না। দাসীটা একেবারে প্রাণে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতে বড় বেশী সুখ পাইতাম। জানকীর জন্য কাঁদিতাম। এমন কি মন্দোদরীর জন্যও একদিন চোখের জল পড়িল। আহা! রাবণ রাজা যাহাই হউক তাহার তো স্বামী! রামচন্দ্র রাবণকে মারিলেন, বেশ ভাল! কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মন্দোদরীর প্রাণটুকু লয়েন নাই কেন?

একদিন কালীঘাটে গেলাম। ছোট ছোট বধূ দেখিলাম, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা গৃহিণী দেখিলাম, সকল বয়সের বিধবা দেখিলাম। সবারই অবস্থা মন্দ, সবাই দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতায় জর্জ্জরিত, কিন্তু গৃহস্থের মেয়ে সবারই মুখে একটা পবিত্র ভাব! আমার ঝলসান রূপের দিকে, আমার চমকদার বেনারসির দিকে সবাই দেখিল বটে কিন্তু কাহারও চক্ষে ঈর্ষা নাই। ছোট ছোট দরিদ্র গণিকাগুলা আমাদের দেখিলে যেমন একটু ব্যগ্র হয়, আলাপ করিতে চায়, মনে মনে হিংসা করে ইহারা তেমনি আমাদের অস্পৃশ্য ভাবিয়া দূরে থাকিতে চাহিল। এ ভাবটা পূর্ব্বে দেখিয়াছি কিন্তু এত বুঝি নাই।

আমার কার্য্যে শৈথিল্য দেখিয়া জননী বিরক্ত হইলেন। বিহারের একটা কোকেনখোর জমিদারের ছেলে আমার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আমি তাহার নিকট মতির সাতনর আদায় করিতে পারি নাই বলিয়া মা বড় বিরক্ত হইলেন। চপলা চিরকাল আমার ঈর্ষা করিত, সে মাতার ক্রোধে ইন্ধন জোগাইল। তিনি সর্ব্বদাই আমার অপমান করিতেন। আমার প্রাণে শান্তির একান্ত অভাব হইল।

এমন সময় নারায়ণ আমার উদ্ধারের জন্য—ওঃ নারায়ণ বলিতেছি? আমি খৃষ্টান বটে! কিন্তু যীশুকে মানি বলিয়া নারায়ণকে ফেলিতে পারি নাই। খৃষ্টদেব পবিত্র; তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণ উদার; সে কথা পরে বলিব।

আমার উদ্ধারের জন্য ইনি একদিন আসিলেন। বিদেশী লোক আসিলেই মা ভাবিতেন একটা মস্ত বড় শীকার। একজন বাঙ্গালী উকীলের সঙ্গে ইনি আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন। উকীল লোচনবাবু এদেশে হাওয়া খাইতে আসিয়া ইঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। উকীল বাবু আমাদের স্বভাব জানিতেন। তিনি মাতাকে

বলিলেন—ইনি মাদ্রাজের ছদ্মবেশী রাজপুত্র ইত্যাদি। তখন বাস্তবিক ইনি কাছারিতে পঞ্চাশ টাকা বেতনের আমলা ছিলেন। জননী ইহাঁকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ্ সুশীলা আর আলিস্যি করিস্ নি। কপাল গুণে এমন রাজ-পুত্তুর এসেছেন, আহা! বাবাজি লোচন বেঁচে থাক্! ইংরিজি টিংরিজি ব'লে সন্তুষ্ট করিস্। দেখিস্ মা! এবার তোকে নতুন ঘোঁড়া কিনে দ'ব। ওদের দেশে একখানা বাড়ি! বুঝলি অলটেয়ারে! মাঝে মাঝে হাওয়া না বদলালে তোদেরই শরীর খারাপ হয় বাছা।"

আমি নায়ডুর দিকে দেখিলাম। লোচন উকীলের দিকে দেখিলাম। হাসিয়া বলিলাম—"এ আবার কাল পাষাণের দেবতা কোথা থেকে আন্‌লে?" হায় হায় তখন বুঝিনি বাস্তবিকই ইনি দেবতা!

কুহকিনীর মায়া! তিন দিনে ইনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন আবেগ ভরে বলিলেন—আমি তোমায় বিবাহ করিব!

বিবাহ! সুপ্তসিংহ জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাতা-লের উক্তি নয়, উন্মাদের উক্তি নয়। দেখিলাম এঁর চোখে নির্ম্মল দৃষ্টি।

আমি বলিলাম—আমি যে বেশ্যা! আমায় প্রকাশ্যে বার করতে পারবে? তোমার মা বোনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে? আমার অতীত ভুলতে পারবে?

ইনি বলিলেন—কোন লজ্জা নাই! তোমার ভিতর ধর্ম্ম আছে! যাদের আমরা বিবাহ করি পূর্ব্বজন্মে তা'রা কি ছিল কে জানে? ধর আজ তুমি জন্মালে, অতীতটাও জন্মের কথা। মাদ্রাজে চলে যাব সেখানে নূতন জীবন নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা! তুমি যদি সাধ্বী হ'তে পার, একনিষ্ঠ হ'তে পার, আমি হাতে স্বর্গ পাব।

প্রথম একটু ঠাট্টা অথচ একটু আবেগের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ক্রমশঃ দেখিলাম ইনি খুব আন্তরিক ভাবে কথা কহিতেছেন। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। যত পাপ করিয়াছি, যত কুকার্য্য করিয়াছি, সমস্ত বলিলাম। ইনি বলিলেন—সব জানি। আমিও অনেক পাপ করেছি। সবাই পাপ করে। পাপ করি বলিয়াই পুণ্য এত ভালবাসি। তোমার পাপ কিছু না।

আমি বলিলাম—কিন্তু বেশ্যাকে ঘরে নিলে তোমার রাজ্যের লোক কি বলবে? তোমার পিতা রাজা কি বলবেন? তুমি রাজপুত্তুর—

ইনি হো! হো! করিয়া হাসিলেন! বলিলেন—রাজপুত্তুর! রাজত্ব—শত্রুর রাজত্ব থাক্। আমি ভিজাগাপটমের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টের আমলা—

মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পাই। তিন কুলে কেহ নাই। না না, তুমি আমার পত্নী হতে পার না। আমি পরিহাস—

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বলিলাম—যেটুকু প্রতিবন্ধক ছিল, সেটুকু কেটে গেল। আর আমার চিন্তা নাই। আমি আপনার পায়ে আত্মসমর্পণ করলাম। আপনি কেবল ভালবাস্‌বেন, ঘৃণা করবেন না। আমার যা' কর্ত্তব্য আমি করব।

স্থির হইল আমি ধর্ম্মপত্নী হইব। কি আনন্দ! কি পুলক! কোন পর পুরুষ আমার দিকে সকাম দৃষ্টিতে চাহিলে পাপ অর্জ্জন করিবে। আমার দিকে? এই জঘন্য মাংসপিণ্ডে একটা পবিত্রতা আসিবে। হা! ভগবন্! স্বামীর জন্য স্বহস্তে ভাত রাঁধিব, ঘর ধুইব, কাপড় কাচিব, বাসন মাজিব! স্বামীর জন্য! কথাটায় যেন যাদু ছিল। আমি আনন্দে ভরিয়া উঠিলাম। তত আনন্দ যেন সেই বিলাসের মধ্যে কোনও দিন পাই নাই।

তাহার পর ছোট কথা! হিন্দু সমাজ আমায় লইবে না। লোচন বাবুর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিলাম। তিনি উৎসাহ দিলেন। তিনি সংবাদ লই-লেন। ব্রাহ্মসমাজ কুণ্ঠাবোধ করিল। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা! বৃথা দম্ভ! উদার খৃষ্ট ধর্ম্ম আমাদের গ্রহণ করিতে চাহিল। ইস্‌লামও বাহু প্রসার করিল। কিন্তু আমরা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। যীশু খৃষ্টকেও ভজনা করি—হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শের কাছেও মাথা হেঁট করি। সীতা দময়ন্তীর আদর্শ মাতা মেরীর আদর্শে মিলাইয়া এক নূতন ধর্ম্ম সৃজন করিয়াছি। কিন্তু আমি স্ত্রী! গৃহস্থের স্ত্রী! বাড়ী হইতে পলাইয়া ইহাঁর পদসেবা করিতেছি সাত বৎসর। কেহ জানে না আমি কোথায় আছি। এখন জানিলেও ভয় নাই। আজ আমার মা ধরিতে আসিলে সেই দাসীর মত জ্যোতি দেখিবে। স্বামীর রন্ধন করি, কাপড় কাচি, বাসন মাজি, গৃহ পরিষ্কার করি, তবু সুখে আছি, শান্তিতে আছি, গর্ব্বে আছি।

ক্ষমা করিবেন। আমি উঠি। কি বলছেন? আমি দেবী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও কথা বলবেন না। আমি ছিলাম পাপী কিন্তু এখন আমি ধর্ম্মপত্নী! গরীব গৃহস্থের বৌ! এই আমার যথেষ্ট উন্নতি! ঐই আমার যথেষ্ট অভিব্যক্তি! আচ্ছা নমস্কার।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী।*

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ এম্-এ, বি-এল্।]

কোচবিহার ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল পুঁথি আলোচনা করিলে প্রাচীনকালে কোচবিহার রাজ্যে সাহিত্য-চর্চ্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পুঁথিগুলির মধ্যে অধিকাংশই কোচবিহার লেখক কর্ত্তৃক রচিত। একটি বিশেষ জনপদের, প্রাচীন সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছিল, সেই সাহিত্যের সহিত সমসাময়িক বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, সাহিত্য হিসাবে এই সকল গ্রন্থগুলি কোন্ শ্রেণীর ও তাহার রচয়িতা পণ্ডিতমণ্ডলীই বা কতটা বাহিরের ভাব গ্রহণ ও বাহিরের সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন, এই সকল প্রশ্নের সমাধান এই পুঁথিগুলি পাঠ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহাদের এই সকল পুঁথি পাঠ অপরিহার্য্য। প্রত্যেক পুঁথিতেই রচয়িতার নাম ভণিতায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ বাঙ্গালা পুঁথি রাজ-আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল। রচয়িতা গ্রন্থে সেই রাজার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি গ্রন্থে রচনা কালও প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল সন তারিখ দ্বারা ইতিহাসে স্বীকৃত কোচবিহার রাজগণের প্রাদুর্ভাবকাল যাচাই করা যাইতে পারে। কোনও কোনও পুঁথিতে তৎকালীন কোচবিহার নগরের বর্ণনা, বা সমসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পুঁথিগুলির প্রয়োজনীয়তা যে অল্প নহে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পুঁথিগুলিকে প্রধানতঃ তিন্ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; সংস্কৃত পুঁথি, আসামী পুঁথি ও বাঙ্গালা পুঁথি। সংস্কৃত পুঁথিগুলি সবই রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণাদির অংশবিশেষের নকল। এ সকল গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুঁথি হিসাবে এই গ্রন্থগুলির মূল্য তত অধিক নহে। তবে একটা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আছে বলিয়া মনে হয়। অনেকেই

* কোচবিহার সাহিত্য-সভার ১লা আশ্বিন ১৩২৩ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

জানেন আজ পর্য্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির প্রত্যেক শ্লোকের প্রকৃত পাঠ নির্দ্ধারণ হয় নাই। এক এক পুঁথিতে এক এক রকম পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে পাঁচ সাতখানি পুঁথি মিলাইয়াও আশানুরূপ সঙ্গত অর্থ করিতে পারা যায় না। এই সকল স্থলে কোচবিহারের পুঁথিগুলির পাঠ কি ও এই পাঠের দ্বারা মূল গ্রন্থের সঙ্গত অর্থবোধে কোনও সহায়তা হয় কি না, তাহা নিপুণভাবে আলোচনা করা উচিত।

আসামী পুঁথিগুলি প্রায় ভক্তিরসাশ্রিত বৈষ্ণবগ্রন্থ। পূর্ব্বাঞ্চলের রাজাগণের অত্যাচারে শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদর নামক বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারকগণ কোচবিহার রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাঁরা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ 'মহাপুরুষিয়া' নামক বৈষ্ণবমত শঙ্করদেবই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কোচবিহারের তদানীন্তন রাজা নরনারায়ণ ইহাঁকে আশ্রয় দেন। মধুপুর ও দামোদরপুরের ধাম এখনও ঐ সমস্ত বৈষ্ণব প্রচারকগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

এই সময় হইতে বৈষ্ণবমত কোচবিহারে প্রসার লাভ করিতে থাকে। বিভিন্ন ধামগুলিতে ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়মিতরূপে পঠিত হইতে থাকে। বৈষ্ণব ভক্তগণও নিজেদের গৃহে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল রাখিতে আরম্ভ করেন। শঙ্করদেব আসাম হইতে এ দেশে আগমন করেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি মিশ্রিত আসামী ভাষায় রচিত। পরে তাঁহার পদানুবর্ত্তী অন্যান্য বৈষ্ণব লেখকগণও ঐ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। এইরূপে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় কোচবিহার হইতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। আসামে মুদ্রিত বহু গ্রন্থ হইতে উহা সঙ্কলন করিতে হইবে। তবে যে কয়েকখানি পুঁথি এখানে আছে, তাহা হইতে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে ও মধুপুরধামে যে সকল প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহার অধিকাংশই আসামে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাঠান্তরের তুলনা ভিন্ন এ পুঁথিগুলিরও অন্য কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

সংস্কৃত ও আসামী পুঁথিগুলি অপেক্ষা এখানকার বাঙ্গালা পুঁথিগুলির মূল্য অধিক। সংস্কৃত ও আসামী পুঁথির তুলনায় বাঙ্গলা পুঁথির সংখ্যাও অধিক। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সমগ্র ভারতে আদৃত ও তাহাদের পুঁথি বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত ছিল। কাজেই সেগুলি অনেক পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। বহু দেশে বহু প্রকারের সংস্করণও হইয়াছে। আসামী পুঁথিগুলিও আসামপ্রদেশবাসীর চেষ্টায়

মুদ্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ এই গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থ রূপে পরিগণিত হওয়ায় এতদ্ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সাগ্রহে এগুলিকে মুদ্রিত করাইয়াছেন, বাঙ্গালা পুঁথিগুলির কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় নাই। কারণ বাঙ্গালা পুঁথিগুলি প্রায় সকলই কোচবিহার বাসীর লিখিত। স্থানীয় রাজসাহায্য বা জনসাধারণের উৎসাহ ব্যতিরেকে এগুলির মুদ্রাঙ্কণ সম্ভব নহে। বাহিরের লোকে এ সব গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া মুদ্রিত করাইবে সে আশাও করিতে পারা যায় না।

অথচ এই সকল পুঁথি রচয়িতাদের মধ্যে কোচবিহারের অধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ একজন। কোচবিহারের রাজাদের মধ্যে আর কাহারও রচিত গ্রন্থ আমরা পাই নাই, তবে অন্য অন্য রাজাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পুঁথিবিশেষে দৃষ্ট হয়। রিপুঞ্জয় দাস ও গোবরাছড়া নিবাসী বিদ্যারত্ন উপাধিধারী কোনও ব্রাহ্মণ রচিত "মহারাজ বংশাবলী" নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে মহারাজ নরনারায়ণের "স্বকৃত মল্লদেবী নামে অভিধান" ছিল। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ উহা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় ঐ মল্লদেবী অভিধান এক্ষণে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে বর্ণিত পুঁথির বচনমাত্রে নির্ভর করিয়া উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে হইতেছে। আবুল ফজল স্বরচিত 'আকবর-নামা'য় লিখিয়াছেন যে মল্লদেব আকবর বাদসাহের প্রশংসাসূচক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও এককালে মহারাজ নরনারায়ণের আর একখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। কতকগুলি ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে ও কতকগুলি কোচবিহার দ্বার আফিসে রক্ষিত আছে। এই সকল গ্রন্থের ভণিতায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোট নয়খানি গ্রন্থে হরেন্দ্রনারায়ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত একটি খণ্ড কবিতা ও কয়েকটি সঙ্গীত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভণিতায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম থাকিলেই যে গ্রন্থগুলি হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত তাহার প্রমাণ কি? অর্থপ্রদাতা রাজা মহারাজা অন্য ব্যক্তি দ্বারাও ত গ্রন্থ লিখাইয়া লইতে পারেন। আপত্তিটা যে একেবারে অসঙ্গত তাহা আমরা বলি না। যে দেশের প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্" অর্থাৎ "ধাবক নামে

কবি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীহর্ষের নিকট অর্থ পাইয়াছিলেন" এই কথা দেখিতে পাই ও যে দেশে এই কথার অর্থ করা হয় "মহারাজ শ্রীহর্ষ অর্থ দ্বারা অপর কবিকে দিয়া রত্নাবলী প্রভৃতি নাটিকা লিখাইয়া নিজ নামে প্রকাশ করেন" সে দেশে ঐ আপত্তি ওঠা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' স্যর্ রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি রচনার ইতিহাস যখন অনেকেরই সুবিদিত, তখন এই আপত্তির পোষক কোন প্রমাণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা মন্দ নহে।

জয়নাথ ঘোষ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক ও মহারাজের মুনসী ছিলেন। তিনি "রাজোপাখ্যান" * নামক কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়া মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে শ্রবণ করাইয়া পঞ্চগ্রাম পুরস্কার লাভ করেন। জয়নাথ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং এই হেতু তাঁহার গ্রন্থের ঐ অংশকে 'প্রত্যক্ষ খণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বর্ণিত কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। অবশ্য স্থলে স্থলে অতিরঞ্জন-দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের অন্ততঃ 'প্রত্যক্ষ খণ্ডের' বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

জয়নাথ মুনশী লিখিয়াছেন "ভূপতির তখন হইতে কবিতা-শক্তি। সংস্কৃত পুস্তক সকল ভাঙ্গিয়া ভাষাপদ করিতেন এবং নানা প্রকার গান সকল তাল মান রাগ রাগিণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন"। (প্রত্যক্ষখণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়)

ইহাতে স্পষ্টই উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে গ্রন্থ রচনা করিতেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি খাসনবীশ কাশীনাথ লাহিড়ীর মৃত্যুর পর বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল এবং তিনি সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ লাহিড়ীর মৃত্যু হয়। ইহার পর হইতেই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, জয়নাথ এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ রচনা সম্ভব ছিল

* এই গ্রন্থের একমাত্র পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখায় রক্ষিত আছে। ঐ পুঁথির নকল (যাহা কোচবিহার সাহিত্য-সভা সংগ্রহ করিয়াছেন) হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল, যৌবনেই বা তিনি কিরূপ ভাবে কাল যাপন করিতেন তাহা এ প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক। যদি আমরা দেখিতে পাই, গ্রন্থ-রচনায় যে জ্ঞান, যে শিক্ষা লাভ আবশ্যক ও যে চর্চ্চা, যে অবসর প্রয়োজন, তাহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ঘটিবার সম্ভাবনা কোন কালে ছিল না, তাহা হইলে বরং আমাদের মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণ যখন গ্রন্থ-রচনার উপযোগী জ্ঞানলাভ করেন নাই এবং গ্রন্থ-রচনার অবসরও পান নাই, তখন তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি কখনও তাঁহার লিখিত হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার বাল্য-শিক্ষার কথা জয়নাথ স্পষ্টই লিখিয়াছেন "শ্রীশ্রীমহারাজার পার্সীতে, বাঙ্গলা ও অন্যান্য শিক্ষার্থে সাহেব অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন। অষ্টাহের দিবস মহারাজার যাহা শিক্ষা হইত তাহার পরীক্ষা দিতেন। তিন মাসান্তর অক্ষর দেখার নিমিত্ত পার্সী ও বাঙ্গালা লিখিত গবর্ণর কৌন্‌সিলে প্রেরিত হইত। পার্সী পড়ার কারণ মৌলভী মেহের আলি লিখনের কারণ লালা স্বরূপ সিংহ খাসনবীশ নূতন প্রবৃত্ত হইল। আর অল্পদিবসেই নানা বিদ্যাতে অভ্যাস হইতে লাগিল।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)।

শুধু তাহাই নহে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ পার্সী ও বাঙ্গালা কিরূপ দ্রুত লিখিতেন ও তাঁহার হস্তাক্ষর কত সুন্দর হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও জয়নাথের গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায়। জয়নাথ বলেন—"শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর হইয়াই পার্সীতে বাঙ্গালাতে সচ্ছন্দ আর খোসখৎ অক্ষর হইল। সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন। বরং পার্সীতে এমন খোসনবীশ লেখক সন্নিকট নাই।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৮ম অধ্যায়)।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কৈশোরে ও বাল্যে হরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল ও সে ব্যবস্থা যে নিষ্ফল হইয়াছিল, জয়নাথের কথা বিশ্বাস করিলে তাহা বলিতে পারা যায় না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্র-ব্যবহারে হরেন্দ্রনারায়ণ যে দৃঢ়চিত্ততা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এ জ্ঞান, এ নৈপুণ্য অশিক্ষিতের হইতে পারে না।

গ্রন্থরচনা করিবার অবসরও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। শৈশবে বহু বিপজ্জালে জড়িত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু বাল্যে সে

অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে তাঁহার মানসিক উদ্বেগজনক বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে ঘটনাগুলি তাঁহার সমস্ত সময় অধিকৃত করিতে পারে নাই। তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতদের গ্রন্থে হরেন্দ্রনারায়ণের পূজার্চ্চনা, ক্রীড়া, বিহার, বসন্ত-উৎসবের আমোদ-প্রমোদের যেরূপ চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে রাজা যে কেবল রাজ্য-চিন্তাতেই দিবস যামিনী যাপন করিতেন তাহা বোধ হয় না। পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা যে প্রায়ই কালযাপন করিতেন তাহার পরিচয়ও পুঁথিবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণের পুত্র ব্রজসুন্দর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'হিতোপদেশে'র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইনি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সম-সাময়িক ছিলেন। উক্ত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের শেষে ইনি মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ, অন্তঃপুর, উদ্যানাদি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মহারাজ কি কি করেন তাহাও জানাইয়াছেন। উক্ত অংশ অতীব দীর্ঘ। কতিপয় পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"কমতা নামত নানামত গুণধাম।
ভূতলে অতুল দেশ মহেন্দ্র-বিশ্রাম॥
সেহি দেশে ভূপবেশে বিহরিতে হর।
নির্ম্মাণ করিছে এক অপূর্ব্ব নগর॥
বিহার তাহার নাম গুণের সাগর।
তাহার স্বরূপ বলি অবধান কর॥
পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তোয়রসা তরঙ্গিনী।
যেন মন্দাকিনী মন আনন্দ-দায়িনী॥
তার মাঝে বিরাজে প্রাচীর চারিপাশে।
যেন শ্বেত কাদম্বিনী অম্বরে প্রকাশে॥
সেহি তোয়রসা তরঙ্গিনী করি সীমা।
আবাসের উত্তর দক্ষিণে অনুপমা॥
কৃত্রিম তটিনী দুই আছে সুগভীর।
বিনা তরী না পারি তরিতে যার নীর॥
নগর সম্মুখে ক্রয় বিক্রয়ের স্থান।
সদাগরগণ তাত করে অধিষ্ঠান॥
দ্বিতীয় অঙ্গনে সৌধ সদনের মাঝে।
মদনমোহন দেব সস্ত্রীক বিরাজে॥
অঙ্গন পশ্চিমে শোভা করে নৃপতির।
সুমেরু শিখর তুঙ্গ রঙ্গিন মন্দির॥
সেহি মন্দিরের মাঝে রৌপ্যসিংহাসন।
সতত বিরাজে নব তুষার কিরণ॥
সেহি রঙ্গমন্দিরের উত্তর পশ্চাত।
আছেন রুচির এক প্রাচীর উচ্চাত॥
প্রাচীরের তলে পথ আছে মনোহর।
সেহি পথে যাতায়াত করে যত নর॥
অস্ত্রশস্ত্র ধরি দ্বারপাল বীরগণে।
সেহি দ্বার রক্ষা করে সাবধান মনে॥
তাহার পশ্চিমে আছে তৃতীয় অঙ্গন।
অঙ্গনের উত্তর দক্ষিণে সুশোভন॥
দেবালয় সম দুই আলয় সুন্দর।
অঙ্গন পশ্চিমে আছে প্রাসাদ-প্রবর॥
সদা সুমধুর মন্দ মারুতের গতি।
বিদায় সময় তাত বিরাজে নৃপতি॥
তাহার দক্ষিণে আছে চতুর্থ অঙ্গন।
তাঁহাতে বহুত সৌধময় গৃহগণ॥

পুরমাঝে বিরাজে প্রাসাদ বহুতর।
দক্ষিণে প্রাচীর উত্তরে সরোবর॥
কিবা পুরী নির্ম্মাইছে নৃপতি কেশরী।
বিরাজে তাহার মাঝে রাজরাজেশ্বরী॥
ধরাপতি তারিণীচরণ করি ধ্যান।
নিত্য হোম করে নিত্য দেয় বলিদান॥
তারিণীর ভবন পশ্চিমে মনোহর।
ব্যায়াম মন্দির এক আছেন সুন্দর॥
বিশ্বাসভাজন পোষ্য মল্লগণ সনে।
মল্লশ্রম করে তথি নৃপ পঞ্চাননে॥
তাহার পশ্চিমে আছে বিচিত্র অঙ্গন।
সদা বিকসিত তাহে কুসুম-কানন॥
কাননের পূর্ব্বদিশে ব্যায়াম-মন্দির।
আর তিন দিশে আছে রুচির প্রাচীর॥
দক্ষিণ প্রাচীরে সিংহদ্বার মনোহর।
ভূতলে অতুল নাহি তুলনা অপর॥
উদ্যানের মাঝে শোভে উচ্চ মঞ্চস্থান।
নন্দন উদ্যানে যেন পুষ্পক-বিমান॥
কারু-বিনির্ম্মিত চারু মঞ্চ মনোহর।
আশ্চর্য্য বিরাজে যেন কাঞ্চন-শিখর॥
তাহার উপরে বিহারের মহীপাল।
সজ্জন-পালন পিতা দুর্জ্জনের কাল॥
বিরাজ করেন সঙ্গে লইয়া সমাজ।
তারাগণ সনে যেন পূর্ণ দ্বিজরাজ॥
মহারাজ বিলাসমঞ্চের সন্নিহিত।
পশ্চিম দিশেত চারু প্রাচীরে আবৃত॥
অন্তঃপুর বর্ণয়িতে শক্তি আছে কার।
থাকুক মনুষ্য, দৃশ্য নহে দেবতার॥"

এই সকল পংক্তি হইতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজপ্রাসাদের একখানি নক্সা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার মধ্যে যে রঙ্গমন্দির, পুষ্পকানন মধ্যে মঞ্চ প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে ঐ সকল স্থলে বসিয়া সেই সেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন লিখিয়াছেন। হরেন্দ্রনারায়ণ মহাভারতের ঐষিকপর্ব্বের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শেষে আছে—

"আশ্বিন মাসত শুক্লা দ্বাদশীদিনত।
প্রহর মধ্যত শশীসুত বাসরত॥
পুস্তক সমাপ্ত চারু কুসুম-কাননে।
সরোবর তীরে মন্ত্রশালা সুশোভনে॥"

অন্য কোনও পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করিলে এরূপ ভাবে প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানমধ্যে মন্ত্রশালায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইল এ কথা লিখিতেন না। এতদূর মিথ্যা সৃষ্টি করিবার কোনও প্রয়োজনও তাঁহার থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

[ক্রমশঃ।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

পল্লীগ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে বাঙ্গালী সসম্মানে জীবিকা-উপার্জ্জন করিতে পারে, এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন বুঝিয়াছে যে, কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজের দ্বারে দ্বারে চাকুরি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে কোন প্রকারে ধ্বংসের কবল হইতে স্বদেশের রক্ষা নাই। পল্লীজীবন জাতীয় জীবনের ভিত্তি, পল্লীসমাজ বাঙ্গালী সমাজের প্রাণ। সমাজদেহে বলসঞ্চার করিতে হইলে পল্লীজীবন উন্নত করিতে হইবে, পল্লীসমাজে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সহরে ছত্রিশ জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য প্রথায় সভাসমিতি করিয়া ঢক্কানিনাদ করিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। আমরা কি চাহি তাহা আমরা বুঝিয়াছি। কেবল সেই আদর্শ লাভ করিবার শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। সেই কর্ম্মশীলতা ও সামর্থ্য যাহাতে বাড়িতে পারে, তজ্জন্য আমাদের জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

দেশ প্রথম চাহে শিক্ষা। মুখস্থ বিদ্যা নয়, তর্ক করিবার জন্য মহাজনের বাক্য আবৃত্তির ক্ষমতা নয়—প্রকৃত জ্ঞান, আসল শিক্ষা—যাহার বলে আমাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয়, আমাদের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বাড়ে, যে বিদ্যায় আমরা সকল বিষয়ে অভ্রান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারি, যে শিক্ষার বলে আমরা প্রতি পদে ন্যায়পথে চলিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সময় ছাত্রদের মনে দেশের প্রকৃত উন্নতির কামনা থাকে। তাহাদের মনে যখন আদর্শ গঠন হয়, তখন তাহারা যদি সে আদর্শের মধ্যে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ রাজকর্ম্মচারীর মূর্ত্তি না দেখিতে শিখে তাহা হইলে অনেক কষ্টের লাঘব হয়। যে আদর্শ সহজলব্ধ, যে আদর্শে দেশের অভাব মোচন হয়, ছাত্রেরা সে আদর্শের চিত্র দেখে না। বি-এ পাশ করিয়া নিজের জন্মভূমি পল্লীগ্রামে বসিয়া সম্মান লাভ করিব, চাষাভূষাকে বিদ্যাদান করিব, তাহাদের উচ্চজীবনের পথ দেখাইব, দেশের শ্রমশিল্পীদের নূতন পথ দেখাইব, তাহাদের সহিত মিলিয়া কর্ম্ম করিয়া আমাদেরও জীবিকার উপায় করিব তাহাদেরও উন্নত করিব—এ সকল স্বপ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মোটে দেখে না। ডেপুটি হইব, হাকিম হইব, বড় প্রফেসার হইব, উকীল হইব, এইসব জল্পনা কল্পনা করিয়াই মনের মধ্যে তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা চিত্র আঁকিয়া

রাখে। যখন দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক সাধ্য-সাধনা, তোষামোদ, উঞ্ছবৃত্তি করিয়াও তাহারা দাসত্ব করিবার অধিকার পায় না, ওকালতির গাউন পরিয়াই স্যার রাসবিহারী হইতে পারে না, তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া ভাবে যে তাহাদের জীবনের মধু ফুরাইয়াছে, তাহারা নিরাশ অন্তরে অলস হইয়া সহরে বসিয়া নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করে। জীবন নিষ্ফল হয়, দেশের শক্তির হ্রাস হয়, স্বদেশের ভবিষ্যৎ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

দেশের ছেলেদের শিক্ষার সময় তাহাদের মনে যে সকল আদর্শের সৃষ্টি হয় সেই সকল আদর্শের মধ্যে পল্লীগ্রামে বাস করিব, নিজের গ্রামে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিব এ আদর্শ বর্দ্ধিত হইলে ছাত্রেরা পরে হতাশ্বাস হয় না। উচ্চ আশার পূরণ হইলেই মানুষ সুখী হয়। প্রাণে অসম্ভব আশা পুষিলে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভবিষ্যতে পল্লীগ্রামে বসিয়া দেশের উন্নতি করিব—এ আশা সামান্য মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এ আশা সফল করিতে হইলে যত শক্তি, যত কর্ম্মনীতির আবশ্যক তাহা একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়।

[ক্রমশঃ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-নীতি—'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র-সম্পাদক, প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি মহাশয় 'স্বাস্থ্য-সমাচার' হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়া 'স্বাস্থ্য-সমাচার-পুস্তকাবলী' সম্পাদন করিতেছেন। এই পুস্তকাবলীর—১ম ও ২য় সংখ্যার নাম 'স্বাস্থ্য-নীতি—'ব্যক্তিগত' ও 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-নীতি' এবং দুই সংখ্যার মূল্য যথাক্রমে ৵০ ও ৶০ মাত্র।

যাঁহারা 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র নিয়মিত পাঠক তাঁহারা এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সহিত বিশেষ পরিচিত। প্রাঞ্জল ভাষায় এই 'স্বাস্থ্য-নীতি' প্রকাশ করিয়া ডাক্তার বসু মহাশয় দেশের অশেষ উপকারসাধন করিতেছেন। সামান্য শিশু পর্য্যন্ত এই নীতির বিধানগুলি শিক্ষকের বিনা সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। অসার রাবিশ উপন্যাস-গল্প প্রভৃতির যুগে, আমাদের রোগজীর্ণ দেশে এইরূপ পুস্তকাবলীর প্রকাশ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্চ, মধ্য ও লোয়ার প্রাইমারি-বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকগুলি বালকদের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সাধু অনুষ্ঠানে সহায়তা করুন ইহা আমাদের অনুরোধ। তাহা না করিলে এবং এই পুস্তকাবলী—'গৃহ-পঞ্জী'র-ন্যায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ না করিলে বুঝিব বাঙ্গালী এখনও গুণের আদর করিতে শিখে নাই।

প্রথম সংখ্যায়—প্রাতঃক্রিয়া, স্নান, আহার, জলপান, পরিধান, পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম

ও নিদ্রা এবং সংযম এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সংখ্যার বিষয়গুলি—গৃহ, বায়ু, জল, খাদ্য ও রোগ। চিকিৎসা শাস্ত্র ভিত্তি করিয়া সম্পাদক মহাশয় স্বীয় পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় এই অকাট্য বিধানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণে ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে প্রতিবৎসর শত শত লোক কালকবলিত হইতেছে. এবং জলের বিশুদ্ধি-রক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে আমরা কতটা অমনোযোগী, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'জল' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিয়া পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন—

"লোকের অজ্ঞতার জন্য নানারূপ মলসংযুক্ত হইয়া জল যেমন দূষিত হয়, সেই প্রকার প্রস্রাব দ্বারাও তদপেক্ষা অধিক দূষিত হইয়া থাকে। প্রস্রাবের স্থানে যে সকল বিষবৎ বস্তু সঞ্চিত থাকে তাহাও বর্ষার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলাশয়ে পড়ে। তাহাতেও জল অত্যন্ত দূষিত হয়।

জলে প্রস্রাব করিলে জঘন্য প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়, এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে জলে প্রস্রাব করিয়া জলকে দূষিত করেন। স্নানাদি কালে অনেকে পুকুরের কিঞ্চিৎ উপরে জলের একপার্শ্বে প্রস্রাব করিয়া থাকেন। আর এই মূত্র গড়াইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। নিজে মূত্রত্যাগ করিয়া বা স্বচক্ষে অন্যকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াও কেহ সাবধান করেন না বা হন না।

কোন কার্য্যের জন্য জলে নামিলে বা ঘাটে হাত পা প্রভৃতি ধুইতে গেলে শৈত্য লাগিয়া অনেক সময় প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এরূপ স্থলে জলের নিকটে কোন স্থানে প্রস্রাব করা হয়। শিশুরা কিংবা শয্যামূত্র ও অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা বিছানা বা কাপড়ে প্রস্রাব করিলে তাহা পুষ্করিণীতে ধুইলেও জল দূষিত হয়। শিশুদিগকে প্রস্রাব না করাইয়া স্নান করাইতে লইয়া গেলে তাহারাও জলে প্রস্রাব করিয়া জল দূষিত করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই পুষ্করিণীতে নামিয়া প্রস্রাব করিয়া থাকেন। তাঁহারা এতই অজ্ঞানান্ধ যে, এই মূত্রদূষিত জল ব্যবহার করিলে যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাহা আদৌ মনে করেন না। তাঁহারা জলকে নারায়ণ বলিয়া জানেন বটে, তথাপি প্রায়ই তাঁহারা ঘাটের জলে প্রস্রাব করিয়া থাকেন। ঘাটের যেখানে প্রস্রাব করেন তাহারই নিকট হইতে ঘটি বা কলসপূর্ণ করিয়া ব্যবহারের জন্য জল আনিয়া থাকেন। এই মূত্রের অধিক বা অল্পাংশ যে জলের সহিত অবশ্যই মিশিয়া আসে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও অজ্ঞতা জন্য সে দোষ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা এই দূষিত অস্পৃশ্য বিষবৎ জল দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করেন এবং স্নেহাস্পদ সন্তান ও গুরুজনদিগকে তাহা খাইতে দিয়া থাকেন। অধিক কি নিজেরাও পান করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। অনেক সময় ঐরূপ জল দ্বারা পবিত্র দেবার্চ্চনা করিতেও তাঁহাদের মনে ঘৃণা, সঙ্কোচ বা পাপ বোধ হয় না। এইরূপ বিষবৎ জলপানে অভ্যাস বশতঃ কত যে শিশুর প্রাণ নষ্ট হয় তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। যে জলাশয়ের জল কম, এই সকল দোষে তাহার জল অতি শীঘ্র মারাত্মক হইয়া থাকে। যে জল সর্ব্বদাই বদ্ধ থাকে তাহাতে এ সকল দোষ অতি গুরুতররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রস্রাব যেমন অপকারী ঘর্ম্মও তেমনই অপকারী। শরীরের ক্ষয় প্রাপ্ত ও অসার অংশ যেমন প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয় সেইরূপ ঘামের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এজন্য ঘাম লাগিলেই, শরীরে ও কাপড়ে দুর্গন্ধ হয় এবং স্নানের পর জল দূষিত হইয়া থাকে। জলে নামিয়া স্নান করিলে, শরীরের ঘর্ম্ম ও ময়লা এবং কাপড়ের ময়লা জলের সহিত মিশিয়া জলকে দূষিত করে। ধোপারা ময়লা কাপড় জলে কাচিয়া জল খারাপ করে। পশুপক্ষীদিগকে জলে নামাইয়া স্নান করাইলে তাহাদের গাত্রমল দ্বারা জল দূষিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন আহার্য্য দ্রব্যাদি—চাউল, ডাল, তরিতরকারি ও মৎস্য মাংসাদি পাক ও ভোজনপাত্র সকল পুষ্করিণীর জলে ধৌত করাতে এবং অন্য নানাপ্রকারে জল দূষিত হয়।

অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার আছে যে, জলে মরা মানুষ ফেলিয়া দিলে তাহার সদ্গতি হয়। এই সংস্কারের জন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ প্রভৃতির জলে প্রায়ই মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই জন্য জল দূষিত হয়। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা প্রসবের পর ফুল ও রক্ত ইত্যাদি ঘাটে পুরিয়া জলে ফেলিয়া দেয়, ক্রমে তাহা পচিয়া জলে মিশ্রিত হওয়ার জন্যও জল খারাপ হয়। পশ্বাদির মৃতদেহও অনেক সময় জলে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য জল দূষিত হয়। কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে ঘায়ের পুঁজ ও রক্ত বিড়ালে শুঁকিলে ঘা দূষিত হয় ও সহজে শুকায় না। এজন্য তাঁহারা পুঁজ ও রক্ত মাখা নেকড়াগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া জল দূষিত করেন।

রক্ত মাখা কাপড়, পুঁযভরা কাপড়, পিকদান, কফযুক্ত কাপড়, গোবর-ছড়ার হাঁড়ি ইত্যাদি এবং ময়লা হাত পা ধৌত করার জন্য জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা সকল প্রকার ময়লা দ্রব্যাদি ঘাটে লইয়া ধুইয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যাদির যে যে অংশ জলের সহিত মিলিত হয় তাহাই ক্রমে পচিয়া উঠে এবং জলকে খারাপ করে।

প্রায়ই গ্রামবাসী লোকদিগকে প্রত্যহ পুষ্করিণীতে যাইয়া মুখ ধুইতে দেখা যায়। তাঁহারা মুখ প্রক্ষালন কালে নেত্রমল, দন্তমল, জিহ্বার মল, কফ ও থুতু প্রভৃতি জলে নিক্ষেপ করিয়া জল দূষিত করিয়া থাকেন।

নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেক লোকের একত্রে আহার হয়, আহারান্তে তাঁহারা প্রায় সকলেই ঘাটে গিয়া আচমন করেন। ইহার দ্বারা জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হয়।

আমরা যে ঘাটের জল খাই সেই ঘাটের জলেই রোজ রোজ থুতু ফেলিয়া থাকি। গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া, ঘর নিকাইয়া, বা ঘুঁটের বেদি দিয়া আমরা ঘাটে গিয়া হাত পা প্রভৃতি পরিষ্কার করি এবং মল ত্যাগ করিয়া অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া থাকি। ইহা কি কম লজ্জার কথা? যে জল আমরা পান করিব সেই জলেই পশুবিষ্ঠা ও মনুষ্য বিষ্ঠার সংযোগ!

বোক্‌নো, কড়া, হাতা, বেড়ি ইত্যাদি রন্ধনের পাত্র, ভোজনপাত্র ও তৈজসপাত্রাদি প্রথমতঃ ঘাটে ভিজান হয় পরে এই সকল দ্রব্য ঘাটেই মাজা ও ধোয়া হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভাতের এবং ডাউলের অংশ, তরকারী ও মৎস্য ইত্যাদির টুকরা জল মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, ক্রমে তাহা জলমধ্যে পচিয়া জল দূষিত করে। আর আহারান্তে যে উচ্ছিষ্টাংশ পুষ্করিণীর পাড়ে ফেলা হয় কালে তাহা বৃষ্টির জলের সহিত পুষ্করিণী মধ্যে নীত হয় এবং যত পচিতে থাকে ততই জল খারাপ হয়।

মৎস্য ও মাংস জলে ধুইলে ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যের অনেক অংশ জলে মিশিয়া পচিতে থাকে। বিবিধ চর্ম্ম রোগ (খোস পাঁচড়া) ও সংক্রামক (কলস্ত) রোগের পুঁজ মামড়ি ইত্যাদি অনেকে ঘাটের জলে ধুইয়া থাকেন। কখন কখন বস্ত্রলগ্ন বড় বড় ঘায়ের পুঁজ রক্তাদি ঘাটেই প্রক্ষালিত হয়। মৎস্য এবং মাংসের ত্যক্ত অংশ এবং ভক্ষণের পর তাহাদের কাঁটা, হাড় ও চর্ব্বিত পরিত্যক্ত অংশ সকল জলেই ফেলা হয়।

অনেক স্থানে মনুষ্য, গরু ও অন্যান্য মৃত প্রাণীর দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রাণীর দেহ ক্রমশঃ পচিয়া জলকে দূষিত করে।

পুষ্করিণীর পাড়ের বড় বড় গাছ সকলের জীর্ণ পত্রাদি জলে পড়ে এবং পচিয়া জল দূষিত করে। তাল, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষই পুষ্করিণীর ধারে ধারে লাগাইবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত। ইহাদের দ্বারা জল কোনরূপ দূষিত হয় না। কিন্তু সাধারণের অজ্ঞতা হেতু নানা প্রকারের বৃক্ষলতাদি পুষ্করিণীর পাড়েই জন্মিয়া জঙ্গলে পরিণত হয় ও তাহাদের গলিত পত্রাদি দ্বারা সর্ব্বদা জল দূষিত হয়। সময় সময় জঙ্গল এত ঘন হয় যে সূর্য্যরশ্মি পর্য্যন্ত পুষ্করিণীতে পড়িতে পারে না। কাজেই জলাশয়ের উপর উপযুক্ত রৌদ্র ও বাতাস খেলিতে না পাওয়ায় জল দূষিত হয় এবং স্বাভাবিক উপায়েও বিশোধিত হইতে পারে না।

পাট ও শন পচাইবার জন্য আজ কাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জল খারাপ হইতেছে। পাটের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকেরা ধান ও অন্যান্য চাষ পরিত্যাগ করিয়া কেবলই পাট ও শনের চাষ আবাদ করিতেছে।

এই সকল পাট পাকিবার পর, কাটিয়া জলে পচাইতে হয়। এই পাট গাছ হালকা বলিয়া তাহার সহিত বড় বড় মাটির চাপড়া বান্ধিয়া পুষ্করিণী, ডোবা ও নদী প্রভৃতিতে ডোবান হয়। এই সকল পাট পচার জন্য জল দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও তাহাতে এনোফিলিস্ নামক ম্যালেরিয়াবাহী মশকেরা শাবক উৎপাদন করে ও ম্যালেরিয়া বিষ ব্যাপ্তির সহায়তা করে। যতই পাটের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে।

অনেকে পুষ্করিণীতে বাঁশ ও অন্যান্য কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ভিজাইয়া রাখিয়া সেগুলি মজবুদ করিয়া থাকেন। এই সকলের দ্বারাও জল দূষিত হয়।

জলে দাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা থাকিলে তাহারাও পচিয়া জল খারাপ করে। এই সকল দাম ও পানা পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবার কালে প্রায়ই পুষ্করিণীর কিনারায় নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহারা পুনরায় পচিয়া বর্ষার জলের সহিত মিলিত হইয়া পুষ্করিণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে ও জল বিশেষরূপে দূষিত করে।

'নৈষধচরিতে' নাস্তিকবাদের আলোচনা। *

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

স্বয়ম্বরের পর নববধূ দময়ন্তীকে লইয়া রাজা নল, সানন্দচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আর ইন্দ্রাদি দেবতারা হতাশ হৃদয়ে নিজ নিজ রত্নময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ধরাধাবন পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া আবার স্বর্গের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, নবভূপতি কলি, কামক্রোধাদি সৈন্য সমভিব্যাহারে মহা আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়াছেন। সেই বিস্তীর্ণ জনসমুদ্র দেবগণের সমীপবর্ত্তী হইলে একজন নাস্তিক,—যেন সুযোগ পাইয়া—দেবগণকে শুনাইতে লাগিল,—

যাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য উভয়েরই অভাব, তাহাদের জীবিকা সংস্থানের জন্যই অগ্নিহোত্র, বেদ, মীমাংসা, দণ্ডগ্রহণ, ভস্মধারণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এই উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিয়া নিজ নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তাহাদের ত আর কূটবুদ্ধির প্রসাদে বঞ্চনা পূর্ব্বক বা দৈহিক শক্তির প্রভাবে বলপূর্ব্বক ধনার্জ্জনের সামর্থ্য নাই। সুতরাং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া উপার্জ্জনের একটা পন্থা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই বেদাদির সৃষ্টি,—পরমার্থতঃ তাহা কিছুই নহে। কাজে কাজেই যাহারা বৈদিক বিধি-নিষেধ অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

তোমাদের শাস্ত্রে আছে, 'ব্রাহ্মণ অমুক কাজ করিলে পতিত হয়,' 'শূদ্র এই কাজ করিলে নিরয়গামী হয়', ইত্যাদি। আরে ছাই, ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণ কি আর বিশুদ্ধ আছে যে, তাহাদের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবে? সকলেই যে জাতিসঙ্কর-দোষে দুষ্ট।

"শুদ্ধির্বংশদ্বয়ীশুদ্ধৌ পিত্রোঃ পিত্রোর্যদেকশঃ।
তদনন্তকুলাদোষাদদোষা জাতিরস্তি কা॥"

মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় বিশুদ্ধ হইলে বিশুদ্ধ সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু অনাদি সংসারে এই বিশুদ্ধি কি সম্ভবপর? পিতামহ পিতামহী ও মাতামহ

* সপ্তদশ সর্গের আংশিক ব্যাখ্যা।

মাতামহীর বিশুদ্ধি হইলে পিতা ও মাতার বিশুদ্ধি হইবে, আবার সেই পিতা-মহাদির মাতাপিতার বিশুদ্ধি হইলে তাহাদের বিশুদ্ধতা হইবে, এইরূপে যদি অনন্ত কুল-পরম্পরার বিশুদ্ধি থাকে, তবেই ব্রাহ্মণকুমারাদির বিশুদ্ধতা হইতে পারে। কিন্তু এই বিশুদ্ধি ত কোনও রূপেই নিরূপণ করা যায় না। কাজেই 'আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ,' 'তুমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়' ইহা ত নিঃসন্দেহে বলিতে পার না। তা'র পর পুরাণাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে জানিতে পারা যায়, সকল জাতিরই মূল পুরুষ, ব্যভিচার-দোষে কলঙ্কিত। ইন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি গুরু দারাসক্ত ছিলেন, ব্রহ্মা কন্যাগমন করিয়াছিলেন, ইহা পুরাণই সাক্ষ্য দিতেছে। কাজেই মূল পুরুষের ব্যভিচার-নিবন্ধন অধস্তন সকল বর্ণই নিশ্চিতরূপে অবিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। নিজের দোষে বা পূর্ব্বপুরুষের পাতকে কেহই বিশুদ্ধ নহে। তোমরাই বলিয়াছ,—অপ্যেকপঙ্‌ক্ত্যাং নাশ্নীয়াৎ সংযতেঃ স্বজনৈরপি। কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং ভবেৎ।" 'বাহ্য শৌচাচার দেখিলেও অত্যন্ত আত্মীয়ের সহিতও এক পংক্তিতে ভোজন করিবে না; কে জানে, কাহার কোন্ প্রচ্ছন্ন পাপ আছে।' এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কোনও জাতিই বিশুদ্ধ নাই। সুতরাং জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সকলের স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তন করাই বিধেয়। জাতিধর্ম্মের মুখ চাহিয়া নিজের সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পরস্ত্রীগমন করিলে পাপ হয়, এরূপ শাস্ত্র তোমাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও দ্বিজরাজ চন্দ্র, গুরুপত্নীর সহিত লীলা করিয়াছিলেন,—সুতরাং তোমরা ইহাতে পাপের ভয় কর কেন? তোমরা বল, "সন্দিগ্ধেঽপি পরে লোকে ত্যাজ্যমেবাশুভং বুধৈঃ।"—পরলোকে সন্দেহ থাকিলেও পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কেন না, যদি পরলোক থাকে, তাহা হইলে নরক ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। যখন বিপ্রতিপত্তি আছে, তখন পরলোক বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি হইতে পারে না। তোমরা বল, পাপ করিও না,—জন্মান্তরে নরকাদি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আর আমরা বলিতেছি, যে পাপ করিল, সে ত চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, নরকভোগ হইবে কাহার? এইরূপ বিপ্রতিপত্তি নিবন্ধন পরলোকে সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি বল, সন্দেহস্থলে সে কাজ না করাই যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে তোমরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কর। কেন না, তাহাতে যে পশুহত্যা করা হয়, তাহাতেও সাম্প্রদায়িক মতে দোষশ্রুতি আছে।

সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি"। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে বলেন যে, যাগাদিতে যে বৈধী হিংসা করা হয়, তাহাতেও পাপ হয়। সুতরাং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও পাপের সংশয় হইল। যদি পাক্ষিক দোষ পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ত্যাগ কর, নতুবা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও। পাপে তোমার ভয়ই বা কি? যাহাতে তোমার 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি হইতেছে, সেই দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে পাপ তোমার কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? যদি বল, আত্মা দেহাতিরিক্ত, দেহ নষ্ট হইলেও দেহান্তরে সেই আত্মা পাপের ফল-ভোগ করিবে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, তোমার 'এতদ্দেহবিশিষ্ট আত্মাতে'ই 'অহং'-প্রতীত হইতেছে, সেই তুমি পাপ করিলে অন্য দেহবিশিষ্ট আত্মা সেই পাপের ফল ভোগ করিবে,—ইহা কোন্ দেশী ব্যবস্থা? যদি একজন পাপ করিলে অন্য লোকে তাহার ফলে দুঃখভোগ করে, তাহা হইলে রাম পাপ করিলে শ্যাম তাহার ফল ভোগ করে না কেন? যে হেতু, সামান্যতঃ 'আত্মত্ব' ধর্ম্ম তাহাতেও বর্ত্তমান আছে। সুতরাং মৃত্যুর পর সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলে পুণ্য পাপ ভোগ করিতে হয়, বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে প্রেতের পরিতৃপ্তি হয়, এ সকল প্রতারকের প্রবাদ মাত্র। বেদে ধূর্ত্তেরাই বলিয়াছে যে, আত্মা দেহব্যতিরিক্ত। 'আমি স্থূল,' 'আমি সুন্দর' ইত্যাদি রূপে দেহকেই সকলে আত্মা বলিয়া জানে, এই প্রাত্যক্ষিক অনুভবের অপলাপ করিয়া শ্রুতি বলিতেছে কি না,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সে নিত্য, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার নাশ হয় না। সুতরাং দেহকে ক্ষীণ করিয়াও পারলৌকিক সেই স্থিরাত্মার কল্যাণার্থ ধর্ম্মার্জ্জন কর—এই সকল শাস্ত্র ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয় ত আর কি? ধূর্ত্তেরাই অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে মণি-মাণিক্যে বঞ্চিত করিয়া কাচ সংগ্রহ করিবার জন্য প্ররোচিত করে। তোমরা বলিতে পার, বেদ ধূর্ত্তরচিত হইল কেমন করিয়া?—পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্র হইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; তখন অশ্বমেধাদি যাগ করিলে যে স্বর্গাদি ফল লাভ হয়, ইহাও অনুমান করিয়া লইতে হইবে। বেদের একাংশ যখন সত্য হইল, তখন অপরাংশ মিথ্যা বলিবার হেতু কি? এইরূপে সমস্ত বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,—

"একং সন্দিগ্ধয়োস্তাবদ্ ভাবি তত্রেষ্টজন্মনি।
হেতুমাহঃ স্বমন্ত্রাদীনসাঙ্গানন্যথা বিটাঃ॥"

তোমাদের ধূর্ত্ততার কথা আর কি বলিব? একজনের পুত্র-কামনায় তোমরা পুত্রেষ্টি যাগ করিলে। তা'র পর যদি তাহার পুত্র হয়, তাহা হইলে তোমরা বল, আমরা যজমানের জন্য রুদ্রজপাদি করিয়াছি, তাই পুত্র হইল। আর যদি পুত্র না হয়, কিংবা পুত্র হইয়া যদি অকালে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা অমনই গাহিতে আরম্ভ কর, 'এ যাগের অঙ্গভঙ্গ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই যাগের সমস্ত সামগ্রী বিশুদ্ধভাবে সংগৃহীত হয় নাই, দক্ষিণাও হয় ত যথানিয়মে দেওয়া হয় নাই,—যজমান বোধ হয় বিত্তশাঠ্য করিয়াছিল।' দেখ, ইহা ধূর্ত্ততা নয় ত আর কি? পুত্রের উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি—এই উভয় কল্পের মধ্যে একটা হইবেই। দুই পক্ষেই তোমরা হেতু কল্পনা করিয়া রাখিয়াছ।

তোমাদের সংহিতাকার মনুও এক মহা প্রবঞ্চক ছিল। সে নিজে মন্বন্তরাধিপতি রাজা ছিল, তাই নানা উপায়ে ধনাগমের জন্য—'অমুক কাজ করিলে এই দণ্ড' 'অমুক পাপ করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত'—এই সকল ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং আমাদের বিধান শুন,—

"কঃ শমঃ ক্রিয়তাং প্রাজ্ঞাঃ প্রিয়াপ্রীতৌ পরিশ্রমঃ।
ভস্মীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

তোমরা যে যাগযজ্ঞাদি কর, তাহা কি কামনায়? স্বর্গে গিয়া উর্ব্বশী প্রভৃতি সুন্দরী রমণীগণের সাহচর্য্যে সুখভোগ করিবে, এই প্রত্যাশায় ত? তাহা হইলে আর শান্তি বা সংযম রহিল কোথায়? ইহা অপেক্ষা ইহলোকেই বিবিধ সুন্দরী রমণীর সংসর্গে সুখভোগ করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়? নরকের ভয় ত সুদূর-পরাহত। এই দেহ ভস্ম হইয়া গেলে তাহা কি আর ফিরিয়া আসিবে?

তোমাদের শাস্ত্রে যে বলে, এই কাজ করিলে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয়। তাহাতেই বা ভয় কি? সর্পাদি সরীসৃপেরাও নিজের সজাতীয় তরুণীসম্ভোগ, ভেকভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে অমিত সুখানুভূতি লাভ করে। সুতরাং পাপের ফলে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হইলেও তাহাতেও সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না, তবে আর পাপে অনিষ্টের আশঙ্কা কি?

তোমাদের দার্শনিক বিচার সমূহও অপূর্ব্ব!—

"স্বঞ্চ ব্রহ্ম চ সংসারে মুক্তৌ তু ব্রহ্ম কেবলম্।
ইতি স্বোচ্ছিত্তিমুক্ত্যুক্তিবৈদগ্ধী বেদবাদিনাম্॥"

মায়াবাদী বৈদান্তিক বলিতেছেন কি না,—সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম দুই-ই আছে, মোক্ষদশায় অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া গেলে জীব আর থাকিবে না। এই

মোক্ষের অভিলাষে আবার লোকের প্রাণপণ যত্ন! আত্মার জন্যই সব, সেই আত্মারই যদি উচ্ছেদ হইয়া গেল, তবে তাদৃশ মোক্ষলাভের আশায় মূর্খ ভিন্ন আর কে যত্নবান্ হইবে?

ত'র পর ন্যায় বৈশেষিক মতে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা—এই নববিধ বিশেষ গুণধ্বংসের নাম মুক্তি। তাঁহারা আবার এই মোক্ষের প্রমাণরূপে শ্রুতি প্রদর্শন করেন যে, "অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ"; মোক্ষাবস্থায় সুখ বা দুঃখ কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকে না। এইরূপ মুক্তি হইলে ত ভারী লাভ হইল! এরূপ হইলে মুক্ত পুরুষের সহিত পাষাণের আর প্রভেদ রহিল কি? মুক্ত পুরুষের সুখ নাই, সুখের অনুভবও নাই। ইহা অপেক্ষা সংসারাবস্থাই ভাল। যদিও সংসারে দুঃখ আছে, তবু ত বহু সময়ে সুখানুভূতিও হয়। যে মোক্ষে প্রস্তরের সহিত কিছুমাত্র অবিশেষ থাকে না, সেইরূপ অপূর্ব্ব মোক্ষের জন্য লোকে লালায়িত হইবে কেন? যে ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ অপূর্ব্ব মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে, তাহার রচয়িতা গোতম। সত্যই তিনি গোতম—গোশ্রেষ্ঠ; তাহা না হইলে কি আর চৈতন্যবিশিষ্টের পরম পুরুষার্থরূপে শিলাত্বরূপ মুক্তির ব্যবস্থা করেন! এই ঋষির 'গোতম' নামটী অন্বর্থ।—

"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেক্ষ্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥"

নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাময় ও অবন্ধ্যবাক্। তাঁহার উচ্চারিত বলিয়াই বেদ-বাক্য সমস্ত সত্য। যদি তিনি করুণাময় ও সত্যবাদীই হন, তবে তিনি একবার 'তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হউক'—এইরূপ অব্যর্থ বাক্য উচ্চারণ করিয়া কৃপাপ্রার্থী আমাদিগকে কৃতার্থ করেন না কেন?

"দেবশ্চেদস্তি সর্ব্বজ্ঞঃ করুণাভাগবন্ধ্যবাক্।
তৎ কিং বাগ্ব্যয়মাত্রান্নঃ কৃতার্থয়তি নার্থিনঃ॥"

কাজেই ঈশ্বর নামে কেহ আছেন, ইহা উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র।

তা'র পর দেখ, তোমাদের ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি কোনও দর্শনেরই পরস্পর মতের ঐক্য নাই, ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে আছে।—"শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ"—শব্দ নিত্য নহে, যেহেতু, তাহা কার্য্য; যাহার উৎপত্তি আছে, সে কখনও নিত্য হইতে পারে না, যেমন ঘট। আবার মীমাংসকেরা

বলেন,—“শব্দো নিত্যঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ, শব্দত্ববৎ”—শব্দ নিত্য, যেহেতু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা অনিত্য হইতে পারে না, যেমন শব্দত্ব। এইরূপ পরস্পর অনুমান করিয়া নৈয়ায়িকেরা শব্দের অনিত্যত্ব ও মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে ত ‘সুন্দোপসুন্দ ন্যায়ে’ উভয় মতকেই অপ্রমাণ বলিতে হয়। আবার বৈদান্তিকেরা বলেন, “গগনং অনিত্যং বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ, ঘটবৎ”—আকাশ নিত্য নহে, কারণ তাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ যে শব্দ, তাহার আশ্রয়, যাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের আশ্রয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না, যেমন ঘট। নৈয়ায়িকেরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া অনুমান করেন যে, “গগনং নিত্যং দ্রব্যত্বে সতি নিরবয়বত্বাৎ আত্মবৎ”—গগন নিত্য, যে হেতু তাহা নিরবয়ব দ্রব্য ; নিরবয়ব দ্রব্য অনিত্য হইতে পারে না, যেমন আত্মা। এরূপ ক্ষেত্রে গগনের নিত্যত্ব, বা অনিত্যত্ব, কোনটাইত প্রমাণ-সিদ্ধ হয় না। এরূপ অবস্থায় বেদ, স্মৃতি, দর্শন—সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সকল সুখের মূলীভূত স্বেচ্ছাচারিতার অনুবর্ত্তন কর। চৌর্য্যবৃত্তি হইতে যদি নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে দারিদ্র্য পরিপুষ্ট হইবে, আর অভক্ষ্য বলিয়া লশুন, শূকর-মাংসাদি সুস্বাদু আহার্য্য পরিত্যাগ করিলে নিজের উদরকে বঞ্চনা করা হইবে।

“দৈন্যসাম্রাজ্যমস্তেয়মভক্ষ্যং কুক্ষিবঞ্চনা।

স্বাচ্ছন্দ্যমচ্ছতানন্দকন্দলীকন্দমেককম্॥”

কলিরাজের সম্প্রদায়ভুক্ত এই নাস্তিকের ঈদৃশ কর্ণপীড়াকার দুর্ব্বাক্য শুনিয়া দেবাধিপতি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—“কে রে এই ভাবে বেদাদি শাস্ত্রকে দুষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত দিতেছে ?” ইন্দ্র তখন হস্ত দ্বারা নিজের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন,—

‘লোকত্রয়ীং ত্রয়ীনেত্রাং বজ্রবীর্য্যস্ফুরৎকরে।

ক ইত্থং ভাষতে পাকশাসনে ময়ি শাসতি॥”

“পাকাসুরমর্দ্দনকারী আমি ইন্দ্র, এখনও বজ্রহস্তে বৈদিক বিধিনিষেধ অনুসারে ত্রিভুবন শাসন করিতেছি,—আমাকে এইভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াও কোন্ দুর্ব্বৃত্ত বেদের প্রামাণ্য অন্যথা করিবার অভিলাষ করে ?”

শাস্ত্রে আছে, “বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ”—সেই বজ্রাস্ত্রধারণকারী ইন্দ্রকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিয়াও যে পামর শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে চায়, তাহার ত সামান্য সাহস নহে,—এই অভিপ্রায়েই ইন্দ্রকে ‘বজ্রবীর্য্যস্ফুরৎকর’ রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। [ক্রমশঃ।

রাসলীলা।

["ওপারের কথা"র লেখক]

যিনি শিশুকালে ও বাল্যাবস্থায় হাসিতে খেলিতে নানা অলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া—বিশেষতঃ গোবর্দ্ধন ধারণ ও কালীয় দমন কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকের কর্ম্মে সুসিদ্ধ হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি বৃন্দাবনের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে অসামান্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি কৌতুকচ্ছলেও কর্ত্তব্য সাধনের ও ধর্ম্মজীবন গঠনের পন্থাগুলি শিক্ষা প্রদানে যত্নশীল ছিলেন ও যিনি বৃন্দাবনে অবস্থান কালে আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন, তিনি কি তুমি-আমি একজন! বিধাতা যদি দিন দেন, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কর্ম্মের মূলতত্ত্ব এ মূর্খ যতটুকু ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব ও যতটুকু সামর্থ্যে সঙ্কুলান হয়, জ্ঞাপন করিতে সচেষ্ট হইবে। তবে আপাততঃ জাগতিক কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী থাকিয়া এই সুমহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করাও অধমের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

মনের স্বধর্ম্ম—কোন সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইলে উহা তদনুরূপ কর্ম্ম সাধিতে বিশেষ যত্নশীল হয়। রাসলীলার পূর্ব্ব হইতেই গোপ-বালক ও মহিলাগণের শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মাবলীর দ্বারা বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহাদের সহিত একপ্রাণ। প্রতিভায় ও শক্তিমত্তায় যিনি শীর্ষস্থানীয়, তিনি যদি কাহাকে অবজ্ঞা চক্ষে না দেখেন, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষণে কেই বা উদাসীন হয়? এই প্রকার ব্যক্তিকে তাঁহাদের একজন বলিলে মুখোজ্জ্বল হয় না কি? এই প্রকার ব্যক্তির নিকট উন্নত মস্তকও আপনা হইতে অবনত হয় না কি? এই প্রকার ব্যক্তি যদি প্রেমের বন্ধনেও আবদ্ধ করেন, তাঁহাকে "আমার" "কেবল মাত্র আমারই" বলিতে সাধ হয় না কি? আরো সাধ হয় না কি শুনি—সাধ মিটায়ে শুনি, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে "তিনি আমার"? সংসার-তাপে তাপিত কোন্ প্রাণ-মনঃ এই প্রকার শান্তি ও আনন্দদায়ক মহাপ্রাণকে আপনার করিতে লোলুপ না হয়? যদি কাহারও সুবিধা থাকে, এই প্রকার মহাপ্রাণের শ্রীমুখ হইতেই শুনেন যে, "আমি তোমার" (হাম্ তেরা), তিনি কি এই সাধটুকু অবহেলে বিসর্জ্জন দিতে পারেন? যদি কোন ললনা

স্বেচ্ছায় কাহার নিকট আপনাকে বিক্রিতা করেন, তাঁহার কি প্রাণে প্রবল তৃষা হয় না যে, তিনি স্বকর্ণে শুনেন বা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার প্রাণের দেবতা তাঁহারই? বৃন্দাবনের ললনাগণ স্বেচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের গুণে বিমোহিতা হইয়া আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিক্রিতা করেন নাই কি? যাঁহারা কাহারও সামান্য গুণে বিমোহিতা ও সামান্য আদরে পরিতুষ্টা হয়েন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য গুণে বিমুগ্ধা ও অপরিসীম প্রেমে বিগলিতা হইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি? কমনীয়, লোভনীয় ও আদরণীয় পরমধন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের মধ্যেই পাইয়া, তাঁহারা কোন্ প্রাণে সাধ না পোষেণ যে, শুনেন—একবার মাত্র শুনেন—তাঁহারই শ্রীমুখে যে "তিনি তাঁহাদের"? যাঁহাদের হৃদয়ে যত্নে প্রোথিত বীজ, বীজাকার হইতে বিশাল তমালবৎ আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদের সুফল লাভের আশা দিনের দিন বলবতী হয় না কি? এই সাধ—এই প্রাণের তৃষা মিটাইবার জন্য বৃন্দাবনের গোপ-মহিলাগণ আপন-হারা অবস্থায় লীলাস্থলে ধাবমানা হইয়াছিলেন। জাগতিক অকিঞ্চিৎকর যাহা কিছু লাভের আশায় মানব এদিক্ সেদিক্ করিয়া কত দিকেই না ধাবিত হইতেছে। সেই সাধ মিটাইবার জন্য প্রাণ, মন ও দেহ উৎসর্গ করিতেছে ও এমন কি কত-না অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম সাধন করিতেছে; কিন্তু যাঁহাতে কদর্য্য আচরণের বা স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই ও যাঁহার নিকট বীভৎস আচরণের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তবে আছে—নিঃসন্দেহ আছে, প্রাণ ঢালাঢালি কারবারও আছে, বিপুল পরিমাণে আছে—সেই সুখ, সেই আরাম, সেই আনন্দ ও সেই শান্তি, যাহা আর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব, সেই মহাপ্রাণের দিকে, সেই মহান্ শক্তিধরের দিকে ও সেই মহান্ প্রেমিকের দিকে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনঃপ্রাণ প্রবাহ আকারে ধাবমানা হইবে না কেন? এ গতি রোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব কি? সূর্য্য কর্ত্তৃক আকর্ষিত বারিরাশি বাষ্পাকারে দিনমনির দিকে ধাবিত নহে কি? সেই সম্মিলনীতে, সেই শুভ রজনীতে ও সেই লীলাস্থলেই গোপমহিলাগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন যে, তাঁহাদের প্রাণের সাধ মিটিবে। মিটিবে—নিঃসন্দেহ মিটিবে—তাঁর, সেই তাঁর, সেই প্রিয়-বদনের, সেই কমনীয়ের, সেই পরমধনের, সেই বড় সোহাগের, সেই বড় গরবের শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে স্বকর্ণে শুনিবেন ও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবেন—সাধ মিটাইয়া উপলব্ধি করিবেন—"আমি তোমার"!

পূর্ব্ব হইতেই উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহিলাগণ লীলাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আর দেখিলেন, তাঁহাদের প্রাণধন বা তাহাদের চিন্তার ভোজ্য-সেব্য সামগ্রী তাঁহাদেরই জন্য সহাস্য বদনে অপেক্ষা করিতেছেন। হাসিতে হাসি টানিল, তাই গোপীগণের বদনেও হাসি দেখা দিল। দুই হাসির প্রবাহ এক সঙ্গে নীরবে মিলিত হইয়া লীলাস্থল আনন্দমাত্রাত্মক হইয়া উঠিল। নিশাপতি নিশীথ রজনীকে বিরলে পাইয়া যে হাসিতে ধরাকে হাসান, এ হাসিও তদ্রূপ। মহিলাগণ একে একে অগ্রসর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক এক করিয়া সকল মহিলার করকমল শ্রীহস্তে লইলেন। মরি—মরি—কি স্পর্শ! সেই স্পর্শে প্রত্যেকের অবসাদ ঘুচিয়া গেল; সেই স্পর্শে দেহে, প্রাণে ও মনে এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল; সেই স্পর্শে দেহ রোমাঞ্চিত হইল; সেই স্পর্শে প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল; সেই স্পর্শে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি কি-যেন-কি-এক অননুভূতপূর্ব্ব পুলকে বাজিয়া উঠিল; সেই স্পর্শে মন আনন্দে আপ্লুত হইল, সেই স্পর্শে নয়ন ঝর ঝর ঝরিতে লাগিল ও সেই স্পর্শে ব্রজাঙ্গনাগণ প্রাণ-রমণের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে সাধ পুষিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কোন মহিলাকে সে অবসর প্রদান না করিয়া প্রত্যেক মহিলার গণ্ডদেশে চুম্বন করিলেন ও প্রত্যেকের কর্ণে কর্ণে বলিলেন, সেই কথা—যাহা পুরাতনেও নূতন—ভাষার সার—গীতের সুর, সোহাগের বাঁধ—গর্ব্বের চূড়ান্ত—প্রাণের তেজঃ ও মনের আকাঙ্ক্ষা। সেই কথা—যাহার দান মুচকি হাসি ও প্রতিদান চুম্বন। সেই কথা—**আমি তোমার (হাম তেরা)**। যাহা কত শত জীবন-তরীকে প্রতিকূল বায়ুতে অকালে নিমজ্জিত করিয়াছে। আবার অনুকূল বায়ুতে দুই দশটা তরীকে ভবপারের অন্য পারে লইয়া গিয়াছে। শশাঙ্ক কিরণজাল যেমন সমুদ্রকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া ঢলিয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শনে, চুম্বনে ও সুধামাখা 'আমি তোমার' বাণী শ্রবণে গোপীগণের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। গোপীগণ তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন যে, তাঁহাদের প্রাণধন, তাঁহাদেরই বটে। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহারা নিজ নিজ অভি-মত স্থানে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গের সাথী। এই দৃশ্য দর্শনমাত্র বিস্ময় আসিয়া গোপীগণের মানব-সুলভ সংশয়কে সাথী করিয়া লীলাভূমি হইতে অন্তর্হিত হইল। তৎপরে তাঁহারা উপবিষ্টা হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ সহ আলাপন মানসে; কিন্তু অল্পক্ষণ আলাপনের পর প্রাণের আবেগ রুদ্ধ না রাখিতে পারিয়া গীত আরম্ভ করিলেন। পরে প্রত্যেকে আপনি মাতিয়া নৃত্যগীতে লীলাভূমি ও উপবন মাতাইলেন। তৎপরে হাস্যি

তরঙ্গ উঠিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে অশ্রুধারা হাস্যের অনুগামিনী হইল। সে এক অভিনব দৃশ্য! আবার নৃত্য সহ গীত ধরিলেন ও দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণও কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন। অহো—কি আনন্দ! কি আনন্দ! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসহ উপবিষ্টা হইলেন ও শ্রীঅঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। তন্দ্রাও অবসর বুঝিয়া দেখা দিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণেই অবসর লইলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই অবসরে লীলাভূমি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণের চমক ভাঙ্গিল ও আশে পাশে দেখিতে লাগিলেন। যাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন, তিনি সে স্থানে নাই, ইহাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয় অন্ধকারময় হইল ও সমস্ত লীলাভূমি তাঁহাদের প্রতীয়মান হইল—তিমিরান্ধকারে আবৃত। চারিদিকে হাহারব উঠিল। প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ ইত্যাদি সম্বোধনে উপবন মুখরিত হইল। মহিলাগণ উন্মাদিনীর মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাতি পাতি অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। তৎপরে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া নয়নজল সম্বল করিলেন, কেহ বা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহ বা আপনাকে অপরাধিনী সাব্যস্থ করিয়া আপনাকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কেহ বা অন্য সখীর গলদেশ ধরিয়া "আমার কি হইল" বলিয়া ক্রন্দনের রোল তুলিলেন, কেহ বা "আমিই কৃষ্ণ" বলিয়া বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইলেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে অপর সখীর গণ্ডদেশে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে গোপীগণ ক্লান্তা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্ব স্ব অঞ্চল পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে শয়ন করিলেন। এই অবসরে তন্দ্রাদেবী আবার রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণেই লীলাভূমি ঘোর নিস্তব্ধতায় নিমজ্জিত হইল। সেই অবস্থায় গোপীগণ দেখিলেন, তাঁহাদের প্রাণধন তাঁহাদের শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য বদনে বলিতেছেন :—

"তোমাতে আমি সৈ পশি, যাপিব লো সারা নিশি,
এই সাধ এবে পুষি এসেছি লো ফিরে আমি।"

এই স্বপ্নদর্শনে গোপীগণ ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া বসিলেন ও চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ লীলাভূমি শ্রীকৃষ্ণশূন্য, ইহাই বুঝিলেন। তখন কোন উপায় না দেখিয়া, হতাশ হইয়া চক্ষু মুদিতা করিলেন। অমনি দেখিলেন, যাঁহাকে তাঁহারা কত অনুসন্ধান করিয়াও পান নাই—তিনি—সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়-নিকুঞ্জবনে বিরাজিত! সে রূপ—সে অসামান্য রূপ দর্শনে কিয়ৎক্ষণ চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেন না। তৎপরে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাদের শিরোদেশে। আরও দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দেহের শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে; এইবার সভয়ে চাহিলেন, চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব তাঁহাদেরই পার্শ্বে। বিস্ফারিত নয়নে চারিদিক্ দেখিলেন। দেখিলেন, লীলাস্থল শ্রীকৃষ্ণময়। ত্রস্তে উঠিলেন, উঠিয়া উপবনের দিকে ধাবিত হইলেন, শশধরের দিকে দেখিলেন; দেখিলেন, তথাও শ্রীকৃষ্ণ। তৎপরে দেখিলেন—নভোমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, লতায় লতায় শ্রীকৃষ্ণ, পত্রে পত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও তৃণে তৃণে শ্রীকৃষ্ণ। পাছে প্রিয়তমের শ্রীঅঙ্গে পাদক্ষেপ করেন, এই ভয়ে অঞ্চল পাতিলেন, নিজ নিজ চরণ কমল উঠাইলেন ও কত কি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু তবুও দেখেন—শ্রীকৃষ্ণময় দেহ, বসন ও বসুন্ধরা। অবাক্ হইলেন, কি করি, কি করি বলিয়া লজ্জিত হইলেন। সরমে ঢলিয়া পড়িলেন। সেই অবসরে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহাদিগকে স্বক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, গোপীরা কেহই তাহা জানিলেন না। হঠাৎ মুরলী-ধ্বনি শুনিলেন। নয়ন মেলিয়া দেখেন নিশাপতি বিদায় লইয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান। শুনিলেন, মুরলীবদন ললিত রাগিণীতে গাহিতেছেন;—

"উঠ উঠ প্রেমময়ী রাসেশ্বরী আমার।
তুমি যথা, আমি তথা, তুমি আমি একাকার।"

মহিলাগণ সেই ইঙ্গিত বুঝিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহারাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন,—

বিশ্বাসে মিলায় পরম রতন,
যুগ পর যুগ করিল ঘোষণা।

সেই নিশি অবসান হইতে বৃন্দাবনধামে এই লীলার যবনিকা পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদিন না নির্গুণ ব্রহ্ম এ বিশ্বকে উঠাইয়া লইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্ম ও অবতারাদি ভাবেও আকারে ইহা নৃত্যলীলাবৎ পূর্ব্বোক্ত কারণে সাধিত হইবে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই লীলা কোন নর-নারী কর্ত্তৃক ইহ-লোকে সাধিত হইলে ব্যভিচারে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং এই লীলার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ও আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে সংযত না করিয়া এবম্বিধ কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও গর্হিত কর্ম্ম।

এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মহিলাগণকে "আমি তোমার" বলা শ্রীকৃষ্ণের অসঙ্গত কর্ম্ম করা হয় না কি? একমাত্র মনই যাহাদের সম্বল, তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ভার্য্যা ব্যতীত অন্য রমণীকে "আমি তোমার" এই কথা কোন

প্রকারে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহ অন্যায় আচরণ। কিন্তু যিনি বয়সে বালক মাত্র ও যিনি নিজ কর্ম্ম দ্বারা প্রতিপন্ন করাইয়াছিলেন যে, তিনি সমগ্র বৃন্দাবনবাসীর, তিনি মহিলাগণকে "আমি তোমার" এই কথা বলিয়া গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহার সুবিচার তাঁহারাই করিতে সক্ষম, যাঁহাদের মস্তক কলুষিত ভাবের বা রোগ-শোকের বা সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য বিকৃত হয় নাই। এ অধমের জিজ্ঞাস্য আত্মায় অধিপতি কোন মহাপ্রাণ কর্ত্তৃক কোন পাঠক সম্ভাষিত হইয়াছেন কি? যদি কাহারও সে ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, মনে হয়, তিনিই এ প্রকার সম্ভাষণের অমূল্যতা সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে সক্ষম হইবেন। ফল কথা, এই ভাগ্যোদয় যাঁহার হইয়াছে, তিনি সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত সন্নাসী সন্ন্যাসিনী। তাঁহার ব্রত সময়ের সদ্ব্যবহার করা ও নিজ নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় জাগতিক কর্ম্ম দেনা চুক্তি হিসাবেও প্রাণ মন ঐক্য করিয়া সাধন করা। তিনি বৃথা বাক্য ব্যয় বা পরচর্চ্চা করিয়া বা অনাবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কালক্ষেপণ করিতে নিতান্ত বীতরাগ।

মনেই পার্থক্য বিদ্যমান, আত্মায় কিন্তু সে পার্থক্য নাই। মনের পার্থক্য বশতঃ জীব আপন-আপন জাগতিক যাহা কিছুর জন্য চিন্তান্বিত। এই পার্থক্য বশতঃ একজনের সামগ্রী বা যাহা কিছু অন্যের অধিকারভুক্ত নয়। আত্মা সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বজীবে অবস্থিত। সুতরাং সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বজীব আত্মার অধিকারভুক্ত। এই জন্য মনের অতীত অর্থাৎ আত্মময় শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলে বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন "আমি তোমার" সুতরাং সাধারণ জীবের নিকট যাহা অকর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণকে সেই বিধানের বশবর্ত্তী করা অসংযুক্ত নহে কি?

[ক্রমশঃ।

বিধির বিধান।

[লেখক—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এ]

(১)

শক্তিগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জানিত যে, দত্তদের বাড়ীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী উষারাণীর সহিত ঐ গ্রামেরই বিনোদবিহারীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহ একান্ত বাঞ্ছনীয়ও ছিল, কারণ উষা ও বিনোদ উভয়ে শৈশবে একত্র

লালিত পালিত, আর তাহার উপর উষার মাতা মৃত্যুকালে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাকে স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিবার সময় এই বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং সকলের বিশ্বাস ছিল এ বিবাহ হইবেই! কিন্তু যখন সকলে শুনিল যে, এই বিবাহে উষার পিতা অমত করিতেছেন, তখন সত্যই অনেকে বিস্মিত হইল! দত্তদের বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী উষারাণীর বিবাহ সেই গ্রামে দিলে বিষয় সম্পত্তি-রক্ষার ব্যবস্থাও হইবে আর দত্তজা সর্ব্বদা কন্যা জামাতার তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন এ সকল সুবিধার কথা ভাবিয়াও তিনি কেন যে এ বিবাহে অস্বীকৃত তাহা অনেকে প্রথমে ধারণাতেই আনিতে পারে নাই। সময়ে প্রকাশ পাইল যে দত্তজার ইচ্ছা তাহার জামাতা বিদ্বান হয়। মূর্খ বিনোদকে তিনি জামাতা করিতে অনিচ্ছুক। তবে যদি বিনোদ বিলাত গিয়া অন্ততঃ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাটা পাশ করিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে দত্তবাড়ীর জামাতা হওয়া অসম্ভব না হইতেও পারে। এমন কি, বিলাত-গমনের ব্যয়টা পর্য্যন্ত দত্তজা বহন করিতে স্বীকৃত আছেন। বিনোদ এই সর্ত্তে সম্মতি-প্রকাশ করিলেও তাহার মাতা এ কড়ারে পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হইলেন না। সুতরাং বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। দত্তজার ঐকান্তিক ইচ্ছা বিলাত প্রত্যাগত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার জামাতা হয়। তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। ডাক্তার শশীপদ বসু উষাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং ভবিতব্যের অখণ্ডনীয় বিধানে চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় শশীপদের সহিত কিশোরী উষার শুভ বিবাহ এক বাসন্তী সন্ধ্যায় সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

(২)

সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দত্তজা ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল পরে আজ এক সপ্তাহ হইল উষা তাহার স্বামীর সহিত শক্তিগ্রামে আসিয়াছে। পৈত্রিক সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্যই এই আগমন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। প্রতিবেশিনীর বাটীতে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া আসিয়া উষা তাহার দ্বিতল কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া উদ্যানের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। সে আজ বড় উন্মনা—অতীতের মধুর স্মৃতিগুলি একে একে তাহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া আজ তাহার রমণী-হৃদয়কে বড়ই উৎপীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বাহিরে বৃক্ষে লতায়, বনে উপবনে,

পুষ্করিণী-বক্ষে, প্রাসাদশীর্ষে সর্ব্বত্র রজত জ্যোৎস্নার ঘন কিরণ ধারা আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। সেই শুভ্রবাসে সজ্জিত হইয়া সমগ্র শক্তিগ্রাম যেন আজ পুলকে স্পন্দন করিতেছিল, কিন্তু এ সকল প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যের দিকে উষার দৃষ্টি ছিল না। সে ভাবিতেছিল, তাহার শৈশব-কাহিনী! সেই বাল্যের স্মৃতিগুলি কত মধুর—কত প্রাণারাম! তাহার নর্ম্মসখা বিনোদের কথা আজ বড় স্পষ্ট হইয়া নানা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল! উষা আশৈশব শুনিয়া আসিতেছিল যে, বিনোদই তাহার ভাবী স্বামী। এই দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায়ও যুবতী উষা তাহার বাল্য-স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সেই অতীতের মধুর স্মৃতি যখনই তাহার প্রাণে জাগিত তখনই সে উন্মনা হইয়া পড়িত।

একদিন উষা গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। সেই দিন আবার সেই বিনোদের সঙ্গে দেখা! দীর্ঘকাল পরে সহসা তাহার বাল্য-সহচরকে দেখিয়া উষা সত্যই আত্মবিস্মৃতা হইয়াছিল। নতুবা যখন বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'চিন্তে পার কি উষা!' সে সহসা উত্তর দিয়া বসিল, 'ভুলিবার সাধ্য কি'—

বিনোদের নয়নে একটা বক্র হাসি ভাসিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কিন্তু সে ত তখন জানিত না যে, এ বিনোদ আর বাল্যের সেই বিনোদ এক নহে। তাহার অতীতের বিনোদ এখন চরিত্রহীন!

তারপর একদিন এক প্রতিবেশীর বাটীতে বিনোদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। সেখানেও তাহাকে দেখিয়া বিনোদ বলিয়াছে, 'জান কি উষা! আমি আজও বিবাহ করি নাই!' কথাটা উষা গ্রামে আসিবার পরেই শুনিয়াছিল। সুতরাং নূতন নহে। কিন্তু ঐ কয়টা কথার ভিতর এমন একটা কিছু ছিল—অন্ততঃ এমন একটা হতাশার—বেদনার সুর বাজিতেছিল যে, তাহার মূর্চ্ছনাটুকু উষা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাই বহুক্ষণ পূর্ব্বে বাটী ফিরিয়াও সে বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই অন্যমনে বাতায়ন-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল,—কেন এমন হয়? মানুষের কথা সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণধার শলাকার ন্যায় কেন অন্যের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে? ইহা ব্যতীত আরও একটা গুপ্ত কারণ ছিল, যাহার জন্য অতীতের কথা স্মরণে উষা আজ এত ব্যথা অনুভব করিতেছিল। এই সাত বৎসরের মধ্যে সে কখনও যথার্থ তৃপ্তিলাভ করে নাই। তাহার নারী-হৃদয়ের একটা অংশ একেবারে শূন্য ছিল। প্রৌঢ়ত্বের

সীমায় পদার্পণ করিয়া শশীপদ যুবজনোচিত চাপল্যের—বিলাসবিভ্রমের অতীত হইয়াছিলেন। আর বিশেষতঃ তিনি নারীর মনোরঞ্জন অপেক্ষা কার্য্যকেই শ্রেয় জ্ঞান করিতেন। উষা কিন্তু এটা মোটে বুঝিত না। স্বামীর মৌখিক দুটো আলাপ—কর্কশ সংসারের নীরস কথা তাহার প্রাণে তৃপ্তি আনিতে পারিত না, তাঁহার বুভুক্ষু প্রাণে শান্তির বারিধারা বহাইতে পারিত না। তাই বোধ হয় বাল্যবন্ধুর কয়েকটা কথায় সে আজ বড়ই বেদনা অনুভব করিল —তাই সে এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজেকে বড়ই অসহায়, বড়ই দীন বোধ করিতেছিল। তাহার নারী-হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশ হইতে একটা অব্যক্ত হাহাকার ধ্বনিত হইতেছিল, তাহার কান্না আসিতেছিল।

(৩)

সে নিশা জ্যোৎস্না-প্লাবিত। উষা স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছে তাহার স্বামী আসিয়া বলিল—"দেখ উষা আমি একবার বাইরে যাব।"

"কোথা ?"

"আর বল কেন! 'ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'! এই এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামের সকলে আমাকে বড় ডাক্তার বলে মনে করেছে! পশ্চিম পাড়ায় কে নরু হাজরা আছে, সে এসে ধরেছে তার ছেলেকে একবার দেখতে যেতেই হবে। সে খালি মাথা নাড়্‌ছে আর চীৎকার কর্চ্চে। ছোট ছেলে—বড় কষ্ট হচ্ছে তা'র! যা হোক, আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব, আস্‌তে ঘণ্টাখানেক দেরী হ'তে পারে।"

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর উষা খেয়ালের বশে উদ্যানে প্রবেশ করিল, যদি উন্মুক্ত স্থানের নির্ম্মল বাতাস তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ককে শান্ত করিতে পারে! সে ধীরে ধীরে গিয়া মল্লিকার বেড়া-ঘেরা একটা বেদীতে উপবেশন করিল। তাহার মনে পড়িল, এই স্থানটিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। পট্টবস্ত্র পরিহিতা সে এই বেদীতে বসিয়া রাশি রাশি বেলা, যাতী, যুঁই, মল্লিকা, সেফালি কুসুম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহদেবতার পূজার জন্য মালা গাঁথিত! একদিন বিনোদ দুষ্টামী করিয়া তাহার মালা ছুঁইয়া দেওয়ায়, মনে পড়িল, সেদিন সে ঠাকুরকে তাহার গাঁথা মালা দিতে পারে নাই। সে কারণ সে দিন সে পিতার নিকট বিনোদের জন্য কত না লজ্জিতা হইয়াছিল!

যুবতী ধরণীপৃষ্ঠে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল। সহসা কিসের শব্দে সে চমকিতা হইল! ও কিসের শব্দ, কে আসিতেছে না? মানুষই ত' বটে!

ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে যুবতী লক্ষ্য করিল—দেখিল, মৃদুপাদক্ষেপে আসিয়া তাহার সম্মুখে একজন দাঁড়াইল! তখন ভয়ে উষার কথা কহিবার শক্তি ছিল না! বিনোদ ডাকিল, "উষা! ভয় পেয়েছ?" উষার সাহস আসিল, সে বলিল, "তুমি কি করে এখানে এলে?"

"পাঁচিল টপ্‌কে! উষা! আমিই ত' নরু হাজরাকে পরামর্শ দিয়ে শশী ডাক্তারকে ডাক দেওয়াই। বেশ ফন্দী করি নাই উষা!" এই বলিয়া বিনোদ পিশাচের অট্টহাসি হাসিল। কি তীব্র হাসি! উষার অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে সে বলিল, 'এত রাত্রে—এই নির্জ্জনে—' বাধা দিয়া বিনোদ বলিল, "উষা! এই চাঁদের আলোয় এই সেই বাল্যের পরিচিত স্থানে তোমাকে দেখে সেই দশ বৎসরের পুরাতন কথাগুলো যেন চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওঃ কি সে দিনগুলোই গিয়েছে!" তখন উষার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল! অতি কষ্টে সে জড়িতস্বরে বলিল, "যাও বিনোদ দাদা! বাড়ী যাও!"

বিনোদ উষার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া ডাকিল 'উষা!'

"দোহাই তোমার, আমায় প্রলোভন দেখিও না—তোমার পায়ে পড়ি চলে যাও! এ কি! তুমি টল্‌ছো যে! মদ খেয়েছো নাকি?"

"আশ্চর্য্য হ'লে নাকি? মদই যে এখন আমার সঙ্গী!"

উষা বলিল, "ছিঃ তুমি মাতাল!"

"সবই ত জান উষা! তুমি আশা দাও, আমি আবার মানুষ হব!"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া উষা বলিল—"কি, তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে বল?"

বিনোদ হাসিল,—"ওসব আমি বুঝি না! আমি তোমায় ভালবাসি, ব্যস্ এই যথেষ্ট। সত্য বল দেখি উষা! তুমি এই বিগত যৌবন বৃদ্ধের সহিত বিবাহে সুখী হয়েছ কি না? 'নিশ্চয়ই না। আমি সাত বৎসর পরে তোমাকে দেখেই তা বুঝেছি! কেন এ কর্ম্মভোগ উষা! চল আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাই!"

উষা চীৎকার স্বরে বলিল, "দোহাই তোমার, তুমি এখান থেকে যাও, তুমি পিশাচ!"

"না উষা! আমি মানুষ! তোমাকে ভুলিতে গিয়াই আজ আমি চরিত্রহীন—মাতাল!"

বিনোদ উষার দিকে অগ্রসর হইল! উষা আতঙ্কে পিছাইয়া গেল!

চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও জনমানব নাই, সুধার পরিবর্ত্তে চন্দ্র যেন হলাহল ঢালিতেছে!

এই নির্জ্জন রাত্রে তাহার সম্মুখে এক মাতাল লালসামদিরনেত্রে তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে! এ সময় কে তাহাকে রক্ষা করিবে! যুবতী তখন ঊর্দ্ধে চাহিল, মনে মনে স্বামী-দেবতার চরণ স্মরণ করিয়া বলিল —প্রভো, এই আসন্ন প্রলোভনের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিবার মত বল দাও, আমার নারী-ধর্ম্ম রক্ষা কর!

সহসা বিনোদ উষার হাত ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী সর্পাহতার ন্যায় আতঙ্কিতা হইয়া সবলে হাত ছিনাইয়া লইল, বলিল, "যদি এখনই তুমি এস্থান না ত্যাগ কর, আমি চীৎকার করিব!"

বিনোদ পৈশাচিক হাসি হাসিয়া বলিল, "আর সকলে আসিয়া দেখিবে—এখানে তুমি আর আমি আছি! সেটা বড় রমণীয় দৃশ্য হবে—না?"

উষার কান্না আসিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল "পিশাচ! ঈশ্বর কি নাই?"

বিনোদ আবার হাসিয়া উঠিল। সহসা দূরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। উষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "ঐ বুঝি আমার স্বামী আসিতেছেন। দোহাই তোমার আমায় বাঁচাও—আমার মান বাঁচাও—শীঘ্র পালাও।" বিনোদও চমকিত হইল। সে ভাবিল, প্রাচীরের পাশেই পথ, সেই পথে ডাক্তার আসিতেছেন। আর বাগানও নিরাপদ নহে—এ চন্দ্রালোকে সে কোথায় লুকাইবে? তাহার মাথায় এক নূতন মতলব খেলিল। সে বলিল, "আজ তোমায় বাঁচাইতে পারি—কিন্তু প্রতিদান চাই।" উষা তখন কম্পিত ওষ্ঠ দন্তদ্বারা চাপিয়া ধরিল, বলিল "রক্ষা কর, তোমার ঋণ পরিশোধ করবো"।

"উত্তম! তুমি সটান গিয়ে দরজার নিকট ডাক্তারের সহিত দেখা কর। তাঁকে বল একটা মাতাল কি পাগল এত রাত্রে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—সে বৈঠকখানায় বসে আছে। এই কথা বল্লে ডাক্তার বাবু সন্দেহ করবেন বলে বোধ হয় না।"

(৪)

ডাক্তারের বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত হইয়া বিনোদ পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া বাতি জ্বালিল ও একটা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল। তাহার তখন সত্যই কষ্ট বোধ হইতেছিল। একটা সিগারেট ধরাইয়া এক টান ধূমপান করিয়া সে উহা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার দেহ অসাড় হইয়া আসিতেছিল, শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

ডাক্তার ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কষ্ট হচ্চে?"

বিনোদ বলিল, "তা' জানি না। তবে বুকটা কি রকম কচ্চে। অবশ্য আমার এ রকম মধ্যে মধ্যে হয়। আজ রাত্রে আপনাদের বাটীর সাম্‌নে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ খুব বেশী কষ্ট হোল, আর চলিতে পারিলাম না। আপনাকে খুঁজিলাম—তারপর এখানে এসে বসে আছি—আমায় মাপ কর্ব্বেন।"

"না—না। আপনি বেশ করেছেন। আমার স্ত্রীও ঐ কথা বল্লেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমার বাটীর কাছে এসে পড়েছিলেন, নইলে পথের মাঝে হয়ত আপনার বিপদ হত।"

ডাক্তার ষ্টেথ্‌স্‌কোপ্‌টি পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "আপনার—বুকটা একবার পরীক্ষা করি।"

"নিশ্চয়! আসুন"—এই বলিয়া সে কোট খুলিল—শার্টের বোতাম খুলিল।

ডাক্তার, নীরবে এক মিনিট দুই মিনিট পরীক্ষা করিবার পর ধীরে ধীরে যন্ত্রটা পকেটে রাখিলেন। তারপর পশ্চাৎ দিকে নিজ হস্তদ্বয় ঘুরাইয়া রাখিয়া কক্ষের মধ্যে পাইচারী করিতে লাগিলেন।

ঘড়িটা—বড়ই একঘেয়ে রকমে চলিতেছিল, বিনোদ বিরক্ত হইল!

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কে আছেন?"

বিনোদ অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর দিল, "কা'কে চান? বাপ মা নেই বটে—তবে খুড়ো জ্যাটা—"

"থাক, আর বলতে হবে না—বিবাহ করেছেন?"

"আজ্ঞে না! তবে শীঘ্র করবার ইচ্ছা আছে!"

ডাক্তার চক্ষু হইতে চশমাখানি খুলিলেন—কাঁচ দুইখানি মুছিলেন—আবার চশমা চোখে লাগাইলেন।

দূরে একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। কক্ষটা বড়ই নির্জ্জন বোধ হইতে লাগিল। ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন, "শুনুন, আমার মতে রোগীর নিকট তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা ডাক্তারের গোপন করা কর্ত্তব্য নহে! আমার বিশ্বাস আপনার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে।"

বিনোদ শ্লেষ জড়িত স্বরে বলিল, "সেই জন্যই ডাক্তার বাবু আমি বিবাহ ক'রে সস্ত্রীক একবার হাওয়া বদ্‌লাতে যাব স্থির করিয়াছি।"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনার বিবাহ করা উচিত নহে।"

বিনোদের আর এই অভিনয় ভাল লাগিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

ডাক্তার সস্নেহে বিনোদের স্কন্ধে একটি হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "শুনুন তবে, আপনার বিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। মৃত্যু আপনার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। আপনার ক্ষয়রোগ হইয়াছে!"

সহসা ধরণী স্তব্ধ হইয়া গেল। বিবর্ণ মুখে বিনোদ বলিল, "মিথ্যা কথা—আপনার ভ্রম হইতে পারে।" তারপর টলিতে টলিতে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

* * * *

ডাক্তার ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের আলোকটা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, উষা তখনও জাগিয়া আছে। তিনি বলিলেন, "তোমার সেই রোগীটিকে দেখিলাম। তাহার অবস্থা"—

উষা আর থাকিতে পারিল না! সে উঠিয়া বসিল ও ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "তার কি তবে কোন অসুখ"—

"অসুখ? তা'তে আর সন্দেহ আছে! তার যে কত বেশী অসুখ, তাহা বেচারা নিজেই জানে না! অভাগার ফুস্‌ফুস একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে! আর এক মাসের বেশী সে বাঁচ্‌বে কি না সন্দেহ!" উষার নয়নপ্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল!

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী বিদ্যাভূষণ এম-এ, বি-এল্‌।]

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে শিক্ষার সুযোগ ও রচনার অবসর পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাক্‌, তাঁহার সাহিত্যানুরাগের কোনও প্রমাণ আছে কি না! এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এক্ষণে কোচবিহারে যে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই হয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বা তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিত-বর্গের লেখা, নয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আজ্ঞায় নকল করান। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে নিজে রচনা করিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহার নামযুক্ত নয়

খনি গ্রন্থ (১) উপকথা (২) বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ (৩) রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড (৪) স্কন্দ-পুরাণ—ব্রহ্মোত্তর খণ্ড (৫) মহাভারত—আদিপর্ব্ব (৬) মহাভারত—সভাপর্ব্ব (৭) মহাভারত—শল্য-পর্ব্ব (৮) মহাভারত—ঐষিক পর্ব্ব ও (৯) পদ্ম পুরাণ—ক্রিয়াযোগ সার। এতদ্ব্যতীত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের শেষে "নিদাঘ বর্ণনা" নামক তাঁহার একটি খণ্ড কবিতা ও তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সভাস্থিত পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থের তালিকা দীর্ঘ। কেবল গ্রন্থ ও রচয়িতা-গণের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কিরূপ বিদ্যোৎ-সাহী ছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণের আজ্ঞায় ব্রজসুন্দর 'হিতোপদেশ' ও 'রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড,' মহীনাথ শর্ম্মা 'মহাভারত অশ্বমেধ ও মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব,' বৈদ্যনাথ 'মহাভারত বনপর্ব্ব ও মৌষলপর্ব্ব', মাধব বিদ্যানিধি 'স্বর্গারোহণ পর্ব্ব' রঘুরাম 'আদি পর্ব্ব' 'ভীষ্মপর্ব্ব' 'অযোধ্যাকাণ্ড' কিষ্কিন্ধাকাণ্ড,' ও 'উত্তরাকাণ্ড' রাম-নন্দন 'নৃসিংহ পুরাণ' লক্ষ্মীরাম 'কর্ণপর্ব্ব,' 'অযোধ্যাকাণ্ড' কীর্ত্তিচন্দ্র 'আশ্রমিক পর্ব্ব,' রুদ্রদেব 'আদিপর্ব্ব' ও 'অরণ্যকাণ্ড' রিপুঞ্জয় 'ব্রহ্মখণ্ড,' সারদানন্দ 'কাশীখণ্ড' ও 'উত্তরাকাণ্ড' এবং শচীনন্দন ও রামনন্দন 'ধর্ম্মপুরাণ' অনুবাদ করেন। ব্রজসুন্দর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"কবিতা কামিনী কান্ত শান্ত শিরোমণি।
গুণি-গণ-গণনার অগ্রে যাক গণি ॥"

[হিতোপদেশ]

কেবল রচনার দিক দিয়া নহে, বিভিন্ন দেশ হইতে পুঁথি সংগ্রহেও হরেন্দ্র-নারায়ণ সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আসামে প্রাপ্ত গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে আছে—

"বিহারের অধিপতি হরেন্দ্রনারাণ।
দূত পাঠি নিয়ে গেল বংশাবলী খান ॥
আর এক বংশাবলী পাছত নির্ম্মিলো।
ছাহেবক দিবে রাজা বিজয়ক দিলো ॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ দূত প্রেরণ করিয়া গন্ধর্ব্ব নারায়ণের বংশাবলী পুঁথির একখণ্ড আসাম হইতে আনাইয়া-ছিলেন। কেবল সংগ্রহে নহে, প্রাচীন পুঁথি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

নারদীয় পুরাণান্তর্গত গঙ্গামাহাত্ম্য নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতা নারায়ণ। ইনি মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময় বিদ্যমান

ছিলেন। উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা খড়্গনারায়ণের আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থ শেষে আছে—

"জয় খড়্গ নারায়ণ নৃপতি-তনয়।
গুণবন্ত সন্ত সাধু সজ্জন আশ্রয়॥
তাঁহার আদেশে তাঁর আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
নিগদতি মতি অনুসারে নারায়ণ॥"

এই পুঁথিখানি অতি জীর্ণ হইয়া যাওয়াতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ইহার একখানি নকল করাইয়াছিলেন। নকলের শেষে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্বাদশ জনে মিলিয়া পুঁথিখানি নকল করেন। তন্মধ্যে স্বয়ং মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও ছিলেন।

"ইতি শ্রীনারদি পুরাণের পদ যত।
দ্বাদশ জনেতে লিখি কৈল সমাপত॥
মল্লবংশ অবতংস শ্রীহরেন্দ্রভূপ।
রমণীর মানমণি-তস্কর স্বরূপ॥
পুরাণ স্বরূপ বৃক্ষ তাঁহার নিদেশে।
জীর্ণপর্ণে নব তরু হইল বিশেষে॥"

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নকল করা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "তাতপরে লিখিল কতেক মহারাজ।" মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং নকলকারীদের মধ্যে ছিলেন ইহা তাঁহার কম গৌরবের কথা নহে। প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষায় অত্যধিক আগ্রহ না থাকিলে এরূপ ভাবে স্বয়ং নকল করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মহারাজের পক্ষে সম্ভব হইত না।

কেবল সাহিত্যে নহে, শিল্প, সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রতিও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কোচবিহারে এখনও যে সকল এতদ্দেশীয় শিল্পী পিত্তলের দেবদেবীমূর্ত্তি গঠন করে তাহাদের মুখে শোনা যায় এই শিল্প অন্য দেশ হইতে কোচবিহারে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাহারা এ কথাও বলে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেও সময় সময় এই শিল্প অভ্যাস করিতেন। জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যানে আছে—

"শিল্পকর্ম্ম যাহা দৃষ্টি তাহা তৎকালীন শিক্ষা করেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৮ম অধ্যায়) অবশ্য প্রবাদ ভিন্ন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নিজ হস্তে মূর্ত্তি গঠনের আর কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু জয়নাথ মুন্সীর বাক্যানুসারে মহারাজ হরেন্দ্র-

নারায়ণের যে শিল্প শিক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তিনি এই মূর্ত্তি গঠন শিল্পের প্রবর্ত্তয়িতা কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক।

চিত্রকলায় হরেন্দ্রনারায়ণের অনুরাগ সম্বন্ধে জয়নাথ লিখিয়াছেন—"ভূপতির বাল্যকাল হইতে চিত্রপটের প্রতি অতি শ্রদ্ধা। কয়েকজন চিত্রকর অতি নিকটে থাকিয়া আজ্ঞা প্রমাণে নানা পট নানাপ্রকার চিত্র করে। কখনও স্বহস্তেও চিত্র করেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়) আর এক স্থলে জয়নাথ লিখিয়াছেন যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ "চিত্রেতে অদ্বিতীয়, লোক সকলের এবং পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৮ম অধ্যায়)

সঙ্গীতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অধিকারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে জয়নাথ বলিয়াছেন "গানবাদ্য সকলই শিক্ষা করিলেন এবং তালমান ও রাগরাগিণী এমত বুঝিতে লাগিলেন যে, উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশঙ্কিত হইয়া হুজুরে গান করেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেও যে সঙ্গীত রচনা করিতেন তাঁহার কথাও জয়নাথ বলিয়াছেন—"নানাপ্রকার গান সকল তালমান রাগরাগিণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রচিত সঙ্গীত সকলের ন্যায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অধ্যাত্মবিষয়ক সঙ্গীত সকল এক সময়ে কোচবিহারের বহির্দ্দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বিবিধ-ধর্ম্মসঙ্গীত" নামক গীত সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ২৯১ ও ২৯২ পৃষ্ঠায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত দুইটী গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী গীত সম্পূর্ণ অপরটী অসম্পূর্ণ। সেই দুইটী গীত এইস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

প্রথম গীত।

(বেহাগ—ঢিমে তেতালা)

ভুবন ভুলালে রে কা'র কামিনী, ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে ভালে করবাল যেন দামিনী॥
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে
নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে (রে)
শিরে শিশু শশী, ষোড়শী রূপসী, শশীমুখী, কাশীবাসিনী॥
অট্ট অট্ট হাসিছে রে
নাশিছে দনুজ মাভৈঃ ভাষিছে রে
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে তব রূপে ভবজননী॥

দ্বিতীয় গীত।

(খাম্বাজ—একতালা)

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা।

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আছে ভয়,

অন্তে যাবো তার ধামে বাজাইয়া দামা॥

শেষোক্ত গীতটীর দুইটী পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অন্যান্য গীত এতদ্দেশে ও অন্যত্র মুখে মুখে প্রচলিত থাকা সম্ভব। সাহিত্য-সভার সভ্যগণ ও সভ্যেতর ভদ্রমহোদয়গণ যদি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের কোনও সঙ্গীত অবগত থাকেন তাহা হইলে সেগুলি জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত এ সকল গীত গৃহীত হইবে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের পরিচিত গায়কদের নিকটও এ সম্বন্ধে সাহায্য পাইতে পারিবেন ইহাও আশা করা যায়। সকলের সমবেত চেষ্টায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি সঙ্গীতও বিস্মৃতি গর্ভ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কোচবিহার সাহিত্য সভার মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করি।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্যানুরাগ তাঁহার অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রথমা মহিষী পদ্মনাথ কার্য্যীর দুহিতা "গরুড় পুরাণে"র বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। 'গরুড় পুরাণে'র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। অসম্পূর্ণ যে একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রথমাংশের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে এ কথা জানিতে পারা যায়ঃ—

"বিহার অমরাবতী পতি নরেশ্বর।
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভোগে পুরন্দর॥
তার বড় মহিষী রূপসী শিরোমণি।
পদ্মিনী স্বরূপা পদ্মনাথের নন্দিনী॥
সে যে রাণী আই আজ্ঞা করিল আমারে।
জ (বগতি) জন্য এহি পুথি লিখিবারে॥"

এই সকল বিষয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালে কোচবিহারে সাহিত্য-চর্চ্চা যথেষ্ট হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহে, ধ্বংসপ্রায় পুঁথি নকল করাইয়া পুনঃ রক্ষার ব্যবস্থায় নূতন নূতন গ্রন্থ-রচনায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের যুগ কোচবিহারের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই যুগপ্রবর্ত্তক মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে সাহিত্য-রচনায় অনুপযোগী ছিলেন এ কথা বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চ্চার যে কাহিনী জয়নাথের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহাতে তিনি যে গ্রন্থরচনা করিতে অশক্ত ছিলেন তাহা কোন ক্রমেই বলিতে পারা যায় না। জয়নাথ ত স্পষ্টই মহারাজের গ্রন্থরচনার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে হরেন্দ্রনারায়ণের জীবনে সাহিত্য-চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা ছিল এবং তাঁহার সাহিত্যানুরাগও প্রবল ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থগুলি হইতে এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না তাহাব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সাধারণতঃ যাঁহারা পরের রচনা নিজের বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ রচনার মধ্যে কাহারও নাম উল্লেখ করিয়া ঋণ স্বীকারে প্রবৃত্ত হন না। কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা থাকে এইরূপ ঋণ স্বীকারে কেহ প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ফেলিবে। আরও একটা কথা, যখন আগাগোড়া গ্রন্থই অপরের লিখিত তখন আর ঋণ স্বীকার করিবারই বা প্রয়োজন কি? অতএব যদি কোন গ্রন্থে লেখককে কাহারও নিকট ঋণ স্বীকার করিতে দেখি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানাই যে অপরের রচনা এ সন্দেহ সহজে আমাদের মনে স্থান পায় না। হরেন্দ্রনারায়ণের "উপকথা" নামক গ্রন্থে আছে :—

"শিববংশে জাত, অবনী বিখ্যাত বিশ্বসিংহ অনুপাম।
তাহার তনয় অতি সুবিনয় নরনারায়ণ নাম॥
বাহুবীর্য্যে সন্ত করিয়া বিক্রান্ত আক্রমিলা বহুদেশ।
তাহার তনয় হৈল সে সময় লক্ষ্মীনারায়ণ শেষ॥
সেহি বংশে জাত ভুবন বিখ্যাত ধৈর্য্যেন্দ্র নাম নরেশ।
তাহার তনয় অতি অবিনয় হরেন্দ্র নাম যে শেষ॥
ভাষা বন্ধ ছন্দ করিতে প্রবন্ধ কেতাবের এককথা।
সামান্য জনায় তাক না বুঝয় এহি হেতু যে সর্ব্বথা॥
জয়নাথ নাম গুণ অনুপাম মুনশী কার্য্যে সেবক।
তার প্রমুখাত শুনিয়া পশ্চাত আরম্ভিলাম এ কথাক॥"

শেষোক্ত পংক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হরেন্দ্রনারায়ণ 'উপকথা' নামক গ্রন্থের উপাখ্যান জয়নাথ মুন্সীর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া পরে ইহাকে পদ্যে রচনা করেন। এই 'উপকথা'র উপাখ্যান ফারসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত। তাই "কেতাবের কথা" সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য মহারাজ হরেন্দ্র-

নারায়ণ বাঙ্গালা কবিতায় 'উপকথা' রচনা করিয়াছেন। যদি আদ্যন্ত গ্রন্থটিই অপরের রচিত হইত তাহা হইলে 'জয়নাথের নিকট গল্পটি শুনিয়া এই গ্রন্থ লিখিলাম' এ ভাবের কথা গ্রন্থে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব হইত। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া খুঁটি নাটিতে পর্য্যন্ত সাবধান হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এ স্থলে ত এরূপ মিথ্যা উল্লেখের কোনও প্রয়োজনই দৃষ্ট হয় না।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ "স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের" বঙ্গানুবাদ করেন। এই গ্রন্থ রচনার সময় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের মনে কাশী গমনের অভিলাষ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ শেষ বয়সে কাশীধামে গমন করেন ও সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। , এই ঐতিহাসিক সত্যের সহিত পুঁথির অধ্যায় শেষের ভণিতাগুলি আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে কাশীগমনাভিলাষ কিরূপে মহারাজের মনকে আয়ত্ত করিল তাহা ভণিতার বচনগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভণিতায় আছে :—

"আশুতোষে আরাধিলে চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে
অতঃপর চল বারাণসী।
কি ভ্রমে ভ্রমিছ মন মিথ্যা দারা ধন জন
কি ভাবনা ভাব দিবানিশি॥
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণে সুনব কবিতা ভণে
ভাবি মনে ভবপদদ্বন্দ্বে।
আনন্দ কাননে মন যাত্রা কর এহিক্ষণ
না পাইবে তবে ভালমন্দে॥"

আর একস্থলে আছে :—

"শ্রীহরেন্দ্রভূপে ভাষে মনে এহি আশা।
কাশীনাথ কাশীক্ষেত্রে ধ্রুবে দিবে বাসা॥"

অন্য একস্থলে দেখিতে পাই—

"কৃত্তিবাস নিবাসে নিবাস কর মন।
চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি আশায় এখন॥
অতঃপর হর গঙ্গাধর পদে মজি।
অনিত্য এ তনু ত্যজি গঙ্গাজলে মজি॥
মান' মন এহি যুক্তি, হবে মুক্তি তবে।
হরেন্দ্রে কহিছে তবে না আসিবে ভবে॥"

আর এক স্থলে আছে :—

"শিব শিব বল জীব চল শিবধাম।
দেহান্তে পাইবা মোক্ষপদ অনুপাম॥"

এইরূপ আরও অনেক পংক্তি আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। কেবল ইহাই নহে, এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত না হইতেই হরেন্দ্রনারায়ণ কাশীযাত্রা করেন। পরে আর গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার অবসর পান নাই। শেষে কীর্ত্তিচন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে আদেশ দেন। গ্রন্থের সার্দ্ধ সপ্তদশ অধ্যায় মহারাজের রচনা, অবশিষ্ট কীর্ত্তিচন্দ্রের লেখা। ইহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পংক্তিগুলি কীর্ত্তিচন্দ্রের রচিত।

"সেহি শিব অংশে শিববংশে অবদাত।
শ্রীহরেন্দ্র মানবেন্দ্র দেবেন্দ্র সাক্ষাত॥
সেহি মহীপতি কাশীগমনের আগে।
বেহারেতে বিহরিতে অতি অনুরাগে॥
স্কন্দপুরাণীয় ব্রহ্মোত্তরখণ্ড নাম।
ত্রিনেত্রের চরিত্র পবিত্র পুণ্যধাম॥
তার সার্দ্ধ সপ্তদশ অধ্যায় পয়ার।
আপনে ভূপালচন্দ্র করিতে তয়ার॥
বারাণসী গমন ঘটিলা নৌকাপথে।
যাত্রাবধি পৈল ভূপ নানা আবাল্যেতে॥
সেহি হেতু বৃষকেতু গুণসঙ্কীর্ত্তন।
বিরচিতে না পারিলা নৃপতিরতন॥
অঙ্কবাণ ঋষিশশী শাকে নিদাঘেতে।
বৃষরাশি মাঝে গ্রহরাজ প্রকাশিতে॥
পাটনা উত্তর গঙ্গাদ্বীপ মিথিলাতে।
গণ্ডকী সঙ্গম তথা পবিত্র ভূমিতে॥
বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ এহি দুই মাস।
সেহি স্থানে নরপতি করিতে নিবাস॥
একদিন এ দীনেরে সদয় অন্তরে।
কৃপাময় নররায় সাদরে আমারে॥
ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের অপর অধ্যাগণ।
আজ্ঞা দিল পদ তার করিতে রচন॥"

যিনি অপর ব্যক্তি দ্বারা গ্রন্থ লিখাইয়া নিজ নামে প্রকাশ করেন তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে কখনও এরূপ অংশ থাকিতে পারে না। সমস্তটাই যদি অপরের লেখা হয়, তাহা হইলে কতকটা নিজ নামে, বাকিটা অপরের নামে প্রকাশ করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

[ক্রমশঃ।

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়।

[লেখক—মোহাম্মদ কে, চাঁদ।]

বাঁকিপুরে গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিষয়-নির্ব্বাচন-সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন 'কি হেতু যে মুসলমানেরা সাহিত্য-সভায় যোগদান করেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।' তদুত্তরে আমি সেই সময় বলিয়াছিলাম যে, "তাঁহাদিগের যোগদান না করিবার কারণ এই যে, হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দু-সাহিত্যিকের মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ করা, রাজললনাগণের উপর বৃথা কলঙ্কারোপ করা এবং 'মুসলমান' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নেড়ে,' 'চাষা,' 'যবন', 'ম্লেচ্ছ,' 'তেতুল নয় মিষ্টি, আর নেড়ে নয় ইষ্টি,' প্রভৃতি নিদারুণ শেল সদৃশ বাক্যবাণ, উপন্যাস, নাটক ও এমন-কি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পর্য্যন্তও ব্যবহার করা, আজও পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহারা হিন্দুর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন।" অতঃপর বলিয়াছিলাম, "এইহেতু আমার ইচ্ছা এই যে, ইহার প্রতিকার সাহিত্য-সম্মিলন সভা হইতে হওয়াই উচিত।" তদুত্তরে, ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "ইহা সত্য যে, হিন্দুদিগের অন্তরে বিদ্বেষ ভাব আছে। আপনি কি বলিতে চান যে এই ভাব তিরোহিত হইবে? এ ভাব আছে, ছিল এবং থাকিবে! হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে লিখিয়া থাকেন, তাহাও সত্য। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে কত লোককে শাসন করিব? আপনারা এরূপ লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন।"

ইহাই সাহিত্য-সম্মিলন সভার কর্ণধারগণের মনোগত ভাব, উদ্দেশ্য বা মন্তব্য।

হিন্দুরা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়া মুসলমানদিগের অন্তরে ব্যথা দিবে, আর মুসলমানেরা তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া সাহিত্য-আলোচনা করিবে। ইহা যুক্তিসঙ্গত কথাই বটে!

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মনোগত ভাব এই যে, আমরা মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করিব, অনৈতিহাসিক ব্যাপার অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রকাশ করিব—বাস্তবিক (কাল্পনিক নহে) রাজকুমারিগণকে

উপন্যাসের নায়িকা করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিব—নাটকে প্রসিদ্ধা রাজললনাগণের কল্পিত প্রণয়-প্রার্থীর প্রেম রহস্য অঙ্কে অঙ্কে প্রস্ফুটিত করিয়া অভিনেতা-অভিনেতৃগণের দ্বারা অভিনয়ের সাহায্যে দর্শকবৃন্দের চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিসাধন করিব; আর তোমরা মুসলমান, তোমরা ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে, ভাষার উন্নতিকল্পে, জাতীয় মিলনের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান দিয়া আন্দোলন সংসৃষ্ট উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে আমাদিগের সহিত মিলিত হইবে!

মুসলমানদিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে সকল প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, মজুমদার মহাশয় তাহারও প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছিলেন। প্রতিবাদ করিতে মুসলমানেরা প্রস্তুত। কিন্তু প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ হিন্দু সম্পাদক মহাশয়েরা প্রকাশ করিতে সম্মত হন না। 'সংযমের অভাব'—'স্থানাভাব' প্রভৃতি মন্তব্যের সহিত ফেরতই দিয়া থাকেন। এইরূপ কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছে।

অনেকেই হয়ত বলিতে পারেন যে, এখন আর মুসলমানের উপর দোষারোপ প্রকাশক কোন কিছুই লেখা হয় না। কিন্তু, গত শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষ' ও 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে এইরূপ মুসলমান-ঘৃণাব্যঞ্জক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক্ষণে কথা এই—ইহাই কি মিলনের রীতি? যদি কোন পল্লিগ্রামস্থ দুইজন প্রতিবেশীর পরস্পর বিবাদ হয়, আর পরস্পর পরস্পরের যদি সততই কুৎসা, নিন্দা ও কলঙ্ক প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে কখনও কি মিলন আশা করা যায়? কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন যদি সমস্ত দ্বেষ, হিংসা, কুৎসা ও নিন্দাবাদ ছাড়িয়া অন্যের মিলন-প্রত্যাশী হয়, তাহা হইলে অপরজনও মর্ম্মান্তিক কথাগুলি বিস্মৃত হইতে পারে এবং উভয়ের মিলনও সম্ভবপর হইয়া উঠে।

এই হেতু আমি বলিতে পারি যে, আমাদের হিন্দু-প্রতিবেশী-ভ্রাতারা বিদ্যা বুদ্ধিতে, ধনে-মানে সকল দিকেই মুসলমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি লেখকের সংখ্যাও গণনাতীত। তাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। আর আমরা মুসলমান অর্থে-সামর্থ্যে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, মানসম্ভ্রমে সকল বিষয়েই হীনপদ হইয়া

তাঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। জ্ঞানের নিম্নতম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চতম সোপানে তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমার ছায়া-দর্শন করিতেছি মাত্র। আর মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের লেখনি-নিঃসৃত মুসলমান-অবজ্ঞাসূচক লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। তাই বলিতেছি ভাই হিন্দু! যদি মুসলমানকে ছাড়িয়া ভাষার উন্নতি বা সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় অবজ্ঞাসূচক লেখা পরিহার করা তোমাদের উচিত। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন-সভায় বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ণধার, যাঁহারা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ লেখক, যাঁহারা বাঙ্গালার নেতা ও যাঁহাদের কথা বিধিবদ্ধ আইনবাক্য বলিলেও চলে, তাঁহাদের উচিত এই বিষয় বিশেষ যত্ন লওয়া। তাঁহাদের উচিত বিচ্ছেদের কারণ অনুসন্ধান করা। তাঁহাদের উচিত ইহার প্রতিকার করা। আমার মতে সাহিত্য-সম্মিলন সভাই ইহার প্রতিকারের একটি প্রকৃষ্ট স্থল। কারণ এখানে বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর লেখকই সমবেত হইয়া থাকেন। এখানে রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ,মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সাহিত্যিকের হিসাবে আসিয়া সম্মিলন-কার্য্যে উৎসাহ দিয়া থাকেন ও সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারাই ইহার কর্ণধার। তাঁহারাই এরূপ মনোমালিন্য দূর করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে এবং মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে মুসলমানের উপর ঘৃণার উদ্রেক করেন, অনৈতিহাসিক বা ইতিহাস প্রমাণ বিরুদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া মুসলমানের প্রাণে আঘাত করেন, তাঁহারাও এখানে উপস্থিত থাকেন। সুতরাং মনে হয়, যদি সাহিত্য-সম্মিলন সভায় এই বিষয়ের প্রতিকারের কল্পে লেখকগণকে ঐরূপ জাতীয় বিদ্বেষভাবজনক প্রবন্ধাদি না লিখিতে অনুরোধ করেন, এবং সম্পাদক মহাশয়গণ প্রবন্ধাদি ছাপিবার পূর্ব্বে মুসলমানের আপত্তিকর বা মর্ম্মান্তিক কথাগুলি বাদ দিয়া উহা পত্রস্থ করেন, তাহা হইলে ঐরূপ লেখার গতি রোধ হয় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে পারে।

কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-রথীগণের যেরূপ মনোগত ভাব তাহাতে বোধ হয় না যে তাঁহারা এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবেন—তাহাতে বোধ হয় না যে তাঁহারা এরূপ একটী গুরুতর বিষয়কে প্রাধান্য দিবেন এবং মুসলমানদিগের অনুযোগের প্রতিকারে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু যতদিন ইহার প্রতিকার না

হইবে, ততদিন মনে-মনে, প্রাণে-প্রাণে মিলন অসম্ভব। জাতীয় সাহিত্য-গঠন, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন, জাতীয় একতা-স্থাপন যাহা বঙ্গবাসীর সাধনা, যাহা স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় বঙ্গের সুধীশ্রেষ্ঠ মহাজনগণের ইচ্ছা, তাহা কখনই পূর্ণ হইবে না, যতদিন হিন্দু মুসলমানের পূর্ণ মিলন না হইবে। জাতীয় কুৎসায়, জাতীয় ঘৃণায় কখনও জাতীয় মিলন হয় না! হিন্দু শিক্ষিত, উন্নত এবং জ্ঞানী। অন্যের কুৎসা রটনা কি জ্ঞানীর কার্য্য? মুসলমানেরা অবনত, বিদ্যায় পশ্চাৎপদ হইলেও হিন্দু কখনই মুসলমানকে ছাড়িয়া কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন না, যে হেতু মুসলমানেরাও বঙ্গবাসী, ভারতবাসী এক্ষণে আর ভিন্ন দেশবাসী নহে। যদি বাঙ্গালার হিন্দুরা শিক্ষোন্নত বলিয়া মুসলমান খাঁটী বাঙ্গালা ভাষা গঠন করিতে পারেন, তাহা হইলে মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে ছাড়িয়া একটী মুসলমানী বাঙ্গালা গঠন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। কারণ বঙ্গদেশে—আধুনিক মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহা হইলে তো জাতীয় মিলন হইল না বা প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা গঠন হইল না। সম্ভবতঃ ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। জাতীয় মিলনই উদ্দেশ্য। সেইজন্য প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া আমি সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলনীর কর্ম্মকর্ত্তাদের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অগ্নি-পরীক্ষা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

আত্মাভিমান, আত্ম-মর্য্যাদা, আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কতকগুলা শব্দের মোহে, আমরা পঁয়ত্রিশজন কেরাণী 'বন্দে মাতরম' বলিয়া ইংরাজ সওদাগর সওার কোম্পানীর দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিলাম। দেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, আমাদের যশোগানে দেশীয় সংবাদপত্রগুলা ভরিয়া উঠিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য দেশের জনকয়েক নেতা 'ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলেন। গৃহস্থ বাঙ্গালীরা যথাসাধ্য টাকাটা শিকাটা ফেলিয়া সেই ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

কিন্তু যে ভাবাত্মক শব্দগুলার মোহে পড়িয়া আমি কষ্টের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলাম, সেই শব্দগুলা বিস্মৃত হইয়া উদরান্নের জন্য স্বজাতির নিকট হাত পাতিতে পারিলাম না। কর্ম্মের জন্য অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলাম, কোথাও দাসত্ব করিবার অধিকারটুকু পাইলাম না। বৃদ্ধা পিসিমা বলিলেন—"লালু, বাপ এমন কুকর্ম্ম কেন করলি, হাতের লক্ষ্মী কেন পায়ে করে ঠেললি"? আমি কি উত্তর দিব, কি বলিব? সাধ্বী স্ত্রী হাসিমুখে আমায় অন্ন দিত, একমাস পরে শুনিলাম, সে নিজে মাত্র এক সন্ধ্যা আহার করে। বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল, বুকের রক্ত জমিয়া গেল। হায় হায়! কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম!

সরলার ভ্রাতারা ধনী। ধনী বলিয়া আমি তাহাদের বাটী সাধ্যমত যাইতাম না। তাহারাও আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমার সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ কাটাইয়াছিল। কিন্তু সরলা ত' তাহাদের ভগ্নী। আমার বুকের মধ্যে কি একটা তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল, আপনার উপর বিষম ঘৃণার উদ্রেক হইতেছিল। আমি সহধর্ম্মিণীর হাত ধরিয়া বলিলাম—"ওগো তুমি আমায় আরও হীনবল করছ। তুমি কিছু দিনের জন্য তোমার ভাইয়েদের কাছে যাও। আমার অবস্থা ভাল হলেই আমি তোমায় আনব।" সে হাসিয়া বলিল—"কেন, তোমার তেজ আছে আমার নেই? আমি কেন ভাইয়ের ভাত খাব?" আমার চক্ষে জল আসিল, বলিলাম—"কেন? তোমার অপদার্থ স্বামী তোমায় ভাত দিতে পারে না বলে।" সে হাসিয়া বলিল—"এই মনের তেজ নিয়ে ধর্ম্মঘট করেছ?"

সরলা তাহার পর দুই বেলা খাইল, কিন্তু রশদ ফুরাইল। গৃহে যাহা ছিল ঠিক দুই মাস চলিল। প্রতিদিন বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। রাত্রে ঘুম হয় না। পাছে সরলা জানিতে পারে তাই চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিতাম। তখন সরলা আমার গায়ে হাত দিয়া দেখিত, আমার পাঁজরার হাড়গুলা কতটা বাহির হইয়াছে, চক্ষের চারিদিকে কতটা গর্ত্ত হইয়াছে। তাহার চক্ষের তপ্ত জল এক একদিন আমার গাত্রে পড়িত। কি মনে হইত, কি ভাবিতাম, কি জ্বালায় জ্বলিতাম তাহা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই।

(২)

আজ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কাল অনশনে থাকিতে হইবে। আমার জন্য ভাবি নাই, ভাবিয়াছিলাম সেই দুইটা অভাগিনীর জন্য। পিসিমা

মুখে আমায় সাহস দিতেন, কিন্তু বুকের ভিতর কি জ্বালা সহ্য করিতেন তাহা বুঝিতাম। আর যাহাকে ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া বিবাহ করিয়াছিলাম তাহার মুখে একমুঠা অন্ন দিতে পারিব না ? হা ভগবান!

সন্ধ্যার পর বাহির হইলাম। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল, পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল। ঠিক বাহির হইবার পূর্ব্বে সরলা হাত ধরিয়া বলিল—"কোথা যাও ?"

আমি বলিলাম—একজন রাত্রে দেখা করতে বলেছে, একটা কর্ম্ম হ'তে পারে।

মিথ্যা কথা! সরলা আপত্তি করিল না। আমি বারান্দায় জুতা পরিতেছিলাম। ঘরের ভিতর খুব আস্তে পিসিমা বলিলেন—ও বৌমা, বেরোতে দিলে কেন ? মনের দুঃখে না বাপু একটা কিছু—

স্ত্রী বলিল—পাগল হয়েছেন পিসিমা, আমাদের দু'জনকে কি ছেড়ে যেতে পারবেন। বেটা ছেলে চেষ্টা করুন না। মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেলাম। দিনের বেলা দেখিতাম উপার্জ্জন করা যায়, কিন্তু পোড়া আত্মমর্য্যাদার ভয়ে পিছাইতে হয়। আজ রাত্রে আর মান-অপমানের ভয় করিব না। রাত্রে নিশ্চয় মোট বহিয়া উদরান্নের সংস্থান করিব। কেহ চিনিবে না, কেহ জানিবে না। আত্মহত্যা—অসম্ভব। সরলা ঠিক্ কথা বলিয়াছিল—তাহাদের দুইজনকে কাহার হস্তে সঁপিয়া যাইব ?

আর্দ্রদেহে বাজারে বাজারে ঘুরিলাম—মোট পাইলাম না। একজন ভদ্রলোক জোড়াসাঁকোর একটা দোকান হইতে অনেকগুলা কাপড় কিনিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কাছে গেলাম, মুখ ফুটিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন—কি মশায় ?

আমি খুব সাহস করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম—আজ্ঞে মুটে।

তিনি রসিক, বলিলেন—বল কি ?

আমি বলিলাম—মশায় আমার ঘরে অন্ন নাই। আপনার মোট লইলে যদি দুইটা পয়সা পাই, কাল মুড়ি—

তিনি বলিলেন—কি বাবা সখের যাত্রায় মহলা দিচ্ছ! গলাটলাগুলা ঠিক করেছ, কিন্তু পোষাকটা ত' যাদু, করতে পারনি।

আমি পোষাকের দিকে চাহিলাম। বাস্তবিক ভুল করিয়াছিলাম। এ বেশে মোট বহা চলে না। লোকটা চলিয়া গেল, আমি তাহার দিকে হতাশ ভাবে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর জোরে জল পড়িতে লাগিল। আমি পথের ধারে একটা বারান্দার তলায় আশ্রয় লইলাম। পথে জনপ্রাণী নাই, ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া জল পড়িতেছিল। একটা কুকুর আসিয়া আমার পাশে বসিল। মুখে কাতর ভাব—আমারই মত বিপন্ন।

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম। সে সোহাগে গলিয়া গেল। আমার পদলেহন করিতে লাগিল, লেজ নাড়িতে আরম্ভ করিল।

বৃষ্টি থামিল। আমি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছু দূরে গিয়া দেখিলাম কুকুরটা অনুসরণ করিতেছে। আমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইতে গেলাম। সে শুইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল, আমি চলিলে আবার অনুসরণ করিতে লাগিল।

কি সমস্যা! আমার গৃহে উপবাস করিতে হইবে জানিলে কুকুরটা কখনই আসিত না। কিছুদূর গিয়া বড় বিরক্ত হইলাম। কুকুরটাকে পদাঘাত করিলাম, সে ভূমিতে শুইয়া লাঙ্গুল নাড়িল, বিরক্ত হইল না। কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল।

কুকুরটা অনুসরণ করিতেছিল। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমার পদপ্রান্তে লুটাইতে লাগিল। আমি তাহার উপর বিরক্ত হইলাম না। তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম—"চল্‌, তিনজনে উপবাস করতাম না হয় চারজনে করব।"

সে বড় আশ্বস্ত হইল। এবার আর চোরের মত অনুসরণ করিল না। খুব প্রকাশ্য ভাবে একবার অগ্রে ছুটিল, একবার পিছনে ছুটিল, একবার বামে, একবার দক্ষিণে। মাঝে মাঝে চীৎকার করিল। তাহার বড় আনন্দ আমি তাহাকে সঙ্গে থাকিবার অনুমতি দান করিয়াছি।

হঠাৎ সে পথের প্রান্ত হইতে একটা পুঁটুলি মুখে করিয়া আনিল। আমার প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। এই জন্যই কি ভগবান ইহাকে আমার জীবন-পথে পাঠাইয়াছিলেন? নিশ্চয় পুঁটুলিতে অর্থ আছে।

(৩)

হ্যাঁ! অর্থ ছিল ছয়খানি দশ টাকার নোট। আমি আনন্দে সেই নির্জ্জন পথে হাঁততালি দিয়া নাচিলাম। কুকুরটাকে কোলে তুলিতে গেলাম, সে পায়ের তলায় লুটিয়া পড়িল। কি আনন্দ! কি শান্তি!

কিন্তু তখনই চমক ভাঙ্গিল। কাহার অর্থ! কাহার সম্পত্তি! নোট-গুলার সঙ্গে একখানা দলিল ছিল। গ্যাসের আলোকে মালিকের নাম পড়িলাম। ঠিকানা দেখিলাম। সেই পথে যাইবার সময় তিনি পুঁটুলিটি ফেলিয়া গিয়াছেন, একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে এ অর্থ প্রত্যর্পণ করা যায়।

আবার ভাবিলাম, ভগবান যখন বুভুক্ষুর সম্মুখে অন্ন রাখিয়াছেন, তখন সে অন্ন পায়ে ঠেলা কি অধর্ম্ম হইবে না? গৃহের অসহায়া রমণী দুইজনকে স্মরণ করিলাম। এ অর্থ ফেলিয়া দিলে তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইবে। আমার কি অধিকার আছে তাহাদিগের অন্ন—

কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদা! ইহার অপেক্ষা কিন্তু ভিক্ষা ভাল। কেন? এ অর্থ পাইবার জন্য ত কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় নাই। আচ্ছা! যিনি এ অর্থ ফেলিয়া গিয়াছেন তিনি খুব অর্থবান। দলিল হইতে তাহা প্রমাণ হইতেছিল। আমি যদি পরে তাঁহাকে এ অর্থ প্রত্যর্পণ করি? ষাট টাকায় আমার অন্ততঃ তিন মাস চলিবে। তাহার মধ্যে চাকুরি জোগাড় করিয়া তাঁহাকে টাকা ফেরত দিব। না না, উপস্থিত অন্ন ছাড়িব না। এ অর্থ আমি রাখিব।

বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে হাতে পুঁটুলিটা ছিল যেন সে হাতটা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিল। এত জলে ভিজিয়াছিলাম, একটু পূর্ব্বে শীতে কাঁপিতেছিলাম, এখন যেন সর্ব্বশরীরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। আমি কিন্তু মনকে দৃঢ় রাখিলাম। পুড়িয়া মরিতে হয় মরিব, লব্ধ-ধন ত্যাগ করিব না, দুইটা অসহায়া রমণীকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না। পরে নরকে যাইতে হয়, আমি যাইব। সংসারের লোকে, আমার ধনী আত্মীয়েরা ত বলিতে পারিবে না যে আমি স্ত্রীকে ও পিতৃস্বসাকে অনশনে মারিয়াছি।

গলির মোড়ে আসিলাম। কুকুর লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছিল। বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতেছিল—ধমনীর রক্তপ্রবাহ বড় ক্ষিপ্রগতিতে ছুটাছুটি করিতেছিল, হাত পা, চোখ কান খুব জ্বলিতেছিল, জিহ্বায় আদৌ রস ছিল না, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছিল। হঠাৎ আমাদের ঘাঁটির পাহারাওয়ালা একটা মুদির দোকানের ঝাঁপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—কোন্‌ হ্যায়?

আমি গ্যাসের স্তম্ভে নির্ভর না করিলে ঘুরিয়া পড়িতাম। মাথা ঘুরিতেছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া কুকুরটা আমার পায়ের তলায় বসিল—পাহারাওয়ালার দাড়ির উদ্দেশ্যে দুইবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিল। আমি তাড়াতাড়ি—

পুঁটুলিটা কোটের পকেটে রাখিয়া দিলাম। ভয় হইতে লাগিল, পকেট পুড়াইয়া সেই অর্থগুলা ভূমিতে পড়িয়া যাইবে।

পাহারওয়ালা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, আপ্? এত্না রাতমে?

আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একটু হাসিবার চেষ্টা করিলাম। পাহারওয়ালা বলিল—বাবু সেলাম্। আপ্‌কা বিমারী হুয়া, ঘর যাইয়ে।

(৪)

সরলা বলিল—ওমা একি? তুমি কি পাগল হয়েছ? কাপড় ছাড়, কাপড় ছাড়।

আমি তাহার সম্মুখে নোটগুলা ধরিলাম। হাত কাঁপিতেছিল। সরলা বলিল—এই ত! চেষ্টা করলেই ভগবান মুখে তুলে দেন। এখন কাপড় ছাড়।

কুকুরটা এতক্ষণ পিছনে ছিল। সরলা তাহাকে দেখে নাই। সে এবার লাফাইয়া আমার গায়ে উঠিতে গেল। সরলা ভয়ে বলিল—মাগো! এ কি?

আমি খুব চেষ্টা করিয়া রসনা আর্দ্র করিলাম। তাহার পর একটু গদগদ কণ্ঠে বলিলাম—সরলা, আজ থেকে এ আমাদের সংসারে থাক্‌বে। এ আজ যেচে বন্ধুত্ব না করলে কাল আমাদের তিন জনকে অভুক্ত থাক্‌তে হ'ত।

সরলা বলিল—কেন?

আমি তাহাকে সকল কথা বলিলাম। তাহার মুখ দেখিয়া বলিতে সাহস হইল না যে এ টাকা আমরা একেবারে আত্মসাৎ করিব। তাহাকে বলিলাম—আমাদের অর্থ সাচ্ছল্য হলেই যাঁর অর্থ তাঁ'কে ফেরত পাঠিয়ে দিব। আপাততঃ বাঁচাবার জন্যই ভগবান এ টাকা পাঠিয়েছেন।

সরলা বলিল—ছিঃ! ছিঃ।

সেই একটা কথায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সেই একটা কথায় দেখিলাম—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক মূর্ত্তিময়ী দেবী আর আমি পিশাচ, নীচ, পাপী, লোভী, অস্পৃশ্য তস্কর। বুঝিলাম শব্দ-ব্রহ্ম। সেই সামান্য একটা শব্দে দারিদ্র্যের জ্যোতি দেখিলাম, দারিদ্র্যের মাধুরী দেখিলাম। বুঝিলাম ধর্ম্ম-পথে অনশনও পুণ্যময়।

আমি ফিরিলাম। স্ত্রী হাত ধরিল, বলিল—কোথা?

আমি বলিলাম—টাকা ফেরত দিতে।

সে বলিল—কা'ল সকালে যেও। এখন কাপড় ছাড়।

আমি বলিলাম—সরলা, জলে ম'রব, পুড়ে ম'রব, তোমার জন্যে পাপ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তোমাকে কাল অভুক্ত রেখে সুখী হ'ব। সরলা, দেবী—

সে হাত ছাড়িয়া দিল। আমি ছুটিলাম।

(৫)

ছুটিলাম, পাহারওয়ালার ভয় করিলাম না—দেব, দৈত্য, ভূত, মানুষ কাহাকেও ভয় করিলাম না—অনশনকেও না। আর গা হাত পা জ্বালা করিল না। অগ্নি-পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। কুকুরও ছুটিতেছিল। এখন যেন তাহার আনন্দ বাড়িয়াছে।

মধ্যরাত্রে ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙ্গাইতে কুণ্ঠাবোধ করিলাম না। তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন, বড় আপ্যায়িত হইলেন। টাকার জন্য নয়—দলিলের জন্য।

তাহার পর বড় ইতস্ততঃ করিয়া আমাকে চল্লিশ টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আমি সওদার কোম্পানীর ধর্ম্মঘটের একজন। কাজকর্ম্ম নাই, ঘরে ভাত নাই, তবু ভিক্ষা করি নাই। কাল্ বোধ হয়—যাক্ আমায় ক্ষমা করিবেন।

তিনি অপ্রস্তুত হইলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন—আমার পুত্রের শিক্ষক চাই, আপনি দশ টাকা আগাম নিন্ কাল থেকে পড়াবেন। আর বোধ হয় সপ্তাহেকের মধ্যে আমার অফিসে কর্ম্ম হতে পারে।

* * * *

সরলা বলিল—উপহার ?

আমি বলিলাম—না অগ্রিম বেতন। কাল্ থেকে ছেলে পড়াতে হ'বে।

এত দিন দারিদ্র্যের কষাঘাতে সে আমার সম্মুখে কাঁদে নাই। আজ সে কাঁদিল। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—দেখ্‌লে, ভগবানের দয়া। তুমি নিরন্ন হ'য়েও তাঁর এই জীবটাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলে ব'লে এই অবলা কুকুরের মুখে তিনি তোমায় অন্ন পাঠালেন।

আমি বলিলাম—আর তোমার মত দেবী পেয়েছিলাম বলে চোর হ'তে, হ'ল না।

প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। উঃ! কি উৎকট অগ্নি-পরীক্ষা!

স্পন্দন।

[লেখক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

এই বিশ্ব এক অনাদি অনন্ত
সাগরে অনন্ত স্পন্দন কেবল ;
সেই স্পন্দনের বিচিত্র লীলায়
এই চরাচর সতত চঞ্চল ;
তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড উঠিছে নাচিয়া,
তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড কোথা নেমে যায় ;
সৃষ্টি-বীচি-শিরে, প্রলয়-গহ্বরে,
তরঙ্গের ভঙ্গে বারিরাশি ধায় ;
তরঙ্গে আলোক উঠিছে ফুটিয়া,
তরঙ্গে আবার মিলায় আঁধারে ;
কোথা নাহি বেলা, এ অপূর্ব্ব খেলা
অবিরাম চলে এই পারাবারে।

স্পন্দনে অরূপে রূপের উদয়,
পরিমাণ ভেদে পরিচিত হয়,
নিগুর্ণ নিথর এক(ই) সে সলিল
স্পন্দনের গুণে বহু গুণময় ;
কোথাও স্পন্দন জীবন-উত্তাপ
আনিয়া দিতেছে হিমাঙ্গ জগতে ;
কোথাও আবার আকর্ষণ রূপে
ধরিয়া রেখেছে বিশ্ব শূন্য পথে ;
কোথাও পলকে তড়িতে ছুটিয়া
স্থাণু অণুরাশি করিছে চঞ্চল ;
কোথাও নিবিড় অনাদি আঁধার
সহসা আলোকে করিছে উজ্জ্বল ;
কোথাও স্পন্দনে ব্যোম শব্দময়,
গ্রহ তারা হ'তে উঠে একতান ;
কোথাও স্পন্দন পরিমলময়
পরমাণু মাঝে করে গন্ধদান।

সেই স্পন্দনেতে সিন্ধুবক্ষ হ'তে
অলক্ষ্যে নীরদ উঠে নীলাম্বরে ;
সেই স্পন্দনেতে নীলাম্বর হ'তে
সহস্র ধারায় সুধাবিন্দু ঝরে ;
সেই স্পন্দনেতে অনিলে সলিলে
সঞ্জীবনী শক্তি হইছে সঞ্চার ;
সেই স্পন্দনের হইছে স্ফুরণ
বরণে বরণে শ্যাম বসুধার ;
ফুটিছে প্রভাতে নীলিমা সরসে
রক্ত কমলের জীবন্ত ছটায় ;
ঘুমায়ে পড়িছে ঘুমন্ত সায়াহ্নে
ক্লান্ত দিনান্তের ধূসর ছায়ায় ;
স্পন্দনে চন্দ্রিকা পরশে ধরণী,
চাহে তারাকুল কম্পিত পলকে ;
স্পন্দনে প্রফুল্ল কুসুমে কুসুমে
বসুমতী ভরি' উঠিছে পুলকে ;
সেই স্পন্দনেতে শত প্রবাহিনী
শত ধারে বহে নীর জীবনের ;
সেই স্পন্দনেতে শতমুখ স্রোতে
বক্ষে বক্ষে বহে প্রীতি মানবের ;
সেই স্পন্দনেতে নবীন শিশুর
কণ্ঠে কেঁপে ওঠে মা মা মা মা রব ;
জুড়াইয়া আসে জননী-পরশ
সকল ক্রন্দন করিয়া নীরব।

স্পন্দনে তরল ধরণী-হৃদয়
উঠিয়া ছুটিছে শত প্রস্রবণে ;
শত প্রস্রবণে মানস আমার
উঠিয়া ছুটিছে সে ভূমার সনে ;
মানসে আমার যত ভাব ওঠে,
এই রসনায় যত ভাষা ফোটে ;
সকলি ত' সেই স্পন্দনের খেলা ;
সেই সিন্ধু এই প্রণালীতে ছোটে ;
এ ক্ষুদ্র প্রাণের যত ক্ষুদ্র কথা
সেই বিরাটের(ই) আপনার ভাষা,
সেই বিরাটের(ই) অচিন্ত্য বাসনা
এ হীন অণুর আশার পিপাসা।
এই স্পন্দনের মহাশক্তি কোথা
এ মানসমাঝে এস একবার !
ও চরণ হ'তে বিনিঃসৃত নীর
আনন্দে ঢালিব চরণে তোমার ;
তোমার স্পন্দনে স্পন্দন আমার
নিশিদিনমান লীন হ'য়ে থাক ;
সাগরসঙ্গমে গঙ্গার মতন
তোমার ভিতরে আমি মিলে যাক।

প্রিয়তর।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

গোলাপের চে'য়ে রূপ অধিক সুন্দর,
অমৃতের চে'য়ে প্রিয় রসের আকর,
কোকিলের কণ্ঠ হ'তে সুমধুর স্বর,
চন্দনের গন্ধ হ'তে আরো মনোহর,
মলয়ের চে'য়ে স্নিগ্ধ পরশ সুন্দর,
প্রেয়সীর চে'য়ে বড় প্রেমিক-অন্তর,
যদি কিছু থাকে শ্রেয় প্রেয় প্রিয়বর,
প্রিয়তম হ'তে মোর সেই প্রিয়তর !

গ্রন্থ-সমালোচনা।

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা।—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ বি-এ সম্পাদিত। আমাদের বহু আশার ধন এত দিনে বাহির হইল!

সম্পাদকযুগল নিজেদের 'বি' 'এ' ডিগ্রীর মধ্যে "." (full stop) চিহ্নের ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালায় 'একটা নূতন কিছু' প্রচলনের চেষ্টা করিলেন।

এবারকার 'সাহিত্য-পঞ্জিকা' ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং ১০ম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আশা আছে, এরূপ নিঃস্বার্থ উৎসর্গের সুফল ফলিবে।

সাহিত্য-পঞ্জিকা দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে এই বিষয়গুলি আছে—(১) ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী (২) প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম (৩) আধুনিক যুগের স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণ (৪) বাঙ্গালার বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ ও তাঁহাদের পুস্তকাবলী (৫) মুসলমান লেখকগণের তালিকা (৬) সংবাদপত্র (৭) সভাসমিতি ও পুস্তকালয় (৮) মুদ্রণ বিষয়ক তথ্য।

২য় ভাগে—(১) ১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ (২) ১৩২২ সালের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা (৩) বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রিকার তালিকা (৪) বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৫) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ ও (৬) পরিশিষ্ট।

যে সব সাহিত্যিক বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি লিখেন, সাময়িক বা সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকতা করেন অথচ স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি নাই, তাঁহাদের নাম এই পঞ্জিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ এগুলি অনবধানতার ফল। পুস্তকের তালিকায় অনেক গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। সুধু গুরুদাসবাবুর পুস্তক-তালিকার উপর নির্ভর করিলেও এ ত্রুটীগুলি হইত না। প্রথম উদ্যম বলিয়া সমস্ত ত্রুটী উপেক্ষণীয়। আশা করি ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকায় সেগুলি সংশোধিত হইবে।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' হইতে উদ্ধৃত '১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণে'র লেখক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। এই অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের এক মা-বাপ। ইঁহার চেলা-চামুণ্ডা যথেষ্ট এবং তাঁহাদের 'বাহবা'য় ইনি একজন মহারথী বিশেষ। ইনি সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ব ভাষায় সুপণ্ডিত, উপরন্তু সমালোচক-কেশরী। বলা বাহুল্য, ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, ইনি না পড়িয়া বা গ্রন্থের নাম শুনিয়া সমালোচনা করিতে পারেন এবং স্বীয় অভ্রান্ত মতগুলি (!) নির্ভীকচিত্তে জাহির করিতে পারেন। ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে! সম্প্রতি এই বিবরণ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' একটী সুদীর্ঘ প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও সম্পাদকযুগল কি মোহাবিষ্ট হইয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

সাহিত্য-পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যে একটা স্থায়ী জিনিস এবং ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের একটী প্রধান উপকরণ হইবে। সেইজন্ত যাহাতে পত্রিকাখানি নির্ভুল হয় সে বিষয়ে সম্পাদকযুগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাহিত্য-পত্রিকা স্বধু তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে তাহা নহে, ইহার সহিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী-সাধারণের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

প্রেমের ডালি—শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত ও হুগলী এলাটী পোঃ 'শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই পুস্তকের 'বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেবা-ভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত'—এইরূপ বিঘোষিত।

এই গ্রন্থখানি যুবক-যুবতীর ভালবাসা 'তথা-কথিত' 'প্রেমে'র ডালি নহে, এ প্রেমের ডালি—শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত ;—

"প্রেমের ডালি, এনেছি হরি,
নেবে কি চরণ তলে ?" ইত্যাদি।

লেখক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও ভক্ত। গ্রন্থান্তর্গত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি পাঠে আমরা সে পরিচয় পাই। এই পুস্তকের কবিতাগুলির বিশিষ্টতা এই যে, সেগুলিতে আধুনিকের হেঁয়ালী নাই। লেখকের বক্তব্য বেশ বুঝা যায়। লেখক 'রাঙ্গা পা দু'খানি'র জন্ত পাগল' সেইজন্ত তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় 'রাঙ্গা পা দু'খানি'র উল্লেখ দেখিতে পাই।

ভক্ত লেখকের উচ্ছ্বাস ভক্ত পাঠকের ভাল লাগিবে।

কর্ম্মফল— ১৩২০ সালের কুন্তলীনের পুরস্কার—৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,কুন্তলীন আফিস হইতে শ্রীযুক্ত হীতেন্দ্রনাথ বসু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থের প্রথমেই কুন্তলীনের আবিষ্কারক স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের নানাবর্ণে মুদ্রিত প্রতিকৃতি। তাঁহার সহাস্ত আনন এখনও আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। এবং তাঁহার স্মৃতির স্বরূপ এই ছবিখানি তাঁহার শোক জাগাইয়া তুলিতেছে। তাই আমাদের মনে হয়—এবারকার উপহারে প্রীতির পরিবর্ত্তে যেন শোক মূর্ত্তিমান্ হইয়া ফুটিয়াছে ; সাহানার পরিবর্ত্তে যেন বেহাগের করুণ সুর জাগিয়া উঠিয়াছে। পিতার উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী এই দারুণ দুর্দ্দিনেও তাঁহার পিতৃ-কীর্ত্তি বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার এই প্রথম প্রয়াস ও উদ্যম তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের প্রদত্ত পুরস্কার সমূহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

স্যর রবীন্দ্রনাথের 'কর্ম্মফল' ও শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'অদল বদল' শীর্ষক গল্প দুইটী এবং শ্রীমতী কুঞ্জবালা দাসীর 'মন্দির দ্বারে' নামক কবিতা ও শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসীর 'বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা' (গাথা) এবারকার উপহারের উপচার। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটীই উপভোগ্য, কোনটীই অপচার নহে।

অগ্রহায়ণ, ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

রাসলীলা

["ওপারের কথার" লেখক।]

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই লীলাভূমিতে ষোলশত নিজ মূর্ত্তি ধারণ করা সম্ভব কি না এই বিষয় আলোচ্য। জড় চিন্তায় ও কার্য্যে অভিভূত জীবের পক্ষে এবম্বিধ কার্য্য ধারণাতীত। সাধনার উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইলে এই তত্ত্ব যৎসামান্য পরিমাণে বোধগম্য হয়। যে পরিমাণে চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হয়, সে মাত্রায় ইহার সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত জীবের সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয়। কিন্তু যখন অন্ততঃ চৌদ্দ আনা মাত্রায় জাগতিক যাবতীয় আসক্তি অপসারিত হয়, সে অবস্থায় শিক্ষা কৌশলে সেই সূক্ষ্মদেহ বিচরণক্ষম হয়। এই শক্তি জাগতিক কার্য্যে বা অন্যের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত হইলে উচ্চসাধনার ফল বিলুপ্ত হইয়া সেই সাধক-সাধিকাকে "পুনর্মূষিকো ভব" এই অবস্থায় পরিণত হইতে হয়। ইচ্ছাশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মে সফলকাম বা বিফল মনোরথ হয়েন। যে মাত্রায় জীব জড়ত্ব হইতে চৈতন্য-যুক্ত হয়েন অর্থাৎ আত্মময় অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়েন, সে মাত্রায় এই ইচ্ছা শক্তি বিকশিত হয়। ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত ইচ্ছাশক্তি ছিল। এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি গোপগণকে গোপমহিলাগণের কর্ম্মে প্রতিবন্ধক হইতে দেন নাই। সুতরাং এই অসামান্য ঐশী শক্তিতে তিনি আর আর অলৌকিক কর্ম্মের মত ষোল শত মূর্ত্তি ধারণ করিবেন, ইহা জীবের পক্ষে ধারণাতীত হইলেও তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। যিনি নিজ ইচ্ছামত সমগ্র বৃন্দাবনকে কর্ম্ম সাধন করাইয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রভূত, এ কথা স্বীকার্য্য নহে কি?

গোপমহিলাগণ কি অবস্থায় উপনীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বস্থানে অবস্থিত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই কথা আলোচিত হউক।

বিশ্ব-বিধানের নিম্নলিখিত অনুকূল প্রবাহে তাঁহারা ভাসিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন;—১। শারীরিক সুস্থতা; ২। যথাসম্ভব সাংসারিক অভাব-

শূন্যতা ; ৩। যথাসম্ভব স্বাধীনতা ; ৪। যথাসম্ভব সচ্ছন্দতা ; ৫। যথাসম্ভব গৃহ-পরিচ্ছদাদির পরিচ্ছন্নতা ; ৬। আবাস স্থানের সুরম্যতা ; ৭। প্রকৃতি-প্রিয়তা ; ৮। হৃষ্ট বা আনন্দ চিত্ততা ; ৯। নিরলসতা ; ১০। সহৃদয়তা ; ১১। বিলাসশূন্যতা ; ১২। আধুনিক শিক্ষা বা সঙ্গদোষ-বিবর্জ্জিতা ; ১৩। প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি সম্ভূত এক মহাপুরুষের দ্বারা চালিতা ; ও ১৪। সেই মহাপুরুষের চিন্তায় রততা। জিজ্ঞাসা করি, এতগুলি সৎগুণের সহিত এবম্প্রকার সংযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? বলিতে হইবে না কি ইহাই মণি-কাঞ্চন যোগ ?

এই বিশ্ব জ্ঞানের, প্রেমের ও শক্তির ভাণ্ডার। এই বিশ্বের নাম বিরাট প্রকৃতি। সুতরাং বিরাট প্রকৃতিতে উক্ত সদ্‌গুণগুলি বিদ্যমান। সদ্‌গুণের আদর বা অর্চ্চনা করিলে যিনি এবম্বিধ কার্য্য সাধেন, তিনিই গুণবান্ গুণবতী হইয়া পড়েন। তেমনি যিনি কুৎসা, ঈর্ষাদি কার্য্যে কালক্ষেপণ করেন, তিনি নিজপদে কুঠার আঘাত করেন। দুগ্ধ হইতে মাখন টুকুকেই উদরস্থ করিয়া জলীয় ভাগটুকু বর্জ্জন করা বিচক্ষণদিগের বিধি নয় কি ? শৈশবাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসী-বাসিনীদিগকে কৌতুকচ্ছলে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি 'ননীচোরা' বলিয়া আখ্যাত। যিনি দেহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া মনকে কর্ষণ করেন, অর্থাৎ তাঁহার দিকে টানেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। জল ও জলের তরঙ্গ সম আত্মা ও মন জীবদেহে অবস্থিত। তরঙ্গায়িত মনকে আত্মায় পরিণত বা চৈতন্যময়ী করিয়া আপনার সহিত একসূত্রে আবদ্ধ করানই আত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম। সাধারণ জীবকে রোগ, শোক, তাপাদি নানা অভাব অশান্তি দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু কথঞ্চিৎ চৈতন্যযুক্ত জীবকে উপরোক্ত বৈরাগ্য ব্রতে ব্রতী করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতেছেন। সাধারণ নারীর তুলনায় ব্রজ-মহিলাদিগের অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল, তথাচ উন্নততা করিবার জন্য তাঁহাদিগের সৎশিক্ষার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। এই কারণে ৺কাত্যায়নীকে পূজা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজাঙ্গনাগণ আদিষ্টা হইয়াছিলেন। ৺কাত্যায়নী বা ৺কালী বা ৺দুর্গা ধারণাগম্য বিরাট প্রকৃতির আকার মাত্র। পূজা অর্থে গুণের আদর করা। সুতরাং পূজা করা গুণবান্ গুণবতী হইবার সুকৌশল। প্রকৃত পূজা করা হইলে গুণবান্ গুণবতী হওয়া নিতান্ত সম্ভব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ব্রহ্মের বা ব্রহ্মের যে কোন সসীম আকারের নিকট প্রার্থনা, আরাধনা বা জপ-ধ্যানাদি করিয়াও যদি চিত্তের উৎকর্ষতা সাধিত না হইল বা জীবের যাবতীয় মলিনতা

ক্রমশঃ বিদূরিত না হইল, ইহা হইতে বুঝা উচিত নয় কি সাধক-সাধিকার প্রার্থনা পূজাদিকর্ম্ম ভণ্ডামী বা বাহিরের আচরণ মাত্র? এবম্প্রকার কর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে সাধন করিয়াও যাহারা পর-সর্ব্বনাশ সাধন চিন্তায় পূর্ণ, যাঁহাদের হৃদয় স্বার্থপরতা, ক্রোধ, ঈর্ষাদি নানা অগুণে আবৃত ও যাঁহাদের জিহ্বা পরদোষ কীর্ত্তনে অতীব রসাল, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত নহে কি সাধন ভজন কেবলমাত্র পণ্ডশ্রম বা তাহাদের আরাধ্য দেবতার সহিত শঠতা বা কৌতুক করা? এই প্রকার কার্য্য দ্বারা কাহার ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে, এ কথা সেই সেই সাধক-সাধিকাগণ ভাবিয়া থাকেন কি?

যতদিন জীবের দেহজ্ঞান ও মন থাকিবে, ততদিন জীবমাত্রই বিরাট প্রকৃতির অন্তর্ভূত। সুতরাং জীবমাত্রই বিরাট প্রকৃতির নিকট ঋণী। ঋণ পরিশোধ হইলেই তবেই পাওনাদারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা। জড়-প্রধান ও চৈতন্য বিশ্বের উপাদান। জীব ইহ জগতে যাহা কিছু লইয়া এই ভবের খেলা সাধিতেছে, উহা জড়-প্রধান। বৃক্ষস্থ ও উহার পাদদেশাস্থিত ফলগুলি এককালীন সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ জড়-প্রধান যাহা কিছু লইয়া মজিয়া ডুবিয়া থাকিব, অথচ চৈতন্যের অধিকারী অধিকারিণী হইবার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন "যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে সাধ পুষিয়া থাক; সর্ব্বাগ্রে কাত্যায়নীদেবীকে পূজা কর"। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য "আমি শ্রীকৃষ্ণ, দেহী নহি অর্থাৎ আমি আত্মা ও আমার উপাদান জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি। হে ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমরাও দেহী নহ, কিন্তু তোমরা অস্থি, মাংসাদি মণ্ডিত মন। সুতরাং তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের জড় যাহা কিছু কাত্যায়নীকে প্রত্যর্পণ করা। তাহা হইলে কোন জননী যেমন নিজ কন্যাকে লালন পালন করিয়া থাকেন ও পরে সেই দুহিতা যৌবনারূঢ়া হইলে তাহাকে বসন-ভূষণে বিভূষিতা করিয়া স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দেন, কাত্যায়নী-দেবীও তোমাদিগের জাগতিক আসক্তি মোচন করিয়া যথাসম্ভব জ্ঞানে ও প্রেমে ভূষিতা করিবেন ও তৎপরে তুল্যে তুল্যে সংযোগ হয় বলিয়া আত্মাকারে অবস্থিত আমার সহিত শুভপরিণয় কার্য্য সাধিত হইবে।"

লজ্জা ও ভয় মনের বৃত্তি। জল স্থির ধীর হইলে বা উহার মলিনতা অপসারিত হইলে, তবেই স্ফটিক জলে পরিণত হয়। তদ্রূপ মনরূপ তরঙ্গ স্থির-ধীর হইলে বা উহার যাবতীয় মলিনতা বিদূরিত হইলে উহা আত্মাসম অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আত্মায় লজ্জা ও ভয় নাই। সুতরাং আত্মার সহিত মনের সম্মিলন কার্য্য সাধন করিতে হইলে লজ্জা ও ভয় বর্জ্জন করা বিধেয়। এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বস্ত্রহরণ লীলা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কৌতুকচ্ছলে সাধিত হইয়াছিল।

রাসলীলার পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত মন বিশিষ্ট ছিলেন, যাঁহারা শৈশবাবস্থা হইতেই প্রকৃতির উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আত্মোৎকর্ষের বিধানগুলি সহজ ও সরল ভাবে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন ও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সম জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে, পূর্ণ মহাপুরুষকে ধ্যান জ্ঞান করিয়াছিলেন—আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী-ধারিণী না হইলেও তাঁহারা সাধারণ জীব শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তোমার আমার নিকট যাহা অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদিগের সম্ভবপর হইবে, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের বিধানে চলা বা শিক্ষিতা হওয়া বিশেষ আবশ্যক নয় কি ?

আত্মতত্ত্ব না বুঝিলে রাসলীলা-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া এই তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখযোগ্য। জীবদেহ প্রাণ, মন ও আত্মার পিঞ্জর মাত্র। অর্থাৎ জীবদেহ মানব মানবী বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রাণ, মন ও আত্মা জীববাচ্য হইবার মৌলিক উপাদান। ভক্ষণ, মল-মূত্র বর্জ্জন, শয়ন, ভ্রমণ ও অঙ্গচালনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দেহের যে কার্য্যকারিণী শক্তি হয়, উহা 'প্রাণ' বলিয়া আখ্যাত। মনেরই জন্য ভক্ষণ, শয়নাদি কর্ম্ম সাধিত হয় বলিয়া মন প্রাণের ভর্ত্তা। জীবের মন দুইটী মুখ বিশিষ্ট। উহাদের মধ্যে একটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুধায় পূরিত ও অপরটী হলাহলে পূর্ণ। এই জন্য ইহাদের নাম-করণ হইল, সুধামুখী ও গরলমুখো। সাধারণতঃ হৃদয়স্থিত মনের নিম্ন স্তরে আত্মার অবস্থিতি, কিন্তু কোন কোন স্থলে মস্তিষ্কেও আত্মার স্থিতি হয়। সুধামুখী আত্মার সংলগ্ন বলিয়া সাধারণতঃ রোগ, শোক বা জাগতিক অভাব অশান্তির জন্য আত্মার দিকে ধাবিতা হয়। তবে গরলমুখোর সহিত সন্নিবেশিত বলিয়া ইহার সহিত এক জুটী হইয়া জাগতিক চিন্তায় ও কার্য্যে অভিভূতা। সুতরাং সুধামুখী গরলমুখোর দ্বিতীয় পত্নীবৎ আচরণ করে। গরলমুখো জাগতিক আসক্তির সহিত নানা অগুণে পূর্ণ। এই জন্য যাঁহারা আত্মতত্ত্ব না বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যব্রতে ব্রতী না হয়েন, তাঁহারা আত্মোৎকর্ষ সাধন না করিয়া দিনের দিন হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহারা মানব-জীবন সার্থক করিবার জন্য উক্ত ব্রত-উদ্‌যাপনে যত্নশীল হয়েন, তাঁহাদের

সুধামুখী মন প্রেমের আধিক্য বশতঃ শিশু পুত্র হইতে বালিকায় পরিণত হয় ও কালক্রমে যতই সদ্‌গুণে বিভূষিত হয়, সেই পরিমাণে যৌবনারূঢ় হয়। এই অবস্থায় সুধামুখী প্রকৃত জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে বিভূষিতা হয় ও তৎপরে চৈতন্যময়ী হইয়া চৈতন্যময় আত্মার সহিত পরিণীতা হয়। এই পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইলে আত্মার সহিত সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিয়া গরলমুখোর দ্বারা মানব-সুলভ বিহার কার্য্যে বিরতা হয়। কারণ সেই অবস্থায় আত্মার যাবতীয় সদ্‌গুণে বিভূষিতা হইয়া সচ্চিদানন্দময়ী ভাবাপন্না হয়। সুতরাং এই প্রকার সাধন দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া অনন্ত জীবনের ও অনন্ত সুখের অধিকারিণী হয়।

মনে হয়, ৺কাত্যায়নী বা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজাঙ্গনাগণ উক্ত তত্ত্বের প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তুলনায় বয়সে পুত্র সম হইলেও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ জীবের মত ব্রজাঙ্গনাগণের দেহজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "প্রাণবল্লভ" "প্রাণেশ্বর" ইত্যাদি ভাষায় সম্বোধন না করিয়া তাঁহার সহিত জননীবৎ আচরণ করিতেন। ইহা হইতে প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, ব্রজাঙ্গনাগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীবের মত মনে অবস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন আত্মাময় অবস্থায় অবস্থিত।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে :—

১। শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজাঙ্গনাগণের বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধার তোমার আমার মত এক মাত্র গরলমুখো মন সম্বল ছিল না।

২। তাঁহাদের বিশেষ নূতনত্ব দেখাইবার সরঞ্জামের অভাব ছিল না।

৩। শ্রীকৃষ্ণ মনের অতীত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া ও ব্রজাঙ্গনাগণের মারফৎ প্রকৃত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগৎকে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন যে কি উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

৪। ব্রজাঙ্গনাগণ জগৎকে প্রতিপন্না করিয়াছেন যে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বস্থানে শ্রীভগবান্ আছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সেই সুদর্শন লাভের পূর্ব্বে ও পরে জীবের কি কি অবস্থা হয়।

৫। আত্মায় ও চৈতন্যময়ী মনের বিহার যে সাধন দ্বারা সাধিত হয়, উহারই নাম রাসলীলা বা আদিরসের লীলা।

৬। জীব যে সম্ভোগ সুখের জন্য লালায়িত, উহাপেক্ষা বিশেষ শান্তি ও আরামদায়ক উচ্চতম সুখ জীবের প্রাপ্যগণ্ডা।

৭। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীব দেহী নয় এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আত্মার ও চৈতন্যময়ী মনের সম্মিলনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য।

৮। বাস্তবিক উন্নতা হইবার সাধ পুষিলে সদ্‌গুণের আদর করা বিধেয়।

৯। সংসার বর্জ্জন না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন করা অসম্ভব নহে।

১০। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সাধ পুষিলে গরলমুখো মনকে যার যাহা জাগতিক কর্ম্ম সাধনেরও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যাপৃত রাখা বিধেয় ও তৎসঙ্গে চৈতন্যময়ী মনকে চৈতন্য অর্জ্জনের জন্য অবকাশ মত নিযুক্ত রাখা মানবোচিত কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।

১১। পুস্তক পাঠ প্রকৃত জ্ঞানলাভের বিশেষ সহায়তা করে না।

১২। এক প্রকৃত আদর্শ পুরুষকে সম্মুখে রাখিয়া ও তাঁহার সহিত কেবল মাত্র মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণগুলির ধারণা করিলে জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে ভূষিত হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম রহস্যময়। কেবল মাত্র হিন্দুধর্ম্ম নহে, সকল পুরাতন ধর্ম্মই রহস্যপূর্ণ। দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি নানা আচারের জন্য প্রত্যেক পুরাতন ধর্ম্ম আরও রহস্যময় হইয়াছে। এবম্প্রকার অবস্থার জন্য এক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট বিশেষভাবে অনাদৃত। এই জন্য এক জন অন্যের ধর্ম্মকে প্রমাদ, কুসংস্কার, অশ্লীলতা বা অসংযুক্ততাপূর্ণ ধারণা বদ্ধমূল করিয়া কত শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেন বা তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা মানব-সমাজের উন্নতি কি অধোগতি সাধিত হইতেছে, এ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও উন্নতমনা ব্যক্তির বিবেচ্য নহে কি? এক ব্যক্তির চিন্তা-প্রবাহ বায়ুর বা প্রবাহিত নদীর মত সমালোচিত সমাজের প্রতি ধাবিত হয়, এ তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন যে, এবম্প্রকার কার্য্যদ্বারা এক সম্প্রদায়ের বা জাতির সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বা জাতির বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব দিনের দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং মানব সমাজ হইতে সহৃদয়তা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ বিলুপ্ত হইতেছে। এবং সমর, রাজ্য ও সমাজবিপ্লব, আত্মীয় ও গৃহবিচ্ছেদ ও যাবতীয় গণ্ডগোল এ ধরায় বিকীর্ণ হইতেছে। সুতরাং হয়-কে নয় ও নয়-কে হয়-করা দলের পুষ্টি সাধন হইতেছে। সুতরাং পুলিসের ও আদালতের বিস্তৃতি হইতেছে। সুতরাং মানব-সমাজের ও প্রত্যেক নর নারীর

অভাব অশান্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং নানা প্রকার উদ্ভাবনায়, সভ্যতার ও বিলাসিতার মধ্যেও মানব-সমাজ হতশ্রী হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক সমাজ হীন হইতে হীনতর হইয়া স্বেচ্ছাচারিত্বের হেতু হইতেছে। সুতরাং বাহ্য আচারে গণ্য মান্য হইয়াও মানব অন্তঃসার বিহীন হইতেছে।

একটী ছিদ্র থাকিলে যেমন কলসীর সমস্ত জল নিঃশেষিত হয়, ব্যক্তিগত বা সমাজগত একটী অগুনের জন্য সমগ্র মানব সমাজের কত অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ইহা কি আলোচনার বিষয় নহে? তবুও প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বা উন্নত জাতি আপন আপন গুণানুকীর্ত্তনে বা উন্নতাবস্থা প্রচার করিতে কত না সচেষ্ট! ইহাই কি ধর্ম্মজীবন লাভের বা উন্নতাবস্থার নিদর্শন? স্ব স্ব মানসিক তুলাদণ্ড অবিকৃত না রাখিয়া কোন বিচারে বা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা শ্রম নহে কি? সংযততাই জ্ঞানালোক প্রভাসিত হইবার সুপন্থা নহে কি? উল্লিখিত বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে মানব-মন ঘোর অজ্ঞানতা-রূপ তিমিররাশি হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নহে কি?

হায় জীব! তুমি চক্ষু ও কর্ণ সত্ত্বেও অন্ধ ও বধির, এ কথা অবগত আছ কি? যাহাদের সহিত আজীবন বস-বাস করিতেছ, তাহাদের মধ্যে কাহারও হৃদয়ভাব উদঘাটনে তুমি সক্ষম কি? ইহাই কি তোমার জ্ঞানোন্মেষ প্রতিপাদ্য?

মানবের অভাব অশান্তির ইয়ত্তা নাই। মনে হয়, সু-ইচ্ছা ও সু-কর্ম্ম-সাধন শক্তি সহ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হইলে, মানব হইয়াও পরকালের যাবতীয় সাধ মিটাইতে পারেন। পুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা লোকের কথা শুনিয়া 'হাঁ' 'না' দ্বারা নিজ মতামত প্রকাশ করা জীবের স্বভাবসুলভ বিধান। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার, চিন্তাশীলতা বা ভাবুকতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্প "আমি একজন হবই হব বা আমার হিস্বা লবই লব" এই সদ্গুণগুলির জীবের বিশেষ অভাব। জীব মনে জড়তা বৃদ্ধির লক্ষণ অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম সাধন বা সেই প্রকার চিন্তা পরিপোষণ। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য-ব্রতে ব্রতী হইয়া জাগতিক কর্ম্ম সহ পারলৌকিক কর্ম্ম সাধনে যত্নশীল হওয়াই প্রকৃত চৈতন্য বৃদ্ধির লক্ষণ। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর উপকারিতা নাই, এ কথা এ মূর্খ বলিতে অক্ষম। তবে দুঃখের বিষয় যে উপাদান জীবের প্রধান সম্বল, সেই মনের উৎকর্ষতা সাধনের পূর্ব্ব আর্য্যজাতির পন্থাগুলি এক্ষণে হতাদৃত হইয়াছে। কালোচিত বিধানে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য বিধানগুলি যথাসম্ভব এক সূত্রে গ্রথিত

হইলেও যাঁহারা এবম্প্রকার কার্য্যে তৎপর হইবেন, তাঁহাদের কার্য্যকুশলতার উপর ভারতের সুদিন নির্ভর করিতেছে। কোন্ যুগে কোন্ মহাজনের দ্বারা এববিধ কার্য্য সাধিত হইবে, উহার প্রতীক্ষায় না থাকিয়া আপাততঃ আমাদিগের বিধেয় নহে কি অসত্য, ঈর্ষা, কুৎসা ও আলস্যকে বর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হওয়া? তৎসঙ্গে কর্ত্তব্য নহে কি সুইচ্ছা ও সুকর্ম্ম সাধন শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে বিভূষিত কোন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াও তাঁহার যাবতীয় গুণগুলি চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ দেহে, প্রাণে ও মনে সন্নিবেশিত করা? এ অধমের বিশ্বাস তবেই সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে প্রশস্ততা, হটকারিতা বা দাম্ভিকতার পরিবর্ত্তে বিনয়, অসরলতার পরিবর্ত্তে সত্যনিষ্ঠতা, সংশয় ও সন্দেহের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস, আসক্তির পরিবর্ত্তে প্রকৃত ভালবাসা, পুস্তক পঠন বিদ্যা বুদ্ধির পরিবর্ত্তে প্রকৃত জ্ঞান ও পরছিদ্রানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে সংযম জীবের নিজস্ব ধন হইবে। তবেই কালক্রমে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মানব রাসলীলাবৎ যাবতীয় তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের আবশ্যক ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হউন, মুসলমান বা খ্রীষ্টান হউন, হিন্দু বা ব্রাহ্ম হউন, জৈন বা আর্য্য হউন, কেবল মাত্র গুণের আদর করা। তাহা হইলেই কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন গঠিত হওয়া সম্ভব। তাহা হইলেই জাতীয় জীবনের অটল ও অচল ভিত্তি স্থাপন করা কল্পনা মাত্র হইবে না। তাহা হইলেই প্রকৃত সমাজ সংস্কারের কর্ম্ম সহজসাধ্য হইবে। তাহা হইলেই শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করা অলীক আশা হইবে না।

ভূদেব প্রসঙ্গ।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।]

(২)

'অর্চ্চনা'র গত আশ্বিন সংখ্যায় ভূদেব বাবুর অন্তরঙ্গ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট ভূদেববাবু সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নরেন্দ্র বাবু ইহা পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়া দয়া করিয়া ভূদেব বাবু সম্বন্ধে নূতন দু'চার কথা আমাকে বলিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগত্যর্থে তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। ভবিষ্যতে আরও কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিবার ইচ্ছা রহিল। ভূদেব বাবুর ন্যায় আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তির

বিষয় বর্ত্তমানযুগে যতই আলোচিত হয়, ততই আমাদের তথা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের বিষয়। এরূপ খাঁটি মহাপুরুষকে আমরা সম্যকভাবে বুঝিতে পারি নাই, ইহা কি আমাদের কম দুর্ভাগ্যের কথা! কুলে শীলে মানে বিদ্যায় রূপে গুণে তাঁহার তুল্য মহাত্মা আমাদের বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না সন্দেহ। একাধারে এতগুলির সমাবেশ আর কাহারও জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না! এরূপ সংযত, শিক্ষিত, উচ্চভাবাপন্ন, নিষ্ঠাবান খাঁটী হিন্দুকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলে, আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যে অতীব সহজসাধ্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের সাহিত্য পরিষদ, সভা সমিতি কেহই এই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার্থ কোনই প্রয়াস পাইয়া থাকে না। ভূদেববাবুকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, তাঁহার মৃত্যুর দিন উপলক্ষ করিয়াও আমরা বৎসরান্তে একবার সকলে একত্র সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য এক ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করি না, তাঁহার সারগর্ভ উপদেশাবলির আলোচনায় রত হই না!

গত প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম যে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহামান্য টেম্পল সাহেব ভূদেব বাবুকে একবার বলিয়াছিলেন,—"সময় পাইলেই আমার নিকট আসিবেন। আমি আপনার সহিত শাসন সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করি।" ইহার সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, উক্ত কথাগুলি বোধ হয় মহামান্য টেম্পল সাহেবের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ভূদেববাবুর গুণ-গ্রাহী স্যর এস্‌লে ইডেনই বলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্যেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীই ভূদেব বাবুর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তবে আমরা পরের মুখেই চিরকাল ঝাল খাইয়া থাকি। বিদেশীয় লোকে দেশের লোকের প্রশংসা না করিলে, তাঁহার গুণাবলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ইহা আমাদের জাতি-মাহাত্ম্য! তাই বিস্মৃতপ্রায় ভূদেববাবুর স্মৃতি আমাদের দেশবাসীর প্রাণে জাগরূক করিবার অভিপ্রায়ে আমরা এ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিদেশীয়গণ ভূদেববাবু সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে উদ্ধার করিয়া দিয়াছি।

মেডলিকট সাহেব মেদিনীপুরের বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার জন্ নামে এক পুত্র ছিল। তিনি পুত্রকে কতকগুলি প্রশ্ন ও উত্তর মুখস্থ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই,—"John, who is my best friend?" ("জন, আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু কে?") উত্তরে বালককে এই শিখান হইয়াছিল,—"Babu Bhudeb Mukherjee (বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) বাড়ীতে কেহ আসিলে, পিতা পুত্রকে উপরি উক্ত প্রশ্ন করিলেই সে উত্তরে ভূদেববাবুর নাম বলিত।

উচ্চপদস্থ বিদেশীয় কর্ম্মচারী অধীন কেরাণীকে একসঙ্গে খানা খাইতে বলিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ ও সার্থকজন্ম মনে করেন। কিন্তু গুণগ্রাহী বিদেশীয়গণ ইহাতে যে তাঁহাদের

প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট হন না, তাহা অনেকে হয়ত বুঝিতে পারেন না! তাঁহারা পদোন্নতির ও বেতনবৃদ্ধির আশায় অবলীলাক্রমে তুচ্ছ ক্রীড়াদ্রব্যের ন্যায় মহামূল্য জাতীয়তা নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু ভাবিতেও হৃদয় পুলকিত হয় যে বিদ্বানপ্রবর ডিরোজিয়োর ছাত্র, রাজনারায়ণ বাবু ও মধুসূদনের সমসাময়িক, তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহমান্ স্রোতের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও, ভূদেববাবু উচ্চপদস্থ সাহেবদের সহিত একত্র ভোজনে সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াও স্বেচ্ছায় সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। গত প্রবন্ধে আমরা এসম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। ভূদেব বাবু নিজেও যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, পুত্রদেরও এই পথ অবলম্বন করিবার শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে তাঁহাকেও এরূপ ভোজন হইতে বিরত থাকিতে বিশেষ ভাবে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তাহা স্মরণ রাখাইবার জন্ম পুত্রের শিরোদেশে দীর্ঘ শিখা-রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

* *
*

তদানীন্তন উচ্চপদস্থ বিখ্যাত রাজকর্ম্মচারী স্যর জন এড্গার্ এক সময় বলিয়াছিলেন,—"When I was in England, I used to think of Bhudeb Babu." (যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, আমি প্রায়ই ভূদেববাবুর কথা ভাবিতাম) উচ্চপদস্থ বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারী তাঁহার গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে রাজকর্ম্মে অবসর লইয়া সুদূর মাতৃভূমিতে বিশ্রামলাভার্থ গমন করিলেও, ভূদেববাবুর কথা ভুলিতে পারিতেন না।

অন্ত এক সময় অপর একজন রাজকর্ম্মচারী ভূদেববাবুকে বলিয়াছিলেন,—"We consider you as one of us" (আমরা তোমাকে আমাদেরই মধ্যে একজন বলিয়া মনে করি) এই সব উক্তি চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে!

* *
*

ভূদেব বাবু অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে কেবল ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা নহে, চিকিৎসা ও আইন শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। একবার হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ উকিলকে আইনের মূল নিয়ম সম্বন্ধে তিনি গুটিকতক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উকিল মহাশয় সেগুলির যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় তাঁহার গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলেন যে, এই পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ভূদেববাবুর নিকট তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল! বৈঠকে, সভা মজ্‌লিসে যে কোন বিষয়ের আলোচনাই হউক না কেন, ভূদেব বাবু বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সেই আলোচনায় যোগ দিয়া তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতেন। কথাবার্ত্তায় সকলকে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল।

* *
*

ভূদেব বাবু তখন হাওড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে তাঁহার এক ছাত্র ছিল। একদিন অপর এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট

শরতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে,—"মহাশয়, শরৎ তামাক খাইয়াছে।" ভূদেব বাবু তাহা শুনিয়া শরৎকে ডাকিয়া পাঠান। শরৎ আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি তামাক খেয়েছ?" সত্যবাদী ছাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ।" "তামাক কেন খেলে?" গুরুর মুখের পানে ক্ষণিকের জন্ত তাকাইয়া শরৎ উত্তর করিল,—"মহাশয় তামাক খান কেন?" ভূদেব বাবু আর তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রশান্তবদনে বলিলেন,—"Sarat, you have taught me a lesson today." (শরৎ, তোমার নিকট হইতে আজ আমি এক নূতন শিক্ষা লাভ করিলাম) অন্ত কোন প্রধান শিক্ষকের মুখের উপর দোষী ছাত্র এরূপ উত্তর করিলে, তাহার পৃষ্ঠদেশের কিরূপ বিকৃত অবস্থা হইত, তাহা কল্পনার সাহায্যে ভাবিবার বিষয়। এই শরচ্চন্দ্র ভূদেববাবুর সংসর্গে আসিয়া পরে একজন গণ্য মান্ত ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিল।

* * *

ভূদেব বাবু বৃদ্ধবয়সেও অনবরত তামাক সেবন করিতেন। একদিন পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখেন ভূদেব বাবু অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে একবারও ধূমপান করিলেন না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া এতদিনের অভ্যাসভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভূদেব বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তামাক খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। দেখলাম, এ বয়সেও মনের জোর আছে কি না!"

হায়! কবে আমরা এই সংযতচিত্ত তেজস্বী মহাপুরুষকে আদর্শ করিয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে রত হইব জানি না। মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ভগবান কবে সে শুভমুহূর্ত্তের সঞ্চার করিবেন, তিনিই জানেন। তবে প্রার্থনা যেন, সে মাহেন্দ্র ক্ষণ সময় থাকিতে শীঘ্রই উপস্থিত হয়। জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেলে আর রোগীর নিকট ঔষধের উপকারিতা কোথায়?

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ, এম-এ, বি-এল্।]

"সভাপর্ব্ব" নামক একখানি পুঁথিতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম কতকগুলি ভণিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এ পুঁথিখানির সমগ্র অংশ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত নয়। পুঁথিখানির প্রথমাংশে যে সকল ভণিতা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায়, সে অংশ জয়দেব নামক কোনও পণ্ডিত-বিরচিত। পুঁথির ৩০ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সকল ভণিতা আছে তাহাতে

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম দৃষ্ট হয়। ১৫১ পৃষ্ঠা হইতে শেষ অবধি অংশ ব্রজসুন্দর নামক ব্রাহ্মণ রচিত। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এক গ্রন্থের কতক কতক অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন। যাঁহার যতটুকু রচনা ততটুকুর মধ্যে যে সকল ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে নিজ নিজ নাম দিয়াছেন। এমন কি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও আশ্রিত পণ্ডিতদের সহিত কতক অংশ লিখিয়াছিলেন। কতক অংশ লিখিয়াও সমগ্র গ্রন্থ নিজ নামে চালাইতে কিছুমাত্র অভিলাষী হন নাই। যে অংশ যাঁহার রচিত, সে অংশে তাঁহারই নাম আছে। "ক্রিয়াযোগ সার" নামক পুঁথি খানির কতকাংশ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ও অবশিষ্টাংশ রিপুঞ্জয় দাস রচনা করেন। পদ্মপুরাণ হইতে এই ক্রিয়াযোগ সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথম আট অধ্যায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনা। নবম অধ্যায় হইতে রিপুঞ্জয় দাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুঁথি মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ স্পষ্টাক্ষরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত হরেন্দ্রনারায়ণের লেখা তাহার পর এই মন্তব্য লেখা আছে—"এই অবধি আমার কৃত পদ, এই হ'তে শেষভাগ রিপুঞ্জয় বড় কাএতের করা। আমার ভাগের চুক ভুল লেখাতে যে হৈছে তা সারাসুরা এক প্রকার করিলাম। ঐ খণ্ড পুঁথি দেবানন্দ শর্ম্মাকে দিয়া লেখাই। তার অক্ষর ভাল শব্দবোধ আছে। চাষা নয়। ইতি।" (৮০ ক পৃষ্ঠা) পদ্যে লিখিত গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ গদ্যে মন্তব্য মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সত্যবাদিতা, গুণগ্রাহিতা ও যাহার যে যশ প্রাপ্য তাহাকে সে যশ দিবার, অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। ইহার পূর্ব্ব পৃষ্ঠার উপরেও নিম্নলিখিত পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায় "ইহার মধ্যে মাধবগুণযশার প্রস্তাবটা রিপুঞ্জয়কৃত পদ।" ইহা পাঠ করিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে নিজ রচনার মধ্যে একটা প্রস্তাব অন্যের রচনা হইলেও পাছে কেহ তাহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বলিয়া মনে করেন সেইজন্য মহারাজ নিজে গদ্যে মন্তব্য দ্বারা সে কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার মন এতদূর সত্যপ্রিয়, তিনি যে অপরের রচনা নিজ নামে চালাইবেন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে যিনি নিজ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে অপরের সামান্য ঋণও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং গ্রন্থের বহুলাংশ নিজে লিখিয়া ও অল্প কয়েক পৃষ্ঠা অপরকে দিয়া রচনা করাইয়াও সমগ্র গ্রন্থ নিজনামে চালাইবার কোন প্রয়াস পান নাই, তিনি যে অপরের

গ্রন্থ নিজ নামে প্রচার করিবেন ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। এমন কি একখানি জীর্ণ পুঁথি নকল করিয়া রক্ষার সময় কে কতখানি নকল করিলেন তাহা পর্য্যন্ত যখন সত্যানুরোধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং নকলকারকদের মধ্যে স্বয়ং মহারাজ একজন হইলেও যখন অন্যান্য নকলকারকগণের সহিত মহারাজের নাম রহিয়াছে, তখন অপরের রচিত গ্রন্থ নিজ নামে চালাইবার অভি-প্রায়ের সম্বন্ধে সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নকল সম্বন্ধেও যখন এত সাবধানতা ও সত্যানুরাগ প্রকটিত তখন রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে মিথ্যা প্রচারে রুচি হইবে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি যে তাঁহারই রচনা এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হইতেছি। এত কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না কারণ, হরেন্দ্রনারায়ণ যখন এতদিন এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তখন তাঁহার অধিকার সম্পূর্ণরূপেই স্বীকৃত। এই অধিকার হইতে কেহ যদি তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে চান তাহা হইলে বিপক্ষকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীও অদ্যাপি কেহ আবির্ভূত হন নাই। তথাপি আমাদের আলোচনা একেবারে নিরর্থক নহে, কারণ এই প্রকার আলোচনায় বাস্তবিক হরেন্দ্র-নারায়ণের দাবী কতদূর সঙ্গত ও কিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নয়খানি গ্রন্থ, একটি খণ্ড কবিতা ও কয়েকটি সঙ্গীত অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থগুলি মৌলিকতার দাবী বেশী করিতে পারে না। আখ্যানবস্তু সমস্তই অন্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রামায়ণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতির অংশবিশেষের অনুবাদই হরেন্দ্রনারায়ণের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এই সকল অনুবাদ যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক ধরিয়া আক্ষরিক অনুবাদ তাহা নহে। কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাস যেরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বিবিধছন্দে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থগুলিতেও সেই ভাবেরই রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। "উপকথা" নামক গল্পগ্রন্থের উপাখ্যানভাগও ফারসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

কিন্তু মৌলিকতা না থাকিলেও এবং স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ করিবার প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই সকল গ্রন্থের

একটা বিশিষ্টতা আছে। এই সকল গ্রন্থের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে বর্ত্তমান কালের সমালোচনার মাপকাঠি লইয়া আসিলে চলিবে না, প্রাচীন সাহিত্যের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ধর্ম্মপ্রবণ। গদ্যগ্রন্থ ত অতি বিরল। যে সমস্ত ছন্দে রচিত কাব্য প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল তাহার সকল গুলিতেই ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের কবিগণ রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির বিষয় অবলম্বন করিয়াই নিজ কবিত্বশক্তি প্রকটিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। নিজের কল্পনা-গঠিত কাহিনী উপাদান করিয়া তাঁহারা কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। কাজেই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীও যে এই শ্রেণীর হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। এখন কোচবিহার রাজ্যে যে সমস্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের স্থাপিত। কোচবিহার সহরে ঠাকুরবাড়ীতে যে আনন্দময়ী কালীমূর্ত্তির নিত্য পূজা হয়, সাগরদিঘীর তীরে যে হিরণ্যগর্ভ শিবলিঙ্গ বিদ্যমান তাহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত টাকাগাছের ও বেহারের নৃসিংহ ঠাকুর, ভবানী ঠাকুরাণী, সিদ্ধেশ্বরী, ঘূর্ণেশ্বরী, বৃক্ষোদ্ভবা ঠাকুরাণী, আমবাড়ীর ক্রোটেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর, গোঁসাইগঞ্জের কালী, কৃষ্ণ বলরাম ও নৃসিংহ ঠাকুর প্রভৃতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হরেন্দ্র-নারায়ণ প্রত্যহ নিজে মহাসমারোহে কালীর পূজা করিতেন। ব্রজসুন্দর শর্ম্মা "হিতোপদেশে" এইরূপে সেই পূজার বর্ণনা করিয়াছেন—

"সিংহাসনে শিবের হৃদয় সরোবরে।
অমল কমল পদতল শোভা করে॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান নিতম্ব বসনা।
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা শাণিত দশনা॥
তারার মন্দিরে উপহার দ্রব্যগণ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কুসুম চন্দন॥
সুধারস প্রায় সব্যঞ্জন অন্নরাশি।
সুবর্ণ ভাজনে কত আছেন প্রকাশি॥
ধরাপতি তারিণীচরণ করি ধ্যান।
নিত্য হোম করে নিত্য দেয় বলিদান॥
নিত্য নৃত্যগীত মহোৎসব পুরঃসরে।
বিহার নৃপতি ভগবতী পূজা করে॥"

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ধর্ম্মানুরাগ জয়নাথ মুনশী লিখিত রাজোপাখ্যান হইতেও জানিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ শাক্ত হইলেও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন না। মহাভারতের আদিপর্ব্ব নামক পুঁথিতে হরেন্দ্রনারায়ণ লিখিয়াছেন :—

"ইতি আদিপর্ব্বে সর্ব্বরসে রসায়ন।
সমাপ্ত হইল পদবন্ধ বিরচন॥
বোল হরি মুখ ভরি এবারে এবার।
এমন মানব জন্ম হবে নাকি আর॥
বল হর দিগম্বর বদন ভরিয়া।
অনায়াসে ভবপাশে যাবে নিস্তারিয়া॥
কালী কালী কালী বল একবার মুখে।
অসার সংসার পার তবে হবে সুখে॥"

শল্যপর্ব্বের অনুবাদে আছে:—

"প্রবন্ধে রচিল হরেন্দ্র ভূপ।
ভাব মন সদা শ্রীরামরূপ॥"

সুন্দরকাণ্ডেও দেখা যায়:—

"শ্রীহরেন্দ্র ভাবে ধন্দ লাগিল এবার।
ত্রাণ কর দুঃখ হর রাম কৃপাধার॥"

সুতরাং হরি, রাম, শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণের মধ্যে কাহাকেও হরেন্দ্রনারায়ণ পৃথক্ দেখেন নাই। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তাহার প্রমাণ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

"অধ্যায়ের অবসানে সভাসদ্‌জন।
বল রামনাম সবে ভরিয়া বদন॥
যেহি রাম সেহি তারা সেহি আদ্যাশক্তি।
এক ভাবে ভাবিলে মিলিবে ভক্তিমুক্তি॥
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ভণে সুপয়ার।
কালী বলি তর ভাই অসার সংসার॥"

এই দেবদেবীতে অভেদবুদ্ধি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের উদার ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক। প্রাচীনকালে এরূপ উদার ধর্ম্মভাবের উদাহরণ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

একে ত প্রাচীন সাহিত্যের ধারাই ধর্ম্মের দিকে বহিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ একনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজ রচিত ও তাঁহার আজ্ঞায় রচিত গ্রন্থাবলী যে ধর্ম্মবিষয়ক হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলিও এই হেতুই আধ্যাত্মিক।

'নিদাঘ-বর্ণন' নামক বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শেষে সন্নিবিষ্ট খণ্ড কবিতাটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কালিদাসের "ঋতুসংহার" হইতে বহু উপমা ও ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্র-

নারায়ণ সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' হইতে নিদাঘবর্ণনাত্মক শ্লোকগুলির ভাব নিজ কবিতাসৌষ্ঠবের জন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর নামমাত্র এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল : সমগ্র গ্রন্থগুলির বিশদ পরিচয় প্রদান বা সমালোচনা করিবার অবসর নাই। সমগ্র গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিবার অবসরও আমি পাই নাই। সুতরাং আমার এ প্রবন্ধ আংশিক পরিচয়রূপেই গৃহীত হইবার যোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে বলিতে চাই ও একটি বিষয়ে বিশেষরূপে কোচবিহার সাহিত্য-সভার মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে চাই। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পুঁথিগুলি সভা-গৃহের একাংশে রক্ষিত হইয়াছে। সেগুলির কয়েক স্থলের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে, এখন তাহার পাঠ উদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কয়েকস্থল এরূপ জীর্ণ হইয়াছে যে তাহার পাঠোদ্ধার করার কোনও সম্ভাবনা নাই। অতি সত্বর এ পুঁথিগুলির মুদ্রণ বা অন্ততঃ নকল না করাইলে এগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। মুদ্রিত হইলে এগুলি যে বর্ত্তমান সাহিত্য হিসাবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন কোচবিহারের এক সময়ের সাহিত্যের অবস্থা ও শক্তি এগুলির দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। বিশেষতঃ কোচবিহার রাজবংশের গৌরবের কথা—একজন মহারাজের রচিত এতগুলি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান তাহা সকলের সুপরিচিত হইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের সহিত তুলনায় এগুলি নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আশা করি কোচবিহার সাহিত্য-সভা হইতে এগুলির প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক কবিরা তাঁহার কন্দর্পবিনিন্দিত কান্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লাবণ্যের কথা জনপ্রবাদে আজিও প্রচারিত। চিত্রের সহিত তাঁহার জীবনী ও রচনাবলীর বিস্তৃত পরিচয়-যুক্ত ভূমিকাসহ গ্রন্থাবলী একত্র মুদ্রিত হইলে বোধ হয় পাঁচশত পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। স্বীকার করি, এ কার্য্যে শ্রম ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তবে ইহাও আশা করি যে, কোচবিহার সাহিত্য-সভার উৎসাহ থাকিলে এ কার্য্য অচিরে সম্পন্ন হইতে পারিবে। স্থানীয় প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান, রক্ষা ও প্রচার এই সভার বিশেষ উদ্দেশ্য। মহারাজ নরনারায়ণের গ্রন্থের ন্যায় বহু পুঁথি

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেগুলির নাম মাত্র শোনা গিয়া থাকে। অল্প যে কয়েকখানি পুঁথি এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রাচীন কোচবিহারের বিদ্যা-চর্চ্চা ও সাহিত্য সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেগুলিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়া এখনই আবশ্যক। এখনই অনেক পুঁথি জীর্ণ ও স্থলে স্থলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিলম্বে সেগুলির উদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।

সাহিত্য প্রসঙ্গ।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা।—

গত চৈত্র সংখ্যা 'অর্চ্চনা'য় আমরা সাহিত্য-পঞ্জিকা সম্বন্ধে দু'একটী অনু-যোগ করিয়াছিলাম। পঞ্জিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় তাহার একটী প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— "বি এ ডিগ্রীর মধ্যে . ফুলষ্টপ্ দেওয়া কাহার কীর্ত্তি জানি না, তবে proof দেখা হয় নাই সময় ছিল না। * * তবে এ কথাও বলি, আমি প্রুফ দেখিলে আপনাদের ন্যায় hyphen চিহ্ন দিতাম না, পরিষৎ পঞ্জিকার ন্যায় বি এ তফাৎ তফাৎ রাখিতাম।" উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে 'ফুলষ্টপ্' 'কমা' প্রভৃতি ইংরেজি আমদানি। তবে বাঙ্গালায় 'কমা' চলিয়াছে, 'ফুলষ্টপ্' এখনও চলে নাই। ইংরেজি ব্যাকরণের আইনে 'ফুলষ্টপে'র ব্যবহারই উপযুক্ত। দুইটী ডিগ্রীর মধ্যেই 'ফুলষ্টপ্' দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম উহা ইচ্ছাকৃত এবং সেই জন্যই আমরা রহস্য করিয়াছিলাম মাত্র। বলা বাহুল্য, ডিগ্রীর মধ্যে 'কমা'র ব্যবহার ভুল এবং 'হাইফেন্' ব্যবহারের সমর্থন করা চলিতে পারে।

ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই হয়। গত চৈত্র মাসে ছাপার ভুলে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়ের 'রায়' বর্জ্জিত হওয়ায় সাধারণে তাঁহাকে হয়ত 'হিন্দুস্থানী' মনে করিতে পারেন, এই জন্য আমরা ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

* *
*

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সমালোচনা উদ্ধৃত করা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"অমূল্য বাবুর সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়াছি ইহাতে 'সৌরভ'ও আপত্তি তুলিয়াছেন কিন্তু করি কি? আমরা এত পুস্তক দেখিতেও পাই না আর দেখিতে পাইয়াও যদি ভাল মন্দ সমালোচনা করি, তাহা হইলে যে গালাগালি খাইতে হইবে তাহা হজম করা সহজ নহে। * * 'ভারতবর্ষে' যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা একজনের অভিমত, আবার তাহারও যে বড় বেশী মূল্য আছে ইহাও মনে হয় না।"

বিরূপ সমালোচনা-কশাঘাতের আশঙ্কায়, সমালোচনায় নিজের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মত ব্যক্ত করিতে না পারিলে সাহিত্য-পত্রিকা-সম্পাদন করিবার গুরুভার কিরূপে বহন করা চলিতে পারে, আমাদের তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। আমাদের মনে হয়, নিজেরা একান্ত অপারগ হইলে ২।৫ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচকের হস্তে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে সুফল ফলিতে পারে। তাহার উপর কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে নব-প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশেরই মতামত বাহির হয়, সেইগুলির সহিত নিজেদের মতের একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইলেও সম্পাদকের গুরুভার অনেকটা লঘু হইতে পারে। 'ভারতবর্ষে'র প্রতিবাদটিকে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়া রাখালরাজ বাবু বিশেষ অসঙ্গত কীর্ত্তি করিয়াছেন। কারণ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সকল পত্রেই 'ব্যক্তিবিশেষে'রই অভিমত প্রকাশিত হয়। এবং সেই মত পাঠকের মতের সহিত মিশিয়া তাহাকেও ঐকমত্য করিয়া তুলে।

বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মিউনিসিপাল কমিশনর পর্য্যন্ত দেশের লোকের প্রতিনিধি। দেশের লোকে এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, এবং এই প্রতিনিধিরা সাধারণের মতের প্রতিধ্বনি করে। প্রতিনিধিরা যে কখনও সাধারণের দ্বারে দ্বারে লোকমত জানিয়া বেড়াইয়াছেন, এমন কথা আমরা শুনি নাই।

* * *

সমালোচকের পক্ষেও এই কথা কতকটা খাটে। সমালোচক কোনও পত্রে সমালোচনা বা বক্তব্য পাঠাইলেন; সম্পাদক স্বীয় মতের সহিত তাহা মিলাইয়া যখন উহা গ্রহণ করিলেন, তখন তাহা আর 'একজনের অভিমত' রহিল না। এবং পরে যত দিন না সেই সমালোচনার কোনও প্রতিবাদ বাহির হইয়া উহার ভ্রম

প্রতিপন্ন হয়, ততদিন যে উহার 'মূল্য' আছে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। অমূল্যবাবুর মূল্যবান সমালোচনায় যে সমস্ত ভুলগুলি 'ভারতবর্ষ' চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে রাখালরাজবাবু কি বলেন? 'ভুল'কে 'ঠিক' বলিলে, মিথ্যাকে সত্য ভাবিলে, রাতকে দিন জ্ঞান করিলে আমরা নিরুপায়। সুতরাং মনে হয়, 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়া রাখালরাজবাবু বিশেষ অবিচার করিয়াছেন।

* *
*

পত্রের একস্থলে রাখালরাজ বাবু লিখিয়াছেন—"যে সব সাহিত্যিক বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি লিখেন, সাময়িক বা সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকতা করেন, অথচ স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি নাই, তাঁহাদের তালিকা দিবার আমার ইচ্ছা ছিল। লেখকের নামের পার্শ্বে সংবাদ পত্রের নাম দিতাম, কিন্তু সময়াভাবে প্রথম বৎসরে সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। * *" আশা করি, পরের সংখ্যায় এই ক্রটী সংশোধিত হইবে।

* *
*

আমরা লিখিয়াছিলাম—"পুস্তকের তালিকায় অনেক গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। এবং সুধু গুরুদাসবাবুর ক্যাটালগের উপর নির্ভর করিলেও এ ক্রটীগুলি হইত না।" ইহার উত্তরে রাখালরাজ বাবু লিখিয়াছেন—"একথা ঠিক নহে। কারণ আমরা জীবিত ও স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণের নাম পৃথক পৃথক দিয়াছি। কিন্তু গুরুদাস বাবুর ক্যাটালগে শেষ দিকে যে সকল গ্রন্থের নাম বিষয় হিসাবে বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে সেখানে গ্রন্থকারগণের নামের পূর্ব্বে শ্রী কিম্বা ৺ কিছুই দেওয়া নাই। এইজন্য বহু নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। গুরুদাস বাবুর তালিকায় নাই এরূপ শত শত নাম অন্যত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমার আর একটা সংকল্প ছিল সে কথা নিবেদনে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি তাহাও ছাপা হয় নাই। জীবিত গ্রন্থকারগণের জন্ম সন ও তারিখ এবং বাসস্থান ও ঠিকানা।"

"আমরা নাম জাহির বা অর্থলাভের জন্য এ কার্য্যে অগ্রসর হই নাই * * সাহিত্যের কাজে লাগিবে এই আশায় যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছি তাহা সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন কেহ বুঝিবেন না।" 'স্থূলদর্শী' হিসাবেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিব যে এরূপ একটী গুরুভার বহন করিতে হইলে এবং এই সাধু উদ্দেশ্য ফলবতী করিতে হইলে নিরপেক্ষ বিচার, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুধী সাহিত্যিক-বৃন্দের সহায়তা একান্ত আবশ্যক এবং পক্ষপাতিতা-দোষ-দুষ্ট ও বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত সর্ব্বভাষাবিদ্ মহাপণ্ডিতেরও সমালোচনা-আবর্জ্জনা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

* *
*

সুবর্ণবণিক্ সমাচার।—

কলিকাতা 'সুবর্ণবণিক্ সমাজ' হইতে 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' নামক একখানি মাসিক পত্র কয়েক মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা সুবর্ণবণিকের জাতীয় পত্রিকা। সম্প্রতি আমরা এই মাসিকের চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। ইহার ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে কেবল মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় জাতীয় প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। পত্রে এই প্রবন্ধের দৈন্য সুলক্ষণ নহে! জাতীয় পত্রিকায় জাতীয় প্রসঙ্গ, জাতীয় ভাব, জাতীয় অভাব প্রভৃতির আলোচনা না থাকিলে এইরূপ সাম্প্রদায়িক পত্রিকার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

* *
*

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অনুপাতে সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। সুবর্ণবণিকের মধ্যে এখন অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা মাতৃভাষার আলোচনায় অনুরাগী, এই পত্রের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি এমন ২।৫ জনের মধ্যে লিখিবার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তাহা হইলে "সুবর্ণ-বণিক সমাচারে"র প্রবন্ধের দৈন্য নিবারিত হইবে এবং ২।৫ জন সুলেখকও সৃষ্টি হইবে। উন্নত জাতিকে ধরিবার প্রয়াস থাকিলে 'পতিতে'র উন্নতি বিদ্যুত গতিতে হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ নিয়ম। সেইজন্য আমাদের আশা আছে, সুবর্ণবণিক জাতি শীঘ্রই শিক্ষায় অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিবে।

* *
*

আলোচ্য সংখ্যায় 'জাতীয় সংবাদ' স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে যে, 'রাঢ়ীশ্রেণীয় ও সপ্তগ্রামীয় দুইটী সম্ভ্রান্ত এবং ধনশালী পরিবারের মধ্যে' সম্প্রতি 'বৈবাহিক সম্মিলন' হইয়াছে। সেই আনন্দ-সম্মিলনে লেখক মহাশয় 'বর্ণনাতীত প্রীতি-লাভ' করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে 'ইহা জাতীয় জীবনে নব জাগরণ।' এইরূপ

একটা নূতন কিছু 'জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত' থাকিতে পারে, কিন্তু এই 'নব জাগরণ' উভয় জাতীয় মঙ্গলবিধায়ক কি না, তাহা লেখক মহাশয় বুঝাইয়া বলেন নাই।

আমরা জানি, 'রাঢ়ীশ্রেণী'য় সুবর্ণবণিকের বিবাহে পণ, আদান-প্রদান, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি অন্য জাতি অপেক্ষা অল্প এবং 'সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিকে'র উহা অত্যধিক। সুতরাং মনে হয়, এই দুই শ্রেণীর সুবর্ণবণিকের মধ্যে বিবাহ-সম্মিলন সংঘটিত হইতে থাকিলে এবং পণ প্রভৃতি মাঝামাঝি দাঁড়াইলেও সপ্ত-গ্রামীয়েরা লাভবান হইবেন এবং রাঢ়ীশ্রেণীয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কাংস পাত্রের সহিত মৃণ্ময় পাত্রের সংঘর্ষণে যে ফল, শেষোক্ত রাঢ়ীশ্রেণীয়েরা সেই দশা-প্রাপ্ত হইবেন। তবে রাজকুমারের সহিত রাজনন্দিনীর বিবাহে অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। অতএব আমাদের মতে এইরূপ বিবাহে উল্লাসপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যাহাতে জাতির মধ্যে পণগ্রহণ-প্রথা একেবারে রহিত হয় সেই ব্যবস্থা করা বা সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। সপ্ত-গ্রামীয়েরা রাঢ়ীশ্রেণী ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ধনশালী। অর্থের অপ্রতুলতা তাঁহাদের অনেকের নাই। তাঁহাদের উক্ত প্রয়াস শুভ ফলপ্রসূ হইলে তাঁহাদের কার্পণ্য-কলঙ্কদুষ্ট সমাজে অনাবিল আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইবে, সুবর্ণবণিক জাতি উপকৃত হইবে এবং অন্যান্য জাতির নিকট নিজেদের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

"সুবর্ণবণিক সমাচারে"র শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই আমরা এত কথা বলিলাম।

'নৈষধ-চরিতে' নাস্তিকবাদের আলোচনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

'কলির দলভুক্ত নাস্তিক বলিয়াছিল, ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণই বিশুদ্ধ নাই,—সকলেই সাঙ্কর্য্যদোষে দূষিত। এই জাতি-দোষের আশঙ্কা যে অমূলক, তাহার প্রমাণরূপে ইন্দ্র বলিলেন,—বেদে এবং সংহিতায় আছে (১), ব্রহ্মহত্যার বা

(১) "পুরুষং সোম্যেতে হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে

ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণস্তেয়ের অথবা ব্রাহ্মণীগমনের অপরাধ-সন্দেহে ধৃতব্যক্তি যদি বলে, 'আমি ব্রাহ্মণবধ করি নাই' বা 'আমি ব্রাহ্মণের সুবর্ণ অপহরণ করি নাই,' অথবা 'ব্রাহ্মণীগমন করি নাই,' তাহা হইলে প্রাড়বিপাক—বিচারক তাহাকে দিব্য করাইবেন। হস্তে উত্তপ্ত লৌহপ্রদান, জলে নিমজ্জন প্রভৃতি প্রকারভেদে এই দিব্যের প্রণালী নানাবিধ। বহ্নিদিব্যের রীতি এই যে, অভিযোজ্যের অঞ্জলিবদ্ধ উভয় হস্তে সাতটী অশ্বত্থপত্র রাখিয়া তাহার উপরে সাতটী পিপ্পলপত্র, সাতটী শমীপত্র, সাতটী দূর্ব্বা এবং দধি মিশ্রিত অক্ষত ও পুষ্প স্থাপন করিবে। তারপর এই সকল দ্রব্যের সহিত শুক্লসূত্র দিয়া সাতবার হস্ত বেষ্টন করিবে। তদন্তর একটী অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ পঞ্চাশৎপল পরিমিত উত্তপ্ত লৌহখণ্ড জলে ফেলিয়া দিবে, আবার উত্তপ্ত করিয়া আবার জলে ফেলিবে, তৃতীয়বার উত্তপ্ত সেই অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ড সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া নিকটে আনিলে অভিযোজ্য "ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাং—" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে। এই সময়ে বিচারক নিজেও যথোক্ত অগ্ন্যাধান করিয়া 'অগ্নয়ে পাবকায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার হোম করিবেন। হোমের পর সেই হোমাগ্নিতে আর একবার পূর্ব্বস্থাপিত লৌহখণ্ড উত্তপ্ত করিতে হইবে। ইহার পর বিচারকেরও "ত্বমগ্নে বেদাশ্চত্বারঃ—" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের বিধি আছে। এই মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া বিচারক অভিযোজ্যের তথা কথিত হস্তে সেই লৌহখণ্ড নিক্ষেপ করিবেন। ইহার পর অভিযোজ্য ব্যক্তি সাতটী মণ্ডল অতিক্রম পূর্ব্বক অষ্টম মণ্ডলে আসিয়া নবম মণ্ডলে সেই

"অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে ॥"—ছান্দোগ্য, ৬।১৬।১-২

'তুলাগ্ন্যাপো বিষং কোশো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে।

* * *

'ততোঽভ্যুক্ষবতো লৌহং পঞ্চাশৎপলিকং সমম্।

অগ্নিবর্ণং ন্যসেৎ পিণ্ডং হস্তয়োরুভয়োরপি॥

* * *

'মৃদিতব্রীহিরদগ্ধঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।

* * *

"সমকালমিষুং মুক্তমানীয়াম্ভো জবী নরঃ।

গতে তস্মিন্নিমগ্নাঙ্গং পশ্যেচ্ছেচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ব্যবহারাধ্যায়, দিব্য-প্রকরণ।

তপ্তলৌহ পরিত্যাগ করিয়া দুই হাতে ব্রীহি মর্দন করিবে। এখন যদি দেখা যায়, তাহার হস্ত দগ্ধ হয় নাই, তাহা হইলে অভিযোজ্য ব্যক্তি যে ব্রাহ্মণ বধকারী নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় এবং মুক্তিলাভ করে। আর যদি তাহার হস্ত দগ্ধ হয়, তবে তাহাকে যথাবিহিত দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। [প্রবন্ধ-বিস্তৃতি-ভয়ে জলাদি পরীক্ষার রীতি প্রদর্শিত হইল না।] ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যে এখনও বিশুদ্ধ আছে, জলানল-পরীক্ষায় অভিযোজ্য ব্যক্তির পরাজয়ই তৎপক্ষে প্রধান সাক্ষ্য। যদি সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হত্যা বা ব্রাহ্মণীগমন না করিয়া থাকে, তবে তাহার পরাজয় হইবে কেন ?

"ব্রাহ্মণ্যাদিপ্রসিদ্ধারা পন্থা যয়েক্ষতে জয়ম্।
তদ্ বিশুদ্ধিমশেষস্য বর্ণবংশস্য শংসতি॥"

তারপর হে নাস্তিক, তোমরা যে দেহব্যতিরিক্ত আত্মা ও অদৃষ্ট স্বীকার কর না, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঋতুকালে যথানিয়মে স্বামিসাহচর্য্য ঘটিলেও অনেকের গর্ভসঞ্চার হয় না ; বংশলোপের আশঙ্কায় স্বামী যদি এ ক্ষেত্রে আবার একাধিক বিবাহ করেন, তাহা হইলেও পুত্রমুখ-সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। এইরূপ অনেকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি কার্য্য করিলেও কোনও সুফল লাভ করিতে পারে না। ইহাতে কি অনুমিত হয় ? এরূপ ক্ষেত্রে ইহাই কি স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় না যে অদৃষ্টরূপ অলৌকিক কারণান্তর আছে ? অনবরত এই প্রকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যে তোমরা পরলোকাদি সম্বন্ধে হৃদয়ে নাস্তিক্য পোষণ করিতে পার, ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাতে তোমাদের মূর্খতাই প্রকাশ পায়।—

"সত্যেব পতিযোগাদৌ গর্ভাদেরপ্রবোদয়াৎ।
আক্ষিপ্তং নাস্তিকাঃ কর্ম্ম ন কিং মর্ম্ম ভিনত্তি বঃ॥"

তোমরা যদি স্পষ্ট অনুভব করিয়াও বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে আর বলিবার কি আছে ? নতুবা ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায় যে, পাপবশতঃ যাহাদের পিশাচ-শরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মীয় বা অন্য কাহারও উপর আবিষ্ট হইয়া বলে যে, "আমি এই প্রেতযোনিতে বড় কষ্ট পাইতেছি, আমার উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা কর।" তাহারা ইহাও প্রকাশ করে যে, 'অমুক জায়গায় আমার টাকা পোতা আছে, তাহা লইয়া গয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।' প্রেতের এই কথানুসারে যথাস্থানে টাকা পাওয়াও যায়। নানা দেশের প্রামাণিক লোকের নিকট এই সকল কথা

শুনিয়াও যে তোমরা তীর্থাদির মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক দেহান্তর প্রাপ্তির প্রামাণিকত্ব বিশ্বাস কর না, ইহাতে আর বলিবার কি আছে?

"যাচতঃ স্বগয়াশ্রাদ্ধং প্রেতস্যাবিশ্য কঙ্কন।
নানাদেশজনোপজ্ঞাঃ প্রত্যেষি ন কথাঃ কথম্॥"

বেদাদি শাস্ত্রবোধিত পরলোকের সত্তা যে অলীক নহে, সে বিষয়ে আর এক প্রমাণ এই যে, আয়ুঃক্ষয় না হইলেও নামভ্রান্তিতে যমদূত কাহারও স্থূল শরীর হইতে লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলে যমরাজ বা চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূতেরা আবার তাহাকে যথাস্থানে রাখিয়া যায়। তখন সেই নিঃস্পন্দ শরীরে চৈতন্যের সঞ্চার হইলে বন্ধুবান্ধবদিগের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে যমরাজ, চিত্রগুপ্ত ও নরকাদি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশ করে, ইহাতে ত স্পষ্টতঃই পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে নরকাদির যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, এই উত্তরের সহিত তাহা সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়।

ঋগ্‌যজুঃ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদে এবং স্মৃতি, পুরাণ, দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে পরলোকের প্রামাণিকত্ব স্থির করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল তোমার কথায় কোন্ বুদ্ধিমান্ পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবে? আর হে নাস্তিক, এই সকল বেদাদি অসংখ্য শাস্ত্র দেখিয়া তোমার নিজেরও পরলোক স্বীকার করাই উচিত। বহুলোকের সম্মতমার্গ পরিত্যাগ করিলে তাহা বিপত্তিকর হইয়া থাকে। কোনও কাশীযাত্রী, মধ্যবর্ত্তী চতুষ্পথে আসিয়া কাশীর পথ বামে না দক্ষিণে জিজ্ঞাসা করিলে পাঁচজন যদি বলে বামে, আর পঞ্চাশজন যদি বলে দক্ষিণে, তাহা হইলে 'বহূনাং বচনং গ্রাহ্যম্'—এই ন্যায়ানুসারে উক্ত পথিক পঞ্চাশজনের কথিত পথেই গমন করে। পথভ্রান্ত হইলে তুমিও এইরূপ অধিক লোকের কথারই অনুবর্ত্তন কর। লৌকিক গ্রাম গমনাদি কার্য্যে যখন এইরূপ কর, তখন পরলোক সম্বন্ধেও অল্পলোকের বৈমত্য গ্রাহ্য না করিয়া বহুলোকের অনুমোদিত মার্গই কি আশ্রয় করা উচিত নহে?

"বেদৈস্তদবেবিত্তিস্তদ্বৎ স্থিরং মুতশতৈঃ কৃতম্।
পরং কষ্টে পরং বাচা লোকং লোকায়ত ত্যজেৎ॥
সমজ্ঞানাল্পভূয়িষ্ঠপান্থবৈমত্যমেত্য যম্।
লোকে প্রয়াসি পন্থানং পরলোকে ন তং কুতঃ॥"

[ক্রমশঃ।

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়।

(প্রতিবাদ)

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ।]

গত চৈত্র মাসের 'অর্চ্চনা'য় মৌঃ মহম্মদ কে চাঁদ মহাশয় 'সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়ে'র যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া আমি মনে করি। তিনি যে বলিয়াছিলেন "হিন্দুরা মুসলমান-দিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দু-সাহিত্যিকের মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ করা, রাজললনাগণের উপর বৃথা কলঙ্কারোপ করা এবং মুসলমান শব্দের 'নেড়ে', 'চাষা', 'যবন,' 'ম্লেচ্ছ,' প্রভৃতি নিদারুণ শেল সদৃশ বাক্যবান, উপন্যাস, নাটক ও এমন কি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পর্য্যন্ত ব্যবহার করা আজও পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহারা হিন্দুর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন।" ইহাতে তাঁহার একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ২।৪টি বা ১০।২০টি দৃষ্টান্ত হইতে কিরূপে স্থির করিলেন যে সকল হিন্দুই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করে? সাহিত্য-সম্মিলনের শেষ দিনে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ও বলিয়াছিলেন "কলিকাতাবাসীরা বাঙ্গালদিগকে ঘৃণা করে।" এ কথায় সকলেরই আপত্তি ছিল। কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি একজন মুসলমানের অন্যায় ব্যবহারে সমগ্র মুসলমান জাতিকেই গালাগালি দেন তাহা হইলে তিনিও যেরূপ ভ্রমে পতিত হন, মৌঃ মহম্মদ কে চাঁদ মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ২।৪ জন সাহিত্যিক যদি এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকেন তজ্জন্য সমস্ত সাহিত্যিকই অভিযুক্ত হইবেন কেন?

কেহ কেহ বলেন, স্যর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখায় হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন, তজ্জন্য কি ব্রাহ্মধর্ম্মের কৈফিয়ত তলব করা হইবে, আর বলিতে গেলে তিনি হিন্দুধর্ম্মও ভাবেন নাই মুসলমান ধর্ম্মও ভাবেন নাই, তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাহা বলিয়াছেন।

এবারকার সাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম কর্ণধার বিজয় বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ঠিক। যে হিন্দু মুসলমানের মনঃপীড়াজনক কোনরূপ

কিছু লিখিবে সেই তাহার জন্য দায়ী, হিন্দুসমাজ বা সাহিত্যিক সমাজ তজ্জন্য কেন দায়ী হইবে. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উঁহা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থাপিত করায় কোন ফল নাই। "মিথ্যা কথা কহা বড় দোষ" এইরূপ শত শত নীতি-কথা ছাপার অক্ষরে পড়িয়া ও শুনিয়া সকলেই সত্যবাদী হইয়াছেন কি ? যাহাতে কাহারও মনে অযথা কষ্ট হয় সেরূপ কার্য্য নিন্দনীয়, এ কথা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে ?

তবে এ কথাও মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক সত্যের জন্য যদি কোন মুসলমানের নিন্দা হয় তবে "তিনি মুসলমান ছিলেন সুতরাং তাঁহার নিন্দা হওয়ায় আমরা ক্রুদ্ধ হইব" এরূপ করিয়া মনো-বিবাদ বাড়াইলে চলিবে না। আওরঙ্গজেব ও সিরাজ-উদ্দৌলা অত্যাচারী ছিলেন বলিলে যেমন মুসলমানের বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, তেমনি দুর্য্যোধন পাষণ্ড ছিলেন বলিলে হিন্দুরও বিরক্ত হওয়া উচিত নহে।

হিন্দুদের মধ্যে কি দেখিতে পাই ? কায়স্থ পত্রিকায় একবার একটা ছবি বাহির হইয়াছিল—একটা শিখাধারী মস্তকের দুইটি পা, শরীর মোটেই নাই। নিম্নে লেখা ছিল রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণির কল্পিত বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ। ইহাতে ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া কি সাহিত্য-সম্মিলনে কোনদিন কথা উঠিয়াছিল ? অন্যের কথা দূরে থাকুক, কায়স্থের উপবীত ধারণ লইয়া কায়স্থের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছে, একদল অপর দলকে ভয়ানক ঘৃণা করেন কিন্তু এই উভয় দলই অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়া থাকেন।

যেমন সাহিত্য-সম্মিলনটা একদল কায়স্থের সামগ্রী নহে, তেমনি ইহা একা হিন্দুরও নহে। ইহা সাহিত্যিকের সাধারণ সম্পত্তি, আহারের সময়ে বা ধর্ম্মাচরণের সময়ে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। সাহিত্যানুশীলনের সময়ে আমরা সকলেই সাহিত্যিক, এই কথা মনে রাখিতে হইবে। সাহিত্যিক মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ অধিক সংখ্যায় যোগদান করুন তখন দেখিবেন সাহিত্য-সম্মিলন তাঁহাদেরই—ইহা ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ব্রাহ্ম হিন্দু বৌদ্ধ কাহারও নহে, ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকের।

গত শ্রাবণ মাসে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র শ্রাবণ সংখ্যায় "মুসলমানি ঘৃণা ব্যঞ্জক" প্রবন্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে 'ব্রজকাহিনী'তে এক স্থানে আছে "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাগপাশের ভীষণ পেষণে জাতিভেদের অনুচিত বৈষম্যে ও

যাবনিক প্রলোভন প্ররোচনা বা প্রপীড়নে, অথবা মুসলমান হইলে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর অসংখ্য লোকে দলে দলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।" এখানে "মুসলমান" এই কথাটির বিশেষণ "যাবনিক" করা হইয়াছে, ইহাতেই কি বন্ধুবর মহম্মদ কে চাঁদ মহাশয় মুসলমানের প্রতি ঘৃণা দেখিতে পাইলেন? আমি ত ইহাতে লেখকের অজ্ঞতাই দেখিতেছি। কারণ 'যবন' কথাটি গ্রীকদিগের প্রতিই প্রযোজ্য (যবন = Ionian)। পুরাণে বা ইতিহাসে কোথাও 'যবন' কথা ঘৃণাব্যঞ্জকত্ব প্রকাশ করে না। 'কাফের' কথায় অ-মুসলমানের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ পায়, ম্লেচ্ছ বা যবন কথায় তাহা প্রকাশ পায় না। খাদ্যাখাদ্য বিচার অহিন্দু আচরণ-কারীকেই ম্লেচ্ছাচারী বলে তা তিনি হিন্দুই হউন, ব্রাহ্মই হউন, আর মুসলমানই হউন। অধুনা ম্লেচ্ছাচারী হিন্দুই অধিক। সুতরাং এখন ম্লেচ্ছ বলিলেই মুসলমানকে বুঝায় না।

এই ব্রজকাহিনীর লেখক 'যাবনিক' কথায় মুসলমানের যত মনঃপীড়া দিয়াছেন যদি ঝগড়া করিতে হয় তবে বলিতে পারা যায় তিনি 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাগপাশের ভীষণ পেষণে'র দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির এবং "জাতিভেদের অনুচিত ক্লৈব্যে"র দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু জাতির ততোধিক মনঃপীড়া দিয়াছেন। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদকযুগল ব্রাহ্মণ। কৈ তাঁহারা ত কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আজ ব্রজকাহিনীর লেখক "মুসলমানদিগের প্রলোভন, প্ররোচনা বা প্রপীড়নে" না লিখিয়া "যাবনিক প্রলোভন" আদি লেখায় যদি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের অন্তরায় ঘটিতেছে! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় 'নারায়ণে' বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা (ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে) অধিক কঠোর কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকায় দীর্ঘ প্রতিবাদ হয়, কিন্তু তজ্জন্য হিন্দুদিগের সহিত মিলনের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই কিম্বা সাহিত্য-সম্মিলনে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার কথাও উঠে নাই।

সংসারে ভালমন্দ লোক থাকিবে, বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকও থাকিবে, ইহার মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া সাহিত্য-সম্মিলন ক্ষেত্রে রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, নিষ্ঠাবান্ ম্লেচ্ছাচারী নির্ব্বিশেষে মিলিতে হইবে। বন্ধুবর মৌঃ ডাঃ আবদুল গফুর, মহম্মদ কে চাঁদ, মৌঃ মজাম্মল হক্, মৌঃ আবদুল লতিফ, মৌঃ খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ, প্রভৃতি সাহেবান্ যেমন উদার

হৃদয় লইয়া সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন, তেমনই আরও সকলকে আহ্বান করুন। হৃদয় উদার করিলে কোথাও দোষ দেখিতে পাইবেন না, আর যদি দোষ দেখিব ইচ্ছা করেন তবে সম্মিলনের শতদোষ দেখিতে পাইবেন। আমি ছয় বৎসর ধরিয়া সম্মিলনে যোগদান করিতেছি, কত অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়াছি কিন্তু গৃহে আসিয়া সব বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিই, আবার সম্মিলনে যাই।

মতিমালা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

কি জানি কোন্‌দিনের কোন্ দুর্ব্বলতার মূল্য দিবার জন্য পিতা আমার কণ্ঠে সেই "মতিমালা" পরাইয়া দিলেন। আমাকে তিনি বলিলেন—"বাবা ওস্‌মান্ তুমি জান গনিমিঞা আমার বাল্যবন্ধু। তাঁর কাছে বহুদিন আমি প্রতিশ্রুত যে তাঁর কন্যা মতিবিবি আমার পুত্রবধূ হবেন। বাবা কথার নড়চড় আমাদের বংশে হয় নি।" পিতার সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের প্রতিশ্রুতির জন্য আমাকে বংশমর্য্যাদা রাখিতে হইয়াছিল—মতিবিবির পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের পর উভয় বন্ধুতে বলিয়াছিলেন—"বাবা তোমার গলায় মতিমালা দুলিয়ে দিলাম, খোদাতালা তোমাদের দু'জনকে সুখী করবেন।"

কিন্তু আমার উদ্দাম যৌবনের উন্মত্ত বাসনারাশি সে মতিমালায় পরিতৃপ্ত হইল না। কোথায় সেই আজন্ম-কল্পিত হুরীর মত রূপ, কোথা সেই লাবণ্যমাখা কান্ত দেহ আর কোথা বা সেই বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর! মনে মনে যে রূপসীর কমকণ্ঠে প্রণয়ের প্রীতিহার পরাইয়া দিয়াছিলাম, সে মানস-প্রতিমার সঙ্গে মতিমালার কোনও সৌসাদৃশ্য ছিল না। আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে মনে মনে সকলেই আদর্শ সঙ্গিনী আঁকিয়া রাখে, তাই যৌবনের দ্বারে আসিয়া আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। জমিদারের ছেলে, পিতা স্বয়ং আমাকে এত বিলাসে রাখিয়াছিলেন শেষে কি এই রূপহীনা মতিমালা পুরস্কার দিবার জন্য? পিতার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলাম

বটে কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম না, স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিলাম না। পিতা কিছু জানিলেন না, মাতা বুঝিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না, তিনি কোন কথা বলিলেন না।

(২)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের দেশের ছেলেরা প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সকলে বিদ্রূপ করিত, সকলে আমোদ করিত, ভোজ চাহিত। আমি কাহাকেও মনের কথা বলি নাই অথচ প্রাণে দারুণ অভিমান, বিষম ক্ষোভ। সেই সময় রূফকাকে দেখিলাম। য়িহুদীর ঘরের মেয়ে, পিতামাতা দরিদ্র কিন্তু রূফকার রূপের সীমা ছিল না। আমার কল্পনার সুন্দরীর মত সুষমা-মণ্ডিতা না হইলেও রূফকা রূপসী। রূফকাকে আশ্রয় করিয়া যৌবন নিজেই যেন গর্ব্বিত। কি সুঠাম দেহ, কি সুন্দর টানা টানা চোখ, কি কমনীয় রূপ! তাহাকে দেখিলে আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিতাম, আমার মনে অদম্য বাসনা জাগিত যে সেই রূপলাবণ্য আমার নিজস্ব করি, চিরদিন সে সৌন্দর্য্য কেবল আমিই উপভোগ করি। আমি কখনও রূফকার মনের পরিচয় পাই নাই, তাহার রূপের কলসীর অভ্যন্তরে গরল আছে কি সুধা আছে কখনও সে কথা বিচার করিবার জন্য তিলার্দ্ধ সময় নষ্ট করি নাই। এই যুবতীর রূপ আমাকে যতই উন্মত্ত করিতে লাগিল মতি-বিবির উপর আমার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার মাত্রা তত অধিক পরিমাণে বাড়িতে লাগিল।

বেশীদিন প্রাণের মধ্যে অগ্নি পুষিয়া রাখিতে পারিলাম না। বন্ধু বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিলাম। মুসলমানেরা বলিল—য়িহুদী শয়তানের জাত, রূফকাকে নিজস্ব করিলে বংশমর্য্যাদা লুপ্ত হইতে পারে। হিন্দুরা বলিল—রক্তের মেশামিশি বড় ভাল না। উহাকে বিবাহ করিলে আমাদের যে সন্তান সন্ততি হইবে তাহারা দুশ্চরিত্র হইবে, পিতামাতা উভয় জাতির কেবল দোষই পাইবে, কোনও গুণ পাইবে না। আমি এ সকল জাতীয় বিদ্বেষকে চিরদিন ঘৃণা করিতাম। আমার ধর্ম্ম উদার, আমার ধর্ম্ম জাতি বিচার গ্রাহ্য করে না। আমি এ সকল সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিলাম না। মানুষের প্রধান উপভোগের সামগ্রী রূপ এবং গন্ধ। আমি অর্থদানে রূফকার পিতামাতাকে বশীভূত করিলাম। তাহাকে পবিত্র কলমা পড়াইলাম! তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে কলিকাতার বাসার অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিলাম।

(৩)

আমার গুপ্ত-বিবাহের কথা কেহ জানিত না। কেবল কলিকাতার দুই একটি বন্ধু জানিত। দুর্গাপূজার ছুটিতে বাটী যাইতে হইল। পড়া শুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া ওজর করিলাম, কলিকাতায় থাকিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পিতা কোনও আপত্তি শুনিলেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি বুড়ামানুষ আর কতদিনই বা দুনিয়ায় থাকিব। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমার আম্মাজানেরও বড় ইচ্ছা তোমায় দেখিবেন। তোমার যাহাতে পড়াশুনার বিঘ্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। কিছুতেই অনুরোধ উপেক্ষা করিও না।"

পিতা সকল কথা প্রথমে অতি নরম করিয়া বলিতেন, 'কিন্তু কথা অমান্য করিলে কেহই নিস্তার পাইত না। কি মনোকষ্ট লইয়া বাটী গেলাম তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। রুফকার সঙ্গে আমি বেশী কথা কহিতাম না, তাহার সহিত কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতাম না, নাটক উপন্যাসের নায়কের মত মধুর সম্ভাষণে সময়ের অপব্যবহার করিতাম না। আমি তাহার রূপের উপাসনা করিতাম, তাহার মাংসপিণ্ড, তাহার হাবভাব, চালচলনে মুগ্ধ হইতাম। তাহার নিকট হইতে নয়ন-জলে বিদায় লইলাম। সে হাসিল, বলিল—"চিরদিনত আমায় দেখ্‌তে পাবেন তবে এত হা হুতাশ করছেন কেন?" সেই কথাগুলা শুনিয়া একবার মাত্র সন্দেহ হইয়াছিল—তবে কি রুফকা আমার প্রণয়ের মূল্য বুঝে না? কিন্তু তখনি চমক্ ভাঙ্গিল। ভাবিলাম তাহাতে আসে যায় কি? আমি ত বাস্তবিক উহার অন্তঃকরণ ক্রয় করি নাই বা সেদিকে চেষ্টা করি নাই। আমি উহার রূপে মুগ্ধ হইয়া উহার রূপ ক্রয় করিয়াছি, যাহাতে উহার রূপ অক্ষুণ্ণ থাকে—আমার বিধিমতে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মন জয় পরে হইবে।

মনকে দৃঢ় করিলাম। কিন্তু মনের উপর একেবারে আধিপত্য অসম্ভব। সে দীপ-শিখার নিকট হইতে যতই দূরে চলিলাম, মনের অন্ধকার ততই তাল পাকাইতে লাগিল। অনেক বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। গৃহে যাইতেছি, রুফকাকে ত্যাগ করিয়া, হৃদয়ের ভোগময়ী লালসাকে দমন করিয়া সেই কুরূপার সঙ্গলাভ করিতে! এ চিন্তায় বড় বেশী কষ্ট হইতে লাগিল। আবার মাঝে মাঝে আশা হইতে লাগিল। পড়া শুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া হয়ত পিতা মতিকে গৃহে আনিবেন না।

কিন্তু গৃহে গিয়াই সংবাদ পাইলাম আমার সন্তোষের জন্য স্নেহময়ী জননী মতিবিবিকে গৃহে আনিয়াছেন।

(৪)

তারের সংবাদ পাইলাম—রূফকা পীড়িতা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বহুক্ষণ বাগানে বসিয়া রহিলাম। মাথার উপর কত দোয়েল ডাকিয়া গেল, কত পাখী কাকলী করিল, কত পাখী চোখের উপর নাচিল, আমার প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। বাগানে বড় বড় গোলাপ ফুটিয়াছিল, তাহাদের কান্তরূপে, মধুর সুবাসে আজ আমার কোন আনন্দ হইল না। প্রাণ গুমরিয়া উঠিতেছিল, সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল উড়িয়া গিয়া সুন্দরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, তাহার যন্ত্রণার উপশম করিবার চেষ্টা করি।

এক ঘণ্টা বাদে আবার তার আসিল—"রূফকা মরিয়াছে।"

রূফকা মরিয়াছে? শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ ছুটাছুটি করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল—রূফকা মরিয়াছে। সেই সোণার স্নেহলতা প্রাণহীন, সেই সৌন্দর্য্য চিরদিনের জন্য ধরণীর অন্ধকার গর্ভে শয়ন করিয়া থাকিবে, আর আমার জন্য জাগিবে না, আর তাহার মাদকতায় আমাকে উন্মত্ত করিবে না।

রূফকা মরিয়াছে—এ সংবাদ সকলে শুনিল। পিতা জানিলেন রূফকাকে, মাতা জানিলেন, গোলাম নফর, খানসামা বাবুর্চি সকলে জানিল, সকলে বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিতে লাগিল। আর আমি কাহারও নিকট আমার বিবাহের কথা গোপন করিলাম না। চিরদিনের জন্য সে কুসুম শুকাইয়াছিল, চিরদিনের জন্য সে হিমাকর অস্ত গিয়াছিল। কিন্তু এখনও তো সে রূপরাশি একবার দেখা যায়, এখনও সে ললিত দেহের স্পর্শসুখ অনুভব করা যায়। সমাধির পূর্ব্বে তাহাকে একবার দেখিব—শেষ দেখা। গৃহ হইতে কলিকাতা পঁহুছিতে তিন দিন সময় লাগিবে। এ তিন দিন যেন তাহার সেই স্বর্ণবপুর সমাধি না হয়। আমি সেই মর্ম্মে তারে সংবাদ পাঠাইলাম।

(৫)

"কই রূফকা কোথা? আমার রূফকা কোথা? আমার সোণার রূফকা কোথা?"

তাহার জননী তারস্বরে কাঁদিতেছিলেন ও শিরে করাঘাত করিতেছিলেন। তাহার পিতাও অশ্রু মোচন করিতেছিলেন—নীরবে। আমার দাস দাসী সকলেই কাঁদিতেছিল, সকলেই আর্ত্ত! সমস্তই নিরানন্দময়! আমার সেই

বিলাস-গৃহে, আমার সেই আনন্দালয়ে! আমি বলিলাম—কান্না রাখ! একবার দেখাও, শেষ দেখা দেখাও, রূফকা কোথা, আমার হুরী কোথা?

তাহার জননী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। অতি সন্তর্পণে গৃহের দ্বার খুলিল—আমার বিলাস-গৃহের দ্বার, আমার সুরভিভরা কুঞ্জগৃহের দ্বার! ছিঃ ছিঃ কি পূতিগন্ধ! কি ভীষণ বিড়ম্বনা!

ভাগাড়ের গন্ধ এত কদর্য্য নয়। তিনদিনে শব গলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। কি জঘন্য পূতিগন্ধ!

তাহার পর রূফকাকে দেখিলাম, ছিঃ ছিঃ কি প্রবঞ্চনা! এ কখনই রূফকা হইতে পারে না। চক্ষু মুদিয়া রূফকা যখন নিদ্রা যাইত, যখন ধীরে ধীরে তালে তালে তাহার বক্ষঃস্থল উঠিত নামিত, তখন তাহার সুকুমার দেহ কি অপরূপ শোভা ধারণ করিত! আর আজিকার নিস্তেজ প্রাণহীন শ্বাসহীন জড়পিণ্ড যেমন দুর্গন্ধময় তেমনি কুরূপ! রূপের মোহে রূফকাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, রূপের মোহে তাহাকে চিত্রের মত গৃহে সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে শবদেহে সে রূপের ত' কিছু অবশিষ্ট ছিল না। প্রাণে ভীষণ ঘৃণা আসিয়াছিল, নাকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, প্রতি মুহূর্ত্তেই পলাইবার বাসনা বলবতী হইতেছিল। তবু একবার ভাবিলাম ইহাকে স্পর্শ করিব। ইহার কুসুম অঙ্গের স্পর্শে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ উপভোগ করিতাম, তাহার আলিঙ্গনে প্রাণে যে আনন্দের যে তৃপ্তির উৎস উঠিত, সে সুখ, সে আনন্দ, সে তৃপ্তির স্মৃতিতে বাস্তব জগতের পূতিগন্ধ লোপ পাইল, বিভীষিকা মুখ লুকাইল। আমি আগ্রহে তাহার সেই চম্পক কলিকার মত আঙ্গুল গুলা ধরিলাম! সর্ব্বনাশ!

কি শীতল! কি ঘৃণ্য! পূতিগন্ধটা বহুগুণ বাড়িল, সেই লোল মাংস আরও বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। ছিঃ ছিঃ, এতদিন কি জড়ের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি! কে আগে জানিত এত সুন্দর দেহেরও এই পরিণতি হইবে। হাত পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে মনে ভীষণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। গৃহের আসবাব সরঞ্জম নাচিতে লাগিল, প্রত্যেক দ্রব্য দ্বিগুণ হইল। শবটা দ্বিগুণ! গলিত লোল অঙ্গ দ্বিগুণ—জঘন্য আকার ধারণ করিল। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া সেই পূতিগন্ধময় নশ্বর দেহের পদতলে পড়িয়া গেলাম।

(৬)

মাঝে মাঝে বিকারের উপশম হইত, জ্ঞান আসিত। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া দেখিতাম—মতিবিবি। যখনই চোখ চাহিতাম তখনই তাহার সতৃষ্ণ কাতর

চক্ষু দুইটি দেখিতাম। অমনি চক্ষু মুদিতাম। আবার জ্বরের প্রকোপ বাড়িত, সংজ্ঞাহীন হইতাম।

দারুণ তৃষ্ণা! একটু সংজ্ঞা হইয়াছিল। ঘরের ঘড়ি বাজিল গণিলাম—এক দুই তিন। আমার ঘড়ি! গৃহে দীপ জ্বলিতেছিল, চক্ষু চাহিলাম, আমার গৃহ। কবে বাটী আসিলাম? ললাটে ধীরে ধীরে কে পাখা বাতাস করিতেছিল? বেশ আরাম হইতেছিল। চক্ষু মুদিয়া বলিলাম—জল।

বাতাস বন্ধ হইল। কাপড়ের খস্‌খসানির শব্দ হইল, কলসীর জল ঢালা শব্দ হইল। কপালে বেশ শীতল কোমল স্পর্শ অনুভব করিলাম। কাণে শব্দ গেল—হাঁ কর।

শীতল স্পর্শ—শীতল কিন্তু প্রাণহীন নয়। এমনি স্পর্শ তাহার ছিল—আবার মাথায় রক্ত ছুটিল। তখনও সংজ্ঞাহীন হই নাই। নিজের মনে বলিলাম, রূপের সেই শেষ, ক'দিনের রূপ।

সে ধীরে ধীরে বলিল—জল খাও, আমার রূপ নেই!

চক্ষু চাহিলাম। কথাগুলা মাথায় ঘুরিতে লাগিল—রূপ নাই! চক্ষু চাহিলাম—না সে রকম রূপ নাই কিন্তু—জ্ঞান লোপ পাইল।

এখন একটু একটু জ্ঞান হয়। যখনই জ্ঞান আসে তাহাকে দেখি—সে ব্যথিতা, সতৃষ্ণা-নয়না, কাতরা!

একদিন বলিলাম—তোমার ঘুম হয় না?

সে চোখ মুদিল। বলিল—তুমি আরাম হও। খোদা ঘুমাবার দিন দেবেন।

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে চক্ষু সরাইল। ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আমি বলিলাম—মতিবিবি রূপ ক'দিন থাকে?

সে বলিল—বেশী দিন না। স্থির হও। বাতাস ক'রব?

আমি স্থির হইয়া তাহাকে দেখিলাম, তাহার ছিল রূপ—ইহার আছে গুণ। কিন্তু রূপ বড় উন্মাদক।

কবিরাজ মহাশয় আসিলেন। সে সময় আমার জ্ঞান হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—বাবা! এবার তুমি সেরে উঠ্‌বে। বেশী কথা—

আমি বলিলাম—সে আপনার দয়া।

তিনি বলিলেন—নারায়ণের দয়া। আর এই আমার মা লক্ষ্মীর সেবায়। আহা! মা'র আমার আহার নিদ্রা নেই!

আমি চাহিলাম—তাল পাকাইয়া কাপড়ের বস্তার মত মাথার শিয়রে বসিয়াছিল—মতিবিবি!

বৃদ্ধ কবিরাজ! ধর্ম্মপ্রাণ! তিন পুরুষ তাঁহাদের সহিত আমাদের বংশের সম্বন্ধ। তিনি সমস্ত জানিয়াছিলেন, সমস্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি পিতার অন্তরঙ্গ—পিতার নিকট সাক্ষাৎ ক্ষমাভিক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইহার নিকট যাহা বলিব পিতা তাহা শুনিবেন।

আমি বলিলাম—কবিরাজ মহাশয় একটা ভুল—

তিনি বলিলেন—কিছু না বাবা কিছু না। না ঠেকলে কি শেখে। এখন বুঝ্‌বে রূপের চেয়ে গুণ কত বড়—রূপ দেহের সঙ্গে শ্মশানে যায়, গুণ চিরদিন থাকে।

বৃদ্ধ আমার প্রলাপগুলা শুনিয়াছিলেন। আমি চোখ মুদিলাম।

যখন চক্ষু চাহিলাম, শিয়রে বসিয়া একাকিনী—মতি।

আমি বলিলাম—মতি।

সে বলিল—জল খাবে?

আমি তাহার হাত ধরিলাম, বলিলাম—মতি গুণ চিরদিনের। কি বল মতিমালা?

আমার ললাটে তাহার এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

আমি বলিলাম—মতিমালা! তুমি চিরদিন আমার কণ্ঠে দুল্‌বে, আমার শক্তি নাই। মতি আমায় তুমি বাঁচালে।

আমি তাহার হস্ত চুম্বন করিলাম। বিবাহের পর এই প্রথম চুম্বন। হাত ছাড়াইয়া মতি ঘরের বাহিরে পলাইল। বোধ হয় এই সে প্রথম রোগশয্যা ছাড়িয়া বাহিরে গেল।

ভাষা-বিভ্রাট।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

ভাষা-বিভ্রাটের কি একটা মীমাংসা সম্ভবপর নয়? যাঁহারা দেশে "একটা নূতন কিছু" করিবার জন্য অভাগিনী ভাষা-জননীর মুণ্ডপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অনেক বুঝাইয়াছি, মাতৃ-ভাষার মঙ্গলের জন্য মাঝে মাঝে অনেক সাময়িক ও সংবাদপত্রে তাঁহাদিগকে অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে, কিন্তু

তাহাতে কোনও ফল ফলিল না। 'সবুজ-তন্ত্র' আপনার জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য, আপনার পথে চলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক আছেন, প্রতিভাবান লোক আছেন। স্যর রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং তাঁহাদের পৃষ্টপোষক। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে তাঁহাদের মাল কাটিতেছে, তাঁহাদের পুস্তক বিক্রয় হইতেছে। শ্লেষ, ব্যঙ্গ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা 'সবুজ-বাঙ্গালা' চালাইতে বদ্ধ-পরিকর।

আমরা বলিতেছি আমাদের বাঙ্গালা বিশুদ্ধ, তাঁহারা বলিতেছেন তাঁহাদের ভাষা খাঁটি আধুনিক বাঙ্গালা। এদিকে "প্রবাসী" বুঝিতেছেন "পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে" সুতরাং "প্রবাসী" স্বরবর্ণে আ-কার, ই-কার সংযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একদল যুক্ত অক্ষর উঠাইয়া দিয়াছেন। ভাল কথা! এতদিন বাঙ্গালা সখের ভাষা ছিল, কেবল নাটক নভেলের ভাষা ছিল, এরূপ বিভিন্নতায় কাহারও কোনও অনিষ্ট হইত না। আমাকে একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, 'সবুজ-ভাষা' যাঁহারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহারা ব্রাহ্ম। এদেশে হিন্দুর বাঙ্গালা মুসলমানের বাঙ্গালা হইতে পৃথক। তাই উহাঁরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক ভাষার সৃষ্টি করিবার জন্য কালাপাহাড়ি ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

অবশ্য কথাটা হাসির বটে। কিন্তু এখন হইতে এ বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি না হইলে পরে ঐ বৈষম্য বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির অন্তরায় হইবে। স্যর আশুতোষ প্রভৃতি মনীষির অনুগ্রহে এখন বাঙ্গালা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় অবধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষার আদর হইবে। সুতরাং বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার রূপ এখন নির্দ্ধারিত না হইলে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটিবে। আমি সেদিন মাট্রিকুলেশনের বাঙ্গালা পরীক্ষকের তালিকা দেখিতেছিলাম। তাহাতে 'সবুজ-তন্ত্রের' সেবক অন্ততঃ দুই জনের নাম দেখিলাম। যে সকল পরীক্ষার্থী যুবক তাঁহাদের নূতন ঢঙ্গের ভক্ত, তাহাদের কাগজ অপরের হস্তে পড়িলে উহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। আবার 'সবুজ-ভাষা'র লেখকদিগের ভাগে যে সকল কাগজ পড়িবে সেগুলি যদি তাঁহারা আপনাদের অভিরুচি-অনুসারে পরীক্ষা করেন তাহা হইলে কিরূপ বিষময় ফল ফলিবে তাহা অনুমান করা সহজ।

আমার মনে হয় এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক। একটু চেষ্টা করিলেই ভাষার রূপ-নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এ কাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের।

এ সকল বিষয় পাশ্চাত্যে যেরূপ ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সেই প্রথা অবলম্বন করিলে সাহিত্যপরিষৎ মাতৃ-ভাষার যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন।

প্রথাটা সরল। সকল সম্প্রদায়ের মেধাবী লোক লইয়া একটি রূপ-নির্দ্ধারণ কমিটি করিলেই এ বিষয়ের মীমাংসা হয়। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত কর্ম্মবীর সভাপতি লইয়া নূতন তন্ত্র, পুরাতন তন্ত্র, পণ্ডিত সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায় প্রভৃতি হইতে প্রতিনিধি লইয়া যদি আমরা এ বিষয় একটি কমিটির হস্তে ন্যস্ত করি তাহা হইলে যুক্তি, তর্ক এবং ভোটের দ্বারা তাঁহারা ভাষার যে ব্যাকরণ গড়িয়া দিবেন, যে শব্দ-কোষ অনুমোদন করিবেন, সেই ব্যাকরণ, সেই শব্দকোষই সাধারণ-গ্রাহ্য হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় তাহা গ্রহণ করিবে, দেশের সকল কার্য্য সেই ভাষায় সম্পাদিত হইবে।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন্ বিবাদ-বিসম্বাদ বন্ধ করিবার জন্য দেশের শক্তির বাহিরের কার্য্যে নিয়োগ করিবার প্রথা রাজনীতি ক্ষেত্রে বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্য-পরিষদের ভিতরের গোলযোগ মিটাইবার এই "স্বর্ণ-সুযোগ।" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ একটি কমিটি গঠন করিয়া তুলিতে পারিলে পরিষৎ এক মহৎকার্য্য করিবেন। তাঁহারা না করিলে স্বয়ং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণ এ বিষয় আন্দোলন করিলে সুফল ফলিতে পারে।

বৌদ্ধ-নীতি-সুধা।*

যাঁহারা চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় পরোপকারার্থে ছেদন ঘর্ষণ ও দহন পর্য্যন্ত অক্লেশে সহ্য করিয়া থাকেন, ঈদৃশ পুণ্যশীলগণই ইহ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

জগৎসৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুত, যেহেতু মকরপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল সমুদ্রমধ্যেই (মহামূল্য) মণিমুক্তাদির উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ (দুঃখশোকাদি-সমাকুল) এই সংসারেও বিখ্যাত পুণ্যবান পুরুষরত্ন উদ্ভূত হন।

---

* মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা ৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

লুব্ধ জনের পক্ষে স্বজনও আত্মীয় হয়না এবং কামী ব্যক্তি ধনের অনুরোধ করে না। তদ্রূপ প্রাণিগণের হিতোদ্যত দয়ালু ব্যক্তির নিজ দেহও স্নেহপাত্র হয় না।

অর্থিগণ যে প্রাণের জন্য সর্ব্বপ্রকারে দীনভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রাণই দীন-জনের উদ্ধরণেচ্ছু মহাত্মগণের পক্ষে তৃণতুল্য বিবেচিত হয়।

স্বর্গীয় অপ্সরাগণের বাহুদণ্ড দ্বারা সঞ্চালিত মনোজ্ঞ চামরকলাপ যাহার হাস্যচ্ছটা বলিয়া গণ্য হয়, এরূপ অতুল সম্পদ্ এবং কর্পূররাশির ন্যায় উজ্জ্বল ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজনক যশোগান ত্রিভুবনস্থ পুণ্যশীলগণেরই হইয়া থাকে। এ সকলই তাঁহাদের সামান্যমাত্র দানের স্বল্পমাত্র ফল বলিয়া জানিবে। দানই সকল সম্পদের নিদান।

সংকল্পপরম্পরা যেখানে বিকলাঙ্গবৎ লুঠিত হয় অর্থাৎ যেখানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাহা স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালমধ্যে কদাপি স্ফুরিত হয় না, ঈদৃশ দানরূপ কল্পদ্রুমের অতুলনীয় ফলসন্ততি ভাগ্যবান্ গণের বিভবভোগের সাধন হয়।

ক্ষীরসাগর দেবগণ কর্তৃক (মন্থনের নিমিত্ত) প্রার্থিত হইলে অতিশয় বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বহুক্ষণ কম্পিত হইয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষগণও স্বভাবতঃ ফলদানকালে কম্পিত হইয়া থাকে। পরন্তু এতাদৃশ অনির্বচনীয় ধৈর্য্যসম্পন্নও কেহ কেহ উৎপন্ন হন যাঁহারা শত শত বার অবিচলিত ভাবে দেহ দান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এবং তৎকালে তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন।

অহো, মহোৎসাহসম্পন্ন মহাশক্তিশালী ও সত্ত্বগুণের সাগরস্বরূপ দানোদ্যত শুদ্ধাত্মা জনগণের চরিত্র কিরূপ অচিন্তনীয়!

মহাত্মগণের সর্ব্বাতিশায়ী ও সত্ত্বগুণসংবলিত প্রভাবের বিকাশ এইরূপ হইয়া থাকে, যে উহা বৃহদাকার মেঘরাজিমণ্ডিত অত্যুন্নত পর্ব্বতগণকেও গৃহসোপানবৎ জ্ঞান করিয়া অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করে, জলরাশির প্রবল তরঙ্গে উদ্ধত সাগর-গণকেও গোষ্পদ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়, এবং অতি দুর্গম মহারণ্যস্থলও গৃহপ্রাঙ্গণজ্ঞানে অতিক্রম করে।

যাঁহাদের চিত্ত কুশলকার্য্যে প্রণিধান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা জন-গণকে বিমলালোকসম্পন্ন বিবেক বুঝাইয়া দেন, এবং যাঁহাদের নামোচ্চারণে লোকের ভবমোহ অপহৃত হয়, তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য।

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তাহার ঠিক অনুরূপ পরিণত ফল ভোগ করিয়া থাকে।

নিখিল কুশলকার্য্যই যাহার মূল ও কীর্ত্তিপুষ্পেই যাহার শ্রী উজ্জ্বল, সেই মনুষ্যগণের ধর্ম্মবল্লীই সমস্ত শুভফলের প্রসব করে। পাপ ও ক্লেশ যাহার মূল, সেই বিষলতাই ভ্রমনিপাত মোহ ও অনন্ত সন্তাপের হেতু।

হে জনগণ, সন্তপ্ত প্রখরমরুভূমি সদৃশ এই সংসারমার্গে তীব্রানুতাপজনক পাপ পরিত্যাগ কর ও সতত পুণ্য বর্দ্ধন কর। পুণ্যবান্‌গণের পক্ষে পবিত্র-ছায়াসম্পন্ন ও শীতল তরুতলভূমি পুণ্যামৃত দ্বারা সিক্ত হয়।

সদাশয়গণের চিত্ত অপকারীর প্রতিও কৃপাকুল, খলের প্রতিও পল্লববৎ কোমল এবং বিদ্বেষোষ্মায় প্রতপ্ত ব্যক্তির প্রতিও অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে।

অশিব বস্তুও ধন্যগণের সৎস্বভাব বশতঃ শুভ হইয়া থাকে। মূর্খগণের পক্ষে মঙ্গলও অহিতে পরিণত হয়। এইরূপ নিয়মই দেখা যায়। অর্দ্ধরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঔষধিবনের অধিকতর কান্তিপ্রদ হয়। সূর্য্যকিরণ আবার পেচক-গণের দৃষ্টিশক্তি নাশ করে।

রাজা গুণবান্ হইলে সকল প্রজাগণই নিষ্পাপ হয়; সজ্জনের উদার পরিচয় হয়; গুণিগণের গুণ থাকে; বংশমর্য্যাদার রক্ষা হয়; সমৃদ্ধি হয়; চন্দ্রতুল্য শুভ্র যশ হয়; লোকের মর্য্যাদানুরূপ ব্যবহার হয় এবং সকলের সম্পত্তিও নিরাপদ্ থাকে।

ধনরূপ মূল হইতে সমুদ্গত ও নির্দ্দোষ কামরূপ কুসুমদ্বারা উজ্জ্বল ধর্ম্মদ্রুম যদি কুনৃপতির দুর্ব্যবহাররূপ বায়ুর আঘাতে হত না হয়, তাহা হইলে লোকে তাহার পুণ্যফল ভোগ করিতে পারে।

যাঁহারা স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণহৃদয়, ও লোকের মঙ্গলের জন্য আগ্রহসহকারে সমধিক অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ প্রাণিহিতার্থে অনুকম্পাবান্ ও মহানুভাব ভব্যজনও এই ভয়াবহ ভুবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হে সাধু, অনুরাগবশতঃ তোমার এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে। কল্যাণে অভিনিবিষ্ট জনগণের চিত্ত বিঘ্নকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় না।

কোথায় তুমি যোগাবলম্বন করিয়া বিষয়াভিনিবেশকে তুচ্ছতৃণ জ্ঞানে ত্যাগ করিবে, তাহা না করিয়া এই নিন্দনীয় ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখাস্বাদের জন্য লালায়িত হইতেছ। এই দুষ্পরিহার্য্য কামমার্গ স্বভাবতই কুশলের বিনাশকারী। ইহা প্রেমানন্দের পক্ষে দুঃসহ বন্ধনরজ্জুস্বরূপ।

নন্দ, তুমি বিপ্লব করিও না। শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ না করা নিন্দনীয়। তুমি পৃথক্ জনের ন্যায় বিদ্বজ্জনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিও না।

বিবেক দ্বারা যাহাদের দোষ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ শীলবান্ বিদ্বজ্জনের বুদ্ধি অসার সুখলাভের জন্য অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

তুমি গাঢ় অনুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক জঘন্য কার্য্যে কেন আসক্ত হইতেছ।

যাহারা যোনি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া আবার যোনিতেই সংসক্ত হয়, স্তনপান করিয়া আবার স্তন মর্দ্দন করে, তাহারা কেন লজ্জিত হয় না। বড়ই আশ্চর্য্য যে তাহারা জন্মস্থানেই লয় প্রাপ্ত হয়।

সজ্জনগণ সতত জননীর জঘনে আসক্তি বর্জন করেন। ইহা কেবল সম্মোহ-মুগ্ধ পশুদিগেরই দেখা যায়।

তুমি রামারমণে অভিলাষ ত্যাগ কর ও বিরত হও। সংসারগর্ত্তে ভুজঙ্গগণই ভোগের সহিত লয় প্রাপ্ত হয় দেখা যায়।

লোকে পর্য্যন্তকালেও যাহাতে পরাঙ্মুখ হয় না, সেই জঘন্য রতি কাহার না বিরতি সম্পাদন করে।

তুমি গৃহজাল হইতে মুক্ত হইয়াছ, আবার কেন সেইখানেই দৌড়িয়া যাই-তেছ। মৃগ জাল হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তথায় প্রবেশ করে না।

তুমি বামাভিলাষ করিও না। ইহা নীলীরাগের ন্যায় তোমার হৃদয়ে সংসক্ত হইয়াছে ; যেহেতু তুমি এখনও বিরক্ত হইতে পারিতেছ না।

রতি প্রারম্ভকালে তৎকালে কাতর ব্যক্তিকে অন্ধ করে। পরে মুখ্যাঙ্গসঙ্গম সমাপ্ত হইলে জুগুপ্সার ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করে।

লোক বিষয়াস্বাদে আসক্তিবশতঃ পাপমিত্র ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক দুঃসহ দুঃখরূপ আবর্ত্তময় নরকে পাতিত হয়।

কুসঙ্গম পচা মাছ হইতে উদ্গত পূতিগন্ধের ন্যায় লেশমাত্র স্পর্শদ্বারাই লোককে অধিবাসিত করে।

কল্যাণমিত্রের সম্পর্ক সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলজনক। উহা সুগন্ধের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া মহার্হতা সম্পাদন করে।

নন্দ, এই নিন্দনীয়াকৃতি মর্কটীকে দেখিতেছ কি? এই মর্কটীও কোনও ব্যক্তির নিকট প্রিয়দর্শনা ও রুচিপাত্র।

ইহ জগতে ভাল বা মন্দ কিছুই নাই। অনুরাগই রমণীয় দেখে। যে যাহার
১০ প্রিয়, সেই তাহার নিকট সুন্দর। নন্দ তুমি পক্ষপাত না করিয়া সত্য কথা বল। এই মর্কটী ও তোমার সুন্দরীর লাবণ্যের প্রভেদ কি?

আমরা প্রার্থনা না থাকায় সৌন্দর্য্যের কিছুই প্রভেদ দেখি না। যে বস্তু প্রার্থিত হয়, তাহাই প্রার্থীর নিকট প্রিয় ও রমণীয় হয়।

আমি ইহাতে ও সুন্দরীতে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিনা। মাংস চর্ম্ম ও অস্থি জড়িত দেহে প্রার্থনা মাত্রই রমণীয়ত্ব।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সানুবাদ সরস্বতীতন্ত্রম্। সিদ্ধপুরুষ পূর্ণানন্দের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এবং তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ "তন্ত্রকল্পতরু" নাম দিয়া বিবিধ দুষ্প্রাপ্য তন্ত্রগ্রন্থ বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম গ্রন্থ "সরস্বতী তন্ত্র" সানুবাদ বাহির হইয়াছে। আমরা ইহার একখণ্ড উপহার পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। তন্ত্র শাস্ত্র, বাঙ্গালীর এক প্রধান গৌরবের সামগ্রী। কাল মাহাত্ম্যে লোকের চিত্ত হইতে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে। সামাজিক বন্ধনের দুশ্চ্ছেদ্যতা বশতঃই এখনও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে বৈদিক দীক্ষা—উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষাটার উপর অনেকেই খড়্গহস্ত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, বেদ পুরাতন হইলেও তন্ত্রটা আধুনিক। তাঁহারা পিতা পিতামহের চিরানুষ্ঠিত আচরণ পরিত্যাগ করিতে যে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, ইহা তাঁহাদের সাহসের পরিচয় বটে। দুইটা স্বকল্পিত লৌকিক যুক্তির প্রভাবে পূর্ব্বপুরুষদিগের আচারে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক আগম-নিগম সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না। একজন ধর্ম্মবিশ্বাসী কবি বলিয়াছেন,—

"কৃত্যে পূর্ব্বপরম্পরা প্রচলিতে শ্রদ্ধাং পরামাশ্রয়ন্
শ্রৌতং তন্ত্রগতং সমাচর সমৌ বিজ্ঞায় বেদাগমৌ।
তত্ত্বাতত্ত্ব নিরূপণং জড়মতে শাস্ত্রে ন তে শোভতে
রূপং তত্র পরত্র নেতি চ সখে নাজ্ঞৈঃ সন্ধীয়তে॥"

দেশের এইরূপ দুঃসময়ে পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় তন্ত্র-গ্রন্থাবলী প্রচার আরম্ভ করিয়া দেশের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই ক্ষুদ্রকায় "সরস্বতী তন্ত্র" জপযজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বি মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। অনুবাদ বিশদ ও সুন্দর। মূলে বর্ণাশুদ্ধি না থাকিলেও স্থানে স্থানে বর্ণবিন্যাসের অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইল। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়দ্বয় ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন। এই পুস্তকের মূল্য ৷৵০ আনা। পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী—এই ঠিকানায় সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট এই তান্ত্রিক গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়। ইহার পর "সানুবাদ লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র" প্রকাশিত হইবে।

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

তারাদেবী।

[শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

বৌদ্ধের সহিত তারাদেবীর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, হিন্দুতন্ত্রেও তারাদেবী "বুদ্ধেশ্বরী" "বুদ্ধমাতা" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং এই দেবীর আরাধনার যাবতীয় নিয়ম মহাচীন বাসী "বুদ্ধরূপী" ভগবান্ বিষ্ণু প্রচারিত করিয়াছেন, এ কথাও রুদ্রযামল প্রভৃতিতন্ত্রে অতিবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই কতিপয় মনীষী তারাদেবীকে মুখ্যতঃ বৌদ্ধদিগের উদ্‌ভাবিত দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং হিন্দুসমাজে ইহাঁর আগন্তুক প্রতিপত্তির আরোপ করিয়া থাকেন; অতএব ইহাঁর সম্বন্ধে আমরা আজ একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

তারাদেবীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বত্ব স্থির করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তারা কাহার? হিন্দু বলেন, ইহাঁ আমার নিজস্ব, বৌদ্ধের উক্তি কিছু জানা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসবেত্তার মতে তারা বৌদ্ধেরই নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হয়।

বৌদ্ধমত খণ্ডনপরায়ণ ভগবৎ পাত শঙ্করাচার্য্যের অগাধ তারাভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তৎপ্রণীত তারাস্তোত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, তারা হিন্দুরই নিজস্ব, কারণ বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক ভগবৎ পাদ হিন্দুর অসংখ্য দেবতা থাকিতে বৌদ্ধদেবতার স্তোত্র রচনা করিতে যাইবেন কেন? এইস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পাঠক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেরই হয়ত এমত ধারণা আছে যে, অদ্বৈতবাদী ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদীর অবলম্বন তন্ত্রশাস্ত্রে আস্থাবান্ হওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে তারাদেবীর স্তোত্র রচনা অসম্ভব। হয়ত অন্য কোনও শঙ্করাচার্য্য কৃত তারা-স্তোত্রই পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রভক্তিসম্পন্ন-ব্যক্তিবিশেষ-কর্ত্তৃক ভগবৎপাদের কৃতি বলিয়া আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি যে,

ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রসরণির একজন প্রধান পথিক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার পরম গুরু গৌড়পাদ স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্য পর্য্যন্তও সমগ্র সম্প্রদায়ই যে তন্ত্র মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র প্রতিপাদন করিব। এইস্থলে তাহার আলোচনা বাহুল্য ভয়ে উপেক্ষিত হইল।

গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য নামক এক পণ্ডিত "তারারহস্যবৃত্তিকা" নামক গ্রন্থে তারাদেবীর ভূতশুদ্ধি প্রকরণোক্ত ধ্যানের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে নিজকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনাভিপ্রায়ে ভগবৎপাদ শঙ্করকৃত স্তোত্রের উপন্যাস করিয়াছেন, এবং স্তোত্রেরও মূলীভূত শ্রুতি প্রদর্শিত করিয়াছেন। এই শ্রুতি, তান্ত্রিক বৈদিক নহে। প্রসঙ্গত ইহাও বক্তব্য যে, স্বনামধন্য কুল্লূকভট্ট মনুব্যাখ্যানাবসরে তান্ত্রিক বৈদিকভেদে শ্রুতির যে দ্বৈবিধ্য-ঘোষণা করিয়াছেন, তারারহস্য বৃত্তিকায় তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়।

শ্রুতিস্মরণাতীত কালের প্রসিদ্ধ বচনাবলী; সুতরাং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তারা-দেবীকে বৌদ্ধের নিজস্ব বলিবার কোনও সমীচীন কারণ প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে শ্রুতিপ্রসিদ্ধত্ব-নিবন্ধন শ্রুতিপরায়ণ হিন্দুরই নিজস্ব বলিয়া ঘোষণা করা সঙ্গত।

তাঁরাদেবীর ভূতশুদ্ধিপ্রকরণ-কথিত ধ্যেয়রূপের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইনি খর্ব্বাকারা, অভিনব মেঘের মত নীলবর্ণা, লম্বোদরী, ইহাঁর কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আবৃত, ইহাঁর স্তনদ্বয় স্থূল এবং উন্নত, নেত্রত্রয় গোলাকার এবং রক্তবর্ণ, জিহ্বা লম্বমান, মুখ দন্তের দ্বারা ভয়ানক, মস্তকে পিঙ্গল বর্ণ এক জটা বিদ্যমান, তাহার উপরিভাগে উভয় পার্শ্বে নীলোৎপল মালা, অতি নীলবর্ণ-নাগের দ্বারা জটাজূট আবদ্ধ, ললাটদেশে শ্বেতবর্ণ পাঁচখণ্ড অস্থি বর্ত্তমান। ইহাঁর কুণ্ডলরূপে জবাপুষ্পের তুল্য রক্তবর্ণ তক্ষকনাগ, হাররূপে অতি শ্বেতবর্ণ নাগ, এবং যজ্ঞোপবীতাকারে দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ নাগ শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইহাঁর হাত চারিখানা, তন্মধ্যে দক্ষিণদিকে ঊর্দ্ধকরে খড়্গ রহিয়াছে। ঐ খড়্গের মূলভাগ রক্তমিশ্রিত মাংসখণ্ড ভূষিত মুষ্টিনিহিত জটাজূটে সংলগ্ন। বামদিকে ঊর্দ্ধহস্তে রক্তবর্ণ নালযুক্ত কিঞ্চিদ্বিকসিত নীলোৎপল রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে অধোহস্তে বীজ-শোভিত-বৃন্ত (বাঁট) কর্ত্তৃকা শোভা সম্পাদন করিতেছে। বামদিকে অধোহস্তে ত্রিজগতের জাড্য-সমন্বিত শুভ্রকপাল (অস্থিখণ্ড) রহিয়াছে। প্রত্যেক ভুজেই ধূম্রবর্ণ নাগ-কৃত কেয়ূর, এবং স্বর্ণবর্ণ

নাগকৃত কঙ্কণ শোভা পাইতেছে। ইনি নির্ভররূপে যন্ত্রণা দিবার (চাপ দিবার) অভিপ্রায়ে শবের হৃদয়ে দক্ষিণচরণ সঙ্কুচিত ভাবে স্থাপিত করিয়া বাম চরণ শবের পাদদ্বয়োপরি প্রসারিত করিয়াছেন। কুন্দপুষ্প সদৃশ নাগের দ্বারা ইহাঁর কটিসূত্র, এবং ঈষদ্রক্তবর্ণ নাগের দ্বারা নূপুর সম্পন্ন হইয়াছে।

ইহাঁর মুণ্ডমালা শ্রীমৎপাদপঙ্কজ পর্য্যন্ত লম্বমান, মালার মধ্যে পঞ্চাশটি নরমুণ্ড রহিয়াছে। মুণ্ডগুলি সদ্যঃ ছিন্ন গলিতরুধির সংপৃক্ত, এবং কেশের দ্বারা পরস্পর গ্রথিত হইয়াছে। ইনি জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা ইহাঁর উত্তরীয় বস্ত্রকার্য্য, সম্পন্ন হইতেছে। ইনি রমণীদিগের ধারণোপযোগী সমস্ত আভরণ পরিশোভিতা! ইহাঁর মস্তকে অক্ষোভ্য ঋষি সর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবীর বদন ঈষদ্ হাস্যযুক্ত।

প্রদর্শিত অর্থ গৌড়ীয়-শঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উক্ত গ্রন্থকার ধ্যান ব্যাখ্যানে ভগবৎ পাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত স্তবেরই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নীলতন্ত্রের যে সমস্ত বচন প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন, সেইগুলিতে শরীরের নানা স্থানে সর্পবিন্যাসের কোনও উল্লেখ নাই। ভগবৎপাদকৃত স্তবে দেবীর শরীরস্থ সমস্ত নাগের নাম বিশেষরূপে কথিত হয় নাই। কিন্তু শ্রুতিতে প্রত্যেকের নাম কথিত হইয়াছে।

যথা—

জটাস্বনন্তঃ শ্রবণেচ তক্ষকো মহাদি পদ্মো হৃদি হার-ভূষণঃ
তথৈব কর্কোটকৃতোপবীতিকাং সুমেখলায়া মথদেহে বাসুকিঃ।
সশঙ্খ পালো ভুজকঙ্কনোগতঃ পদেষু পদ্মঃ ক্বিলনূপুরাশ্রয়ম্।
ভুজেষুনাগঃ কুলিকোঽঙ্গদোমতো।
ভুজোর্দ্ধ মালা মনুজাস্থিভিঃ কৃতা॥

ইহার অর্থ হইতে বুঝা যায়, জটাতে অনন্তনাগ, কর্ণে তক্ষক, হৃদয়ে মহাপদ্মনাগ হাররূপে অবস্থিত, কর্কোটনাগ উপবীতাকারে স্থিত, কটিসূত্রে বাসুকিনাগ, সঙ্খপালনাগ কঙ্কনস্থানে স্থিত, পদ্মনাগ চরণে নূপুরাকারে অবস্থিত, এবং কুলিক নাগ হস্তে বলয়াকারে অবস্থান করিতেছে।

ভগবৎ পাদকৃত স্তোত্রে বারটি শ্লোক আছে। ধ্যানানুকূল শ্রুতিতে সার্দ্ধদশ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রের বচন, এতত্রিতয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ অবলম্বন করিয়া যেমন গৃহ্যসূত্র শ্রৌতসূত্র স্মৃতি সংহিতা পুরাণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই

তান্ত্রিক শ্রুতির মৌলিকত্বে দেবতার ধ্যান স্তব এবং অধুনা দৃশ্যমান তন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে কিছু ধার করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তারাদেবীর বিবরণ অতি বিস্তৃত, ইঁহার অনেক প্রকার ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলির সহিত আবার আখ্যায়িকা (গল্প) সংসৃষ্ট রহিয়াছে। আমরা ক্রমে সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

নীল সরস্বতী।

তারাদেবীর যে কয়টি মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তি নীল-সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে তারারহস্য বৃত্তিকায় উদ্ধৃত সিদ্ধ সারস্বততন্ত্রের একটি আখ্যায়িকা পাঠে জানা যায় যে, একসময়ে হয়গ্রীব ও সোমক নামক অসুরদ্বয় দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দেবতাদিগকে কিরূপে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী মন্ত্রময়ীরূপে ব্রাহ্মণদিগের মুখে অবস্থিত আছেন। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞকুণ্ডে দেবতার উদ্দেশে হবিস্ত্যাগ করেন। দেবতাগণ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত সেই হব্য ভক্ষণে বলবত্তর হইয়া, অসুরদিগকে অনায়াসে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যদি কোন উপায়ে বাগ্দেবীকে দেবতাদিগের মুখ হইতে অপসারিত করা যায়, তবেই দেবগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ইহা স্থির করিয়া তাহারা শব্দাকর্ষনিকা দেবীর উদ্দেশে তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। দেবী তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদানে উদ্যত হইলে তাহারা সর্ব্বশব্দাকর্ষণ নামক অস্ত্রপ্রার্থনা করিল। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ঐ অস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন অস্ত্রবলে বলীয়ান্ দৈত্য-দ্বয় পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া সেই সর্ব্বশব্দাকর্ষণ অস্ত্রের দ্বারা বাগ্দেবীকে আকর্ষণ করিল। দেবী নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈত্যদ্বয়ের হস্তগত হইলেন। তখন অসুরদ্বয় দেবীকে ভীষণ বিষধর সর্পের দ্বারা বন্ধন করিয়া, পাতালপুরীতে হলাহল পূর্ণ কুণ্ডমধ্যে নিমগ্ন করিয়া পর্ব্বতের দ্বারা সেই কুণ্ড আচ্ছাদিত করিল।

অন্য দিকে বাগ্দেবীর অন্তর্ধান নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন, মন্ত্রের অভাব বশতঃ আর যজ্ঞ করিতে পারিলেন না, ইহাতে দেবগণ হব্যাভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন অসুরদ্বয় সুযোগ বুঝিয়া স্বর্গে উপস্থিত হইয়া দেবতা-

দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং দুর্ব্বল দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর ভয়ে আবার সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক পাতালপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিল।

মন্ত্রস্বরূপা, বেদময়ী বাগ্দেবী বিনিষ্ট হইয়াছেন, মন্ত্রাভাবে পৃথিবী হইতে যজ্ঞও বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত খিন্ন হইয়া বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন। অশেষমায়ানিধান ভগবান বিষ্ণু দেবতাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই মায়াবী অসুরদ্বয়ের নিকট হইতে সরস্বতীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাঠীন (বোয়াল) মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রবল বেগে সমুদ্রগর্ভ আলোড়িত করিলেন। তাঁহার মৎস্যাকার শরীর হইতে হস্ত চতুষ্টয়ের আবির্ভাব হইল।

চতুর্ভুজে সুদর্শনচক্র নন্দক খড়্গ শার্ঙ্গ ধনু ও কৌমোদকী গদা ধারণ করিয়া তিনি অসুরদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা অসুরদিগের সর্ব্বশব্দাকর্ষক অস্ত্র অপহরণ করিয়া চক্রের দ্বারা হয়গ্রীবের ও সোমকের শিরশ্ছেদন করিলেন।

ভগবান বিষ্ণু অসুর মারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সরস্বতী দেবীর উদ্ধারার্থ বিষকুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইয়া নিঃশ্বাস পবনের দ্বারা আচ্ছাদক পর্ব্বত বিদূরিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে গরুড় হলাহল পূর্ণকুণ্ড বিষরহিত করিল। তখন ভগবান বিষকুণ্ড মধ্যে চেষ্টাশূন্য মৃতপ্রায় সরস্বতী দেবীর চৈতন্য সম্পাদনার্থ নানাপ্রকার যত্ন ও মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সরস্বতী দেবী নিজ শরীর বিষজ্বালায় নীলবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন যে, আমি বিষ-কুণ্ডমধ্যে নিবেশিত হইয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব যাহাতে ক্ষণকালের মধ্যে এই নীলিমা বিদূরিত হয়, তুমি তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন কর। তৎপর বিষ্ণু বলিলেন,—হে বাক্ প্রসবিত্রি! তুমি শোক করিও না, কারণ পূর্ব্বে তুমি চন্দ্রের মত শুভ্রবর্ণ ছিলে, এখন বিষের প্রভাবে নীলবর্ণ হইয়াছ, ইহাতে আর দোষ কি? দেখ, নীলবর্ণ দেহেই নানাবিধ আভরণ শোভা পায়। মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ, অমর চক্রবর্ত্তী ইন্দ্রদেব নীলবর্ণ, জগতের জীবনদাতা মেঘ সকল নীলবর্ণ, সর্ব্বজনের অবকাশ নভোমণ্ডল নীলবর্ণ, নীলবর্ণ কলঙ্কই চন্দ্রের শোভা সম্পাদন করে। আমি স্বয়ং নীলবর্ণ, অথচ সত্ত্ব গুণের আশ্রয়; নীলবর্ণের আর দোষ কি? তুমি জগতে নীল সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা হইবে, এবং শীঘ্রই সাধকদিগকে বাক্যপ্রদান করিতে সমর্থা হইবে।

এই আখ্যায়িকা হইতে সরস্বতী দেবীর নীলতার মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাঁর দুই প্রকার ধ্যান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহাঁর বর্ণ নীল, নয়ন তিনটি, পরিধানে নীলবস্ত্র, ইহাঁর হস্তে মণিময়ী বিণা মুদ্রা এবং সুধাপূর্ণ পাত্র ধৃত হইয়াছে। চতুর্ম্মুখ দেব উদ্যত হইয়া ইহাঁর নিকট হইতে কবিতা প্রবাহ ধারণ করিতেছেন। ইনি নীলবর্ণ হংসশ্রেণীর দ্বারা শোভিত বিমানে অবস্থান করিতেছেন।

অভেদে।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

নীরব মন্দিরে মোর প্রতিমা স্থাপন করি,
পূজিতে বসিনু তা'য় পবিত্র আসন'পরি।
আবেশে নয়ন মুদি ভাবিতে তন্ময় রূপ,
অন্তরে উঠিল জাগি' অপূর্ব্ব স্বরূপ-রূপ!
প্রতিমার কণ্ঠদেশে পরাতে কুসুমহার,
সে হার পরায়ে দিনু মোহাবেশে আপনার!
স-চন্দন বিল্বদল শ্রীঘটে অর্পিব বলে,
সঁপিলাম যত কিছু আপনার ক্রোড়তলে!
পূজার অঞ্জলী দিতে প্রতিমার পদমূলে,
আপনার দু' চরণ ঢাকিয়া ফেলিনু ফুলে!
প্রণাম করিতে তা'য় সহসা গেলাম ভুলি,
প্রণমি নিজের পদে লইনু চরণ ধূলি!
অবশেষে চেয়ে দেখি হয় নাই পূজা সারা,
প্রতিমা পূজিতে একি হইয়াছি আত্মহারা!
পূজিতে প্রতিমা সে যে পূজিয়াছি আপনায়,
আপনি আপন-মাঝে লভিয়াছি প্রতিমায়!

হার জিৎ।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি এ]

(১)

সেদিন আড্ডায় গিয়া দেখি মহা তর্ক বাধিয়াছে। তর্কটা উঠিয়াছিল কলেজ স্কোয়ারে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার আলোচনা হইতে।

নৃপেণ বলিতেছিল—"পাঁচ মিনিটে মাইলদৌড়ের বাজী জেতা এ আর এমন কি কথা?"

রমেশ—"তুমি পার? পাঁচ মিনিট কেন, সাড়ে পাঁচ মিনিটে পার?"

আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। সহজে নৃপেণকে কেহ ঘাঁটাইত না—কারণ, আড্ডায় অমন তার্কিক আর দু'টি ছিল না। রমেশকে ইসারা করিলাম; কিন্তু তখন তার ঘাড়ে ভুত চাপিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল "আচ্ছা বল ত আরও দু' চার সেকেণ্ড grace দিতে পারি।"

নৃপেণ তক্তাপোষের উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—"কলেজে সাড়ে চার মিনিটে কতবার মাইলদৌড়ের প্রাইজ নিয়েছি তা জান? আমি পারিনে?"

রমেশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

"এই ত? আচ্ছা, বাজী?"

"কত, বল?"

"পঞ্চাশ টাকা।"

"এক শ'।"

"বেশ।"

"কিন্তু সর্ত্তটা কি?"

"পাঁচ মিনিটে—"

"সে কি? এই বল্‌লে সাড়ে পাঁচ?"

"আচ্ছা, তাই।"

"কবে?"

"যবে তোমার সুবিধা। আজই বল আজ, কাল বল কাল।"

নৃপেণ খানিকটা ভাবিয়া বলিল—"দেখ কলেজ ছেড়ে এই বছর পাঁচেক আদৌ দম নেই। আমাকে সময় দিতে হ'বে।"

"কোন আপত্য নাই। কত সময় চাও—এক সপ্তাহ, এক মাস,—দু' মাস—তিন মাস ?''

আমরা বিস্মিত হইলাম। রমেশ করে কি !

নৃপেণ হাসিয়া বলিল—"না, তিন মাস চাইনে, এক মাসই যথেষ্ট।"

"না, না, তিন মাসই কথা রইল। তা'তে আর তোমার বলবার কিছু থাকবে না। তিন মাস কেন, তিন বছর ধরেও চেষ্টা করলে ও হাড়ে আর হচ্ছে না।"

"আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া নৃপেণ উঠিয়া গেল।

শরৎ বলিল—'রমেশ, তুমি কি পাগল হয়েছ, টাকা কি কামড়াচ্ছে না কি ? নৃপেণকে জান না, শুধু মরচে পড়ে আছে—মেজে ঘসে নিতে কতক্ষণ ? পাঁচ মিনিট না হয় বড় জোর সওয়া পাঁচ পর্য্যন্ত সময় দিতে পারতে ; কিন্তু সাড়ে পাঁচ—পনের সেকেণ্ড কি কম সময় ?"

"সময় বিশেষে নয় বটে ; আচ্ছা, দেখতেই পাবে। কিন্তু একথা তোমাকে বলে রাখি, সে যদি সত্যিই বাজী জিততে চায়, তা হলে তাকে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা এই তিন মাসের মধ্যে বুঝতে হবে—কিন্তু সেকথা সে বুঝবে কি ?"

(২)

রমেশের কথার মর্ম্ম পরদিনই বুঝিতে পারিলাম।

বৈকালে নৃপেণ তার মোটরে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। দেখা হইতেই বলিল—"মাঠের দিকে চল, আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক। তোমাকে কিন্তু আমার গুরুমশাই হতে হবে।"

"আমি ? এই বিশালবপু নিয়ে দৌড়ের গুরুমশাই ? রক্ষা কর ভায়া।"

"ভয় নেই। নিন্দা খ্যাতি তোমায় কিছু অর্শাবে না। কি আমার করা উচিত না উচিত সব তোমায় শিখিয়ে দেব, তুমি শুধু সেই মত আমায় হুকুম করে যাবে। বুঝেছ ?"

আমরা ততক্ষণে মাঠে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেণ্টপল গির্জ্জার পশ্চিম দিকের জায়গাটা অনেকটা নির্জ্জন। নৃপেণ কোট জুতা ছাড়িয়া গজ ফিতা বাহির করিয়া দুইটা গ্যাস-পোষ্টের ব্যবধান মাপিয়া লইয়া আন্দাজে সিকি মাইল পথ স্থির করিয়া বলিল—"এইটে বার চায়েক হলেই হ'বে। নাও, এখন ঘড়িটা খোল।"

দুর্দ্দান্ত ছাত্রের কবলে নিরীহ মাষ্টার মশাইয়ের মত আমি ঘড়িটা খুলিয়া

কাঁটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম—নৃপেণ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রথম সিকি মাইলে ৭০ সেকেণ্ড লাগিল, দ্বিতীয়ে ৯০; কিন্তু তখনই সে হাঁফাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া আমি বলিলাম—"আজ এই যথেষ্ট, থাক্।"

তার কিন্তু তখন রোখ চাপিয়াছে—একবার আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল—সেবারে লাগিল ১২০ সেকেণ্ড;—কিন্তু তখন তার দম একেবারে গিয়াছে, ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া সে হাঁফাইতেছিল। আমি নিকটে যাইতেই সে বলিল—"কতক্ষণ লাগল, দেখেছিলে?"

"বিলক্ষণ। তা নইলে কি ঘাস খাচ্ছিলাম? যাই হোক্ ভায়া যে ভাবে ক্রমশঃ চলছিলে তাতে—তোমার মন-রাখা কথা বল্‌ছিনে—মিনিট আষ্টেকের কিছু কমে বোধ হয় মাইলটা পূরা করতে পারতে।"

নৃপেণ দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হস্তে আমাকে শাসাইয়া উঠিল, আমি সভয়ে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিলাম। এমন সময় পাশাপাশি দুইটা বড় গাছের অন্তরাল হইতে কয়েকজন লোক খিল খিল করিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম, রমেশ তার মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য আমরা সেদিকে আর তাকাইলাম না। সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, সোজাসুজি মোটরে আসিয়া উঠিলাম। তখন নৃপেণ শান্ত হইয়াছে। ধীরভাবে বলিল—"আচ্ছা তোমার ঘড়িটা কি ঠিক যায়?"

"ঘড়ি? না, বেশী চলে,—দু'বার সারিয়েছি—তবু ঠিক হ'ল না।"

"তাই বল। আমিও তাই ভাবছিলাম। তা নইলে,—আট মিনিট—বল কি?"

আমি ঘড়িটা খুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম—"হাঁ, তাই বটে। রোজ প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড করে কমে, সে ত্রিশ সেকেণ্ডকে যদি ২৪ দিয়ে ভাগ দাও তা হলে ঘণ্টায় হ'ল ১$\frac{১}{৪}$ সেকেণ্ড, মিনিটে তা হলে—"

সহসা নৃপেণের কনুইয়ের ধাক্কা খাইয়া আমার পরিহাস-উৎস অৰ্দ্ধপথেই মিলাইয়া গেল। নৃপেণ গোঁ হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল, আমি মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিতেছিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নৃপেণ তাহার গতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বলিল—"ফূর্ত্তির ঝোঁক অল্প সময়ে মানুষকে এমন অপদার্থ করে তোলে আগে আমার ধারণাই ছিল না। যাই হোক্, এখনও ঢের সময় আছে। মনে রেখো শুধু নামে 'গুরুমশাই' হলে চলবে না, কাজেও গুরুগিরি করতে হবে।"

"ঐ ত ফ্যাসাদ। আচ্ছা বলে দাও, কি কি করতে হবে।"

"প্রথমতঃ, বোতলের সম্পর্কটি আমায় ত্যাগ করাতে হবে।"

"সেটা ত আগে করা উচিত। কিন্তু, পারবে কি?"

"তুমি হুকুম কর। তামিল করা আমার হাত।"

"আচ্ছা আমি হুকুম কর্‌ছি। তার পর?"

"দ্বিতীয়তঃ, সন্ধ্যায় শোয়া, ভোরে ওঠা।"

"আচ্ছা তাই করবে।"

"তৃতীয়তঃ, ডাম্বেল বা মুগুর ভাঁজা অভ্যাস করা—তাতে দম বাড়্‌বে।"

"ভাল, তাই করবে। আর কি?"

"প্রত্যেক দিন আমাকে দৌড় করাবে। যেমন যেমন দম বাড়্‌বে—তেম্‌নি রোজ খানিকটা করে বেশী ছোটাবে।"

"এই ত সবই ত তুমি নিজে জান, তবে অনর্থক আর এ বেচারাকে ধরে টানাটানি কেন?"

"তুমি বোঝ না, একটা ঠাঠ বজায় রাখতে হয়—নইলে চাড় হয় না। ছেলেবেলায় একা একা মার্ব্বেল খেলনি—বুড়ী সাক্ষী রেখে? তুমিও আমার সেই ধর্ম্ম-বুড়ী।"

ইহার পর হইতে নৃপেণ রীতিমত কসরৎ আরম্ভ করিল। তবে সে কাজে সমস্ত সময় দিতে পারিত না। পিতার কারবার 'দেখে শোনে' বলিয়া বাহিরে একটা গুজব ছিল—সেইজন্য লোকদেখানি হিসাবে মাঝে মাঝে তাহাকে পিতার অফিসে গিয়া বসিতে হইত। কিন্তু এখন হইতে দুপুরবেলা পেলিটিতে না গিয়া, বাড়ী হইতে খাবার আনাইয়া অফিসে বসিয়াই টিফিনটা সারিতে লাগিল; এবং আড্ডার সময়টা প্রায়ই অফিসে কাটাইতে লাগিল। যেখানে দশজন লোক খাটে, সেখানে কেহ বেকার বসিয়া থাকিতে পারে না—সুতরাং নৃপেণ ক্রমে ক্রমে অফিসের কাজও শিখিতে আরম্ভ করিল।

(৩)

এদিকে কিন্তু 'গুরুমশাই' হিসাবে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছিল। 'গুরুগিরি' আমার ঠিক হইতেছিল না, আমিও বুঝিতেছিলাম, নৃপেণও বলিতেছিল। লোভে পড়িয়া কোন দিন হয়ত গুরুপাক কিছু খাইয়া ফেলিল, বা রোখের মুখে ব্যায়ামের মাত্রা হয়ত বাড়াইয়া ফেলিল—অমনি তম্বিটা পড়িল আমার উপর। অথচ খাদ্যাখাদ্য বা ব্যায়ামের ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে

আমার আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। সে কথা বলিয়া আমি কাটিয়া পড়িবার মতলব করিলে অমনি কিন্তু সে রুখিয়া আসিত—পিঠ বাঁচাইবার জন্ত আমি চুপ করিয়া যাইতাম।

কিন্তু নৃপেণ দ্রুত উন্নতি করিতেছিল। এক মাস পরে হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহার গতির পরিমাণ—ছয় মিনিটে মাইল। রমেশের এক শত টাকা এক এক করিয়া খসিতেছিল।

দুই মাস পরে একদিন নৃপেণ পুরা মাইল দৌড়াইবার সঙ্কল্প করিল। আমি ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম—প্রথম সিকি মাইল ৬০ সেকেণ্ড, দ্বিতীয় ৭৫—নৃপেণ আর দৌড়াইল না। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"আমাকে থামালে না কেন?"

"কেন? বেশ ত চলছিলে"—

"বেশ চলছিলাম। দমটা বেশ নষ্ট করতে বসেছিলাম বল। খুব গুরুগিরি করছ যাহোক্। রমেশের সঙ্গে সড় থাকলেও এর বেশী খারাপ করতে পারতে না।"

আমি রাগিয়া উঠিলাম, আরও বুঝিলাম এই আমার একমাত্র সুযোগ। ঘড়িটা বন্ধ করিয়া বলিলাম—"তাই যদি ভাব, তবে আজ থেকে এ গুরুগিরি থেকে রেহাই নিলাম।"

"নাও দেখি কেমন সাহস তোমার। তা হলে তোমার হাড় একখানি সোজা রাখব না তা মনে থাকে যেন।"

আচ্ছা খপ্পরে পড়েছিলাম যা হোক্। কিন্তু নৃপেণের সে ভাব দেখিয়া প্রতিবাদ করিতে সাহসে কুলাইল না।

পরদিন রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম—"ভায়া, আর কেন, ও টাকা তোমার জলে গেছে। ছেড়ে দাও, আমিও অব্যাহতি পাই।"

রমেশ হাসিয়া উঠিল। আমি নোট বহিখানা বাহির করিয়া নৃপেণের ক্রমোন্নতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, সে বলিল—"ওসব বাজে কথা, শেখবার মুখে অমন অনেক হয়, আবার আসল দিনে সব উল্টে যায়, তাও অনেক দেখেছি।"

আমি রাগিয়া উঠিলাম। "তোমার দুর্ব্বুদ্ধি—তুমি যে এতে হারবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

"তাই না কি!"

"নিশ্চয়ই, বাজী রাখতে চাও ?"

"অবশ্য। কত ধরবে ? এক শ ?—বেশ !"

এ পাগলের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ কি ? যাই হোক্ এ পড়ে-পাওয়া একশ টাকা—মন্দ কি ? মনে মনে খুসী হইলাম।

তার কয়েক দিনের পর নৃপেণের গতির পরিমাণ দেখিলাম—৫৷৷৹ মিনিটে মাইল। নিজের প্রাপ্য একশ টাকার সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইলাম।

নৃপেণ বলিল—"আগেকার দম নেই তা জানি, কিন্তু ৫৷৷৹ মিনিটে পারব সে বিশ্বাস এখন হচ্ছে। কথাটা টাকার জন্য নয়—কিন্তু জিদ বজায় রাখতে হবে, মুখ রক্ষা করতেই হবে।" তার পর হাসিয়া বলিল—"আজ বাবার মুখে হাসি দেখলাম—৪ বছর পর। তাঁকেও কিন্তু এক হিসাবে আমার এ বিষয়ের গুরুমশাই বল্‌তে হবে।"

"কিসে ?"

"আমার অফিসের টেবিলে প্রতিদিন স্তূপাকার করে কাজ চাপিয়ে। অফিসে যখন বসতেই হয়, তখন চুপচাপ বসে থাকা বড় কষ্টকর। বিশেষতঃ, কাজ নিয়ে একটা একাগ্রতা আসে—সেটা আমার এই ব্যায়ামচর্চ্চায় কম সাহায্য করে নি।"

ধার্য্য দিনের সপ্তাহ পূর্ব্বে দেখিলাম—নৃপেণের দম আট মিনিট হইতে পাঁচ মিনিটে নামিয়াছে। আর সন্দেহ ছিল না—কিন্তু রমেশ তবু দমিবার পাত্র নয়। তাহার মুখে এক কথা—"আমার ন্যায় হতেই পারে না।" কেহ তর্ক করিতে আসিলে—তাহার সহিত নূতন করিয়া বাজী ধরিতে লাগিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—"বেজায় টাকা কামড়াচ্ছে যে হে ! কিছু গুপ্তধন টন পেয়েছ না কি ?"

"সে কথায় তোমার দরকার কি ? আমি বল্‌ছি—আমি হারতেই পারি না। আরও একশ' ধরতে চাও ?"

"নিশ্চয়ই।"

দু' দু'শ টাকা—বিনা চেষ্টায় ! আমি গম্ভীরভাবে গোঁফ জোড়াটায় একবার মোচড় দিয়া লইলাম।

(৪)

ধার্য্য দিনে প্রাতঃকালে ঘোড়দৌড়ের মাঠে সকলে উপস্থিত হইলাম। নৃপেণ গেঞ্জি ও পাজামা পরিয়া লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল। তা'র পূর্ব্ব চেহারা

ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিন মাসের সংযমে ও ব্যায়ামচর্চায় তাহার দেহ নূতন করিয়া যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রমেশ প্রশংসমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া, পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"বাঃ, সুন্দর চেহারাখানি করে তুলেছ ত ?"

"নিশ্চয়ই।"

"এখন মনে হচ্ছে, চেষ্টা করলে সাড়ে পাঁচ কেন, পাঁচ মিনিটেই পারতে পার।"

"আশা ত করি।"

"আচ্ছা, তোমার কথাই আমি ধরে নিলাম! এই নাও তোমার বাজীর টাকা—" বলিয়া পকেট হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া নৃপেণের হাতে দিল।

বিস্ময়ের প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিলে আমাদের মুখে কথা ফুটিল—সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—

"তা হলে তুমি হার মানছ ?"

"আমি যতদূর শুনেছি তাতে সে সাড়ে পাঁচ মিনিটে ত নিশ্চয়ই পারবে—যদি অসাবধানে পড়ে না যায় বা পা না মচকায়। এ টাকা ওর ন্যায্য পাওনা।"

"তা হ'লে আমাদের বাজীর টাকাগুলাও দাও।"

"কেন ?"

"সে কি হে ? আমাদের সঙ্গে তুমি বাজী রাখনি ?"

"তা ত আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু সর্ত্তটা কি ছিল ?"

"যে তুমি এতে হারবে না।"

"ঠিক। আমি ত এতে হারিনি। বরং জিতই আছে।"

"কি রকম ?"

"তবে শোন। নৃপেণের বাবা মাসকতক আগে কথায় কথায় বলেছিলেন যে নৃপেণের বদ্ খেয়ালগুলা নষ্ট করে অন্ততঃ তিন মাসও যদি তাকে সংযত ভাবে সহজ জীবনপথে চালান যায়—ব্যবসায়ে পাঁচ শ' টাকা লাভের চেয়ে তা'তে তাঁর বেশী লাভ হবে। আজ সকালে সেই পাঁচ শ' টাকা পেয়েছি—তার মধ্যে নৃপেণের হাতে ওই এক শ' টাকা, আর বাকী চার শ' এই শর্ম্মারামের পকেটে। তবে আমার হার কিসে ?"

নৃপেণ বলিল—"এ এক শ' টাকার জিত ত সামান্য কথা। স্বাস্থ্যে উৎসাহে আমি যা লাভ করেছি—এক লাখ টাকাতেও তার দাম হয় না।

যাই হোক, টাকাটা আমি অমনি নেবো না—অন্ততঃ ব্যায়ামের হিসাবেও দৌড়টা দিয়ে আসি।”

আমি ঘড়ি খুলিয়া রহিলাম—সেবার ঠিক ৪ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ড লাগিল।

সে এক শ' টাকার নোটখানা আমরা অবশ্য নৃপেণের পকেটস্থ হইতে দিলাম না।

পরের রবিবার আড্ডায় একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন হইল। আহার্য্যের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল—নৃপেণ-গৃহিণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন।

কালিয় দমন।

[“ও-পারের কথা”র লেখক।]

গল্পটী এই :—বৃন্দাবন-প্রবাহিত যমুনার এক আবর্ত্তে কালিয় নামে এক বৃহদাকার ও ভীষণ বিষধর সপরিবারে বাস করিত। কালিয়ের তিনটী ফণা ও কতকগুলি পত্নী ছিল। উক্ত আবর্ত্ত হলাহলে এমন কলুষিত ছিল যে উহার বারি সেবন করা দূরের কথা, কোন প্রাণী ঐ স্থান দিয়া যাইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জীবের কল্যাণে ব্রতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচরণকালে একদিন সেই আবর্ত্তে ঝম্ফপ্রদান করেন। কালিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিপ্রতাসহকারে সেই বিষধরের মস্তক উত্থিত হইয়া বংশী নিনাদ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্যে সর্পরাজ এমন হীনবল হইল যে, রুধির বমন করিয়া করিয়া মুমূর্ষু হইল। তদ্দর্শনে কালিয়ের বনিতাগণ কতকটা মানবী আকারে করযোড়করতঃ মনুষ্যভাষায় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিল। অনন্তর কালিয়ও মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার মানসে সেই স্তবগানে যোগদান করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিবারসহ যমুনা ত্যাগ করিয়া সমুদ্র বাস করিতে আদেশ করিলেন। কালিয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আবর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়া গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইলেন। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের জয়-ঘোষণা করিল ও কালিয় সপরিবারে সেই আবর্ত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। ফলতঃ সমগ্র বৃন্দাবনবাসী এক ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইল।

উক্ত ঘটনা 'আষাঢ়ে গল্প' শ্রেণীভুক্ত না বলিলেও অবশ্য স্বীকার্য্য যে লেখক সত্য ঘটনাকে 'অলঙ্কারে' পরিশোভিত করিয়াছেন। সকল দেশের পুরাতন সাহিত্যের গবেষণায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রচনা-কৌশল পরবর্ত্তী সময়ের রচনার সহিত অনেকাংশে ভিন্নতর। মনে হয়, যে কালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ লিখিত হইয়াছিল, তখন ভাষায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য থাকিলেই সেই লেখক উচ্চশ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আরও মনে হয়, এই প্রকার রচনার ভঙ্গিতে হিন্দুদিগের যাবতীয় দেব দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। ইহার সহিত দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রীআচার প্রভৃতি যাবতীয় আচারগুলি সন্নিবেশিত হইয়া হিন্দুদিগের পূজা, আরাধনাদি কর্ম্ম সকল কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সম্মান রক্ষার্থ যাজক-শ্রেণীর সহিত শিক্ষিত হিন্দুসমাজের এই সম্বন্ধে যথাসম্ভব প্রকৃত তত্ত্ব নিরাকরণে যত্নশীল হওয়া বিধেয়।

এক্ষণে 'কালিয় দমন' লীলার মৌলিক তত্ত্ব কি হওয়া সম্ভব, সেই কথা বলা যাউক। যে জলাশয়ে পদদ্বয় দিবা মাত্র উহার গভীর জলে নিমজ্জিত হইতে হয় বা যাহার ঘূর্ণায়মান জলে প্রাণ হারাইতে হয়, উহাই আবর্ত্তবাচ্য। কাম-কাঞ্চনাদির বা মায়া-মোহের জন্য এই ভবসংসার এক বিশাল আবর্ত্তবৎ অবস্থিত। সুতরাং ইহার অন্তঃস্থিত প্রত্যেক সংসারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত। অধিকন্তু সুরাপানের জন্য কত সংসার উচ্ছন্ন গিয়াছে ও যাইতেছে ও কত শত জীবের অকালমৃত্যু হইয়াছে ও হইতেছে! এই হেতু সুরা গরলবাচ্য ও শৌণ্ডিকের স্পৃষ্টজল অসেব্য ও তাহার দান গ্রহণীয় নহে। যে স্থলে 'খোলা ভাঁটি' বিদ্যমান তত্রস্থ মদ্যপায়ীদিগের বিকট চীৎকারে, উচ্চহাস্যে, অশ্রাব্য গীতে, কলহে এবং দ্বন্দ্বে নরকরাজ্যের জ্বলন্ত চিত্র উদ্ভাসিত থাকে। এতদ্ব্যতীত যে স্থলে সুরার উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়া মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার সন্নিকটস্থ বায়ু পূতিগন্ধে দারুণ কলুষিত হইয়া যাবতীয় প্রাণীর দেহপাতের কারণ হয়। শৌণ্ডিকের কর্ম্মস্থল 'ভীষণ আবর্ত্ত' বলিয়া আখ্যাত হইলে উহা প্রমাদোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইবার কথা নয়।

সাধারণতঃ জীবগণ জাগতিক প্রতিপত্তি লাভের আশায় অসত্য, কুৎসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, দম্ভ প্রভৃতি অগুণের উপাসক উপাসিকা হইয়া স্ব স্ব হৃদয়কে হলাহলে প্রায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু দারুণ অর্থ লালসায় মানব হৃদয় পরিপূরিত না হইলে কোন প্রাণী শৌণ্ডিকের কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতে পারে

না। যদি কোন জীব অত্যধিক লালস প্রযুক্ত উপরি উক্ত সঙ্গদোষে দূষিত থাকে, সে ব্যক্তি কালে পাষাণবৎ নির্ম্মম হইবে বা পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত থাকিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ সেই জীব বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় অর্থাৎ ত্রিফলার হলাহল নির্গত করিবে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অমূলক নহে! সুতরাং সেই জীব মানবদেহধারী হইলেও সর্পসদৃশ ভীষণ ও ত্রিফলা যুক্ত। ইহা ব্যতীত তাহার কর্ম্মভূমি কুকর্ম্মের বা হলাহলের আবর্ত্ত স্বরূপ জনসমাজে অবস্থিতি করে।

কালিয় যখন 'নাগ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহার পরিবারবর্গ নাগ ব্যতীত অন্য প্রাণী বলিয়া আখ্যাত হইলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইত। কিন্তু এই গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালিয়-বনিতাগণ কতকটা মানবী আকার ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করিয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কালিয় বা তাহার পরিবারবর্গ কেহই বাস্তবিক 'নাগ' শ্রেণীভুক্ত ছিল না। তবে হইতে পারে তাহারা অনার্য্য 'নাগ' জাতিভুক্ত মানব-মানবীই ছিল।

বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শৌণ্ডিকগণ 'কালাল' বলিয়া আখ্যাত। সুতরাং 'কালাল' হইতে 'কালিয়' কথা উদ্ভূত হওয়া বিচিত্র নহে।

কালিয় ও তাহার পত্নীগণ যদি বাস্তবিক সুললিত সংস্কৃত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 'অনার্য্য' শ্রেণীভুক্ত করা কতকটা অযথাচার।

এ দেশে অর্থশালীদিগের মধ্যে বহু বিবাহ চিরপ্রচলিত প্রথা। সুতরাং শৌণ্ডিক কালিয়ের বহু পত্নী থাকা অসম্ভব নহে।

ব্রজবাসী-বাসিনীদিগকে জাগতিক স্থূল আমোদ-প্রমোদ হইতে সূক্ষ্ম অর্থাৎ প্রকৃত আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত করা ও তাহাদিগের প্রকৃত মানবজীবন গঠন করা বৃন্দাবন অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার যাবতীয় কর্ম্ম ক্রীড়া বা কৌতুকচ্ছলে সাধিত হইয়াছিল। এই কথা "রাসলীলা" প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে ও অবকাশমত "দোললীলা" প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। এই 'কালিয় দমন' লীলা সেই উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তবে সমাজসংস্কারই তাহার প্রধান লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, ব্রজবাসীগণ মদ্য সেবন করিয়া ক্ষণিক উল্লাসের প্রত্যাশায় চির-আনন্দ লাভের পথ হইতে দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে ও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণে সুকুমারমতি গোপবালকগণও কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত এই মদ্য সেবার জন্য ব্রজবাসীদিগের

সংসারে অকালমৃত্যু ও আনুসঙ্গিক অভাব-অশান্তি আসন পাতিতে পারে। এই সকল কারণে তিনি কালিয় শৌণ্ডিককে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাকে বৃন্দাবন হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। শৌণ্ডিকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার "খোলাভাঁটি" বা আবর্ত্ত বৃন্দাবন হইতে অন্তর্হিত হইল। সুতরাং কালিয়রূপ দারুণ কালিমাকে বৃন্দাবন হইতে ধৌত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমাজের অতীব কল্যাণ-প্রদ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কেবল মাত্র বালক হইয়াও যিনি এইরূপ প্রতিভার ও সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার গুণের জন্য তিনি পূজার্হ নহেন কি? হায় ভারত! কবে তুমি অন্যের গুণের আদর ও আপনার যাবতীয় গলদ আলোচনা করিয়া বাস্তবিক মনুষ্যবাচ্য হইবে? তবেই তোমার জাত্যভিমানের বা উচ্চশিক্ষার আস্ফালনের বা ধর্ম্মযাজক বা সাধক-সাধিকাবাচ্য হইবার সাধটুকু পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

সাহিত্য প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

'সাহিত্য' (প্রতিবাদ)

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মুখভারতী আছেন; ইহাঁরা "democracy" প্রচার করেন, মুখে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী, সাম্যভাবের পরিপোষক, কিন্তু কার্য্যতঃ কেহ ইহাঁদের মতের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলে ইহাঁরা ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন, রোষে আত্মহারা হইয়া সহজ জ্ঞানটুকু অবধি জলাঞ্জলি দেন। ইহাঁরা ব্যক্তিগত রেষারিষি, দ্বেষ, হিংসা দ্বারা মাতৃ-মন্দির কলুষিত করেন, ইহাঁদের অত্যাচার ও উপদ্রবে দেশের লোক, সাহিত্যসেবী-সম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়, সাহিত্যিকগণের সম্ভ্রম যায়।

বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মেলনে সভার বিধি-লঙ্ঘন করিয়া "সাহিত্য"-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয় নানা প্রকার অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া সভা পণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সভাপতি মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ধমক দিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াই সমাজপতি মহাশয় অভিমানভরে বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কাঁদিলেন। তিনি 'নায়কে'র সহকারী সম্পাদক। নায়কের স্তম্ভে নিষ্ফল তর্জ্জন-গর্জ্জন, লম্ফ-ঝম্প-আস্ফালন করিয়া স্যর আশুতোষের উদ্দেশে গালি পাড়িতে লাগিলেন, কণ্ঠী ছিঁড়িলেন। স্যর আশুতোষের প্রতিভা মলিন হইল না, নিন্দুকই হাস্যাস্পদ হইলেন মাত্র। স্যর আশুতোষের উপর ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঝাল ঝাড়িবার জন্য মাতৃ-মন্দির কলুষিত করিবার অধিকার কাহারও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ব্যক্তিগত কোন্দলের জন্য সুবিধা পাইলেই তিনি 'বঙ্গবাসী'র' রায় সাহেব বিহারীলালকে গালি দিয়া থাকেন। তাঁহার দর্পে আঘাত করিয়া শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সাহিত্যসেবীকে কুকথা শুনিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ও এখন সাহিত্য-সম্পাদকের রোষের পাত্র। হায়রে অর্থ!

* *
*

এ আত্ম-প্রবঞ্চনা কেন? মুখে সাম্য-ভাব প্রচার করিয়া লোকে যদি আপনাকে উচ্চ জ্ঞান করে তাহার পক্ষে হাস্যাস্পদ হওয়া অনিবার্য্য। দাম্ভিক লোকের সাম্যবাদ বিড়ম্বনা। ইহাঁদের যুক্তিতর্ক খুব সরল। "আমি বিদ্যাদিগ্‌গজ, আমার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা অসহনীয়; আমি যদি ভুল করি, মত পরিবর্ত্তন করি, এক দল ছাড়িয়া অপর দলে মিশি, তুমি বলিবার কে? আমার হস্তে কলম আছে কাগজ আছে, তোমাকে গালি দিব, সাধারণের নিকট তোমাকে হেয় করিব। সাধারণে না শুনে অন্ততঃ দংষ্ট্রাকরালের দ্বারা তোমাকে ভয় দেখাইব"। হাঃ ভ্রান্ত! কখনও খোঁজ লইয়াছ কি যে তোমার কলমের খোঁচায় কি ফল হয়, তোমার 'দাঁত-খিঁচুনী' লোকে কতটুকু গ্রাহ্য করে?

* *
*

সাহিত্য-সম্পাদক ব্যক্তিগত ঝগড়া লইয়া সাহিত্য-মন্দির কলুষিত করেন ইহার আর একটি উদাহরণ আমরা এস্থলে দিতেছি। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া তাঁহার সহিত আমার মতানৈক্য হইয়াছে। সেদিন রামমোহন লাইব্রেরীতে আমি তাঁহাকে "inconsistent" বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলাম। আর রক্ষা আছে? তিনি আমার মুণ্ডপাত করিবার জন্য আদাজল খাইয়াছেন। সাহিত্যের সমালোচনা-স্তম্ভে আমাকে ইতর ভাষায় গালি

দিয়াছেন, নিজের অন্তরের রুদ্ধ বিদ্বেষ-বহ্নিতে নিজেই ঝলসিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও অনেক গালাগালি দিবেন, এখন হইতে পাঁয়তারা করিতেছেন।

শুধু ইতর ভাষায় গালি দিলে সমাজপতি মহাশয় হয়ত দুই একজন পাঠকের মনে ধাঁধা দিতে পারিতেন। কিন্তু আমার ভাষা উদ্ধৃত করিয়া তিনি জব্দ হইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গলাদেশে এমন পাঠক নাই যে, তাঁহার উদ্ধৃত ভাষা ও তাঁহার টিপ্পনী পড়িয়া তাঁহার অসূয়া-দগ্ধ প্রাণের পরিচয় পাইবেন না। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—ক্রোধান্ধ সমালোচক কি ছার! ভবিষ্যতে তিনি কেবল সাধারণ ভাষায় গালি দিলে একটু ফল ফলিতে পারে।

* *
*

সমালোচনার সনাতন-প্রথা অনুসারে তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবে কতকটা বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার পর বিশ্লেষণ। যথা—"যে বড় মানুষের ছেলে বেশ্যার পায়ের কাছে একখানা বাড়ীর দানপত্র রাখিয়া দিতে পারে, সে তাহার পরদিনই তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর কানের হীরার টপ্ চুরি করিয়া আনিয়া বেশ্যার কানে পরাইয়া দিল কেন তাহার কোনও স্বাভাবিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেশববাবুর 'সাইকলজী'ও অত্যন্ত অদ্ভুত।" নিঃসন্দেহ! কিন্তু বিদ্বেষের মুখোস সরাইয়া সাধারণ দৃষ্টিতে লাইন কয়টা পড়িলে বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র "স্বাভাবিক কারণ" খুঁজিয়া পাইতেন না কি? তিনি যে পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আছে যে, নায়িকার পায়ের কাছে দানপত্র রাখিয়া বড় মানুষের ছেলে বলিয়াছিল—"সুশীলা এখন বুঝলে আমার ভালবাসা কত গভীর।" স্বাভাবিক বৃত্তির বশে সুশীলা তাহাকে মূর্খ বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার জননীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে তখনই শুধরাইয়া বলিয়াছিল—"ভাই ঠাট্টা করছিলাম। আমি তোমা বই কাকেও জানি না।" "হতভাগ্য একেবারে স্বর্গ হাতে পাইল। তাহার পরদিন"—ইত্যাদি। সুতরাং অর্থাভাবে বড় মানুষের ছেলে স্ত্রীর কানের টপ্ চুরি করিয়া আনে নাই। সে মূর্খ; সে ঐরূপে প্রেম জানাইতে চাহিয়াছিল; নিজের স্ত্রী অপেক্ষা গণিকাকে ভালবাসে তাহা ঐরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সমাজপতি মহাশয় কি বাস্তব-জগতে এরূপ মোহগ্রস্ত লম্পট দেখেন নাই?

* *
*

একস্থলে গল্পের নায়িকা বলিয়াছে—"লম্পট বহু নারীর ভজনা করে সেই

একনিষ্ঠার সম্পূর্ণ সুখটুকু ভোগ করিবার জন্য। সেটুকু পায় না বলিয়াই সে একের পর অনেক গণিকার দ্বারস্থ হয়।" সমালোচক-প্রভু এই উক্তি লইয়া খুব দশনবিকাশ করিয়াছেন, তুড়ি-লাফ্ খাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞের মত বলিয়াছেন, আমার সিদ্ধান্তগুলা সাঙ্ঘাতিক। কারণ আমি "কামটাকে নির্ব্বাসিত করিয়া", "মজ্জমান লম্পটকে একনিষ্ঠার তৃণ ধরিয়া পরিত্রাণ পাইবার সদুপায়" করিয়া দিয়াছি। সিদ্ধান্তগুলা গল্পের নায়িকার, আমার নহে। কুৎসিত সংসারে থাকিয়াও সে নিজে প্রাণে প্রাণে একনিষ্ঠার জন্য লালায়িত। সে লম্পটকে বিচার করিবার সময় তাহার ভিতর প্রচ্ছন্ন একনিষ্ঠার বাসনা দেখিয়াছে। সুরেশবাবু লম্পটের "কামটা" দেখিয়াছেন। সে সেটুকু দেখে নাই, কারণ তাহার নিজের সে বৃত্তি প্রবল নহে। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ"। গল্পের নায়িকাটি অবধি এই সাম্যবাদী সমালোচকের ভিন্ন মতাবলম্বিনী হইলে তাহার নিস্তার নাই, অন্যে পরে কা কথা! একনিষ্ঠার জন্য লালায়িত, এমন গণিকা বা লম্পট নাই, এ সংবাদ সুরেশবাবু পাইলেন কোথা? সেদিন এই সহরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আত্মীয় একটি হিন্দু বেশ্যাকে কল্‌মা পড়াইয়া নিকা করিয়াছেন। হিন্দু বেশ্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ করিয়াছে, নিজেরা গৃহস্থ হইয়াছে এমন অনেকগুলি মুসলমান যুবককে আমি জানি। তাহাদের স্ত্রীর পালয়িত্রীরা রুষ্ট হইয়া তাহাদের উপর মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল। সুরেশবাবু কি বলিতে চাহেন যে তাঁহার আদর্শের মাপকাটি লইয়া চরিত্র-সৃষ্টি করিতে না পারিলে রচনা ব্যর্থ হইবে? আমার বিশ্বাস এ মত তাঁহার চিরদিনের নহে!

* *
*

গল্পের সুশীলাকে মান্দ্রাজী নায়ডু বিবাহ করিয়াছিল। সুশীলার সহিত তাহার পরিচয় হয় এক উকীলের মারফৎ। সমাজপতি মহাশয় কি আর উকীল জাতিকে গালাগালি দিবার লোভ্ সম্বরণ করিতে পারেন? বিশেষ যখন রামমোহন লাইব্রেরীর সেই "কেশববাবু উকীল"। শুনিয়াছি অনেক সম্পাদক-সমালোচকও ঐ সকল কুস্থানে নিশিযাপন করেন। তাঁহারাও বন্ধুবান্ধবদের ঐ সকল স্থলে কুৎসিত আমোদের জন্য লইয়া যান এ সংবাদ আমরা রাখি। সুতরাং ঐরূপ জঘন্য রসিকতায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বুঝা উচিত ছিল যে ঐরূপ রসিকতা আমাদের সম্পাদক-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও হইতে পারে। স্ফটিক গৃহে বাস

করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা সাজ্ঘাতিক। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে সুরেশ বাবু রসিকতা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ কুৎসিত রসে যে কেবল "পূতিগন্ধ ভিন্ন কিছু থাকে না।"



নায়ডুর বিবাহ প্রস্তাবে সুশীলা সুখী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিল—"আমি যে বেশ্যা! আমাকে প্রকাশ্যে বার করতে পারবে? মা বোনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে? আমার অতীত ভুলতে পারবে?" ইহার পূর্ব্বে সুশীলা বলিয়াছে—"একটা কথা বড় মনে বাজিত।... প্রকাশ্যে কেহ আমাকে স্বীকার করিত না।...যাহারা আমার মুখের একটা কথা শুনিলে আপনাদের ধন্য মনে করিত, তাহারা প্রকাশ্যে আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত।" ইহার পর একটি দুঃস্থ স্ত্রীলোক, বেশ্যা জানিয়া, তাহাদিগের চাকুরী করিতে চাহে নাই। "আমি সেই পরিচারিকার চক্ষে সেই স্বর্গীয় দীপ্তি দেখিলাম। যে দেশের পরিচারিকা এমন হইতে পারে, সে দেশের সীতা দময়ন্তী কি ছিলেন?" সেই দিন হইতে "দাসীটা একেবারে প্রাণে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল।...একদিন কালীঘাটে গেলাম। ছোট ছোট বধূ দেখিলাম, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা গৃহিণী দেখিলাম, সকল বয়সের বিধবা দেখিলাম। সবারই অবস্থা মন্দ, সবাই দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতায় জর্জ্জরিত, কিন্তু গৃহস্থের মেয়ে সবারই মুখে একটা পবিত্র ভাব।" যে স্ত্রীলোকের এই রকম মতিগতি, সে নায়ডুকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল—ইহাতে অস্বাভাবিকতা কোথায়? নায়ডু হিন্দুর ছেলে, উদার, অথচ, প্রেমোন্মত্ত, সে এক ঢিলে দুই পাখী মারিল, মনকে আঁখি ঠারিল, অথচ নায়িকাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"কোনও লজ্জা নাই, তোমার ভিতর ধর্ম্ম আছে। যাদের আমরা বিবাহ করি, পূর্ব্বজন্মে তারা কি ছিল কে জানে!...ধর আজ তুমি জন্মালে, অতীতটা ও জন্মের কথা।" সুরেশবাবুর মতে এ অভিমতটা "ভদ্র-সন্তান কেশববাবুর খেলো উদারতা।" এটুকু নায়ডুর উদারতা, কেশববাবুর নহে, এ সামান্য বুদ্ধিটুকুও বন্ধুবর সুরেশচন্দ্রের ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি ঘটে নাই, একথা আমি বিশ্বাস করি না। বিদ্বেষের ঠুলি বাঁধিলে আগুনের ভাঁটার মত চক্ষুও নিষ্প্রভ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে একথাটা বলিয়াছিল, আপনার দুঃসাহসের জবাব-দাহির জন্য, সুশীলার সম্মতি পাইবার জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের নায়িকারা বলিয়াছিল—"বিদ্যাসাগর যদি পণ্ডিত ত' মূর্খ কে" ? কি বে-আদবী ! এ মত নিশ্চয়ই লেখকদের নিজস্ব ! প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মহাশয়ের দৌহিত্রের পক্ষে এখন দেশ-পূজ্য রমেশচন্দ্রের ও বঙ্কিম-চন্দ্রের ওয়ারিসগণের নামে মানহানির হরমুতের নালিস করা কর্ত্তব্য। মহামতি দীনবন্ধুর ত' দুর্নীতির সীমা নাই। নিমাইদত্ত প্রভৃতি যে যাহা বলিয়াছে, সমস্ত নাট্যকারের অভিমত ও খেলো উদারতা। মিল্‌টনের কোমাস পড়িয়া অতঃপর স্থির করিতে হইবে যে মিল্‌টন ঘোর লম্পট ও পাষণ্ড ছিলেন !

এই প্রসঙ্গে গত মাঘ মাসের 'গৃহস্থ' হইতে কয়েক ছত্র এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

"মৃচ্ছকটিকের নায়িকা 'বসন্ত সেনা' গণাঙ্গনাগণের উজ্জ্বল চিত্র। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ইহাকে বিবাহ করিয়াও সমাজে বা রাজদ্বারে কোনরূপ দোষী হন নাই। বসন্ত সেনার পরি-চারিকা অপরা বেশ্যা মদনিকাকেও অপর এক ব্রাহ্মণ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সুহৃদ্বর সমাজপতি মহাশয় এখন কি বলেন ? 'মৃচ্ছকটিক'-প্রণেতার টিকি না কাটিয়া এবং সমাজের পতিত্ব ছাড়িয়া তিনি বা তাঁহার ন্যায় সমালোচককেশরী বোধ হয় তখন কচু-বনে তপস্যা করিতেছিলেন ! নহিলে, এ শ্রেণীর জঘন্য ও কুরুচিপূর্ণ নাটক (?) হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যের আবর্জ্জনা বাড়াইত না !

* *
*

নায়ডু বলিয়াছিল—"মান্দ্রাজে চলে যাব, সেখানে নূতন জীবন নূতন পারি-পার্শ্বিক অবস্থা। তুমি সাধ্বী হ'তে পার, একনিষ্ঠ হ'তে পার, আমি স্বর্গ হাতে পাব।" সমালোচক-প্রবর ইহাতে টিপ্পনি করিয়াছেন যে কেশববাবু "মান্দ্রাজের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার" অবিচার করিয়াছেন। যাহা কিছু বিচার অবিচার করিয়াছেন, নায়ডু—কেশববাবু নয়। নায়ডু তাহার কারণ দেখাইয়াছে। সেখানে নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সেখানে নূতন অবস্থার মধ্যে সুশীলার "অতীত" ভুলিয়া যাওয়া সহজ। সত্যই সমালোচনার বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। একটি গণিকা "গৃহস্থের বউ" হইয়া মান্দ্রাজে গেলে যে "বিশাল মান্দ্রাজ" কলুষিত হয় এ ধারণা কাহারও নাই। কলি-কাতার কোনও প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতের গুণধর নাতি বাড়ীর এক অংশে একটি বেশ্যা আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে কি দেশের লোক পণ্ডিত মহাশয়ের সমস্ত বংশের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা অবিচার

করিয়াছিল? বৃহৎ সমাজে বৃহৎ কুলাঙ্গারই জন্মিবে। মান্দ্রাজ সমাজ বা বাঙ্গালার সমাজে লোকে গোপনে গণিকাদের বিবাহ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত প্রদেশটা অপবিত্র হইবে, এ নীতিজ্ঞান অদ্ভুত। হিন্দুসমাজে স্থান পাইবে না বলিয়াই তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল—একেবারে নূতন পথের পথিক হইয়াছিল।

* *
*

এই রকম কথা লইয়া সুরেশবাবু গাত্রদাহের উপশম করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একস্থলে নায়িকার পুলক হইয়াছে বলিয়া তিনি স্বয়ং আঁৎকিয়া উঠিয়াছেন! নায়িকার পুলক! সর্ব্বনাশ! আমরা বলি—নায়িকা সুরাদেবীর আরাধনায় স্নায়ুগুলা বিকল করেন নাই বলিয়াই পুলকটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। নায়ক নায়িকার পক্ষে রোমাঞ্চিত হওয়া নূতন নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক স্বৈরিণী নায়িকার বিষয় নায়ক রাজকুমার বলিয়াছিলেন—"এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে আমার রোমাঞ্চ হয়।"

* *
*

আমি ষোল বৎসর গল্প লিখিতেছি। বলা বাহুল্য, সমালোচকেরা আমার অনেক গল্পের নিন্দা করিয়াছেন, অনেক গল্পের প্রশংসা করিয়াছেন। আমি কখনও তাঁহাদের সমালোচনার প্রতিবাদ করি নাই। সুরেশ বাবু আমার বন্ধু, তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। সামান্য মতদ্বৈধ হইয়াছে বলিয়া তিনি জোর করিয়া আমাকে কুকথা বলিয়াছেন বলিয়া আমি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি মুখে democracy প্রচার করেন অথচ তাঁহার মতের বিরোধী মত প্রকাশ করিলে লোকে কিরূপ নিগৃহীত হয় তাহা দেখাইলাম। যাঁহাদের দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা এত অধিক, তাঁহারা আবার দশের কাজে, দেশের কাজে কোমর বাঁধেন! ছিঃ!

* *
*

'সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের চিত্র' সম্বন্ধে সুরেশবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের প্রতিবাদপত্রখানিও এই স্থানে প্রকাশ করিলাম:—

"এই 'অন্তর্দৃষ্টি'সম্পন্ন সমালোচক মহাশয় কেবলমাত্র শেষ প্যারাগ্রাফটী পড়িয়া সমস্ত প্রবন্ধের উপরে মন্তব্য লিখিয়া ফেলিয়াছেন ইহা তাঁহার তীক্ষ বুদ্ধির পরিচায়কই বটে। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন "কেবল বৈচিত্র্য বিধানের জন্যই সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের সৃষ্টি অতএব সংস্কৃত নাটকের পঞ্জরস্বরূপ এই বিদূষক সম্বন্ধে লেখকের এই নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ নহে।" কিন্তু সমালোচক মহাশয় আমার উক্তির মধ্যে 'কেবল'' শব্দটী পাইলেন কোথায়? নিশ্চয়ই উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। "ঘটনার বিকাশ ও চরিত্রের পুষ্টি" নাটকীয় সকল ব্যক্তিই করিয়া থাকে, সে কথা আমিও অস্বীকার করি না। আমিও ত দেখাইয়াছি যে বিদূষক হাস্যপরিহাস ব্যতীত নায়কের প্রণয় ব্যাপারেও সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে গেলে নাটকে বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়া monotony দূর করাই বিদূষকের প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে হয় না কি? ঘটনার বিকাশ ও চরিত্র পুষ্টি বিদূষকের নিজের সম্পত্তি নহে, সে ত সকলেই করিয়া থাকে। চরিত্রপুষ্টি ও ঘটনার বিকাশ শকুন্তলার ধীবরও করিয়াছে। বিদূষকের তাহাতে প্রাধান্য কোথায়? সেকথা বলিবারও বোধ হয় আবশ্যক করে না। সমালোচক মহাশয়ের সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে বোধ হয় বিশেষ পরিচয় নাই, নতুবা তিনি এমন একটা যা হয় বলিয়া ফেলিতেন না। তিনি যে আমার প্রবন্ধটী আগাগোড়া পড়েন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি কেমন করিয়া বুঝিলেন প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হয় নাই? আশা করি এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন সমালোচকের 'অর্চ্চনা'য় স্থান নাই। ইতি—

পুনশ্চ—গালি দেওয়াই কি সমালোচক মহাশয়ের স্বভাব, তিনি ত কাহাকেও বাদ দেন নাই দেখিলাম!

বিনীত—শ্রীবিষ্ণুপদ দেবশর্ম্মা।

* *
*

ভারতবর্ষ বৈশাখ ১৩২৪

সহযোগী "ভারতবর্ষ" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রচারে মনোযোগী হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। "বংশানুক্রম ও সুপ্রজনন বিদ্যা" উপাদেয় প্রবন্ধ। অধ্যাপক পুরকায়স্থ মহাশয়ের "চড়াদরের কড়া কথা"—অর্থনীতি বিজ্ঞানের তথ্যে পূর্ণ। কথাগুলা পুরাতন হইলেও এ প্রবন্ধ মূল্যবান। "প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্বন্ধবিচার" প্রবন্ধটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী। এই সকল প্রবন্ধে লোক-শিক্ষা হয়, বিজ্ঞানের প্রসার হয় এবং মাসিকের মূল্য বাড়ে। "মধু-স্মৃতি" বেশ ভালই চলিতেছে। এবার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর অনুরোধে কবিবরের যে স্মৃতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিবরের বন্ধু লিখিয়াছেন—"বুদ্ধি, বিদ্যা এবং উচ্চশিক্ষার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর সহিত মাইকেল সম্বন্ধে যতবার আন্দোলন হইয়াছে, ততবারই তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—"আমাকে তোমরা বুদ্ধিমান বল,

....কিন্তু মাইকেলের তুলনায় আমি অতিশয় হীন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, প্রতিভার ও মেধার সমকক্ষ আমি অদ্যাপি দেখি নাই।” এই কথায় আমাদের দেশের গৌরব—দুইটি মহাত্মারই গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

* *
*

ভারতবর্ষে এত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উপদ্রব কেন? সীমান্ত, ইন্দোর ও উজ্জয়িনী বরং সহ্য হয় কিন্তু স্বয়ং দীনেন্দ্রবাবু “মেদিনীপুরে তিন রাত্রি” লইয়া পাঠকদিগের সমক্ষে হাজির হইলেন কেন? এবার রায়সাহেব হারাণচন্দ্র “লিলুয়ায় ঘণ্টাখানেক” লিখিয়া জলধর বাবুকে পাঠাইতে ভুলিবেন না। এ বাজারে কাগজের যেরূপ দর তাহাতে ও সকল রচনাগুলা যুদ্ধের পর ছাপাইলে ভাল হয় না?

* *
*

সাহিত্য-পঞ্জিকা।

গত চৈত্র মাসের অর্চ্চনায় ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’র সমালোচনায় আমরা অনুযোগ করিয়াছিলাম—“যে সব সাহিত্যিক বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি লিখেন, সাময়িক বা সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকতা করেন অথচ স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি নাই, তাঁহাদের নাম এই পঞ্জিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ এগুলি অনবধানতার ফল। পুস্তকের তালিকায় অনেক গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে * * প্রথম উদ্যম বলিয়া সমস্ত ত্রুটী উপেক্ষণীয়। আশা করি ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকায় সেগুলি সংশোধিত হইবে।” সুখের বিষয়, সম্পাদকযুগলের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে। আমাদের মন্তব্য অনুযায়ী তাঁহারা একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালার সম্পাদকবৃন্দকে প্রেরণ করিতেছেন। আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

‘আগামী বর্ষের ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’য় আমরা একটী অতিরিক্ত অধ্যায় যোগ করিতে চাহি। যে সকল সাহিত্যিক কোন গ্রন্থ লেখেন নাই অথচ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও যে যে পত্রে লিখিয়া থাকেন, সেগুলির নাম এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইবে। সাহিত্যিকগণ আমাদিগকে এই সকল সংবাদপ্রদানে বাধিত করিবেন।

গতবর্ষের পঞ্জিকায় অনেক গ্রন্থকারের জন্মের তারিখ, ঠিকানা বা নিবাস অজ্ঞতা প্রযুক্ত দেওয়া হয় নাই। যাহাতে এই অভাব এইবার আমরা দূরীভূত করিতে পারি, তজ্জন্য সকল গ্রন্থকারের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যে সকল গ্রন্থকারের নাম বাদ পড়িয়াছে, দয়া করিয়া তাঁহারা নিজ ২ নাম ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ প্রকাশে নিজ ২ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবা মাত্র আমাদিগকে পাঠাইলে আমাদের পক্ষে পঞ্জিকা সঙ্কলনে ও সম্পূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। নিবেদন ইতি।"

'অর্চ্চনা'র লেখকবৃন্দ পত্রানুযায়ী বিবরণ অর্চ্চনা-কার্য্যালয়ে পাঠাইলে আমরা সাদরে তাহা 'সাহিত্য-পঞ্জিকা' কার্য্যালয়ে পাঠাইব। 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'র জন্য 'সমসাময়িক ভারত' কার্য্যালয়, মোরাদপুর (পাটনা) এই ঠিকানায় সকলেই পত্রাদি ও বিবরণ পাঠাইতে পারেন।

* * *

কণ্ঠহার—সচিত্র সামাজিক নাটক।

আমাদের পরম অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'কণ্ঠহার' নাটক ২য় সংস্করণে 'সচিত্র' হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

দেড় বৎসর হইল এই নাটকখানি একটানে সুখ্যাতির সহিত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে এবং ইহা শত শত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতেছে। নাটকখানি করুণ রসে প্লাবিত এবং মধ্যে মধ্যে হাসির উৎসে পরিপ্লুত। এমন হৃদয়গ্রাহী, শিক্ষাপ্রদ, নাটকীয় গুণাবলি-সমন্বিত নাটকের সংখ্যা বাঙ্গালা ভাষায় অল্প। গিরিশচন্দ্রের ও ক্ষীরোদচন্দ্রের নাটক ও গীতিনাট্যগুলির মত এই নাটকখানিও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সখের থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। সাধারণ্যে ইহার বিশেষ প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও নাটককার ২য় সংস্করণে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। কাগজ, ছবি, ছাপা, ত্রিবর্ণে রঞ্জিত আবরণী প্রভৃতিতে গ্রন্থখানি প্রিয়জনকে উপহার দিবার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। নাটকে এমন পারিপাট্য এই নূতন। ইহা কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে ১॥০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

স্থিতি পরিবৃত্তি (Metathesis.)

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ]

বররুচির প্রাকৃত প্রকাশ ব্যাকরণে দুটি সূত্র আছে, "করেণ্বাং রণোঃ স্থিতি পরিবৃত্তিঃ" ও "আলানে লনোঃ" অর্থাৎ "করেণু" শব্দের "র'ও ণ" এর এবং

"আলান" শব্দের "লওম" এর স্থিতি পরিবৃত্তি হয়। তাহাতে "করেণু" শব্দের 'র' স্থানে 'ণ' ও 'ণ' স্থানে 'র' হয় এবং "আলান" শব্দের 'ল' স্থানে 'ন' ও 'ন' স্থানে 'ল' হইয়া "করেণু" "কণেরু" হয় এবং "আলান" "আণাল" হইয়া যায়। প্রাকৃত জন খাঁটি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া এই কাণ্ড করিত, ইহা এতই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহার জন্য ব্যাকরণের সূত্র রচনা করিতে হইয়াছিল।

আমরা এখনও বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দেখিতে পাই জনসাধারণ "বাতাস" "বাতাসা" "বাসক" "বাক্স" "ডেস্ক" বলিতে যথাক্রমে "বাসাত" "বাসাতা" "বাকস" 'বাস্ক" ও "ডেক্স" বলিয়া ফেলে। দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোথাও সাধারণ লোকে "দাঁড়িয়ে" বলিতে, "দাঁইড়ে" বলে। একজন বাঙ্গালা শিক্ষিত লোক একবার "৫ ফুট ৪ ইঞ্চি" বলিতে, "৫ ফুচ্ ৪ ইন্টি" বলিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? লোকে যেরূপ শুনে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে। তবে উচ্চারণের এরূপ অসামর্থ্যের কারণ কি? যে "আণাল" উচ্চারণ করিতে পারে সে "আলান" উচ্চারণ করিতে পারে না কেন? হিন্দীভাষীদের মধ্যেও কেহ কেহ "আদ্‌মি" না বলিয়া "আম্‌দি" বলে কেন?

আমাদের সংস্কৃত বর্ণমালার পাঁচটি উচ্চারণ স্থান যথা জিহ্বামূল বা কণ্ঠ, তালু মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ অর্থাৎ জিহ্বার সাহায্যে বায়ু এই সকল স্থানে আহত হইলে বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ হয়। এই পাঁচ বর্গের বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি লইয়া স্বরযোগে যে শব্দ হয় তাহা ধীরে ধীরে সকলেই উচ্চারণ করিতে পারে কিন্তু শব্দটি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে গেলে যে কস্‌রতের প্রয়োজন, অনেকের জিহ্বা তাহাতে অভ্যস্ত থাকে না কাজেই তাহারা একটু গোলমাল করিয়া ফেলে। কোন দেশে যে বর্ণের যে ধ্বনি প্রচলিত তাহা হইতে একটু পৃথক্ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে গেলে সে দেশের লোকের অনেকেই বাল্যাবধি অনভ্যাস নিবন্ধন তাহাতে অসমর্থ হয়। যথা—দন্ত্য 'স' স্থানে 'ছ' এবং দন্ত্য 'জ' (ইংরাজী Z) স্থানে তালব্য 'জ' উচ্চারণ করে। আবার কয়েকবিধ উচ্চারণ সকলের পক্ষেই কঠিন, যথা ইংরাজী আস্ক্‌ড্ (asked') ও পাস্‌ড্ (passed) স্থলে অঘোষ-বর্ণ ক্ ও স্ এর পরে ঘোষবদ্বর্ণ 'ড' উচ্চারণ করা প্রায় অসম্ভব, কারণ জিহ্বার এরূপ কস্‌রত সকলের পক্ষেই কঠিন, সেইজন্য ইংরাজীতে আস্ক্‌ট্ ও পাস্‌ট্ হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়মে ঘোষবদ্বর্ণের অনুনাসিক ব্যতীত বর্ণ অর্থাৎ

বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। কোন কোন হিন্দুস্থানী শিক্ষার্থী জোর করিয়া asked কথার 'ড'এর উচ্চারণ রাখিতে গিয়া 'আস্‌গ্‌ড্‌' করিয়া ফেলিয়াছে; ইহা ঠিক সংস্কৃত সূত্রানুযায়ী।

আবার দুইটি মহাপ্রাণ বর্ণ উপর্য্যুপরি উচ্চারণ করা কিম্বা পদের অন্তে মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যথা "হঠাৎ" বা "হঠ্‌-কারিতা" স্থানে আমরা বলি 'হটাৎ' ও 'হট্‌কারিতা'। আবার "গর্দ্দভ্‌" কথাটা উচ্চারণ করিতে গেলে শেষে 'ভ্‌' উচ্চারণ কঠিন বলিয়া আমরা 'ভ্‌' স্থানে 'ব্‌' বলি অথচ 'ভ্‌'এর মহাপ্রাণত্ব ছাড়িতে না পারিয়া 'দ্দ'এর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে 'দ্ধ' করিয়া ফেলি অর্থাৎ 'গর্দ্দভ্‌' না বলিয়া আমরা বলি 'গর্দ্ধব্‌'।

ইহা ঠিক স্থিতি পরিবৃত্তির উদাহরণ নহে। স্থিতিপরিবৃত্তিতে ৩টি বর্ণের উচ্চারণ হয়। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণ তৃতীয় স্থানে এবং তৃতীয় বর্ণ দ্বিতীয় স্থানে আইসে। ইহা দুই কারণে সম্ভব। প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিবার পরে তাড়াতাড়িতে ধ্বনি দুটি শেষ করিবার জন্য দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বনি হইবার পূর্ব্বেই তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণ করিয়া ফেলি, কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারেই বুঝিতে পারি যে, একটা বর্ণের ধ্বনি বাদ পড়িল তাই সেটিকে শেষে উচ্চারণ করি। কিম্বা ইহাও সম্ভব যে, প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিবার পরে আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া অবশিষ্ট দুইটি বর্ণই উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করি তখন দুইটির মধ্যে যেটি সহজ সেটির উচ্চারণ অগ্রে হয়, কঠিন উচ্চারণটি পরে হয়। 'আদ্‌মি'র 'দ' অপেক্ষা 'ম'এর, 'আলানে'র 'ল' অপেক্ষা 'ন'এর এবং 'করেণু'র 'র' অপেক্ষা 'ণ'এর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত সহজ।

কিন্তু যেখানে "৫ ফুট ৪ ইঞ্চি" না বলিয়া "৫ ফুচ্‌ ৪ ইন্টি" বলে কিম্বা "ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস না খাইয়া" লোকে "ঘাস ডিঙ্গিয়ে ঘোড়া খায়" সেখানে প্রথম মতই প্রযোজ্য বলিয়া বোধ হয়। যেরূপেই হউক, উচ্চারণের এই পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন উচ্চারণকারীর অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে।

ছিন্ন-হস্ত।*

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

(১)

বিচারক বারমিষ্টারের চতুর্দ্দিকে সকলেই আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। তিনি 'সেণ্ট ক্লাউডে'র ভীতিপ্রদ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ করিতেছিলেন। কয়েক মাস অবধি এই রহস্যপূর্ণ ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সমস্ত প্যারিস সহরকে এক মহা জটিল সমস্যায় ঘেরিয়া রাখিয়াছিল! পুলীশের যথাসাধ্য প্রয়াস সত্বেও ঘটনাটির কোন মূলসূত্র আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রজ্বলিত অগ্নিপাত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বিচারক বারমিষ্টার দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি একে একে ঘটনা সম্পর্কীয় বিষয়গুলি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি যে অনেক মাথা ঘামাইয়াও ঘটনাটি সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না তাহা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে হইল। সেখানে অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাব-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রত্যেক বাক্যটি শুনিবার জন্য তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। তাহারা স্ত্রীসুলভ অতৃপ্ত কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য সমস্ত বিষয়টা আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল।

বিচারক এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইলে একজন স্ত্রীলোক বলিল "কি ভয়ানক! এই প্রকার অতি অস্বাভাবিক ভৌতিক ব্যাপার মনুষ্যের ধারণায়ও আসিতে পারে না!"

বিচারক তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনি যেরূপ ধারণা করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা সত্য। ইহা অনেকেরই বোধগম্য নহে। তবে আপনি যে 'ভৌতিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় ইহা তাহা নহে, কিন্তু এই প্রকার একটি সুকল্পিত ভয়ঙ্কর ব্যাপার যাহা বাস্তবিকই এতটা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটন করা নিতান্তই সহজসাধ্য

* গি. দে মোপাসার ফরাসী গল্প হইতে।

নহে বলিয়া মনে হয়। তবে সত্য সত্যই আমাকে একবার এক ভীষণ ব্যাপারে পড়িতে হইয়াছিল, যাহাকে বাস্তবিকই 'ভৌতিকের' কাছাকাছি বলা চলে। তাহাও আমরা এই প্রকারই একটি অভেদ্য সমস্যা ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।"

অনেকগুলি মহিলা তাহাকে সে বিষয়টি বলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, বারমিষ্টার স্মিতবদনে বলিলেন—"আমি আপনাদিগকে যে ঘটনাটি বলিব তাহা যে আমি কখনও ভৌতিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা আপনারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিবেন না।" আমি একজন বাস্তববাদী—এবং একেবারে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত এমন কোনও বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। আমার বিশ্বাস, যাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম তাহাকে 'ভৌতিক' না বলিয়া তাহার স্থলে সোজাসুজি "বোধাতীত" শব্দটি ব্যবহার করিয়া লইতে পারি এবং আমি অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিতে পারি যাহাতে ঐ শেষোক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা চলিতে পারে। আমি এখন আপনাদিগকে যে বিষয়টি বলিব তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাহাকেও এই প্রকার একটি জটিল সমস্যা বলিয়াই মনে হইবে। যাহা হউক, আমি আপনাদিগকে প্রকৃত ঘটনাটি বলিতেছি, আপনারা নিজেদের মধ্যেই তাহার বিচার করিয়া লইবেন।

"আমি তখন সেই শ্বেতশুভ্র জলাশয় বেষ্টিত কর্সিকাদ্বীপের ক্ষুদ্র অজাসিও সহরটিতে বিচারক ছিলাম। সেই সুন্দর জলাশয়ের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া একটি বিশাল পর্ব্বত প্রহরীর মত দণ্ডায়মান থাকিয়া গম্ভীর নেত্রে এই মনোহর দ্বীপটির প্রতি চাহিয়া থাকিত।

আমার আফিস সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্য্যে আমাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইত তাহাদের অধিকাংশ গুলিতেই কেবল 'ভেণ্ডেটাদের' অতিশয় শোচনীয় এবং ভীষণ লোমহর্ষণ বিয়োগান্তমূলক কাহিনীর অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু যদিও এই 'ভেণ্ডেটাদের' কার্য্যগুলি সচরাচর অত্যন্ত ঘৃণিত এবং হিংস্র-জনোচিত বলিয়া মনে হইত, তবুও সময়ে সময়ে তাহাদের দুই একটি কাহিনী এতই মধুর নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ থাকিত যে তাহা ভাবিতে গেলেও অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। এমন কি, এই সমস্ত বিভীষিকাময় তাণ্ডবলীলার অন্তরালেও কখনও কখনও দুই একটি অতি মনোহর বীরত্বপূর্ণ এবং প্রেম-রসোদ্দীপক চিত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে।

এই 'ভেণ্ডেটা' শব্দে একজনের কল্পনায় যতগুলি প্রতিশোধ বাসনা জাগিতে পারে কেবল তাহাই চরিতার্থ করা বোঝায়। পিতার পর পুত্র এই প্রকার বংশপরম্পরায় ভেণ্ডেটাদের প্রতিশোধের ধারা বহিয়া যায় এবং আততায়ীগণ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী হইতে নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি থাকে না। এমন কি বহুপূর্ব্বে মৃত কোন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত প্রতিশোধও কোন দূরাগত বংশাবতংশ কর্তৃক সাধিত হইতে দেখা গিয়াছে।

ক্রমাগত দুই বৎসরাবধি আমি এই সকল রক্তপিপাসু তরক্ষুদিগের কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাই নাই।

(২)

একদিন আমি শুনিলাম যে, একজন ইংরেজ এখানে আসিয়াছেন। তিনি দুই বৎসরের জন্য জলাশয়ের সম্মুখস্থ একটি সুন্দর লোকালয় ভাড়া করিয়া তাহাতেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত কেবলমাত্র একটি ফরাসী ভৃত্য ছিল। শুনিতে পাইলাম তিনি তাহাকে মার্সেলেসের পথে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

অল্পকালের মধ্যেই এই ভদ্রলোকটী সকলের আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সর্ব্বদাই একাকী থাকিতেন। বাহিরে এক শিকার করা এবং মাছ ধরা ভিন্ন তাঁহার অপর কোন কার্য্য ছিল না। তিনি কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না কিম্বা কোন দিন সহরের কোন হোটেলে কেহ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি প্রত্যহই কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত কোন একটি লক্ষ্যের উপর বন্দুক চালনার অভ্যাস করিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শোনা যাইত। কেহ কেহ বলিত এই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী, কিম্বা কোন গুরুতর অপরাধী, অভিযুক্ত হইবার ভয়ে দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া শাসনের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য এই স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

যাহা হউক, বিচারকের পদে সমাসীন থাকিয়া এই নবাগত ভদ্রলোকটী সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য আমারও ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহাকে রাওয়েল্ নামে পরিচয় দিতেন। স্যর্ জন্ রাওয়েল্ তাঁহার সম্পূর্ণ নাম এবং উপাধি ছিল। প্রথমতঃ তাঁহার সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে নিজেই একপ্রকার নজরবন্দী অবস্থায় রাখিয়া সন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, আমি কখনও তাঁহার সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহজনক কিছু জানিতে পারি নাই।

ক্রমশঃ তাঁহার সম্বন্ধে জনরব আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, যাহাতে তাঁহার সহিত শীঘ্রই আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, তাহার একটা উপায়-উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সেই অবধি আমি তাঁহার বাসস্থানের চারিপার্শ্বে রীতিমত শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

আমি যে সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলাম, অন্ততঃ তাহার জন্য আমাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে একদিন আমি আমার এই ইংরেজটির বাসস্থানের অতি সন্নিকটে একটি পায়রা শিকার করিলে আপনা হইতেই সে সুযোগটি আসিয়া মিলিল। আমার কুকুরটি পক্ষীটিকে ধরিয়াছিল। আমি পায়রাটিকে আমার কুকুরের নিকট হইতে লইয়া স্যর জন্‌কে প্রদান করিতে গেলাম এবং তাঁহার বাসস্থানের এত নিকটে শিকার করিয়া তাঁহার শান্তিভঙ্গ করার জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিলাম।

তিনি অত্যন্ত লম্বকায় পুরুষ এবং তাঁহার দেহের আয়তনও সেই পরিমাণে মানানসই ছিল। তাঁহাকে দেখিতে একটি প্রকাণ্ড 'হার্‌কিউলিসের' মত এবং দেহের কুত্রাপিও একটু কুৎসিত কিম্বা অস্বাভাবিকত্ব ছিল না।

তিনি আমার এই বর্ত্তমান সঙ্কোচ ভাবটি বেশ উপলব্ধি করিলেন এবং আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(৩)

প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমাদের পরস্পরের আলাপ-পরিচয় আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বাস্তবিকই শেষটায় আমরা উভয়ে উভয়ের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ হইলাম।

একদিন বৈকালে আমি তাঁহার দ্বারদেশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম স্যর জন্‌ ইংরেজি কায়দায় বাগানের একটি চেয়ারে বসিয়া পাইপে ধূমপান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি আমাকে তাঁহার সহিত এক গ্লাস এল্‌ (মদ্য) পান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে আর পুনরুক্তি করিতে হইল না। তিনি আমাকে ইংরেজি পদ্ধতি অনুসারে শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাকে অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিলাম। তিনি অনুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া তাহাদের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার সেই অদ্ভুত

ফরাসী ভাষায় আমাকে তাঁহার আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা পর্য্যটনের নানাবিধ বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি অনুমান করিলাম তাঁহার জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার অদ্ভুত সমাবেশ আছে।

একত্র দুই বন্ধু বসিলে যেরূপ হয়, আমিও সেইমত একথা সেকথার পর নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক এবং শিকারের কথা পাড়িলাম। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি হাতী, বাঘ কিম্বা বনমানুষ এমন কিছুই নাই যাহা শিকার করেন নাই। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমি বলিলাম—"স্যর জন্! এই সমস্ত জন্তু কি অত্যন্ত ভয়ানক নহে?"

তিনি উত্তর করিলেন—"ওঃ না! মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর প্রাণী। সত্য কথা বলিতে কি, আমি সময়ে সময়ে মানুষও শিকার করিয়াছি।"

তারপর তিনি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের কথা আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র দেখাইবার জন্য অস্ত্রাগারে লইয়া গেলেন।

আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই দেখিলাম তাঁহার বৈঠক-খানাটির দেওয়ালের চারিদিক এক প্রকার অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং মূল্যবান পশমে আবৃত রহিয়াছে। এই কাপড়ের মধ্যে মধ্যে সোনালী কারুকার্য্যের পুষ্পালঙ্কার পরিশোভিত ছিল। পুষ্পগুলি মেঘনিনাদিত আকাশের তিমিরাবৃত অন্তরালে থাকিয়া সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মির মত চতুর্দ্দিক হইতে আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল।

স্যর জন্ নিজেই বলিলেন—"এই ফ্যাসানটি জাপানী। ইহা নিশ্চয়ই আপনার নিকট অদ্ভুত ঠেকিবে কিন্তু আমার পক্ষে বড়ই দৃষ্টি-সুখকর।"

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, অমনি সহসা কক্ষ মধ্যস্থিত একটি বস্তু আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিল। আমি দেখিলাম এক খণ্ড কাল চতুষ্কোণ মখমলের সহিত একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ঝোলান রহিয়াছে।

অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একখানি ছিন্ন নরহস্ত!—কোন জীর্ণ কঙ্কালের হস্ত নহে—বেশ পরিষ্কৃত ভাবে ইহা সংরক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি ইহাতে তখনও কালো কালো মাংসখণ্ড গুলি সংলগ্ন ছিল এবং স্থলে স্থলে শুষ্ক রক্তের দাগ অতি সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান ছিল। অতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে হস্তখানিকে ঠিক এক কোপেই মণিবন্ধ এবং কনুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। সেই কর্ত্তিতস্থলের হাড়গুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। হস্তখণ্ড বিচ্ছিন্ন করিতে যে কি ভয়ানক শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল—কেবল হস্ত-খানিই তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছিল! বাহুটির মণিবন্ধের চতুর্দ্দিকে মোটা

লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটি হস্তীর বন্ধনোপযুক্ত কড়ার সহিত দেওয়ালে ঝোলাইয়া রাখা হইয়াছিল!

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কি?"

স্যর জন্ ধীরভাবে উত্তর করিলেন "একখানি ছিন্নহস্ত। ইহার মালীক আমার ঘোরতম শত্রু। এই ব্যক্তি মধ্য-আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল। এই হস্তটিকে একটি প্রশস্ত ফলকযুক্ত তীক্ষ্ণধার তরবারীর সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল এবং সপ্তাহকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আতপদগ্ধ করিয়া ইহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় সংরক্ষিত করা হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে তাঁহার স্মৃতি-পথে সেই ভীতিপ্রদ পূর্ব্বকাহিনী জাগিয়া উঠিল এবং তিনি অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন "এই হস্তখানিকে বিচ্ছিন্ন করা আমার পক্ষে নিতান্তই মঙ্গল হইয়াছে।"

আমি আরও নিকটে আসিয়া হস্তটি স্পর্শ করিলাম। ইহা যে একটি ভীষণ দানবাকার 'হার্‌কিউলিসের' মত নরদেহের অংশ তদ্বিষয়ে আমার আর কোন সংশয় রহিল না। প্রত্যেক অঙ্গুলি সুদীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে সুবৃহৎ অস্থিগ্রন্থি এবং দৃঢ়তম শিরাগুলি দেখা যাইতেছিল।

আমি ভীতভাবে আমার সহচরকে বলিলাম—"ইহার মালিক নিশ্চয়ই আপনার একজন ভীষণ শত্রু ছিল?"

তিনি বলিলেন—"হাঁ ছিল। কিন্তু আমি আরও অধিক বলবান ছিলাম এবং এই শৃঙ্খলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলাম।" তিনি বাস্তবিক উন্মাদ কিম্বা তামাসা করিতেছেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না!

আমি বলিলাম—"কিন্তু এই হাতখানিকে এই প্রকার রক্ষা করার অভি-প্রায়টা কি? ইহা ত আর এখন পলাইতে পারে না!"

ঐকান্তিক আগ্রহ এবং গাম্ভীর্য্য সহকারে স্যর জন্ উত্তর করিলেন—"ইহার কারণ ছিল এবং আছে। ইহা সর্ব্বদাই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিত এবং এখনও করে। কাজেই এই শৃঙ্খলের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।"

আমি লোকটার মুখের দিকে চাহিলাম। বাস্তবিকই এ লোকটা উন্মাদ না আমাকে তামাসা করিতেছে? কিন্তু তাঁহার মুখে সেই একপ্রকার প্রশান্ত ভাব, নয়নে সেই স্থিরদৃষ্টি এবং কথায় সেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি। যাহা হউক উপস্থিত আমি আর এ বিষয় লইয়া বিশেষ তোলাপাড়া করিলাম না। তাঁহার নিকট অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম।

আমরা পরক্ষণেই বন্দুকগুলি দেখিতে লাগিলাম। এবারও আমি একটি

আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাইলাম। তাঁহার টেবিলের উপর তিন তিনটি টোটাভরা পিস্তল দেখিয়া মনে হইল যেন প্রতিমুহূর্ত্তেই কি এক আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার বিষয় তিনি কিছুই বলিলেন না। আমিও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম না, শুধু তাহাদের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়াই আমি বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। এই সাগরতীরস্থ নির্জ্জন লোকালয়বাসী ইংরেজটিকে দেখিয়া আমার মনে হইল প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার ক্ষণস্থায়ী জীবনটি কি ভয়ানক বিপজ্জনক! প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে মৃত্যুর জন্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে! রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছিল। আমিও এই কুহেলিকা-উদ্‌ঘাটনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।"

(৪)

আমি মধ্যে মধ্যে স্যর জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিনয়ী এবং শিষ্টাচারী বন্ধুরূপে দেখিয়াছি। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু দিনের জন্য আফিস সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আমি আর তাঁহার সহিত কিছুদিন দেখা করিতে পারি নাই।

সহসা একদিন প্রাতঃকালে আমার ভৃত্যটি আমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সংবাদ দিল যে পূর্ব্বরাত্রে স্যর জনকে কে হত্যা করিয়াছে!

আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্থানীয় কমিশনার এবং সামরিক কাপ্তেন সমভিব্যহারে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, তাঁহার ভৃত্যটি দ্বারদেশে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ভৃত্যটি এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। ভৃত্যটি আমার মতই নির্দ্দোষ। যাহা হউক আমরা প্রকৃত দোষীকে কেহই বাহির করিতে পারিলাম না।

এই বলিয়া বারিষ্টার কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইলেন। রূপসী শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার আরও কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার গল্প শেষ হয় নাই!

বিচারক পুনরায় আরম্ভ করিলেন "আমরা তাঁহার সেই কৃষ্ণপশমাবৃত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম তাঁহার দেহটি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের মনে হইল যেন মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আততায়ীর সহিত তাঁহার কি এক ভীষণ মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল! তাঁহার পোষাকের উপরিভাগ ছিঁড়িয়া গিয়া ভিতরকার অঙ্গরাখাটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

এবং শিকারী কোটের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার একটি সুঠাম উন্মুক্ত বাহু একেবারে মোচড়াইয়া বহির্গত হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহাকে দম বন্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। তাঁহার মুখখানি অত্যন্ত স্ফীত এবং ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ভাব প্রকাশ করিতেছে!

দেহখানির বাহ্যিক পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখিলাম তাঁহার গলদেশে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রহিয়াছে। মনে হইল কোন তীক্ষ্ণধার লৌহফলাকার মত অস্ত্রের সাহায্যে এই গর্ত্তগুলি হইয়া থাকিবে।

আমি আরও একটি আশ্চর্য্যজনক জিনিষ দেখিতে পাইলাম।—দেখিলাম, মৃতদেহের কবাটবদ্ধ দন্তশ্রেণীর মধ্যে একটি মনুষ্যাঙ্গুলী কর্ত্তিত রহিয়াছে! অঙ্গুলীটি প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থির মধ্যস্থলে কর্ত্তিত হইয়াছিল!

ডাক্তার আসিলেন। তিনি ক্রমে দেহ এবং কণ্ঠস্থিত ক্ষতস্থানে অঙ্গুলীর দাগ ও ক্ষতচিহ্নগুলি সমস্তই সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার বিশ্বাস এই ব্যক্তি কোন একটি কঙ্কাল কর্ত্তৃক শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছেন!"

আমার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে এক ভীতিপ্রদ প্রবাহ শিহরিয়া উঠিল। আমি স্বভাবজাত বুদ্ধিবলে একবার সেই দেওয়ালের দিকে—যেখানে ঐ ছিন্নহস্তটি ঝোলান ছিল সেই দিকে—চাহিলাম।

ছিন্ন হস্তটি সেখানে নাই!

* * *

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এই সমস্যার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলাম না। গৃহের জানালা, কবাট এবং সমস্ত জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কোথায়ও একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য হইল না! স্যর জনের দুইটি বৃহদাকার প্রহরী-কুকুরের মুখেও সেদিন কোনও শব্দ শুনিতে পাই নাই।

স্যর জনের ভৃত্য এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল যে সে তাহার প্রভুকে কি এক বিষয়ে সর্ব্বদাই অত্যন্ত চিন্তিত থাকিতে দেখিত। তিনি ইদানীং অনেকগুলি পত্র পাইয়াছিলেন। তিনি পড়িয়াই সেগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তিনি কখনও বা অত্যন্ত ক্রোধভরে উন্মত্তের ন্যায় প্রকাণ্ড বেত্রধারণ পূর্ব্বক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া ঐ শুষ্ক ছিন্নহস্তে ক্রমাগত প্রহার করিতেন। তিনি অধিক রাত্রি অবধি জাগিয়া থাকিতেন এবং শয়নকক্ষ উত্তমরূপে অর্গলাবদ্ধ করিয়া

নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার আরও একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি নিমেষে ব্যবহারোপযুক্ত কতকগুলি টোটাভরা আগ্নেয়াস্ত্র সর্ব্বদাই নিজের কাছে রাখিতেন। ঐ তালাবদ্ধ শয়নকক্ষ হইতে প্রায়ই রাত্রে কোলাহল শোনা যাইত। তাহার মনিব যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কাহারও সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেন। কিন্তু যে ভাষায় এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হইত সে তাহা বুঝিত না। যাহা হউক যে রাত্রে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল সে রাত্রে সে কোনও শব্দ শুনিতে পায় নাই। কেবল প্রাতঃকালে কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সে তাহার প্রভুকে এরূপ মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল।

পুনরায় বারমিষ্টার বলিতে লাগিলেন—"আমি কমিশনার ও উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বলিলাম, যে আমি এই মৃত ব্যক্তিকে জানিতাম। আমরা সকলেই হত্যাকারীর যথাসাধ্য সন্ধান করিতে লাগিলাম কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ঘটনাটি চিরকালই অনাবিষ্কৃত থাকিয়া গেল!

(৫)

এই হত্যাকাণ্ডের প্রায় তিন মাস পরে একদিন রাত্রে আমি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম আমায় যেন 'বোবায়' ধরিয়াছিল। আমি যেন সেই ভীতিপ্রদ ছিন্নহস্তটি দেখিতে পাইলাম! যেন তাহার মণিবন্ধ হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাহিয়া মাকড়সার মত আমার মশারী এবং শয্যাকক্ষের দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল। আমি তিন তিনবার জাগিয়া উঠিলাম এবং তিন তিনবার হিংস্র এবং বন্যজন্তুর থাবার মত সেই বিকট লম্বা লম্বা অঙ্গুলীগুলি দেখিতে পাইলাম! আপনারা যেমন আমার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছেন দেখিতে পাইতেছি, সেইরূপ সেই বিকটাকার হস্তটির ভীষণ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ যেন এখনও দেখিতেছি!

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, পরের দিন লোকেরা আমার নিকট সেই ছিন্নহস্তটি লইয়া আসিল। হস্তটিকে তাহারা স্যর জনের কবরের উপর হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে স্থানীয় গোরস্থানে কবর দিয়াছিলাম।

ছিন্ন হস্তটির একটি অঙ্গুলী হারাইয়া গিয়াছিল। আমার বিশ্বাস আমি তাহার ঠিক কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

অতঃপর বারমিষ্টার বলিলেন—"মহিলাবৃন্দ! আমার 'ভৌতিক' উপাখ্যানটি শেষ হইল।"

উৎসুক রূপসীবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু হত্যাকাণ্ডের কি আজও

পর্য্যন্ত কোন নিষ্পত্তি হয় নাই? তাহার জন্য কি পরে কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় নাই? আপনি যদি সমস্ত না বলেন তবে আমাদের শান্তি হইবে না।"

বিচারক বারমিষ্টার স্মিতবদনে বলিলেন—"আমার বিশ্বাস ইহার প্রকৃত কৈফিয়ৎ দিতে হইলে আমার গল্পটি নষ্ট হইয়া যাইবে। আমার মনে হয় ঐ ছিন্ন হস্তের অধিকারী তখনও জীবিত ছিল। সেই রাত্রে সে শুধু তাহার প্রাপ্যটুকু আদায় করিতে আসিয়াছিল।"

তাঁহার কথা শুনিয়া রূপসীবৃন্দ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন বারমিষ্টার সহাস্যবদনে বলিলেন—"আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, আমার কৈফিয়তে আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন না!"

'নৈষধচরিতে' নাস্তিকবাদের আলোচনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

নিজের কন্যাকে নিজে বিবাহ না করিয়া বা পুত্রের সহিত বিবাহ না দিয়া সকলেই তৃতীয় ব্যক্তিকে কন্যা দান করিয়া থাকে। ইহাতে ত শ্রুতির স্মৃতির প্রামাণ্য ও পরলোকের প্রামাণিকত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। শাস্ত্রানুমোদিত পারলৌকিক অনিষ্টের আশঙ্কাতেই কেহ নিজের কন্যাকে নিজে বিবাহ করে না। যদি পরলোকের ভয় না থাকিত, তবে কি কেহ নিজের কন্যাকে একজন অপরের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? শ্রুতিস্মৃতি কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত এই কন্যাদান-পদ্ধতি, তোমাদের মতন নাস্তিকদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিয়া লও, বৈদিক বিধি-নিষেধ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লোক-সমাজে কতদূর প্রসারলাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। হে নাস্তিক, সর্ব্ব-সাধারণের এই কন্যাদান-পদ্ধতি দেখিয়াও ত পরলোকে বিশ্বাস করা তোমাদের সর্ব্বথা উচিত।

"স্বকন্যামন্যসাৎকর্ত্তুং বিশ্বানুমতিদূষনঃ।
লোকে পরত্র লোকস্য কস্য ন স্যাদ্‌দৃঢ়ং মনঃ।"

তুমি সিদ্ধান্ত করিয়াছ, শাস্ত্রসমূহে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ কথার অবতারণা আছে, তখন সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা। তাহা হইলে হে নাস্তিক, তোমাদের নিজের

শাস্ত্র স্বীকার কর কেন?' তোমাদের শাস্ত্রের সহিত ত কোনও শাস্ত্রেরই মিল নাই। কাজেই পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তোমাদের শাস্ত্রও অসত্য প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং তোমাদের শাস্ত্র, বৈদিক বিধি-নিষেধের সহস্র দোষ উদ্ভাবন করিলেও তাহা কেহ গ্রাহ্য করিবে না। অসত্য শাস্ত্রের কথার আবার প্রামাণ্য কি? ফলে বৈদিক পক্ষ যে নির্দ্দোষ, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল। বেদের আংশিক বিধি-নিষেধ মানিয়া তোমরা যখন কন্যা-দান কর, মাতৃগমন হইতে বিরত হও, তখন বৈদিক অন্যান্য অংশ মিথ্যা, এ কথা বলা তোমাদের শোভা পায় না। যে সকল আচারের লৌকিক কোনও যুক্তি নাই, বেদে আদিষ্ট এইরূপ বিবিধ বিধি-নিষেধ তোমরা যখন লঙ্ঘন কর না—নত মস্তকে তাহা মানিয়া চল, তখন সেই বেদেই উপদিষ্ট যাগাদির উপরে তোমরা যে কেন খড়্গহস্ত, ইহা বুঝিতে পারি না। তারপর তোমরা ঈশ্বর স্বীকার কর না—ইহাও কি যুক্তিসিদ্ধ? কর্ত্তা ব্যতিরেকে কোনও পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহা বোধ হয় তোমরাও স্বীকার কর। সকলেই জানে, ঘট যে উৎপন্ন হইল, কুম্ভকার তাহার নির্ম্মাণ না করিলে ঘট কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। উৎপাদনশীল বস্তুর একজন কর্ত্তা আছে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং বিপুল পৃথিবী অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর যখন উৎপন্ন বস্তু, তখন নিশ্চয়ই তাহার একজন কর্ত্তা থাকিবে। কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ মনুষ্য, ইহার কর্ত্তা হইতে পারে না। বিবিধ চিহ্নশোভিত শালগ্রামশিলার বিষয় লক্ষ্য করিলেই মানুষকে বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল বিস্ময়কর বস্তু-সম্ভার যাঁহার নির্ম্মিত, তিনিই ঈশ্বর। হে নাস্তিক, মানবের অনির্ম্মেয় এইরূপ বিবিধ বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াও তোমরা যে সেশ্বরমার্গ হইতে ভ্রষ্ট—ঈশ্বরের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস রাখ না—ইহা আশ্চর্য্যের কথা বটে।

"মানবাশক্যনির্ম্মাণা কূর্ম্মাদ্যকবিলা শিলা।
ন শ্রদ্ধাপয়তে মুগ্ধাস্তীথিকাধ্বনি নঃ কথম্॥"

এই সকল কথা শুনিয়া কলিদব্বের সেই নাস্তিক, কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবগণকে বলিল,—

"নাপরাধী পরাধীনো জনোঽয়ং নাকনায়কাঃ।
কালস্থাহং কালবন্দী তচ্চাটুচটুলাননঃ॥"

হে দেবগণ, আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না—যেহেতু আমি পরাধীন। আমি কলিরাজের স্তুতিপাঠক, সুতরাং তাঁহার চাটুকারিতা না করিলে আমার উপায় নাই। আমি পেটের জন্যই আপনাদের কাছে বেদাদির শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছি—আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন।

* আজকালও অনেকে পেটের জন্য হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ঘোষণা করিয়া থাকেন।

হিতপদ্যাবলী।

[৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মেঘ।

ঘন ঘোর ঘনঘট জলধর গরজন।
মন মোর রণছট রহি রহি নিরজন॥
মুখ মোর বিলসিত ভ্রূভঙ্গি ইঙ্গিত।
পশুপখি সুখ আঁখি মেঘে উজলিত॥
জলচর চিরদিন মেঘে উছলিত॥
জলধর চমকে নরতন হিতকো।
কলকল সাগর নিনাদ নিতকো॥

কঁহ গল জীবনসার?

সখি কব তুহুঁ কহিবি
কঁহ গল জীবন সার।
পিরিতী পিরিতী
পিরিতী কি সহিবি
রহয়িবি যদি সহি
কহয়িব তব—কহি
পিরিতী নিগূঢ় সার॥
সুখফল নিষ্ফল পার
পিরিতী জগত আধার।
নয়ন মণিক যে
পিরিতী বুঝয়ে যে
নিকুঞ্জ হয়রে জগত তহার॥
বয়ন ফটিক সে
পিরিতী খুঁজয়ে যে
তহার
তরঙ্গ হয়রে ছন্দবিহার
পিরিতী হিতকো নিত্য আহার॥

প্রেম।

পেম চন্দমা জলদ মাঝ হস।
হিদয় অঙ্কমে পুলক সাধ রস॥
কুসুম অঙ্গমে সুরভি মাল যশ।
সিন্ধু সঙ্গমে নিঝরি রূপ বশ।
পেম কারণে হিত অনলস॥

গ্রন্থ সমালোচনা।

বর্ণচিত্রণ। শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী কলাবিদ্যার্ণব প্রণীত। মন্মথ বাবু ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক এবং অনেকগুলি গ্রন্থপ্রণেতা। কলাবিদ্যার জন্য মন্মথবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কিরূপে ছবি আঁকিতে হয় মন্মথবাবু তাহা শিখাইয়াছেন। পুস্তকখানি তাঁহার অভিজ্ঞতার সুফল। বিশেষজ্ঞেরা এই শ্রেণীর পুস্তক-প্রণয়নে যত্নশীল হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। আমরা মন্মথবাবুর বর্ণচিত্রণ পাঠে সুখী হইয়াছি। যাঁহাদের কলা-বিদ্যায় আস্থা আছে তাঁহাদিগকে এ পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অর্চ্চনা, ১৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়।

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম্ এ]

হিতোপদেশ বলিয়াছেন,

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে ;
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটী মাত্র মধুর ফল আছে, কাব্যরূপ অমৃত রসের আস্বাদন এবং সাধু ব্যক্তির সহিত সঙ্গম। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিবেন তাঁহারা কাব্যামৃতরসে বঞ্চিত হইবেন না। কাব্য এবং অকাব্যের মধ্যে কি পার্থক্য তাহাও কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহাকে তাঁহারা কাব্য বলিয়া অনুভব করিবেন, তাহার কাব্যত্ব কোথায়—এই কথা যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বোধ করি অনেকেই নীরব হইয়া থাকিবেন, কারণ 'কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়'?—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মানুষ কোনও বিষয়েই একমত হইতে পারে না। বিশেষ, তর্কের দ্বারা, যাহার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক তাহাতে মতের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে পথিক দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথ খুঁজিয়া পায় না। তবে নিঃসংশয়ে এইটুকু বলা যাইতে পারে, যে কাব্যপদার্থটী বুঝিবার এবং বুঝাইবার জন্য প্রাচীন ভারতে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। আজ এইরূপ কয়েকটী মতের পরিচয় প্রদান করিব।

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য" (কাব্যালঙ্কার সূত্র, ২।৬) রীতিই কাব্যের আত্মা—ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিক বামনের মত। কাব্যের শরীর—গুণ এবং অলঙ্কারের দ্বারা সংস্কৃত শব্দ ও অর্থ। সুতরাং গুণযুক্ত এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থই কাব্য এবং রীতিই তাহার আত্মা। রীতি শব্দে 'গুণবিশিষ্ট পদরচনা' বুঝায়। বামনের কাব্যলক্ষণের বিশ্লেষণ করিলে আমরা

বামনের মত।

দেখিতে পাই যে তিনি রসের উল্লেখই করেন নাই। যদি তুমি এমন ভাবে কতকগুলি সুশ্লিষ্ট শব্দের সন্নিবেশ কর যাহাতে অর্থপ্রতীতি হয় এবং অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত গুণ ও অলঙ্কারের সত্ত্বা পরিলক্ষিত হয়, বামন তাহাকেই কাব্য বলিতে প্রস্তুত, তিনি আর কিছু চাহেন না। গুণ ও অলঙ্কার তাঁহার মতে কাব্যের শোভার জনক। গুণ রসের ধর্ম্ম ইহা পরবর্ত্তী কালের কথা। শব্দের বিশদত্ব, অর্থের স্ফুটত্ব—বামনের মতে ইহাতেই কাব্যের কাব্যত্ব।

দণ্ডী কাব্যের শরীর মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন আত্মার কথা বলেন নাই। "শরীরং তাবদ্ ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"। মনোহর অর্থ বিশিষ্ট পদসমূহই কাব্যের শরীর। কিন্তু কাব্যের শরীর সম্বন্ধে ত মতদ্বৈধ নাই, যত গোল আত্মা লইয়া। কাজেই দণ্ডী বুদ্ধিমানের মত আত্মার কথাটা একেবারে 'ধামা চাপা' দিয়াছেন। তবে আমরা দণ্ডীর মত কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তিনি "পদাবলী" বা পদসমূহকেই কাব্যের শরীর বলিয়াছেন। সেই শরীর কিরূপ এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তিনি বলিয়াছেন "ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না," অলৌকিক আনন্দের জনক যে অর্থ এইরূপ অর্থের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন। সুতরাং তাঁহার মতে অলৌকিক আনন্দের বিধায়ক অর্থকে আত্মা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে জগন্নাথ পণ্ডিতও এই মতেরই পক্ষপাতী।

দণ্ড্যাচার্য্যের মত।

"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ" কাব্যের আত্মা ধ্বনি। ইহাই ধ্বন্যালোকপ্রণেতা আনন্দবর্দ্ধনের মত। কাব্যের শরীর শব্দ ও অর্থ তাহা তিনি অস্বীকার করেন না। শব্দ ও অর্থ (বাচ্যার্থ) ব্যতীত ধ্বনি নামে অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কেহ কেহ এই ধ্বনির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান। তাঁহারা বলেন "এই ধ্বনি আবার কি? যদি বল শব্দ ও অর্থের চারুত্বই ধ্বনি, তাহা হইলে গুণ ও অলঙ্কার ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। কারণ গুণ ও অলঙ্কারই কাব্যের শোভা বিধান করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে "সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্" গুণজ্ঞের হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার করিতে পারে এরূপ শব্দ ও অর্থ যাহাতে আছে তাহাই কাব্য। তাঁহারা ধ্বনিবাদিগণকে এইরূপে গালি দিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধনের মত।

"যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালঙ্কৃতি।
ব্যুৎপন্নৈরচিতং চ নৈব বচনৈর্ব্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ॥
কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমহো প্রীত্যা প্রশংসন্ জড়ো।
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥"

যাহাতে অলঙ্কার বিশিষ্ট মনোহর কোনও বস্তু নাই, যাহা বিদগ্ধবচনের দ্বারা ভূষিত নহে, যাহাতে বক্রোক্তির নামমাত্র নাই—তাহাকেও যাহারা কেবল মাত্র ধ্বনিযুক্ত বলিয়া কাব্য নাম প্রদান করে, জানি না, যদি কোনও বুদ্ধিমান্ তাহাদিগকে ধ্বনির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে সেই সকল মূর্খ কি উত্তর প্রদান করিবে?

ইহার উত্তরে অভিনব গুপ্ত বলিতেছেন—

"শব্দার্থশরীরং কাব্যমিতি যদুক্তং তত্র শরীরগ্রহণাদ্ এব কেনচিদাত্মনা অনুপ্রাণকেন ভাব্যমেব। তত্র শব্দস্তাবচ্ছরীরভাগ এব সংনিবিশ্যতে। সর্ব্বজনসংবেদ্যধর্ম্মত্বাৎ স্থূলকৃশাদিবৎ। অর্থঃ পুনঃ সকলজনসংবেদ্যো ন ভবতি। ন হ্যর্থমাত্রেণ কাব্যব্যপদেশঃ। লৌকিকবৈদিকবাক্যেষু তদভাবাৎ। স এক এবার্থো দ্বিশাখতয় বিবেকিভিঃ বিভাগবুদ্ধ্যাভিযুজ্যতে। তথাহি তুল্যে অর্থরূপত্বে কিমিতি কস্মৈচিৎ সহৃদয়ঃ শ্লাঘতে। তদ্ভবিতব্যং কেনচিদ্ বিশেষেণ। যো বিশেষঃ স প্রতীয়মানভাগঃ। স এব বিবেকিভির্বিশেষহেতুত্বাৎ আত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে। বাচ্যসংকলনাবিমোহিতহৃদয়ৈস্তু তৎপৃথগ্ভাবো বিপ্রতিপদ্যতে, চার্ব্বাকৈরিবাত্মপৃথগ্ভাবঃ"। আচার্য্য অভিনব গুপ্তের মত।

শব্দ এবং অর্থকেই কাব্যের শরীর বলা হইয়াছে। শরীর থাকিলেই তাহাকে অনুপ্রাণিত করে এরূপ আত্মা নিশ্চয়ই আছে। সেই আত্মা কি? শব্দকে শরীর ভাগেই সন্নিবিষ্ট করা হয়। কারণ শরীরের ধর্ম্ম স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি যেমন সকলেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ শব্দের ধর্ম্ম কঠোরত্ব, মৃদুত্ব প্রভৃতি সকলেই বুঝিতে পারে। অর্থ কিন্তু সকলে বুঝিতে পারে না। আবার অর্থ থাকিলেই যে কাব্য হইল তাহা নহে। লৌকিক বাক্য এবং বৈদিকবাক্যেরও ত অর্থ আছে কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা কাব্য নাম পায়? অর্থ যদিও এক, তথাপি বিবেকিগণ ইহার দুই শাখা স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ সকল অর্থই যদি একরূপই হয় তাহা হইলে গুণগ্রাহিগণ কিজন্য কোনও কোনও অর্থকেই ভাল বলিয়া থাকেন? অতএব নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু আছে। এই বিশেষই অর্থের প্রতীয়মান অংশ। এই প্রতীয়মান অংশই কাব্যের আত্মা। যে সকল ব্যক্তি বাচ্য অর্থের গ্রহণেই মোহিত হইয়া যান, তাঁহারা প্রতীয়মান অংশ বুঝিতে পারেন না। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ যেমন দেহ হইতে আত্মার পৃথগ্ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ইহারাও সেইরূপ। ধ্বনিবাদিগণ অর্থের এই প্রতীয়মান অংশকেই ধ্বনি বলিয়া থাকেন।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকটী দেখুন—

পশ্য নিশ্চলনিষ্পন্দা বিসিনীপত্রে রাজতে বলাকা,
মরকতভাজনোপরিস্থিতা শঙ্খশুক্তিরিব।

দেখ, পদ্মপত্রের উপরে নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া একটী বক শোভা পাইতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একটী মরকতমণিনির্ম্মিত পাত্রের উপরে একটী শঙ্খ অবস্থিত রহিয়াছে। কোনও নায়িকা তাহার উপপতিকে এই কথা বলিতেছে। ইহার বাচ্য অর্থ উপরে লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ এই বাচ্য অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। কিন্তু ধ্বনিবাদিগণ বলেন বাচ্য অর্থে এই শ্লোকের কাব্যত্ব নহে, ইহার কাব্যত্ব প্রতীয়মান অর্থে। সে অর্থ এই—বকটী যখন নিশ্চল এবং নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ উদ্বেজিত করে নাই। অতএব এই স্থানটী নির্জন, এইরূপ স্থলেই উপপতির সহিত মিলন বাঞ্ছনীয়। অথবা—এইস্থানে পূর্ব্বেই নায়কের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু যেরূপ নিশ্চিন্ত-চিত্তে বকটী বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে নায়িকা অনুমান করিয়া লইল, যে নায়ক সেখানে আসে নাই। এই কথাই প্রকারান্তরে জানান হইতেছে।

কাব্য প্রকাশকার মম্মটের মতে "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতিঃ পুনঃ ক্বাপি।" দোষবর্জ্জিত, গুণযুক্ত, অলঙ্কারযুক্ত শব্দ এবং অর্থই কাব্য। কোথায়ও কোথায়ও অলঙ্কার না থাকিলেও ক্ষতি নাই। মম্মটও রসের বা ধ্বনির উল্লেখ লক্ষণের মধ্যে করেন নাই। কিন্তু তিনি যে ধ্বনির সত্তা কাব্যের প্রাধান্য হিসাবে আবশ্যক এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। যে কাব্যে প্রতীয়মান অর্থই প্রধান, তিনি তাহাকেই উত্তম কাব্য বলেন *। গোবিন্দঠক্কুর মম্মটের লক্ষণের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

মম্মটের কাব্যলক্ষণ।

নির্দ্দোষত্বাদিবিশেষণবিশিষ্টৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্ ইতি ব্যবহর্ত্তব্যৌ। * * * * যৎ 'সর্ব্বত্র সালঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্, কচিৎ স্ফুটালঙ্কারবিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানিঃ। নঞোঽল্লার্থকত্বাৎ। অল্পত্বস্য চাত্র অস্ফুটত্ব এব বিশ্রামাৎ। নীরসেঽপি অস্ফুটালঙ্কার কাব্যত্বমিষ্টমেব' ইতি ঋজুঃ পন্থাঃ। বয়ং তু পশ্যামঃ। নীরসে স্ফুটালঙ্কারবিরহিণি ন কাব্যত্বম্। যতো রসাদিরলঙ্কারশ্চ দ্বয়ং চমৎকার হেতুঃ। তথা চ ন যত্র রসাদীনামস্থানং তত্র স্ফুটালঙ্কারাপেক্ষা। অতএব ধ্বনিকারেণোক্তম্—অতএব রসানুগুণার্থ বিশেষ নিবন্ধনম্ অলঙ্কারবিরহেঽপি ছায়াতিশয়ং পুষ্ণাতি।"

গোবিন্দঠক্কুরের ব্যাখ্যা।

নির্দ্দোষত্ব প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট শব্দ ও অর্থই কাব্য। * * * 'যাহাই অলঙ্কার বিশিষ্ট তাহাই কাব্য, কোনও কোনও স্থলে অলঙ্কার পরিস্ফুট

---

* "ইদমুত্তমমতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।"

না থাকিলেও কাব্যত্বের হানি হয় না। কারণ 'অনলঙ্কৃতী' এই শব্দে নঞ্ অল্পার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অলঙ্কৃত্বর অর্থ এখানে অস্ফুটত্ব, সুতরাং যাহা নীরস তাহাতেও অলঙ্কার পরিস্ফুট না হইলেও তাহা কাব্য'—এই মত সরল বটে, কিন্তু আমরা এ মতের সমর্থন করি না। আমাদের মতে, যাহা নীরস এবং যাহাতে অলঙ্কার পরিস্ফুট নহে তাহা কাব্য নহে, যেহেতু, রসাদি ও অলঙ্কার এই দুইটীই চমৎকারের হেতু। সুতরাং যেখানে রসাদি আছে, সেখানে স্ফুটালঙ্কার না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যেখানে রসাদি নাই, সেখানে অলঙ্কার পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই ধ্বনিকার বলিয়াছেন "অলঙ্কার না থাকিলেও, যদি অর্থ রসের পক্ষে অনুকূল হয় তাহা হইলেই উহা কাব্যের শোভাবৃদ্ধি করিয়া থাকে। গোবিন্দঠক্কুরের ব্যাখ্যা অনুসারে ধরিতে গেলে, মম্মটের মতে দুই প্রকার কাব্য হইতে পারে। এক, যেখানে রসের প্রাদুর্ভাব আছে এবং দ্বিতীয়তঃ যেখানে রস নাই কিন্তু অলঙ্কার আছে। রস থাকিলে, অলঙ্কার পরিস্ফুট থাকুক্ বা না থাকুক্ তাহাতে আসে যায় না। আর অলঙ্কার পরিস্ফুট থাকিলে রসের আবশ্যকতা নাই। তবে যেখানে রস আছে তাহাই উত্তম, রস-বিহীন অলঙ্কারযুক্ত কাব্য কাব্য হইলেও, উত্তম নহে।

জয়দেবের মত।

চন্দ্রালোককার জয়দেবের মতে, মম্মটের লক্ষণ উপাদেয় নহে। তিনি স্ফুটালঙ্কারের পক্ষপাতী, তিনি বুঝিতে পারেন না, অলঙ্কার না থাকিলেও কাব্য হইতে পারে। তাই তিনি বলেন—

"অঙ্গীকরোতি যঃ কাব্যম্ শব্দার্থাবনলংকৃতী।
অসৌ ন মন্যতে কস্মাদনুষ্ণমনলং কৃতী॥"
(চন্দ্রালোক ১।৮)

যিনি অলঙ্কারবিহীন শব্দার্থকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, তিনি কেন উত্তাপবিহীন অগ্নির কল্পনা করিতে পারেন না? তাঁহার নিজের কাব্যলক্ষণে তিনি কিছুই বাদ দেন নাই।

নির্দোষা লক্ষণবতী সরীতিগুণভূষিতা।
সালঙ্কাররসানেকবৃত্তির্বাক্ কাব্যনামভাক্॥

দোষবর্জ্জিত, উৎকর্ষযুক্ত, রীতিসমন্বিত, গুণভূষিত অলঙ্কার রস, ও বহুবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট যে বাক্য তাহার নাম কাব্য।

ইঁহার কাব্যলক্ষণ দেখিলে মনে হয় যে ইনি কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে চাহেন না, ইনি একাধারে সকল বস্তুই লক্ষণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফল হইয়াছে এই যে ইঁহার মতে অনেক কাব্য অকাব্যে পরিণত হয়।

একাবলীকার বিদ্যাধর মম্মটপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া ধ্বনিকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। "শব্দার্থৌ বপুরস্ত তত্র বিবুধৈরাত্মাভ্যধায়ি ধ্বনিঃ"

বিদ্যাধরের মত।

শব্দ এবং অর্থই কাব্যের শরীর এবং পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ধ্বনিই তাহার আত্মা। অভিনব গুপ্তের মত তিনিও বলেন "শব্দার্থবপুস্তাবৎ কাব্যম্। বপুষি চ কেনাপি আত্মনা ভবিতব্যম্। আত্মা চ ধ্বনিরেব" কাব্যের শরীর শব্দ ও অর্থ। দেহ থাকিলেই একটা আত্মা থাকিতে হইবে। ধ্বনিই আত্মা।"

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উপরে লিখিত অনেক লক্ষণেরই দোষ প্রদর্শন

বিশ্বনাথের মত।

করিয়াছেন। তিনি বলেন—একজন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতীপুনঃ কাপি"। এই লক্ষণ বিচারসহ নহে। কারণ যদি দোষবর্জ্জিতই কাব্য হয়, তাহা হইলে—

ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ।
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ॥
ধিক্ ধিক্ শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা।
স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ॥

এই শ্লোকটী বিধেয়াবিমর্শ দোষে দুষ্ট বলিয়া কি কাব্য সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে না? প্রত্যুত, ধ্বনিযুক্ত বলিয়া এই শ্লোককে উত্তম কাব্য বলিয়া মম্মটও স্বীকার করেন। সুতরাং মম্মটের কাব্যলক্ষণ অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট। যদি বলা হয় এই শ্লোকটীর একটী অংশ মাত্র দুষ্ট, সমস্তটা ত আর দুষ্ট নহে—ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে অংশে দোষ তাহা অকাব্যত্বের হেতু, এবং যে অংশ নির্দ্দোষ তাহা কাব্যত্বের কারণ—এইরূপ দুই টানের মধ্যে পড়িয়া এই শ্লোক কাব্য বা অকাব্য কিছুই হইবে না। আর শ্রুতিদুষ্ট প্রভৃতি দোষগুলি সমস্ত কাব্যকেই দূষিত করে, কোনও অংশ বিশেষকে নহে। তাহারা কাব্যের আত্মস্বরূপ রসের অপকর্ষসাধন করে বলিয়াই তাহারা দোষ।

আর তা ছাড়া, দোষবর্জ্জিত্তকেই যদি কাব্য বলা হয়, তাহা হইলে জগতে কাব্য বলিয়া পদার্থ খুব কমই মিলিবে, হয়ত একেবারেই মিলিবে না। কারণ একেবারে নির্দ্দোষ বস্তু পাওয়া যায় না।

যদি বলা যায় 'অদোষ' শব্দের অর্থ 'ঈষদ্দোষবিশিষ্ট' অল্পার্থেও নঞের প্রয়োগ ত পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন "তাহা হইলে অল্পদোষবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থ তোমার মতে কাব্য, যাহা একেবারে দোষবর্জ্জিত

তাহা কাব্য নহে”। যদি বল ‘দোষ যদি একান্তই থাকে, তাহা হইলে সে দোষ অল্প হওয়া চাই’ তাহা হইলে কাব্যের লক্ষণে কি সে কথার উল্লেখ উচিত? রত্নের লক্ষণে কীটবিদ্ধ বলাও যেমন অপ্রাসঙ্গিক, এখানেও সেইরূপ। কীটবিদ্ধতা যেমন রত্নের রত্নত্বকে নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রুতিদুষ্ট প্রভৃতি দোষগুলিও কাব্যের কাব্যত্ব হানি করিতে পারে না।

তারপর কাব্যলক্ষণে ‘সগুণ’ এই বিশেষণটীও ঠিক্ নহে। ‘গুণ শুধু রসের ধর্ম্ম’ একথা মম্মটও স্বীকার করেন, কারণ তিনি গুণের লক্ষণে বলিয়াছেন যে “রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ”। আত্মার যেমন ধর্ম্ম শৌর্য্য প্রভৃতি সেইরূপ যেগুলি কাব্যাত্মস্বরূপ রসের ধর্ম্ম তাহাই গুণ। রসের অভিব্যঞ্জক বলিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে এখানে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিলেও ‘সগুণ’ এই বিশেষণের কোনও মূল্য নাই। তোমরা যাহাকে কাব্য বল তাহাতে রস আছে কি না? যদি বল নাই, তাহা হইলে গুণও নাই, কারণ গুণ রসেরই ধর্ম্ম। যদি বল আছে, তাহা হইলে ‘সগুণৌ’ না বলিয়া “রসবন্তৌ” বল না কেন? “প্রাণিমান্ দেশঃ”, এই কথা না বলিয়া কি তোমরা “শৌর্য্যাদিমান্ দেশঃ” বলিয়া থাক? তাহা যদি না বল, তাহা হইলে সরসৌ না বলিয়া সগুণৌ বল কেন? এইরূপে “অনলংকৃতী” বিশেষণটীও অনর্থক। কারণ অলঙ্কার কাব্যত্বের হেতু নহে, কাব্যের উৎকর্ষমাত্রের বিধান করিয়া থাকে।

বক্রোক্তিজীবিতকারের মতের খণ্ডন।

বক্রোক্তিজীবিতকার যে ‘বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্’ ‘বক্রোক্তিই কাব্যের জীবন’ এই কথা বলিয়াছেন, তাহাও উপরে যাহা উক্ত হইল তাহার দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে কারণ বক্রোক্তি একটী অলঙ্কার মাত্র।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণকার ভোজরাজ কাব্যের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—

ভোজরাজের মত ও তাহার খণ্ডন।

“অদোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিংপ্রীতিঞ্চ বিন্দতি” ॥

দোষবর্জ্জিত, গুণযুক্ত, অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং রসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়া কবি কীর্ত্তি এবং আনন্দ লাভ করেন। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা এই মতও খণ্ডিত হইয়াছে।

ধ্বনিকার যে বলিয়াছেন “কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ” কাব্যের আত্মা ধ্বনি, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি এবং রসাদিধ্বনি এই ত্রিবিধ ধ্বনিই কি

ধ্বনিকারের মত খণ্ডন।

কাব্যের আত্মা না কেবল মাত্র রসাদিধ্বনি? প্রথমটী হইতে পারে না, কারণ প্রহেলিকা (হেঁয়ালী) ও তাহা হইলে কাব্য হইয়া যায়, সুতরাং এই মত অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট। দ্বিতীয়টীই যদি অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমারও আপত্তি নাই।

বিশ্বনাথের মত ও তাহার সমর্থন।

অতএব "বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্", রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বেদাদি-শাস্ত্রে বিমুখ রাজপুত্র প্রভৃতিকে সুস্বাদু করিয়া উপদেশ দেওয়াই কাব্যের উদ্দেশ্য প্রাচীনেরাও একথা স্বীকার করেন। আগ্নেয় পুরাণও বলেন, "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্" বাক্য-বৈচিত্র্যপ্রধান কাব্যের রসই জীবন। ব্যক্তিবিবেককার মহিমভট্টও বলিয়াছেন "কাব্যস্যাত্মনি সঙ্গিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্বিমতিঃ।" অবশ্য স্থায়ী রস প্রভৃতিই যে কাব্যের আত্মা সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। রসযুক্ত প্রবন্ধের মধ্যবর্ত্তী নীরস পদ্যগুলিকেও প্রবন্ধরসের খাতিরেই সরস বলা হয়। সুতরাং যাহাতে রসের সত্তা নাই তাহার কাব্য নাম গৌণ।

বামনের মত খণ্ডন।

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য" রীতিই কাব্যের আত্মা বামনের এই কাব্যলক্ষণ ঠিক্ নহে, কারণ রীতি বর্ণ সন্নিবেশের কৌশল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং রীতি কাব্যের শারীরিক ব্যাপার, আত্মসম্বন্ধীয় নহে, কারণ আত্মা ও শরীর এক নহে।"

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মত।

কিন্তু "পণ্ডিরাজ জগন্নাথ বিশ্বনাথের উক্ত লক্ষণকেও দুষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কাব্যলক্ষণ এই "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"। যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক তাহাই কাব্য। 'রমণীয়তা' শব্দের অর্থ "লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা" অর্থাৎ যে অর্থের জ্ঞান হইলে মনে অলৌকিক আনন্দের উদয় হয় তাহাই রমণীয় অর্থ। যে শব্দসমষ্টি এইরূপ অর্থের বোধ জন্মায় তাহাই কাব্য। 'অলৌকিক' আনন্দ বলা হইতেছে তাহার কারণ "তোমার পুত্র হইয়াছে", "তোমাকে টাকা দিব", এই সমস্ত শব্দের অর্থ বুঝিবামাত্রই মনে আনন্দের উদয় হয় বটে, কিন্তু সে আনন্দ লৌকিক, অলৌকিক নহে। সুতরাং এ শব্দগুলি কাব্য নহে।

জগন্নাথকর্ত্তৃক মম্মটের মত খণ্ডন।

প্রাচীনেরা যে বলেন "অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্" তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিতে হইবে, শব্দ ও অর্থ উভয়ই কাব্যশব্দ বাচ্য হইতে পারে না। প্রমাণ নাই। "উচ্চৈঃস্বরে কাব্য পাঠ করা হইতেছে" "কাব্যের অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে" "কাব্য শুনিলাম বটে কিন্তু অর্থবোধ হইল না"—সকলেই ত এইরূপ

বলিয়া থাকেন। এই সকল স্থলে 'কাব্য' শব্দের দ্বারা শব্দবিশেষই ত বুঝায়। যদি বল সে সকলস্থলে 'কাব্য'শব্দের ব্যবহার গৌণ, অবশ্য তাহা মানিতে পারিতাম যদি শব্দ এবং অর্থ উভয়ে মিলিয়া কাব্য হয়, এ সম্বন্ধে কোনও দৃঢ়তর প্রমাণ থাকিত। কিন্তু তাহা ত নাই। বিপক্ষের মত শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। সুতরাং শব্দ ও অর্থ উভয়ই বুঝাইবার শক্তি 'কাব্য' শব্দের আছে; এ সম্বন্ধে যখন প্রমাণ নাই, তখন আমি যে লৌকিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি "উচ্চৈঃস্বরে কাব্য পাঠ করা হইতেছে" ইত্যাদি, তাহার বলে "কাব্য" বলিতে শুধু শব্দই বুঝায় ইহা সিদ্ধ হইতেছে, কে ইহা নিবারণ করিতে পারে? সুতরাং শব্দই যখন শুধু কাব্য নাম পায় তখন সেইরূপ লক্ষণই করা উচিত। 'কোন্ শব্দকে কাব্য বলিব?' এই প্রশ্ন হইলে, তখন বলিতে হইবে "যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক তাহাই কাব্য।"

সাহিত্যদর্পণে যে নির্ণীত হইয়াছে "রসযুক্ত বাক্যই কাব্য", তাহা ঠিক নহে। বস্তুপ্রধান ও অলঙ্কারপ্রধান কাব্যগুলি তাহা হইলে অকাব্য হইয়া যায়। যদি

বিশ্বনাথের মতখণ্ডন।

বল আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, তাহা হইলে মহাকবিসম্প্রদায়ের মুণ্ডপাত করা হয়। তাঁহারা জলপ্রবাহ, নিপতন, উৎপতন, শিশুক্রীড়া, বানরের ক্রীড়া এই সকল বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন—সেগুলি অকাব্যে পরিণত হয়। যদি বল এ বর্ণনা গুলিতেও কোনরূপ রসস্পর্শ আছে, সেরূপ রসস্পর্শ 'গোরু যাইতেছে', 'হরিণ ছুটিতেছে' এই সকল বাক্যেও আছে। সেরূপ রসস্পর্শ কাব্যত্বের প্রয়োজক হইতে পারে না।

কিন্তু এত মতখণ্ডন করিয়াও কি জগন্নাথ প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন? কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়—তাহা কি তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন?

জগন্নাথের মতখণ্ডন।

তিনি বলেন যে শব্দের অর্থ বুঝিবামাত্র মনে অলৌকিক আনন্দের উদয় হয় তাহাই কাব্য। কাব্য পড়িয়া যে মনে অলৌকিক আনন্দের উদয় হয় তাহা সকলেই বলিতে পারে, কিন্তু সে আনন্দটা কাব্যের কোন্ বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ত জগন্নাথ বলিলেন না। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন কই?

উপর্য্যুক্ত সকল মতের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিশ্বনাথের লক্ষণই শ্রেষ্ঠ। রস না থাকিলে কাব্য হয় না, এ অতি উত্তম কথা। জগন্নাথ পণ্ডিত

বিশ্বনাথের লক্ষণের উৎকর্ষ।

এ লক্ষণের উপরে অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। "গোরু যাইতেছে" "হরিণ ছুটিতেছে"—এই সকল বাক্যে রসের সম্পর্কও নাই। কিন্তু মহাকবিগণের হস্তে পড়িলে এই

বাক্যগুলি এরূপ ভাবে রূপান্তরিত হইবে, যে তাহাকে সরস বলিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রথম অঙ্কে কৃষ্ণসারের পলায়ন কিরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখুন—

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ।
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্॥
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা।
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রযাতি॥"

এরূপ বর্ণনায় রসের অভাব আছে, একথা জগন্নাথ পণ্ডিত বলিলেও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। মম্মটভট্ট এই শ্লোকটীই ভয়ানক রসের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কিন্তু এ প্রবন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা অভিপ্রেত নয়। আমি কতকগুলি মতের উল্লেখ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করিবেন।

ভিন্ন ফুলের রেণু।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

ফুলের ভিতর লূতাতন্তুর মত কেশর থাকে; যে কোন ফুল ছিঁড়িলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কেশর দুই প্রকার তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। কতকগুলির উপরের স্থূল অংশে হাত দিলে চট্‌চটে আঠার মত পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। আর কতকগুলি কেশর স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে ধূলার মত রেণু লাগে। শেষোক্ত কেশরগুলি পুংকেশর। আর চট্‌চটে আঠা সংযুক্ত কেশর গুলি স্ত্রীকেশর। পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরের চট্‌চটে রেণু-ধারকে (stigma) লাগিলে বীজ উৎপন্ন হয়।

অনেক ফুলের মধ্যে উভয়বিধ কেশর থাকে। মাঝের স্ত্রীকেশরটিকে ঘিরিয়া চারিদিকে চারি পাঁচটি বা ততোধিক পুংকেশর থাকে—সকলেরই দেহ সূক্ষ্ম মাথার উপর একটি পুঁটুলির ভিতর রেণু। আবার এক এক ফুলে কেবল স্ত্রীকেশর থাকে, এক এক ফুলে কেবল পুংকেশর থাকে। কুমড়া লতায় স্ত্রী ও পুরুষ কেশর ভিন্ন ভিন্ন ফুলে। যেগুলি স্ত্রীপুষ্প, তাহাদের ঠিক পুষ্পদলের

নিম্নেই একটু গোল স্ফীতি থাকে। রেণু সংযুক্ত হইলে সেই স্ফীত অংশই কুষ্মাণ্ড-ফলে পরিণত হয়। কুমড়ার পুরুষপুষ্প গুলা আমরা ভাজিয়া খাই। আবার এক জাতীয় বৃক্ষ আছে যাহাদের এক গাছে কেবল পুরুষ-পুষ্প জন্মে আর একেবারে ভিন্নগাছে স্ত্রীপুষ্প উৎপন্ন হয়। সুতরাং

(ক) এক শ্রেণীর গাছে একই ফুলে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর উৎপন্ন হয়

(খ) এক শ্রেণীর একই গাছে বিভিন্ন পুষ্পে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর দেখিতে পাই। এবং

(গ) এক শ্রেণীর বৃক্ষে বিভিন্ন গাছে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর জন্মে।

উদ্ভিদবিজ্ঞান নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, যে, একই ফুলের পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরের রেণু-ধারকে পড়িয়া ফুলের গর্ভ-সঞ্চার হইলে ফল ভাল হয় না। ভিন্ন ফুলের রেণু পড়িলে তবে ফল উৎকৃষ্ট হয়। মানুষ এ নিয়ম আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব্বে প্রকৃতি এইরূপ ভিন্ন ফুলের পরাগের দ্বারা বৃক্ষের ফল উৎপাদন করিবার নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি এ প্রবন্ধে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলিব।

এই ভিন্ন ফুলের রেণুর দ্বারা কুসুমের গর্ভাধানের ব্যবস্থা প্রকৃতি দুই প্রকারে করিয়াছেন। প্রথমতঃ ফুলের শারীরিক (physiology) কার্য্যের দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ ফুলের অঙ্গ-গঠনের (structure) দ্বারা।

প্রথম শ্রেণীর ফুলের এমন কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষত্ব নাই। ইহাদের রেণু-ধারকের আঠার উপর সেই পুষ্পের পুংকেশরের রেণু পড়িতে পারে বটে কিন্তু ইহাদের স্ত্রীকেশরের এমন একটা নির্ব্বাচন-শক্তি আছে যে তাহাদের ক্ষেত্রে নিজের ফুলের রেণু পড়িলে তাহা ব্যর্থ হয়। এই সকল গর্ভকেশরে সেই ফুলের রেণুর সহিত ভিন্ন ফুলের রেণু পড়িলে ইহাদের এই শক্তির দ্বারা কেবল ভিন্ন ফুলের রেণুর দ্বারাই ইহাদের গর্ভাধান হয়। ইংরাজ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান এই শক্তিকে prepotency বলে। বলা বাহুল্য, স্ত্রীপুষ্পের এই শক্তি বড়ই অদ্ভুত।

কতকগুলি ফুলের self-sterility বা "আত্ম-বন্ধ্যা" দোষ বা গুণ আছে। ইহাদের উপর নিজের ফুলের রেণু পড়িলে কিছুতেই ইহাদের ফল ফলে না। আবার, এই শ্রেণীর কতকগুলি ফুলের পক্ষে নিজের পরাগ একেবারে বিষ। একই ফুলের রেণু পড়িলে ইহাদের গর্ভ-কেশর একেবারে জ্বলিয়া যায়। এই ত গেল দেহের শক্তির দ্বারা ভিন্ন ফুলের রেণুকর্ত্তৃক গর্ভাধানের নিয়ম।

দেহের গঠনের দ্বারাও প্রকৃতি বিভিন্ন ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ কেশরের

সংযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের প্রথম নিয়মের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন কোন বৃক্ষে স্ত্রীজাতীয় কেশর এক ফুলে জন্মিয়া থাকে, পুরুষ কেশর ভিন্ন ফুলে দেখা যায়।

দ্বিতীয় নিয়মটি বড় সুন্দর। যে বৃক্ষে স্ত্রী ও পুংকেশর একই ফুলে জন্মিয়া থাকে, সে সকল ফুলে ঐ দুই প্রকার কেশরের পরিণতি বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে। কুসুমের এই আকৃতির বিশেষত্বকে dichogamy বলে। যৌবনকাল উপস্থিত না হইলে উৎপাদন-শক্তি জন্মে না, এ বিধি জীব-জগতে সাধারণ। এই শ্রেণীর পুষ্পে কোন স্থলে পুরুষ-কেশর গুলি যখন যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের রেণুর যখন গর্ভসঞ্চার করিবার শক্তি জন্মে, তখন সেই ফুলেরই কেশরস্ত্রী কিশোরী মাত্র। সুতরাং সে রেণু তাহার গাত্রস্পর্শ করিলেও সাড়া পায় না, নষ্ট হইয়া যায়। সেই সময় অন্য ফুলের স্ত্রীকেশর যৌবনত্ব লাভ করে। তাহাদের চট্‌চটে রেণু-ধারক (stigma) ফুলের রেণু ধরিয়া লয়, তাহাদের ফল ফলে। তাহার পর এই পুরুষকেশরের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, ইহাদের রেণুকোষ নিঃশেষ হইলে, তবে স্ত্রীকেশরের পরিণতি হয়। তখন অপর ফুলের রেণু আসিয়া তাহার গর্ভে ফল উৎপাদন করে। পুংকেশরের পূর্ব্বে যৌবনলাভের ব্যবস্থাকে ইংরাজি বিজ্ঞান protandry বা "পূর্ব্বসামীত্ব" বলে। কোন কোন ফুলে আবার স্ত্রীকেশরের যৌবন-লাভ পূর্ব্বে ঘটে। অপর ফুলের রেণু লইয়া ইহাদের গর্ভ কেশরে ফলের ভ্রূণ জন্মিলে তবে ইহাদের নিজের কেশরের রেণু-কোষের পরিণতি হয়। স্ত্রীকেশরের প্রথম যৌবনলাভের ইংরাজি নাম proterogyny.

একই ফুলের রেণুর দ্বারা গর্ভাধান নিবারণ করিবার জন্য প্রকৃতি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা জবা প্রভৃতি পুষ্পে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ফুলের চুঙ্গির ভিতর স্ত্রীকেশর ও পুংকেশর এমন ভাবে সংন্যস্ত যে রেণু স্ত্রীকেশরের আঠার উপর পড়িতে পারে না। জবাফুলের সকল কেশর মিলিয়া একটি নলের আকার ধারণ করিয়াছে। নলের উপরের স্ফীত অংশে স্পর্শ করিলে সেগুলিতে আঠা আছে বুঝিতে পারা যায়। মৌমাছি অপর ফুলের রেণু আনিয়া অগ্রে এই গুলিকে ছুঁইয়া তবে নীচের স্তরের রেণুকোষে পঁহুছিতে পারে। তখন ইহার নিজের রেণু লইয়া আসিলে আর তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে না।

কাঠগোলাপ (primrose) প্রভৃতি ফুলে বিভিন্ন ফুলের রেণু পাইবার এক বিশিষ্ঠ উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর গাছে দুই প্রকার ফুল ফোটে। এই শ্রেণীর ফুলে পাঁচটি করিয়া পুংকেশর থাকে। ইহাদের এক

একটি ফুলের স্ত্রীকেশর লম্বা পুংকেশর পাঁচটি খর্ব্ব একেবারে ফুলের ভিতর সংন্যস্ত। আর এক একটি ফুলের পুংকেশর পাঁচটি লম্বা, স্ত্রীকেশর ছোট, পুষ্পচুঙ্গির ভিতর অবস্থিত। বলা বাহুল্য, ইহাদের আকৃতির এই বিশেষত্ব সহজেই অনুমেয়। অলি খর্ব্ব পুংকেশর যুক্ত ফুলের ভিতর মধু আহরণ করিবার সময় অঙ্গে ফুলের রেণু মাখে তাহার পর লম্বা স্ত্রী-কেশর যুক্ত ফুলে ভ্রমণ করিবার সময় অগ্রে সেই রেণু স্ত্রীকেশরে লাগাইয়া তবে ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

অনেক পরগাছায় (orchids) রেণুকোষের এক প্রকার বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহাদের পুষ্পের যে অংশে অলি আসিয়া বসে সে অংশটি চট্‌চটে স্ত্রী-কেশর। ইহার উপরে মুগুরের মত উচ্চ অংশের ভিতর পুঁটুলি বাঁধা রেণু থাকে। ফুলের স্ত্রীকেশরের উপর অলি বসিয়া ঐ মুগুরের মত অংশের নীচে মধু খুঁজিবার সময় সেই পুঁটুলি ফাটিয়া যায় এবং ষট্‌পদের শিরে রেণু লাগিয়া যায়। সেই ফুলের উপর আর রেণু পড়িতে পারে না। পরে যখন সেই অলি অন্য ফুলে যায় তখন সেই রেণুগুলা তাহার ললাট হইতে সেই ফুলের রেণু-ধারকে লাগিয়া যায় এবং সেই কুসুমের গর্ভ হয়।

অবশ্য অনেক ফুলে নিজের রেণুর দ্বারা ফল উৎপাদিত হয়। কিন্তু সে শ্রেণীর পুষ্প অল্প।

চিত্রকর।

[শ্রীঅবনীকুমার দে।]

(১)

বৃদ্ধ সওদাগর মলহর রাওয়ের পালিত পুত্র চিত্রগোপাল শৈশব হইতেই চিত্রাঙ্কনে মন দিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই ছয় ঋতু, গিরিপথ, কৌমুদী-দীপ্ত নির্ঝরিণী, শষ্পসমাচ্ছন্ন উপত্যকা প্রভৃতির নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ক্রমেই সে দক্ষতালাভ করিতেছিল। সে মধ্যে মধ্যে দুই একটি মনুষ্য-মূর্ত্তিও তুলিকায় প্রতিফলিত করিয়াছে। তাহার নিবিড় চিত্রশালাটি কেবল তাহারই অঙ্কিত আলেখ্যে পূর্ণ।

রাজ্যের অধিপতি মহারাজ বিজয়সিংহও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার বিখ্যাত চিত্রাগারটি যথার্থই তাঁহার অপরিসীম শিল্পানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। তদ্ব্যতীত চিত্রবিদ্যার সম্যক্ অনুশীলনের জন্য তিনি সেই বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী অজিতবর্ম্মাকে তাঁহার পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য প্রাসাদতুল্য বাসভবন দিয়াছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী বৃদ্ধ অজিতবর্ম্মাকে স্বয়ং মহারাজা এবং রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিত। মহারাজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-নিদর্শনে মনবৃত্তিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রায়ই এই বৃদ্ধ শিল্পীর সহিত একত্র অশ্বপৃষ্ঠে রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন।

(২)

দ্বিপ্রহরের পর আপনার চিত্রশালায় বসিয়া চিত্রগোপাল অতি ধীরে ধীরে একখণ্ড খড়িমাটির সাহায্যে সম্মুখস্থ একটী বিরাট মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের উপরে নির্জ্জন বালুকাতটে একটি পত্রবিহীন শুষ্ক তরু অঙ্কিত করিতেছিল। তাহার সমস্ত চিন্তা ও একাগ্রতা ঐ শুষ্ক তরুটির প্রতি অভিনিবিষ্ট।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। স্নিগ্ধ মলয়ানীল বসন্তের সুগন্ধ পশরা লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করিতেছে। এক একবার চিত্রগোপালের শিল্পশালার খোলা জানালা দিয়া চোরের মত আনাগোনা করিতেছিল। দূরে পশ্চিমাকাশ হইতে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা শুষ্ক তরুর পাদদেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সহসা উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে অশ্বপদ শব্দ শুনিয়া চিত্র ফিরিয়া চাহিল।

বৃদ্ধ অশ্বারোহী বলিলেন "বালক! তুমি ছবি আঁকিতে পার?" তাঁহার দৃষ্টি ঐ অঙ্কিত শুষ্ক তরুটির প্রতি সংরুদ্ধ।

চিত্র কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না,—শুধু আপনার স্কন্ধদেশ কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল।

অশ্বারোহী পুনরায় বলিলেন "বালক! তুমি রাজপ্রাসাদে যাইও। অজিত-বর্ম্মা স্বয়ং তোমাকে শিল্পশিক্ষা দিবেন। তাঁহার একজন শিষ্যের প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অপরিচিত অশ্বারোহী অশ্ববল্গা ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

(৩)

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ছবি মলহর রাওয়ের একমাত্র কন্যা। ছবি, চিত্রের বাগ্দত্তা পত্নী। যুবক চিত্র যখন আপন মনে বসিয়া [illegible] অঙ্কিত করে তরুণী ছবি

তখন তাহার পার্শ্বে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে। যুবক তুলিকা-ধারণপূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে রঙ্গের উপর রঙ্গ ফলাইয়া যায় আর তরুণী সতৃষ্ণ নয়নে ঐ করাঙ্গুলির প্রতি চাহিয়া থাকে।

অশ্বারোহী চলিয়া যাইবার পর চিত্র আপন মনে ভাবিতে লাগিল। সে একটী ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া শুষ্ক তরুটি আঁকিতেছিল, এমন সময় সহসা অপরিচিত অশ্বারোহী আসিয়া তাহার কানে কানে কি সম্মোহন-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—তাহার শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হইয়া উঠিল! চিত্র ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিল!

ছবি আসিয়া চিত্রের পার্শ্বে উপবেশন করিল। চিত্র, ছবির নিকট কোন কথা গোপন করে না,—অশ্বারোহীর সকল কথা তাহার নিকট বলিল।

তিন মাস পরে তাহাদের বিবাহ হইবার কথা, কিন্তু ছবি ভাবিল, চিত্র রাজ-প্রাসাদের বিখ্যাত শিল্পী অজিতবর্ম্মার নিকট শিল্প-শিক্ষা করিতে যাইবে, এ কত বড় কথা! কত উচ্চ সম্মান! কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! চিত্রের উচ্চমর্য্যাদা—এ যে তাহার! সে যে তাহারই!

ছবি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল "তবে তুমি নিশ্চয়ই একজন খুব বড় শিল্পী হইবে—না?"

চিত্র বলিল "হাঁ—যদি অপরিচিত অশ্বারোহীর কথা সত্য হয়। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি?"

কম্পিত কণ্ঠে চিত্র বলিল "ছবি! যদি আমরা উভয়েই যাইতে পারিতাম!"

তখন চক্রবাল নিম্নে শেষ সূর্য্যরেখা মিলাইয়া যাইতেছিল, শুধু একটি মাত্র অস্ফুট কিরণ-রেখা চিত্রের বাষ্পাকুললোচনে আসিয়া প্রতিফলিত হইল। ছবি, চিত্রের হস্ত দু'টি আপনার করতলে আনিয়া তাহার উভয় চক্ষুর উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া উত্তর করিল "কেন?—সামান্য কয়েকটা বৎসর বই ত নয়? আমি তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় বসিয়া থাকিব আর প্রতিদিন একমনে পরমেশ্বরের নিকট তোমারই মঙ্গল-প্রার্থনা করিব। আমার প্রার্থনায় নিশ্চয়ই তুমি সফল হ'বে।"

(৪)

প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড ভবনের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রসিদ্ধ শিল্পী অজিতবর্ম্মা বসিয়া আছেন। গৃহের চতুষ্পার্শ্ব হইতে কেবল নানাবিধ শিল্পসরঞ্জাম তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। কোণে [illegible] একখানি অর্দ্ধ[illegible] চিত্র [illegible]ও একটি

অসম্পূর্ণ নগ্ন রমণীমূর্ত্তি, কোথায়ও বা শুধু একখণ্ড চিত্রপট, বিবিধ শিল্পপ্রস্তর, নানা প্রকার ধাতুপদার্থ সযত্নে রক্ষিত। গৃহের চারিদিকে শুধু রং আর তুলিকা।

কতকগুলি চিত্র-হস্তে একটি বালক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি একে একে তাহার অঙ্কিত চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন "হাঁ, চিত্রগুলি বালকেরই উপযুক্ত বটে। তবে তুমি খুব চেষ্টা করে শিখ্‌লে ভবিষ্যতে ভাল রং ফলাতে পারবে।" এই বলিয়া তিনি চিত্রগুলি উপেক্ষার সহিত মেজের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিত্র তাঁহার এই অবজ্ঞায় অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথিত হইল।

তৎপরে শিল্পী নিকটস্থ একটি প্রস্তরখণ্ডকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"যাও, উহার উপর একটি মানুষের হাত এঁকে নিয়ে এস।"

একখণ্ড সূক্ষ্মাগ্রভাগ খড়িমাটি হাতে লইয়া চিত্র হস্তাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল। বৃদ্ধের ব্যবহারে সে মনে মনে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল।

শিল্পী একমনে বসিয়া আছেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে বালকের প্রতি মৃদুহাস্য বর্ষণ করিতেছেন। চিত্রের নিকট তাহা বিদ্রূপাত্মক বোধ হইতেছিল। সে কেবলই বৃদ্ধের মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল। কার্য্যের প্রতি মন ও দৃষ্টি কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে কিছুক্ষণ পরে হস্তখানি অঙ্কিত করিয়া শিল্পীর সম্মুখে ধারণ করিল।

শিল্পী দেখিলেন হস্তখানির বহির্দৃশ্য মোটামুটি নির্ভুল কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাতে যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়।

অতঃপর গম্ভীর স্বরে শিল্পী বলিলেন "আমি তোমাকে একটি নরহস্ত অঙ্কিত করিতে বলিয়াছি। আমি তোমাকে বনমানুষ কিম্বা কুম্ভীরের থাবা আঁকিতে বলি নাই।"

চিত্র বৃদ্ধের মর্ম্মান্তিক শ্লেষে অধোবদনে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অজিতবর্ম্মা পুনরায় বলিলেন "যাও!—তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও এবং যে প্রকার ছোট ছোট ছবি আঁকিতে ছিলে তাই আঁকিতে থাক। যদি কখনও কোনদিন একটি হাত আঁকিতে পার, তবে পুনরায় আমার নিকট আসিও।"

বৃদ্ধের কথায় চিত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। অকৃতকার্য্য হইয়া সে কিরূপে গৃহে ফিরিয়া যাইবে? সে কি বলিয়া ছবির নিকট আপনার অপযশ কলঙ্কিত মুখ দেখাইবে? ছবি বলিয়াছিল "তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।" তবে কি সে [illegible] কখনও হইতে পারে

না—সে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। হৃদয়ে শেষ আশার সঞ্চার করিয়া নির্ভীকচিত্তে চিত্র বলিল "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একটিবার মাত্র চেষ্টা করিতে দিন।"

অজিতবর্ম্মা বলিলেন "আচ্ছা! তাই হউক।"

(৫)

চিত্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিল। কি প্রকার হস্ত অঙ্কিত করিবে মনে মনে কেবল তাহারই একটা ধারণা করিয়া লইতে লাগিল। সহসা তাহার ছবির কথা মনে উদিত হইল। হঠাৎ বিদায় দিনের ছবির সেই সুন্দর সুকোমল হস্ত তাহার মনে পড়িল। যেদিন চিত্রশালায় সেই শুষ্ক তরুটির নিম্নে বসিয়া তাহার হস্তখানি আপনার হস্তমধ্যে টানিয়া লইয়া সে বলিয়াছিল "তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।" কি মনোরম—কি কোমল—কি সুগঠিত সে হস্তখানি! আপনা হইতেই সে ধীরে ধীরে আঁকিতে আরম্ভ করিল। তাহার হস্তের উপর ছবির হস্তটি যেরূপ ছিল সে স্মৃতি হইতে তাহা চিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিল। একটির পর একটি করিয়া অতি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে প্রত্যেক অঙ্গুলি শিরা-উপশিরা আঁকিতে আরম্ভ করিল। অতি নিবিষ্ট চিত্তে প্রতি রেখায় রেখায় তাহার সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। স্বচ্ছ নখের কোণে রক্তের গোলাপী আভাটুকু পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থির কোমল ভঙ্গিটুকু অবধি উজ্জ্বলরূপে দাগিয়াছিল। এবার আনন্দে অজিতবর্ম্মার মুখশ্রী দীপ্তগরিমায় বিকশিত হইয়া উঠিল! তিনি ঘাড় নীচু করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বালকের প্রত্যেক অঙ্গুলি-সঞ্চালন একাগ্রচিত্তে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে হস্তটি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইলে তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "এই হস্তের অধিকারীকে অশেষ ধন্যবাদ!"

চিত্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

অজিতবর্ম্মা পুনরায় বলিলেন "বালক আজ হইতে আমি তোমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মনে রাখিও যশের পথ অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ। আমি তোমাকে যাহা বলিব তোমাকে চুপ করিয়া তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। তারপর তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে ঐ হস্তখানিকে গ্রহণ করিও—আমি তাহাতে কোনও আপত্তি করিব না। কেমন—বুঝিতে পারিয়াছ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিত্র ধীরে ধীরে উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ।"

"না—শুধু 'হাঁ' বলিলেই [illegible] জ্ঞানকে

পরিস্ফুট করিতে হইলে বহুদর্শিতা লাভ করা চাই। কিন্তু তাহা একদিনে হয় না। তাহার জন্য একটা যুগের একাগ্র সাধনার আবশ্যক। সকল সময়ে সে সাধনা হয় না। জীবনের একটা শুভলগ্ন আছে। সে লগ্ন একবার আসে। লগ্ন অতীত হইয়া গেলে শুধু জীবনটা পড়িয়া থাকে মাত্র। কিন্তু তুমি কি সেই কঠোর সাধনায় দীক্ষিত হইতে পারিবে?"

চিত্র, তুলিকা ও বর্ণপাত্র তাঁহার চরণনিম্নে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ।" গম্ভীর ভাবে অজিতবর্ম্মা উত্তর করিলেন "কল্য হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তোমার কার্য্যকাল। তার পর ছুটি।"

(৬)

প্রথম প্রথম চিত্র ছবির কথা অত্যন্ত ভাবিত। কিছুতেই তা'র দীর্ঘ দিন গুলা অতিবাহিত হইতে চাহিত না। অবশেষে অনেক কষ্টে এক বৎসর অতীত হইল। এতদিন চিত্র শুধু আঁকিয়াছে, এবার রঙ্গের পালা। এখন তাহাকে তুলিকা-সম্পাতে বর্ণসৌষ্ঠব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

অজিতবর্ম্মা মনে মনে বলিলেন "এবার চিত্র একটি স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইবে। সে স্বপ্নরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই হস্তাধিকারিণী! জীবনের বাকিটুকু তাহাকে তাহারই নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে।" বৃদ্ধ শুধু শিল্পী নহেন—মহাকবি!

ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। চিত্র, এবার মনুষ্যমূর্ত্তি বর্ণে প্রতিফলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে প্রায়ই ছবির পত্র পাইয়া থাকে। সেই পত্রের প্রতি ছত্রে কত আশা, কত উদ্দীপনা, কত ভবিষ্য সুখস্বপ্নের সম্মোহন-চিন্তা তাহার কৈশোর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে!

আর মাত্র তিন মাস বাকি।

সেদিন অজিতবর্ম্মা একমনে কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি মর্ম্মর-প্রতিমা। তিনি এই দুই বৎসর যাবৎ অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে এই প্রতিমাটি স্বহস্তে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। একটি অঙ্কিত হস্ত হইতে তাঁহাকে এই মর্ম্মর-প্রতিমার সমস্ত অবশিষ্ট অবয়ব শুধু কল্পনাবলে ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। তিনি শুধু একটি হস্ত পাইয়াছিলেন, বাকিটুকু তাঁহাকে তাঁহার [illegible]মান্য সূক্ষ্ম-দর্শিতা ও কবিত্বের বিচার-শক্তির মধ্য দিয়া [illegible]কাশ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি [illegible] কোথাও একটু [illegible] নাই। [illegible] অনুযায়ী হস্তের এবং হস্তানু- [illegible]

ায়ী দেহের কুত্রাপি এতটুকুও বিসদৃশ ভাব যে কোনও কৃতকর্ম্মা শিল্পীর পক্ষে আবিষ্কার করা অসম্ভব !

সহসা তিনি চিত্রকে ডাকিলেন।

চিত্র আসিল। তিনি তাহাকে বলিলেন "এই তিনমাস অতিক্রম হইবার পূর্ব্বে তুমি ইহাকে বর্ণে প্রতিফলিত কর। কিন্তু চক্ষু দু'টি অমনি রাখিয়া দিবে।"

চিত্র মর্ম্মর-প্রতিমাটি দেখিবামাত্র বিস্ময়চকিতনেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিল !

(৭)

তিন মাসের মধ্যেই প্রতিমাটিকে বর্ণে প্রতিফলিত করিতে হইবে। চিত্র দিবারাত্র অত্যন্ত পরিশ্রম-সহকারে প্রতিমাটিকে অবধারিত সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বেই বর্ণে প্রতিফলিত করিয়া সম্পূর্ণ করিল। এত শীঘ্র সমাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া অজিতবর্ম্মা প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। চিত্র ভাবিল, তবে বুঝি সে কৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু যখন অজিতবর্ম্মা প্রতিমাটি দেখিবামাত্র আনন্দে স্বীয় আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না !

কিছুক্ষণ পরে অজিতবর্ম্মা বলিলেন "বৎস ! তোমার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।"

সবিস্ময়ে চিত্র গুরুদেবের মুখপানে চাহিল !

অজিতবর্ম্মা স্মিতমুখে বলিলেন—"এখন তুমি তোমার সেই হস্তাধিকারিণীর নিকট যাইতে পার।"

চিত্র ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল "কিন্তু গুরুদেব ! আমার কার্য্যকাল ত এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।"

চতুর গুরুদেব শিষ্যের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরস্বরে আজ্ঞা দিলেন—"আচ্ছা ! তবে চক্ষু দু'টিও অঙ্কিত কর। তোমাকে বিজয়গর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া সে যে প্রকার আনন্দে অভ্যর্থনা করিবে, চক্ষু দুইটীতে সেইরূপ ভাব ফুটাইতে হইবে।"

গুরুআজ্ঞায় অতিশয় সন্তর্পণে একাগ্রচিত্তে চিত্র চক্ষুদু'টি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল। যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষুদু'টি তা'র প্রাণের ভিতর থাকিয়া এতকাল উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল—সে আজ তাহাই পরিস্ফুট করিবে। অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা আজ তাহাকে [illegible] দু'টির উপর নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

নির্জ্জন কক্ষ। সে একাকী বসিয়া বসিয়া অতি সন্তর্পণে আপনার শেষ কার্য্যটি সমাপন করিতেছে। কক্ষের সমস্ত দ্বার-গবাক্ষাদি চারিদিক হইতে বন্ধ। অনাহারে অনিদ্রায় সপ্তাহকাল পরিশ্রম করিয়া চিত্র চক্ষুদু'টি অঙ্কিত করিল।

প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে চক্ষুদু'টি দেখিয়া বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী বলিলেন—"বৎস! তুমি চিরজীবী হও। তুলিকাধারণ করিবার জন্য আমিও কোথায় এরূপ হস্ত কিম্বা চক্ষুদু'টি খুঁজিয়া পাই নাই!"

চিত্র তাঁহার আন্তরিক কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না।

(৮)

অদ্য শিল্পপ্রদর্শনী। মহারাজা বিজয়সিংহ, মহারাণী এবং রাজ্যের নিমন্ত্রিত যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাবর্গ সমভিব্যহারে প্রদর্শনী দেখিতে আসিবেন। বৃদ্ধ সওদাগর মলহর রাও-ও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আজ চিত্রের গুণপনার বিচার। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী বসিয়াছে। রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার জন্য আজ রাজপ্রাসাদ অবারিত। অজিতবর্ম্মা আজ স্বয়ং মহারাজাকে শিষ্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। অদ্য তিনি কিছুই প্রদর্শন করিবেন না—শুধু একটি মূল্যবান্ মখ্‌মলাবৃত প্রতিমূর্ত্তির আবরণ-উন্মোচন করিবেন।

যথাসময়ে মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দে অধীর হইয়া বৃদ্ধ শিল্পী অজিতবর্ম্মা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া একপাশে একত্র হইলেন। মহি রা অন্যদিকে সমবেত হইয়া বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর শিষ্যের কৃতিত্ব দেখিবার জন্য দগ্রীব। চারিদিকে বিপুল জনসঙ্ঘ।

সমস্ত নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে কাষ্ঠনির্ম্মিত সো ানাবলী অতিক্রম করিয়া অজিতবর্ম্মা উচ্চমঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী মঞ্চের দিকে সতৃষ্ণনয়নে ঝুঁকিয়া পড়িল। মহিলারা একপাশ ইতে অবগুণ্ঠন-উন্মোচন পূর্ব্বক আত্মবিস্মৃত হইয়া পলকহীননেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অজিতবর্ম্মা ধীরে ধীরে মখ্‌মলের আবরণটি উন্মো ন করিতে লাগিলেন। চিত্র তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হৃদয়টি প্রতে ক পলে পলে এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল! প্রত্যেক র্ত্তটি অদ্য তাহার নিকট নিতান্ত অপরিসীম বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল! রূপ অধীরতার মধ্যে ক্রমে সমস্ত আবরণটি উন্মুক্ত হইব মাত্র বিপুল জনস ের বিস্ময় ও উল্লাসে [illegible] পাদ মুখরিত হইয়া উঠিল!

মহারাজা আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া চিত্রকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণপাত্রস্থিত 'ধানদুর্ব্বা' দিয়া চিত্রের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। কিন্তু সহসা একি!—সবিস্ময়ে চিত্র দেখিল যেন পাষাণ-প্রতিমাখানি সোপাননিম্নে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

সে ছুটিয়া গিয়া প্রতিমাটী তুলিতে [illegible]—পাষাণপ্রতিমা জীবন্ত হইয়া তাহার বক্ষপাশে আবদ্ধ হইল!

খাঁটি বাঙ্গালা কথার বিশেষত্ব।

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ]

ইংরাজী ভাষাতত্ত্বে একটা কথা আছে ফোনেটিক্ ডিকে (Phonetic Decay) অর্থাৎ সকল দীর্ঘ শব্দ কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া হ্রস্ব হয়। কিন্তু শব্দ সাধারণতঃ প্রথমে দীর্ঘ থাকে পরে হ্রস্ব হয়, না প্রথমে হ্রস্ব থাকে পরে দীর্ঘ হয়? মানব সমাজের জ্ঞান ও শব্দসম্পদের ক্রমোন্নতির ইতিহাস একজন মানবের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। শিশু যেমন প্রথমে এক অক্ষরের ভাষা ব্যবহার করে যথা 'মা' 'দা' 'কু', মানবসমাজও আদিম অবস্থায় সেইরূপ করিত। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু সংস্কৃত, লাটিন্ প্রভৃতি ভাষায় দীর্ঘ শব্দই অধিক এবং এই সকল প্রাচীন ভাষাজাত ইংরাজী হিন্দী বাঙ্গালায় হ্রস্ব শব্দই অধিক। তবে যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা লাটিন্ জাত সেগুলি দীর্ঘ। যাহা হউক, আমরা কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই যে খাঁটি বাঙ্গালায় এক স্বর ও দুই স্বর বিশিষ্ট শব্দই অধিক। খাঁটি বাঙ্গালা উচ্চারণে সংবৃতধ্বনিই অধিক, হিন্দীতে মুক্তধ্বনিই অধিক। বাঙ্গালায় যেখানে সংস্কৃত "দ্বার" স্থানে "দোর", হিন্দীতে তথায় 'দুয়ার'।

যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার নিতান্তই আবশ্যক, যাহা নহিলে চলে না, সেই সকল দ্রব্যের নাম প্রায়ই এক বা দুই স্বর বিশিষ্ট যথা (১ স্বর) চাল্, ঘর্, দোর্, চা'ল্, ডাল্, নুন্, তেল্, ঘি, দুধ্, জল্, গাং, ইট্, কাঠ্, গাই, মোষ্, মান্, গুড়্, শাক্, পাত্, [illegible]ল্, মূল্, গাছ, আম, [illegible]ম্, তাল, বেল, পাণ, চুণ্; (২ স্বর) [illegible] চৌকাট্, কাপড়্, [illegible] সুত, জামা, ঘটি, বাটি, [illegible]লা, চাবি, ধনে,

জীরে, লঙ্কা, হলুদ, মরিচ্, আলু, বেগুন্, পটোল্, কচু, তেঁতুল্, কাঁটাল্, কলা, নার্‌কেল্, গোবর্, ঘুঁটে, গোরু, বাছুর, বলদ, চিনি, মধু, মাখন্, মিছ্‌রি, ছুরি, কাঁচি, সুতো, জুতো, ছাতা, হুকো, কল্‌কি, তামাক্, টাকে, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস্, আফিম্, কাগজ্, কালি, দোয়াত্ (সংক্ষেপে দোত্), ইত্যাদি।

বাঙ্গালী শিশু নিকটস্থ আত্মীয়ের নাম করিবার সময়ে বলে 'মা' কিম্বা বাবা, কাকা, মামা, দাদা, দিদি। এগুলি এক বর্ণেরই দ্বিরুক্তি কিন্তু পিসী, মাসী এ নিয়মের বহির্ভূত। তবে পিসীকে পিতৃগৃহে যত অধিক দেখা যায় মাসীকে তত অধিক দেখা যায় না, তাই হিন্দুস্থানী পিসীকে বলে "ফুফু", তাহারা মাতামহকে বলে "নানা"। বাঙ্গালীর "আজা" বা "জ্যেঠা" কেমন যেন অস্বাভাবিক, শিশুর উচ্চারণের উপযুক্ত নহে।

যাহা হউক, মোটামুটি দেখিতে পাইতেছি বাঙ্গালার কথিত ভাষার গতি ফোনেটিক্ ডিকের দিকে অত্যন্ত বেশী ঝুঁকিয়াছে। তাই 'বিবাহ' অন্য স্থানে 'বিয়ে' কিন্তু কলিকাতায় 'বে'। 'খাইয়া', 'যাইয়া' ত্রি-স্বর হইতে দ্বি-স্বর 'খেয়ে' 'গিয়ে' হইয়াছে কিন্তু তাহাও এরূপ দ্রুত উচ্চারিত হয় যে, মনে হয় যেন একস্বর শব্দই উচ্চারিত হইতেছে। এইরূপ 'দেওয়া'—কলিকাতায় 'দোআ', ইহার 'ও'কার ও 'আ'কার একত্রে মিশ্র স্বর মনে করিলে এইরূপ ক্রিয়াগুলিও একস্বর বিশিষ্ট হইতেছে।

বীরভূম জেলার নলহাটি নামক গ্রামের সন্নিকটে কোন লোক একবার একাক্ষরী ভাষায় কথা বলিতেছিল " 'ক' কিন্‌তে 'য' হলোনা, 'য' হলোত 'খ' হলোনা, 'খ' হলো ত 'শ' হলো না।" অর্থাৎ "কোআ কিন্‌তে যাওয়া হলোনা, যাওয়া হলো ত খাওয়া হলোনা" ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে শুধু কলিকাতা বলিয়া নহে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই, আর বাঙ্গালাই বা বলি কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ অল্পধ্বনিতে বা অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে চাহে। পরিশ্রমের লাঘব সকলেরই বাঞ্ছনীয়, তাই দীর্ঘ শব্দ ক্রমেই হ্রস্ব হয়।

খাঁটি বাঙ্গালার কবিতা হইল ছড়া। ইহাতে প্রতি পদে (foot) দুই স্বর থাকে। যথা,—

বিষ্টি। পড়ে। টাপুর্। টুপুর্। নদী। এলো। বাণ্।

তাই ছড়া শিশুর এত মনোযোগ আকর্ষণ করে। শিশু ও অশিক্ষিতা নারী [illegible]ই এত সহজে ছড়া আয়ত্ত করিতে পারে। কারণ বাঙ্গালীর খাঁটি শব্দের অধিকাংশই এ[illegible] বা দুইস্বর বিশিষ্ট।

যে সকল বিদেশী শব্দ এইরূপ ক্ষুদ্র (যথা স্কুল্, কলেজ্, বেঞ্চ্, চেয়ার্, জজ্, মুন্সেফ্) সেগুলি যত সহজে ভাষার মধ্যে খাপ খাইয়াছে দীর্ঘ শব্দগুলি (যথা য়ুনিভার্সিটি, আমেরিকা, মাজিষ্ট্রেট) তত সহজে ভাষায় খাপ খায় নাই। তাই 'আমেরিকান' আমাদের ভাষায় 'মার্কিন' এবং 'ইয়ুরোপ্' আমাদের ভাষায় 'বিলাত' এবং 'মরিশস্' আমাদের ভাষায় 'মারীচ' মুলুক।

মহাযুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ]

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউরোপে যখন এই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ভেরী প্রথমে বাজিয়া উঠে, তখন আমাদের অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে আমাদের রাজা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিলেও ভারতবাসীর কোন লাভ-লোকসান হইবে না। কেহ বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে যখন আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ভারতবাসী যোগদান করিতে পারিবে না, তখন ভারতবর্ষের সহিত এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক হইবে না। কেহ ভাবিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং এই 'সর্ব্বনেশে' যুদ্ধে ভারতবাসীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই সকল মতামত যে কয়েক বৎসরের যুদ্ধের ফলে বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আর অবিদিত নাই। যুদ্ধের জন্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল দিকেই বেশ একটা 'হেস্ত নেস্ত' হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছেও। স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতে মন্ত্রণাদিতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন, বাঙ্গালী যুবকগণ রণক্ষেত্রে রাজার জন্য রক্তপাত করিয়াছেন—উভয়ই আমাদের গৌরবের বিষয়।

অবশ্য কেবল কৃষির দিক হইতে পর্য্যালোচনা করিলে ভারতবাসীর বেশী লাভলোকসান হয় নাই। শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত হইতেছে না। কেবল এই ক্ষেত্রের দিকে চাহিলে মনে হয় যে, যুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক নাই, ভারতবর্ষ যুধ্যমান জাতিগণের অন্তর্ভুক্ত নহে—যেন [illegible] নির্লিপ্ত জাতি।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে [illegible] ত হইবে।

ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ ব্রিটীশ রাজত্বের অংশভূত বলিয়া তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সে বৈদেশিক জাতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে বাধ্য; তাহার দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সে পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং সমুদ্র হইয়া দূর দেশান্তর হইতে এই সকল সম্ভার পৌঁছাইবার পক্ষে এই যুদ্ধ অন্তরায় হইয়াছে। অবশ্য, ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের মালিক; কিন্তু, সমুদ্রপথে আর এই সকল কাঁচা মাল বিদেশে সহজে পৌঁছিতে পারে না—এগুলি আর সে বিক্রয় করিবার সুবিধা পায় না। পক্ষান্তরে, বিদেশাগত নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য তাহাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে বিক্রয় করিতে হইতেছে কম মূল্যে, অথচ কিনিতে হইতেছে বেশী মূল্যে। ভারতবর্ষের মাল পাঠাইবার আপনার জাহাজ নাই—তাহার রপ্তানী যোগ্য মাল (২।১টী বাদে—যেমন চটের থলে) আর বিদেশে যাইতে পারিতেছে না।

ফলে যুদ্ধের প্রারম্ভেই এই ফল দাঁড়ায়—

(১) শত্রুর দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইল। আমাদের রপ্তানীর শতকরা চতুর্দ্দাংশ পণ্য বিদেশে যাইত—এই পণ্য দেশে থাকিতে লাগিল—অবিক্রীত থাকিল।

(২) বৈদেশিক আমদানী বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল। জর্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সকল যোধেয় দেশেই শিল্পজাত দ্রব্য কম পরিমাণে উৎপাদিত হইতে লাগিল। এই সকল দেশ যুদ্ধের জন্য আবশ্যক গোলাগুলি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য লোক ও কারখানা প্রয়োগ করিতে লাগিল। ফলে ফলোৎপাদিকা * পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে অফলোৎপাদিকা পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

(৩) পণ্যবহনকারী জাহাজে যুদ্ধের মালমসলা, সৈন্যসামন্ত লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের সংখ্যা কম পাইল। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের শতকরা ৭০ খানি জাহাজ এই কার্য্যে ব্রতী হইল। ইংরাজের প্রতাপে জর্ম্মাণ বাণিজ্যবহর কিয়েলখালে একবারে রুদ্ধ হইল। অপিচ, মধ্যে মধ্যে 'এমডেন' নামক শত্রুর জাহাজের উৎপাতে জাহাজ থাকিলেও বন্দর হইতে সহসা অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। যুদ্ধের প্রারম্ভে, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাট-চালানীর সময় হইলেও কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর পরিত্যাগ করে নাই; ফলে পাটের বাজার দশ টাকা স্থলে তিন টাকায় নামিয়া যায়।

* মৎপ্রণীত [illegible] দ্রষ্টব্য। [illegible]

(৪) বৈদেশিক মূলধন ভারতবর্ষ হইতে অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়

(৫) অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া লয়, নোটের পরিবর্ত্তে টাকা লইয়া ঘরে আটক করে, সভেরিণ কিনিয়া ঘরে সঞ্চয় করে। ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অসুবিধা দাঁড়ায়। অবশ্য এই দফা ফল বহুদিনব্যাপী হয় নাই। সাধারণতঃ, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও মাড়োয়াড়ীরাই এরূপ করিয়াছিল।

এই হইল যুদ্ধের প্রারম্ভিক অর্থনৈতিক ফল।

কিন্তু যুদ্ধ থামিল না—শীঘ্র থামিবার সম্ভাবনাও রহিল না। যখন এই অবস্থা হইল তখন অর্থনৈতিক অবস্থা দাঁড়াইল এইরূপ :—

(ক) আমদানী, রপ্তানী, ক্রয় বিক্রয়, উৎপাদন সবই আর হিসাবমত চলিল না—রাজ্যের সুবিধা অসুবিধানুযায়ী চলিতে লাগিল।

(খ) পণ্যবহনকারী জাহাজ এত কম হইল যে, কতকগুলি দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইল।

(গ) যুদ্ধের জন্য নদীগামী ষ্টীমার হ্রাস হওয়াতে ও রেলপথ বৃদ্ধি ও সুসংস্কৃত করিবার দ্রব্যাদির অভাবে দেশের মালেরও যথাযথভাবে চলাচল বন্ধ হইল।

(ঘ) অনেকগুলি শিল্প বিনষ্ট হইল; অনেকগুলি উপযুক্ত দ্রব্যাদির স্বল্পতায় খর্ব্ব হইল।

(ঙ) কয়েকটী দ্রব্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল—যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় চটের থলে, চামড়ার দ্রব্য, গরম কাপড় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(চ) ভারতবর্ষে যে কয়েকটী শিল্প পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল তাহাদের অত্যধিক লাভ হইতে লাগিল। কানপুরের উলেন্ মিল্, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(ছ) জাপানী দ্রব্যে দেশ ছাইয়া পড়িল। *

যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের উৎপন্নকারীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষজাত অনেক কাঁচা মাল যাহা পূর্ব্বে ইউরোপে রপ্তানী হইত, তাহা আর তথায় যায় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রায় ১৭০ কোটী টাকার মাল ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে রপ্তানী হইত। এখন অনেক কম পড়িয়াছে। ১৯১৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ব বৎসরের

* চাউল ডাল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসও একটা ফল বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। [illegible] রেলওয়ে ভাড়ার বৃদ্ধিও ইহারই [illegible]

১৬৬ কোটীর স্থলে ৯৫ কোটী দাঁড়ায়। আমদানীও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। শুধু ইহাই নহে—কেবল যে রপ্তানী কম হইয়াছে তাহা নহে। যুদ্ধের জন্য রপ্তানীর মালের মূল্যও কম পড়িয়াছে। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে পাটের দাম ছিল মণকরা ১৬৲, ১৯১৪ সালে উহার দাম দাঁড়ায় ৩৲ কি ৪৲ টাকা। ফলে পাট আর কৃষকে 'বুনিতে' চাহে না—কারণ ঐ মূল্যে আর তাহাদের পেট ভরে না।

আমদানী অনেক জিনিষের যে কেবল কম হইয়াছে তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে তাহা অত্যন্ত চড়া মূল্যে আসিয়াছে। ১৯১৫ সালে ৬৪৭,৭০০ টন চিনি আসিয়াছিল—মূল্য পড়িয়াছিল ১৬৬২ কোটী টাকা। যুদ্ধ না হইলে আমাদের দিতে হইত ১০ কোটী টাকা।

অনেক জিনিষেই এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে।

অবশ্য লাভও কিছু কিছু হইয়াছে। আমি এখানে রাজনৈতিক লাভ বা স্যর সত্যেন্দ্রনাথের পদোন্নতির কথা উল্লেখ করিতেছি না—টাকার হিসাবে লাভের কথা বলিতেছি। যুদ্ধের জন্য গম, চা, নীল, পশমী বস্ত্র, চট, তামাক—এ সব দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য গম-রপ্তানী এখন গবর্ণমেণ্ট সীমাবদ্ধ করাতে খুব বেশী লাভ হইতেছে না। চা'এ যেরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল, বিলাতে চায়ের উপর শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় লভ্যাংশ হ্রাস পাইয়াছে। জর্ম্মাণীর নীল আর এদেশে আসে না—ফলে ইউরোপে আমাদের নীলের একচেটীয়া হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছে চটের থলিয়ায়। ফরাসী, রুস, ইংরাজ সকল যোদ্ধেয় জাতিরই চটের থলিয়ার প্রয়োজন। অবশ্য, এ লাভের প্রায় সর্ব্বাংশই পকেটস্থ হইতেছে ইউরোপীয়দেরের। যাহা হউক, ১৯১৩ সালে পাট রপ্তানী হইয়াছিল ২৮ কোটী টাকার, ১৯১৫ সালে হইয়াছে ৩৮ কোটী। এদিকে দেশে কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রও প্রচুর হইতেছে বেশী। শিল্পোন্নতির চেষ্টায় সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাপানের শিল্প প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ জাপানে প্রেরিত হইতেছেন। লর্ড কারমাইকেল যে যশোহরের চিরুণী প্রস্তুতের কারখানায় পদধূলি দিয়াছেন তাহাও এই যুদ্ধের সুফল।

আবার 'কারও সর্ব্বনাশ কারও পৌষমাস'ও হইয়াছে। মজঃফরপুরের উদ্যোগী কর্ম্মী ফল সংরক্ষণকার শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি [illegible] মহাশয় Fruit Pie[illegible] কারবার করিয়া [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible]

যুদ্ধের ফলে সুপ্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে জ্যাম্ ও জেলী সরবরাহ করিয়া তিনি অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের কয়েকজন ব্যবসায়ী 'হালুয়া' রপ্তানী করিয়া ধনী হইতেছেন। কলিকাতার এক মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী ১৯১৫ সালে পাটের কারবারে কিছু "চাল খেলিয়া" পাঁচ কোটী রজতখণ্ড পকেটস্থ করিয়াছিলেন।

অনেক দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আয়ের ক্ষতি ও তাহারই ফলে করবৃদ্ধি হইয়াছে। নিত্যব্যবহার্য্য লবণ, কয়লা, কেরোসিন তৈলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। জার্ম্মাণ ঔষধ আমদানী হয় না—ঔষধ অগ্নিমূল্য হইয়াছে, তা'ই কবিরাজী ঔষধের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডকে দেড় শত কোটী টাকা সাহায্য করিবেন—ইহাও এই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের অন্যতম ফল। অর্থাৎ [illegible]ড়ে মানুষ প্রতি ৬৲ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য "ওয়ার-লোনে" টাকা দি[illegible]লে লাভ ব্যতীত লোকসান কিছুই নাই বরং যদি এই ১৫০ শত কোটী টাকা [illegible]মরা ভারতবাসীরা না দিতে পারি, তবে আমাদের ঘোরতর কলঙ্কের কথা হইবে। *

[illegible]বি ও সমালোচক।

[শ্রী[illegible]নিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল্]

ইংরাজীতে একটি সারগর্ভ প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, "A failed poet is a good critic", অর্থাৎ যিনি কাব্যরচনায় সফলকাম হইতে পারেন না, তিনি একজন ভাল সমালোচক। ইহা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না, তবে এই ভাবটি আরও একজন বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ওয়ালটর স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডার তাঁহার প্রসিদ্ধ "Imaginary Conversations" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"Those who have failed as painters, turn picture-cleaners, those who have failed as writers turn reviewers. Orator

---

* এই প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ সরকার মহাশয়ের সুলিখিত ইংরাজী 'Economics [illegible]itish India' [illegible]

Henley taught in the last century that the readiest-made shoes are boots cut down; there are those who abundantly teach us now, that the readiest-made critics are cut-down poets." এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমি যে সমালোচকের কার্য্যকে নিন্দনীয় বলিতেছি, তাহা কেহ মনে না করেন। পক্ষান্তরে ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। তবে কবি ও সমালোচক এই দুই শ্রেণীর লেখকের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কবিতা ও সমালোচনা যে সম্পূর্ণ বিপরীত উপাদানে রচিত তাহাতে বোধ হয় কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যাঁহার কল্পনাশক্তি নাই, তিনি কখন কবি হইবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ভাল সমালোচক হইতে গেলে, প্রখর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বিবেকশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। যাঁহার ভাবের প্রসার, বাসনার আতিশয্য (passions) এবং ভাব ও ভাষার সরলতা যত বেশী, তিনি তত উচ্চদরের কবি। আদর্শ সমালোচকের রচনা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সংযত। কবিতার রস কবিহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্বতঃই প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কাব্যে কবিরই প্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রবল আবেগভরে হৃদয়ের দুইকূল ছাপাইয়া ভাষার আকারে বাহির হইয়া পড়ে। কবিকে কবিতা লিখিতেই হইবে। যতক্ষণ না প্রাণের সুকুমার কোমল ভাবপ্রসূনগুলি কবিতার ছলে প্রস্ফুট হইয়া উঠে, ততক্ষণ কবির নিষ্কৃতি নাই। ভূতগ্রস্ত লোকের ন্যায় তাঁহার মনে তিলমাত্র শান্তি থাকে না। কেহ জোর করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন না। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ প্রভৃতির কঠোর নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া কবিতা-রচনা করিতে গেলে তাহা ছন্দোবিশিষ্ট গদ্য হইয়া দাঁড়ায়। সজল জলদনিচয়ের মধ্যে সুশীতল বারিধারার ন্যায়, সুধাকরে রজতধবল জ্যোৎস্নার ন্যায়, কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুললিত স্বরলহরীর ন্যায় কবিতাও কবির স্বভাবজাত। ইংরাজীতে এক কথায় যাহাকে "inevitable" বলিয়া থাকে। কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"I do but sing because I must
And pipe but as the linnets sing." (টেনিসন)

কবিরা যথার্থই ঐশ্বরিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। তাঁহাদের রচনাও নন্দনকাননের পারিজাতের ন্যায় শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র। "কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।" ইংরাজ কাব[illegible]; — "[illegible] language [illegible]"

নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তিও একজন প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর স্বভাব-কবি হইতে পারেন। কিন্তু সমালোচকের রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন, তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্ক করিবার ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য্য। তাঁহাকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশ্রম করিয়া লিখিতে হয়। এক কথায়,—"The poet is a genius, the critic is a scholar."

এক এক সময় সাহিত্যের এক এক যুগ আসে। কোনও সময় কবিতা, কোনও সময় গদ্যরচনা বা সমালোচনা সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যুগে বেশী গদ্যলেখক বা প্রসিদ্ধ সমালোচক আবির্ভূত হইয়াছেন, যে যুগে গদ্যরচনা ও সমালোচনার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে যুগে উচ্চদরের কবির আবির্ভাব হয় না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যরচনারই প্রাচুর্য্য ও প্রাধান্য। এইজন্য ইংরাজিতে এই যুগকে "a century of prose" বলিয়া থাকে। এই সময় জনসন, বার্ক, গিবন, ফিল্ডিং, ডিফো, হিউম প্রভৃতি বড় বড় গদ্যলেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ সময়ের কবিদের কাব্যও গদ্যময়তায় পূর্ণ। সেই জন্যই ইংরাজ কবি পোপ ও ড্রাইডেনের কবিতাকে ইংরাজীতে "versified prose" অর্থাৎ ছন্দোবিশিষ্ট গদ্যমাত্র বলিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে কাব্যের যুগে আমরা গদ্যসাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতিলাভ লক্ষ্য করিয়া থাকি। এবং তৎকালীন গদ্যরচনা যথার্থই "poetic prose" হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে আমরা শ্রেষ্ঠ কবি, সরস গদ্য-লেখক ও সমালোচকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট, ক্যাম্বেল, মূর, বাইরন, শেলী, কীটস্, ল্যাম্ব, ডিকোয়েন্সি, অষ্টেন, টেনিসন, আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কারলাইল, রসকিন, মেকলে, জর্জ্জ ইলিয়ট, ডিকেন্স, থেকারে প্রভৃতি উচ্চদরের কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিকগণ সাহিত্যগগনে উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের ন্যায় উদিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যেও কাব্যের যুগ চলিয়াছে বোধ হয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের কাল ও বঙ্কিমযুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এত ভাল ভাল কবির আবির্ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অতি বিরল। তাই বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকগণেরও রচনা পদ্যময় বলিয়া ধারণা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা [illegible]চন্দ্র, রামেন্দ্র[illegible] [illegible]প্রসন্ন, [illegible]চন্দ্র [illegible] প্রভৃতির

নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই সব সম্যক্ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গদ্যরচনা ও সমালোচনার যুগ কাব্যকুসুমকলিকা-নিচয়কে নীরস ও শুষ্ক করিয়া দেয়; কিন্তু কাব্যযুগে গদ্য ও পদ্য দুইশ্রেণীর রচনাই সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

কবিরা একটু চেষ্টা করিলেই বেশ ভাল সমালোচক হইতে পারেন। তাই বাঙ্গালাসাহিত্যে আমরা রবীন্দ্রনাথ, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচকগণের নাম দেখিতে পাই। ইংরাজী সাহিত্য হইতেও দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পোপ, ড্রাইডেন, কোলরিজ, স্কট, ওয়াড্‌সওয়ার্থ, ল্যাম্ব, ম্যাথু আর্নল্ড, শেলী, সুইনবার্ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারি। ড্রাইডেনই বলিয়া গিয়াছেন, "poets themselves are the most proper, though I conclude, not the only critics." অনেক গদ্যলেখক এই উক্তির অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ল্যাম্বের জীবনীলেখক বলিয়া গিয়াছেন,—"That Lamb was a poet, is at the root of his greatness as a critic" (English Men of Letters—*Lamb*). সাধারণ ধ্বংসকারী (destructive) সমালোচক অপেক্ষা সৃষ্টিকারী (creative) কবি-সমালোচকদিগেরই সমালোচনা অধিক যুক্তিসঙ্গত, মৌলিক এবং সারগর্ভ বলিয়াই বিশ্বাস হয়। অধিকন্তু কবি বলিতে যদি আমরা কেবল ছন্দোবিশিষ্ট কাব্যরচয়িতা না বুঝিয়া, যাঁহাদের প্রাণের ভিতর ভাবের লহরী খেলা করিয়া বেড়ায়, যাঁহাদের কল্পনাশক্তি অতি প্রবল, যাঁহাদের রচনার মধ্যে আমরা লেখকের অনুভূতি, আন্তরিকতা, ভাব ও ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতা দেখিতে পাই, তাঁহাদেরও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি, তাহা হইলে কেবল বাঙ্গালা কেন, পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য হইতে আমরা এরূপ বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ সমালোচকের নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালা সাহিত্যেও আমাদের ৺বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রযোজ্য। তাঁহারা গদ্য লিখিলেও "কবি" আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য; আর তাঁহাদের রচনাও গদ্যাকারে পদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কবিতার সমালোচনা কবিদিগেরই করা বাঞ্ছনীয়। কবিতা, কবির প্রাণের জিনিষ। কবিতা প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হয়। উহার সমালোচনা করিতে গেলে, কল্পনাশক্তির প্রয়োজন এবং সাধারণ গদ্য-লেখক অপেক্ষা কবিদেরই ভাবের দো[illegible] না, উহাদেরই বাস্তবজ[illegible] করিয়া কল্পনা[illegible] বিচরণ

করিতে পারে, তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই। তাই কবিগণেরই কবিতার সমালোচনা এত হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী এবং স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ইংরাজ কবি বাট্‌লার নিজেই এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

The poet must be tried by his peers,
And not by pedants and philosophers.

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কবিরা মধ্যে মধ্যে ছন্দে তাঁহাদের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রসিদ্ধ বড়ালকবির "ঈশানচন্দ্র" শীর্ষক সনেটটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ;
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী—করুণ-লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ।
তুমি মন্থনের শেষে আসিলে, যোগেশ,
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল!
কালকূট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ,
সুর নর যক্ষ রক্ষঃ আতঙ্কে বিহ্বল!
প্রজাপতি যুক্তকর—রক্ষ' বিশ্ব-প্রাণ,
মূর্ত্তিমান প্রেম-মন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান!

এক একটি নির্ব্বাচিত প্রাণস্পর্শী উপমায় এক একজন কবির রচনার এরূপ যুক্তিযুক্ত সমালোচনা, সাধারণ সমালোচকের স্বপ্নেরও অগোচর!

ইংরাজ কবি শেলীও কবিভ্রাতা কোলরিজ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"You will see Coleridge; he who sits obscure
In the exceeding lustre and the pure
Intense irradiation of a mind,
Which, with its own internal lightning blind,
[illegible] wearily [illegible] darkness and des[illegible]

A cloud, encircled meteor of the air,
A hooded eagle among blinking owls."

এই কয়ছত্র কোলরিজ সম্বন্ধে যে কেবল মাত্র যথার্থই প্রযোজ্য তাহা নহে, অপর কোন সমালোচক তাঁহার বিষয়ে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী, বা ইহা অপেক্ষা সুন্দর ভাবে কিছু বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোলরিজের Biographia Literaria, ল্যাম্বের Essays on Dramatic poets, বায়রন, শেলী, কীটস, ল্যাম্ব, কাউপার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ ও পত্রাদি (Essays and letters) পাঠ করিলে আমরা কবি-সমালোচকদিগের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা সম্যক্ জ্ঞাত হই। এই সব মন্তব্যের অধিকাংশ ভাগই অচিন্তিতপূর্ব্ব ও আকস্মিক, কিন্তু অপর লোকের যত্নলিখিত ও নিয়মবদ্ধ টিপ্পনী অপেক্ষা বেশী মৌলিকতাপূর্ণ এবং তাহাদের সারভাগ কোন মিথ্যা ঘটনার সহিত মিশ্রিত নহে।

পক্ষান্তরে সমালোচকগণ সহস্র চেষ্টা করিলেও তা[illegible] কবি হইতে পারিবেন না। তাঁহাদের রচিত কাব্য ইংরাজ সাহিত্যিক ড্রা[illegible]ডেন ও পোপের ন্যায় ছন্দোবিশিষ্ট গদ্য হইয়া দাঁড়াইবে। একজন প্রসিদ্ধ প্রব[illegible]লেখক (Bandelaire) যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—"It would be a whol[illegible] new event in the history of the arts, if a critic were to [illegible]urn himself into a poet, a reversal of every psychic law, [illegible] monstrosity ; on the other hand, all great poets become n[illegible]urally, inevitably critics, * * * It would be impossible for a critic to become a poet and it is impossible for a poet not to contain a critic." যে কাব্যের রহস্যোদ্ভেদ ও লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবার জ[illegible] গদ্যলেখকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়াও কৃতকার্য্য হইতে[illegible] পারেন না, সেই যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যান, কবিরা একটি [illegible]সুন্দর কথায় তাহা অক্লেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও জটিল সমস্যার সন্তোষজনক নিরাকরণ করেন। ইহা হইলেও আমরা কবির প্রতিভা ও সাধারণ সমালো[illegible]কের পাণ্ডিত্যের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি।

জাতীয় সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কবি ও সমা[illegible]চক উভয়েরই আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। সমালো[illegible]কগণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থস[illegible]হের টিপ্পনী করিয়া তা[illegible] উপ[illegible] করিবার আ[illegible] প্রধান

সহায়। অপাঠ্য গ্রন্থের ভাব ও ভাষার তীব্র সমালোচনা না করিলে, সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশঃই আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ ও রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু কবিদের কার্য্য আরও মহত্তর ও গুরুতর। তাঁহারা মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপ আগাছা উপড়াইয়া তাহাতে সুনীতিপূর্ণ বীজসমূহ বপন করিয়া দেন। তাঁহারা সংসার-তাপক্লিষ্ট, শোকাকুল, ব্যথিতচিত্ত নরনারীর মনে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদিগকে ভগবৎপ্রেম ও নির্ম্মল আনন্দের অধিকারযোগ্য করিয়া তুলেন। জন্মজন্মান্তর কঠোর তপস্যা করিলে, তবে ভাল কবি হইতে পারা যায়।

আজকাল অনেকেই সমালোচকের বেশ ধারণ করিয়া কবিতা সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাঁহারা কবিতার মূলগত অর্থ কিছুই না বুঝিয়া কেবল তাহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া থাকেন। অযথা সমালোচনায় দেশের তথাগত সাহিত্যের কিরূপ সমূহ ক্ষতি হইতে পারে, তাহা যাঁহারা ইংরাজ কবি কীট্‌সের মৃত্যুর কারণ অবগত আছেন ও তৎসম্বন্ধীয় শেলীর শোকগীতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। কেবল "Adonais" কবিতার ভূমিকায় সমালোচকের উদ্দেশ্যে কবি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা একটু উদ্ধার করিয়া দিলাম:— "Miserable men you, one of the meanest, have wantonly defaced one of the noblest specimens of the workmanship of God. Nor shall it be your excuse, that murderer as you are, you have spoken daggers but used none." তাই বাইরণও যথার্থই মূরকে বলিয়াছেন, যে সমালোচকগণের নাম লোপ পাইলেও, তোমার বীণার মধুর তান কখন নীরব হইবে না।

"Thy soothing days may still be read,
When Persecution's arm is dead.
And critics are forgot."

পুত্রহারা।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

---

(১)

"ভদ্রলোক ডাকাত! ধার্ম্মিক পাষণ্ড! সাধু চোর! সচ্চরিত্র মাতাল"—

"আহা! রাখুন না মশায় তালিকা। কথাটাই শুনুন না।"

"ঐ একটা ধুয়ো উঠেছে! ভদ্রলোক ডাকাত! যদি ভদ্রলোক তো আবার ডাকাত কি? আর যদি ডাকাত তো সে আবার ভদ্রলোক কিসে? মশায় ও সোণার পাথর বাটি!"

সি আই ডি ইনস্‌পেক্টর বলিলেন—আজ্ঞে তাই হ'ল। ডাকাত! চোরের দাদা ডাকাত।

আমি আশ্বস্ত হইলাম। কথাটায় আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে। ভদ্র ঘরে জন্মিয়া যদি লোকে নিজের বংশের কলঙ্ক হয়, তাহাকেও কি ভদ্রলোক বলিয়া মানিতে হইবে? নিরস্ত্রকে গুলি মারিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কেহ ভদ্রলোক থাকিতে পারে না। সি আই ডি বাবুকে অগত্যা একথা স্বীকার করিতে হইল।

এক দল ডাকাত আমার এলাকার ভিতর ধনেশ্বর পোদ্দারের বাড়ি লুট করিতে আসিবে—সি আই ডি সে সন্ধান পাইয়াছিল। সন্ধ্যার ট্রেণে তাঁহাদের সাহেব আসিবেন, আমাদের জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিবেন, আরও অনেক বড় বড় রথী মহারথী বীর আসিয়া কৃপণ ধনেশ্বরের সম্পত্তি-রক্ষা করিবেন। আমার এলাকা বলিয়া আমার লোকজনকেও সাহায্য করিতে হইবে। আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহিত ডাকাত ধরিতে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

রাত্রে আমার সাহেব বলিলেন—ঘোষ, তোমার খুব সাহস আছে। যদি একটাও ডাকাত ধর্‌তে পার ভাল হয়। সি আই ডির লোকেরা ষোল আনা বাহাদুরী নিতে পারবে না।

(২)

কি অন্ধকার রাত্রি! পার্শ্বের মানুষ চিনিবার উপায় ছিল না। ধনেশ্বরের বাড়ি হইতে ন[illegible] হইতে [illegible] গিয়াছিল, [illegible] পথে কে[illegible]

না। আমি সাতজন হিন্দুস্থানী সিপাহী লইয়া উত্তরের পথে নদীর ধারে লুক্কায়িত ছিলাম। চক্ষু অন্ধ, কেবল কর্ণে শুনিতেছিলাম—গাছের পাতার উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ আর খরস্রোতা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি। বটগাছের তলায় স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছিল। সামান্য তন্দ্রাও আসিয়াছিল।

হঠাৎ বাঁশী বাজিল। তাহার পর দুই তিন মিনিট একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল। আবার অল্পক্ষণ পরে দক্ষিণ দিকে নদীর উপর হইতে বন্দুকের শব্দ হইল। তীরের উপর মশাল জ্বলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম—একখানা নৌকা তীরবেগে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, আর পাড়ের উপর আমাদের লোকজন যথাসাধ্য সেই দিকে ছুটিতেছে।

বুঝিলাম ব্যাপারটা কি। সংবাদপত্রে এরূপ ঘটনার কথা অনেক পড়িয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি [illegible]স আই ডির বাবু আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল —আপনাদের সাহেবের তাড়াতাড়িতে সব মাটি হ'য়েছে। ডাকাতদের বাড়ি ঢুকতে দেখেই তিনি [illegible]শী বাজিয়েছেন। ডাকাতেরা তাড়াতাড়ি লুকানো নৌকায় চড়ে পালাচে[illegible] আমরা গুলি মেরেছিলাম, তারাও উত্তর দিয়েছে, কিন্তু কোন পক্ষের কে[illegible] জখম হয়নি।

আমি বলিলাম—ব[illegible]ন কি ? তবে চলুন সবাই মিলে নৌকাখানার অনুসরণ করা যাক্।

তিনি বলিলেন—[illegible]ৌকা অনুসরণ করবার অনেক লোক আছে। বোধ হয় তা'দের একটা [illegible]োকও উঠ্‌তে পারেনি। চারিদিকের রাস্তা বন্ধ। এই দিকেই আসবে। আপনি ধরবার চেষ্টা করবেন না। বুঝলেন ? বাঁশী বাজাবেন। আমরা এসে পড়ব। বেড়াজাল—বুঝলেন ? বাঁশী ! বেড়াজাল ! বুঝলেন ?

লোকটা অন্ধকা[illegible]র মিশিয়া গেল। আমার মনের মধ্যে তুমুল ঝড় উঠিল। তাহার মধ্যে ভয় ছি[illegible] না, সে কথা বলিতে পারি না। সশস্ত্র শত্রু ! অন্ধকার রজনী ! আর "মরি মরি সিং" "দুর্ব্বলসিং" "হোঁচোট্ খাওয়া" তেওয়ারির দল সাথী।

বেশীক্ষণ অ[illegible]পেক্ষা করিতে হইল না। একটা লোক ছুটিয়া আসিতেছিল। পিছনে অ[illegible]েকগুলা পায়ের শব্দ। পুলিস তাহার অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ [illegible] হানিল, লোকটা সেই অবসরে ফিরিয়া পুলিসের উপর লক্ষ্য কারিয়া [illegible] তাহার পিছনে ছিলাম। সে আমাকে দেখে

নাই, আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

কড় কড় শব্দে বজ্রনিনাদ হইল। আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বাল্যাবধি মুগুর ভাঁজি, কুস্তি লড়ি, একটা বড় মাছ একেলা খাই। ডাকাত আমাকে শিশুর মত তুলিয়া লইয়া জলে পড়িল। তাহাকে অগত্যা ছাড়িয়া দিলাম, আবার চিকুর হানিল। দেখিলাম সে আমার পাঁচ হাত আগে স্রোতে গা ভাসাইয়া তীরের মত ছুটিতেছে। আমিও গা ভাসাইলাম, বহুদূরে—তীরের উপর মসালের আলোগুলা দেখা যাইতেছিল। মাথার উপর মুসলধারে জল পড়িতেছিল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেবল অনুমানে বুঝিতেছিলাম, ডাকাত আমার নিকটে।

(৩)

কতক্ষণ ভাসিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। বোধ হয় অল্পক্ষণ। কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল যুগ-যুগান্তর ভাসিতেছিলাম। তীরের উপর হইতে নদীর মধ্যস্থল দেখিয়াছি, পর-পার দেখিয়াছি, নদীর একটানা স্রোত দেখিয়াছি। কিন্তু সেই কাল-রাত্রিতে দামিনীর ক্ষণিক আলোকে নদীর মাঝে ভাসিতে ভাসিতে দুদিকের কূল-কিনারা দেখিয়াছিলাম, স্রোতের বেগ দেখিয়াছিলাম, ঢেউগুলার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়াছিলাম। উভয় দৃশ্যে অনেক প্রভেদ। নদী এত প্রশস্ত, তাহার তরঙ্গগুলা এত প্রবল, তাহার বেগ এত ক্ষিপ্র, এ সন্দেহ পূর্ব্বে কোন দিন মনোমধ্যে স্থান পায় নাই।

তাহার পর শরীর অবশ হইল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সমস্ত জীবনের ইতিহাসটা দামিনীর ক্ষণিক বিকাশের মত মনের মধ্যে বিকসিত হইল। কত আশা, কত নিরাশা, কত পাপ, কত সুখ—তাহার পর প্রিয়জন—স্নেহময়ী জননী, অভাগিনী স্ত্রীর বিধবার বেশ, স্নেহের ভ্রাতা—আর বাকি নাই—এত দিনের পৃথিবী—

অকস্মাৎ আবার চপলার মুহূর্ত্তের হাসি। শত্রু একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি ধরিয়াছিল। জীবনের আশা ছিল। পাঁচ হাত জোরে সাঁতার কাটিতে পারিলে গুঁড়িটা ধরিতে পারি। হাতে পায়ে অসুরের বল আসিল, আবার পৃথিবীর লুপ্ত গরিমা ফিরিয়া আসিতেছিল। জননীকে স্মরণ করিলাম, সহধর্ম্মিণীর মলিন মুখ, আশার কেন্দ্রস্থল, অনুজের হাসিমুখ ভ...ণা জোরে হাত পা ছুঁড়িলাম। জয় জগদীশ্বর! কাঠ ধরি...

(৪)

উভয়েই প্রাণপণে কাঠ ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলাম। ভবিষ্যতের ভাবনা কাহারও মনে ছিল না—বৈরীভাব তিরোহিত হইয়াছিল। উভয়ের প্রবল শত্রু যমরাজার করাল ভ্রূকুটিতে আমাদের তুচ্ছ মনোবাদ ভাসিয়া গিয়াছিল। তখন উভয়েরই বোধ হয় এক ইচ্ছা—আপাততঃ কিরূপে রক্ষা পাইব। তাহার এমন শক্তি ছিল না যে, আমাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়—আমারও এমন শক্তি ছিল না যে তাহাকে ডুবাইয়া মারি। চোখ বুজিয়া ভাসিতেছিলাম, উপরে জল পড়িতেছিল—জলের ভিতর দিয়া ছুটিতেছিলাম। উভয়েই পরিশ্রান্ত—উভয়েই প্রাণভয়ে ভীত।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি তাহার নিশ্বাসের শব্দ পাইতেছিলাম। একবার তাহাকে দেখিবার সাধ হইল। যখন এত সহ্য করিয়াছি, তাহাকে ছাড়িব না—কোন মতেই না।

চপলা হাসিল। আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল। বুঝিলাম মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। কাণ ভোঁ ভোঁ করিতেছিল, আবার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। হাত পায়ের শক্তি লোপ পাইল। আবার বিদ্যুত চমকিল। নিঃসন্দেহ—কান্তি!

"কান্তি!"

"দাদা!"

উপরে জল, নীচে জল, তাহার উপর চোখে জল আসিল। নিজে পুলিসের কাজ করিতেছিলাম, আশা ছিল কান্তি পাশ করিয়া বড় উকীল হইবে কিম্বা প্রোফেসার হইবে, দশের কাছে মান পাইবে, বংশের মর্য্যাদা রাখিবে। সেই কান্তি আমার আশা, ভরসা, বল, বুদ্ধি—সেই অনুজ আমার, ডাকাত—ভদ্রলোক ডাকাত। আমার এলাকায় ধনেশ্বরের সংবাদ কান্তির নিকটই ডাকাতের দল পাইয়াছে। উঃ! ভাই আমার ডাকাতের গুপ্তচর! ধিক্! নরক-কুণ্ড কলিকাতা! ধিক্! কুচক্রীর কুপরামর্শ। আবার আলোক! কান্তি স্থিরনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল।

আমি বলিলাম—কান্তি! ভাই! তর্ক আর কি করব! আমি যার নেমক খাই তার কাজ করেছি; তুই যে কাপুরুষের দলের পরামর্শ পেয়েছিস, সেই পরামর্শে কাজ করেছিস। উভয়ের জীবনের পথ ভিন্ন। আমি ডাকাত হ'তে পারব না, তুইও ভদ্রলোক হ'তে পারবি না। ঘরে বিধবা মা রইলেন,

তোর বিধবা বউঠাকরুণ রইলেন, তোদের ধর্ম্মে বলে তো তাদের দেখিস। আজ থেকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'লেম। হা ভগবন্! ভাই শেষে ডাকাত হ'ল!

কাঠ ছাড়িলাম। জননীর চরণ ভাবিতে ভাবিতে ডুবিলাম। কান্তি, আমায় টানিয়া তুলিল। আমি বলিলাম—কি ভাই পুলিসকে গুলি মেরে নাম নিবি? তাই মার্। পিস্তলটা কোথা?

চিকুরের হাসিতে তাহার মুখ দেখিলাম। ভাবটার অর্থ বুঝিলাম না। সে বলিল—দাদা, আমি বংশের কলঙ্ক! আমি যাই!

"কি সর্ব্বনাশ! কান্তি! কান্তি! করিস কি? ভাইরে! তুই যে মার বড় আদরের ধন, তুই যে আমার বুকের পাঁজরা! তুই চুরি কর, ডাকাতী কর, নরহত্যা কর। বেঁচে থাক, ভাই আমার!"

ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল—দাদা যেতে দাও। আমি বংশের কলঙ্ক।

সে জোরে হাত ছাড়াইল। আমি তারস্বরে চীৎকার করিলাম—বাঁচাও! বাঁচাও! ভাই! ভাই! কান্তি!

তীর হইতে শব্দ হইল—কে দারোগা বাবু!

তাহার পর কতকগুলা মশাল জ্বলিয়া উঠিল। কোন সন্ধান পাইলাম না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আবার ডাকিলাম—ভাই! ভাই!

হা ভগবন্! সে শিশু। সে ডুবিল; আমি কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড ছাড়িতে পারিলাম না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পুলিসের দুই তিনটা লোক জলে পড়িল। আর স্মরণ নাই।

যখন জ্ঞান হইল মাথার শিয়রে বসিয়াছিল স্ত্রী, পার্শ্বে ছিলেন জননী। আমি কাঁদিয়া বলিলাম—মা, মা সে ডুবেছে, মা তোমার কান্তি—

মাতা কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিলেন। সহধর্ম্মিণী বুঝিল। সে কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর জননী যে তিন দিন জীবিতা ছিলেন কাঁদেন নাই, হা হুতাশ করেন নাই, আহার করেন নাই, জলস্পর্শ করেন নাই—স্থবিরা মা আমার, কেবল স্থির দৃষ্টিতে ঘরের কোণে কান্তির ফটোগ্রাফের দিকে চাহিয়াছিলেন।



সাহিত্য সমাচার।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩২৪।

'রামের সুমতি' গল্পটি প্রতিভাধান্ লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। গত পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' 'শরৎ-প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন গল্পটী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"রামের সুমতি গল্পটির মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর গল্প আমি বাঙ্গালা সাহিত্যে পড়ি নাই। * * নারাণী যেদিন স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়া রামের জন্য রাঁধিতে বসিল, সেদিন তাহার মূর্ত্তি রাফেলের অমর তুলিকায় আঁকা ম্যাডোনা-মূর্ত্তির ন্যায় আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি। * * সকল দিক্ দিয়া দেখিলে, "রামের সুমতি" গল্পটিই বোধ হয় লেখকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে এত ঘটনার বাহুল্য আছে যে, ইহার প্রত্যেক চিত্র একটি মহাকাব্যের অধ্যায়ের মত।"

'রামের সুমতি' সম্বন্ধে দীনেশবাবুর মতের সহিত আমরাও সম্পূর্ণ একমত। সকলকেই আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সর্ব্ববিষয়েই আমাদের দেশে অনুকরণপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুঃখের বিষয়, দুই একজন সাহিত্যিকও এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারিতেছেন না। গত বৈশাখ মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র 'দাদা' শীর্ষক গল্প পাঠ করিলেই পাঠক আমাদের উক্তির প্রমাণ হাতে হাতে পাইবেন। গল্পটীর নায়ক নদেরচাঁদ "রামের সুমতির" রামের ছায়ায় পরিকল্পিত। নদের-চাঁদের চরিত্রটী সামান্য মাত্রায় পরিস্ফুট হইলেও পারিপার্শ্বিক কোনও চরিত্র এমন কি নদেরচাঁদের জননীও আদৌ ফুটে নাই। কিন্তু শরৎবাবুর 'নারায়ণী' রামের বৈমাত্র অগ্রজের পত্নী হইলেও তাঁহার চরিত্র আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি হইয়া ফুটিয়াছে। 'দাদা' গল্পের অক্ষম অনুকরণপ্রিয় লেখকের সৃষ্ট 'নদেরচাঁদে'র জননী 'নারায়ণী'র সহিত তুলিত হইবার যোগ্যা নহে। এই দুইটী গল্পের তুলনায় সমালোচনা করিবার বাতুলতা আমাদের নাই, তবে নিতান্ত আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিতে হইল। পাছে সাধারণে 'দাদা'কে সন্দেহের নেত্রে দেখেন সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় লেখক গল্পটিকে বিয়োগান্ত করিয়াছেন। এইরূপ অক্ষম অনুকরণের ব্যর্থ রচনা মাসিকের পৃষ্ঠা ভরাইতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণের উপভোগ্য হয় না! শ্রেষ্ঠ 'ছোট গল্প'-লেখক বলিয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুনাম আছে। তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞের সম্পাদকতায় ইহা বাহির হইল কেন, তাহা বুঝিয়া উঠিলাম না।

গ্রন্থ সমালোচনা।

লিখন—গল্পপুস্তক, মূল্য ॥০, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে নয়টী ছোট গল্প আছে। তন্মধ্যে 'করুণা' গল্পটী শ্রেষ্ঠ রচনা। 'নতুন মা' সমাজের হুবহু চিত্র। 'অন্তিমে' ও 'মিলন' গল্প দুইটী বৈদেশিক, তন্মধ্যে প্রথমটী আমাদের সমাজের উপযুক্ত নহে, দ্বিতীয়টী নির্দ্দোষ এবং ইহা 'ইংরাজী হইতে অনূদিত' হইলেও আমাদের সমাজের সহিত বেশ 'খাপ' খায়। 'পতিতা' গল্পটীর উপসংহার-অংশে বিনা কারণে সমাজ-পরিত্যক্তা নারীদিগের জন্য একটী সৎপন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'অর্চ্চনা'য় এই গল্পলেখকের গল্প মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি কিরূপ মিষ্ট, কিরূপ পাকা হাতের প্রাঞ্জল ভাষায় সরস রচনা তাহা নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। সামান্য ২।৪ পৃষ্ঠায় ছোট গল্পের মধ্যে এক একটী চরিত্র ফুটাইয়া তুলা, অনাবশ্যক কথোপকথন ও স্বভাব-বর্ণনা বর্জ্জন করা প্রভৃতি ছোট গল্প-রচনার যে উপাদান সেদিকে লেখকের বেশ দৃষ্টি আছে। আমরা সকলকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পুত্র—শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত প্রণীত [মূল্য ।৵০, কলিকাতা ১০০ নং গড়পার রোড হইতে মেসার্স ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত] এই পুস্তকখানিতে চারখানি ছবি আছে, এবং ইহার কাগজ, ছাপা প্রভৃতি পরিপাটী। মহাভারত ও রামায়ণ হইতে 'দেবব্রতের ইন্দ্রিয় সংযম', 'পুরুর কুষ্ঠ', 'রামের বনবাস' এই তিনটী ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লেখক মহাশয় পুত্রত্বের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছেন। "পিতা যে প্রবৃত্তি দমনে অক্ষম, পুত্র সেই প্রবৃত্তি দমন করিয়াছেন; পিতা যে ব্যাধিবহনে অপারগ, পুত্র সেই ব্যাধি বহন করিয়াছেন; পিতা সত্যের জন্য পুত্রকে বনে পাঠাইতে প্রাণত্যাগ করিলেন, পুত্র দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে বনে চলিলেন।"

উপসংহারে লেখক 'শেষ কথা'য় এই চরিত্রত্রয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করায় গ্রন্থখানির মূল্য আরও বাড়িয়াছে। ভাষা একটু সরল হইলে পুস্তকখানি শিশুপাঠ্য হইতে পারিত, কিন্তু ইহা যে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

উপাধি।

এ বৎসর সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার, সুকবি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'রায় বাহাদুর' উপাধি-মণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি অর্চ্চনার লেখক। আজকাল গবর্ণমেণ্ট উপাধিদানে মুক্তহস্ত। তাই উপাধির উপর লোকের শ্রদ্ধা কমিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে বর্ষিত হইলে লোকে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেন না একথা আমরা বলিতে পারি না। মিত্র মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধিতে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দিত এবং প্রত্যেক সাহিত্যসেবী গর্ব্বিত। আমরা রায় বাহাদুরের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দুইখানি সংস্কৃত কাব্য।

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

১। ভূদেব-চরিতম্।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা। কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥" বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি কবিত্বশক্তি-লাভে সমৃদ্ধ, তাঁহার সৌভাগ্য বড় অল্প নহে। একদিন এই কবিতার প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ অভিভূত ছিল। যশঃ ও অর্থ উভয়ই কবির সমভাবে প্রাপ্য। "ভোজপ্রবন্ধ", "প্রবন্ধচিন্তামণি" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, কবিত্বামোদী নৃপতিবৃন্দ, একটীমাত্র কবিতা শুনিয়াও রচয়িতাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কালের পরিবর্ত্তনে এখন সেরূপ কবি বা তাদৃশ দানশীল নৃপতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের এইরূপ দুঃসময়ে কোনও সংস্কৃত কাব্য রচিত ও প্রচারিত হইতে দেখিলে অন্তঃকরণ একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বঙ্গভাষার অঙ্গ অপূর্ব্ব অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্তে যাঁহারা অনন্যমনাঃ হইয়া সুরসরস্বতীর সেবায় ব্যাপৃত ছিলেন, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার "কাব্যপেটিকা" প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ, কি ভাবে, কি ভাষায় প্রাচীন কাব্য হইতে যে কোনও অংশেই ন্যূন নহে, ইহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়। সেই মহাকবি মহেশচন্দ্র, এই "ভূদেব-চরিত" কাব্যের রচয়িতা।

যে মহাপুরুষ স্বোপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব, সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রক্ষার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নত স্তরে আরূঢ় হইয়াও যিনি চরিত্রগত পবিত্রতার জন্য জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন, সেই স্বনামধন্য স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুকরণীয় চরিত্র, এই সংস্কৃত কাব্যে অতি নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই "ভূদেব-চরিত" কাব্য ২৪ সর্গে সম্পূর্ণ। ২২ সর্গ পর্য্যন্ত রচনা করিয়া মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় লোকান্তরিত হইলে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ মহাশয় অবশিষ্ট ২ সর্গ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি সাধন করেন। ভাষার প্রসাদগুণের জন্য এই "ভূদেব-চরিত" কাব্য

সহৃদয়গণের অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভূদেবের ছাত্র-জীবনের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

"কৃতোদ্বাহোঽপি ভূদেবো বর্ণীব বরবর্ণিনীম্।
বধূং হৃদাপি নাযুঙক্ত শ্বশুরাগারবাসিনীম্॥
অবিলুপ্তব্রহ্মচর্য্যো যৌবনেঽপি সমাহিতঃ।
বিদ্যামেব তপস্তেপে স যুক্তশয়নাশনঃ॥
ষোড়শগ্রাসমাত্রং স হবিষ্যং বুভুজে দিবা।
সাগোশস্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ যামিনীং দুগ্ধসংস্কৃতম্॥"

ভূদেব ছাত্র-জীবনে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছেন। পরিণীত হইয়াও বরবর্ণিনী বধূকে একবার স্মরণ-পথেও আসিতে দেন নাই। তিনি একাগ্রচিত্তে কেবল বিদ্যারূপ তপস্যাতেই সমাসক্ত ছিলেন। পান ভোজনেও তাঁহার অত্যন্ত সংযম ছিল। ভূদেব দিবাভাগে ১৬ গ্রাসমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন ও রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ দুধসাবু মাত্র পান করিতেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ দেখিয়া ভূদেবেরও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ঋষিকল্প পিতৃদেব বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের যথাশাস্ত্র হিতোপদেশে অচিরেই ভূদেবের হৃদয় হইতে সেই অসদিচ্ছা তিরোহিত হয়। "ভূদেব-চরিত"কার লিখিয়াছেন,—

"ইত্থং দ্বিত্রৈরেব মাসৈভূ দেবঃ প্রকৃতিং যযৌ।
ন তিষ্ঠতি চিরং বারিণ্যুষ্মা স্বাভাবিকেতরঃ॥
যো মিশনরীগিরাঽকারি নীচয়া নীচদর্শনঃ।
পিতুর্গিরা স ভূদেবোভূয়োঽভূদুচ্চদর্শনঃ॥"

এই ভাবে দুই মাসেই ভূদেব আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। জলে কখনও অস্বাভাবিক উষ্ণতা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যে ভূদেব মিসনারীদিগের কুহকবাক্যে নীচদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিই পুনর্ব্বার পিতার সদুপদেশে ব্রাহ্মণোচিত মহনীয় জ্ঞান লাভ করিলেন।

ভূদেবের ছাত্রজীবনের পর তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ঋষিজীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত এই 'ভূদেব-চরিত' কাব্যে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত বিদ্যার প্রতি অনুরাগের কথা, বালরাম স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধের কথা, তারপর সেই অসামান্য দানের কথা—ভূদেবের এই সমস্ত চরিত্রই কবি প্রস্ফুটরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কবি সত্যই লিখিয়াছেন,—

"রাজানো রাজবদ্বা কতি কতি ধনিনঃ সন্তি দেশে বিদেশে।
তেষাং মধ্যে কিয়ন্তো দদতি ধনমিয়দ্দেবভাষোদয়ার্থে॥
ভূদেবো ভূমিদেবো ন তু ধরণিপতির্নাপি বা তস্য তুল্যো।
যাবৎ স স্থূললক্ষ্যো ব্যতরদিহ ধনং স্বার্জ্জিতং পুণ্যকর্ম্মা॥"

দেশ-বিদেশে রাজা বা রাজতুল্য কত শত শত ধনবান্, বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যার অভ্যুদয়ের জন্য কে এত প্রভূত সম্পত্তি দান করে? ভূদেব, রাজাও নহেন, রাজতুল্যও নহেন,—তিনি একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ মাত্র। পরন্তু এই পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা, নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ, শাস্ত্ররক্ষক ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের পরিপোষণের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

কবি শেষে বলিয়াছেন,—

"হন্ত গঙ্গাজলে পঙ্কঃ কলঙ্কশ্চন্দ্রমণ্ডলে।
ছিদ্রং মুক্তাফলে কান্তি ভূদেবযশসস্তুলা॥"

গঙ্গাজলে পঙ্ক, চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্ক ও মুক্তাফলে ছিদ্র বিদ্যমান, সুতরাং কোন্ বস্তুর সহিত ভূদেবের অনাবিল যশের তুলনা করিব?

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

২। পাণ্ডববিজয়ম্।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় কবিভূষণ এম এ, অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত কাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে "পরশুরামচরিত", "রুক্মিণীহরণ", "সুভদ্রাহরণ" প্রভৃতি মহাকাব্য প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া পণ্ডিতসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল ইঁহার রচিত "পাণ্ডববিজয়" নামক মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া কবির রচনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের আংশিক ইতিবৃত্ত, অতি নিপুণতার সহিত সংক্ষেপে এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য পাঠ করিবার সময়ে মহাকবি ভারবির রচনাশৈলী স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়, ইহা নবীন কবির সামান্য কৃতিত্বের পরিচয় নহে। দ্বিতীয় সর্গে দ্রৌপদীর উক্তি—

"দ্রুপদস্য মহীপতেঃ সুতা মহিষী পাণ্ডবনাম বিভ্রতম্।
তব কৃষ্ণ সখী পরৈরহং প্রসভং হন্ত সভামনায়িষি॥"
"অবমানমজাতশত্রুণা নিখিলং সোঢ়বতা বিমূঢ়বৎ।
সতি চ প্রতিকারপাটবে তুলিতং নাঙ্গুলিমাত্রমপ্যহো॥"
"ব্যথতে হৃদয়ং স্মরামি চেন্ননু দাসীয়মিতি স্মরেন মাম্।
বিরতঃ প্রভুচিত্তরঞ্জনে যদসৌ সূতসুতোঽপ্যপাহসৎ॥"

ইত্যাদি দুঃখব্যঞ্জক তেজোবিজৃম্ভিত শ্লোকাবলী দেখিলে "ভারবির" প্রথম সর্গের দ্রৌপদীর উক্তি মনে পড়িয়া যায়।

শব্দ-সৌষ্ঠবে ও অর্থ-সম্পদে এই "পাণ্ডববিজয়" কাব্য, সহৃদয়গণের চিত্ত, সত্যই আকৃষ্ট করিয়া তুলে।

"স্বচ্ছমম্বু যুবতীঃ স্রর্থাম্বরা
যত্র কৃত্রিমসরস্তলজ্জয়ৎ।
সাম্বরেণু গজমজ্জনাকুলং
তজ্জলং ভজতি কজ্জলশ্রিয়ম্॥"

বর্ত্তমান সময়ে কোনও নবীন কবি যে সংস্কৃত ভাষায় এমন প্রসন্ন গম্ভীর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণার বিষয়ই ছিল না। দেশে 'কাব্যতীর্থে'র দুর্ভিক্ষ নাই,—বর্ষে বর্ষে শত শত ব্যক্তি 'তীর্থ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু কবিতা রচনার প্রথা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে চলিল। সেকালে সভায় যেমন শাস্ত্রীয় বিচার হইত, তেমন সমস্যাপূরণ প্রভৃতি উপায়ে সভাক্ষেত্রে কবিতা রচনা করিবারও পদ্ধতি ছিল। গুণানুসারে কবিগণ বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন। তখন বঙ্গদেশে কবিতার এতই সমাদর ছিল যে, মহারাষ্ট্র-মহিলা রমাবাই, এই বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া বহু টাকা লইয়া গিয়াছিলেন। কালের প্রভাবে দেশের সমস্ত পূর্ব্ব-গৌরবই লোপ পাইতে বসিয়াছে। নবীন কবি হেমচন্দ্র, যেরূপ উৎসাহের সহিত বিবিধ সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে আমরা সত্যই আশান্বিত হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে হেমচন্দ্রের ন্যায় সংস্কৃত কবিতা, আর কেহই লিখিতে পারেন না—ইহা বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নহে। এই নবীন কবি হেমচন্দ্র যেরূপ সমাদর পাইবার যোগ্য, দেশে এখনও তিনি ততদূর সমাদর পান নাই। একজন প্রাচীন কবি সত্যই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"গুণিনো বহবঃ সন্তি গুণগ্রাহী তু দুর্লভঃ।"

বাঙ্গালায় ধনবানের অভাব নাই। আমরা অচিরে কি এই প্রতিভাশালী কবির যথোচিত সমাদর দেখিতে পাইব না? কলিকাতার সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতি, যদি এই "পাণ্ডববিজয়" কাব্য, 'কাব্যতীর্থ' পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন, তাহা হইলে এই উদীয়মান কবি যথেষ্ট উৎসাহ পাইবেন এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন সুন্দর সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া গীর্ব্বাণ-বাণীর সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। আশীর্ব্বাদ করি, এই নবীন কবি, দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

"রত্নমালা"-পরীক্ষা।

[শ্রীহারানচন্দ্র বিদ্যারত্ন।]

কিছুদিন পূর্ব্বে ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "দ্বৈতোক্তি-রত্নমালা" নামে একখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি ভুবনবিখ্যাত শিবাবতার আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই পুস্তকের একখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পুস্তকের প্রথম হইতেই তর্করত্ন মহাশয় অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিলে গর্ব্বের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

তর্করত্ন মহাশয় এই পুস্তকে আচার্য্য শঙ্করের মতের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এবং উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সকল যুক্তি ও ব্যাখ্যার মধ্যে একটীও নির্দ্দোষ নহে, ধরিতে গেলে বলিতে হয়, এই পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠা অশুদ্ধিদোষে কলঙ্কিত; এই সকল অশুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে গেলে "দ্বৈতোক্তিরত্নমালা"র চতুর্গুণ একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। এরূপ বৃথাশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনেক সময় ব্যর্থ নষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কাজেই আমরা সমস্ত দোষগুলি না দেখাইয়া এই পুস্তকের কতিপয় স্থানের অশুদ্ধি প্রদর্শন করিতেছি। এই খণ্ডন যে কিছুই হয় নাই এবং খণ্ডনকার যে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত মতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা এই প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন।

তর্করত্ন মহাশয় অহঙ্কার করিয়াছেন যে, তিনি আচার্য্যশঙ্কর কৃত বৈশেষিক মতের খণ্ডনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আমরা কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রথমে সেই অংশ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম নিখিল প্রপঞ্চের উপাদান কারণ। ইহার উপর তার্কিকেরা দোষ দিয়াছেন যে, সমবায়ি-কারণের গুণ কার্য্যে স্বসজাতীয় গুণ আরম্ভ করিয়া থাকে; চেতন ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে সমস্ত জগৎও চেতন হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, সমবায়ি-কারণের গুণ কার্য্যে স্বসজাতীয় গুণ উৎপন্ন করে, এরূপ অব্যভিচারী নিয়ম নাই। অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষের জীবচ্ছরীর হইতে তাহা অপেক্ষা বিলক্ষণ কেশ লোমাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে (১)। মুণ্ডকোপ-



(১) [illegible] শাঙ্কর ভাষ্য—২ অধ্যায় ১ পা, ৩ অধি।

নিষদেও এ বিষয় স্পষ্ট; উল্লিখিত হইয়াছে (১)। সমবায়িকারণের গুণ কার্য্যে স্বসজাতীয় গুণ উৎপন্ন করিয়া থাকে—এই নিয়ম বৈশেষিক মতে স্বীকৃত প্রক্রিয়া দ্বারাই ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়াছে। দ্ব্যণুকত্রয় হইতে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়; দ্ব্যণুক অণু-পরিমাণ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন ত্রসরেণু মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে অণুপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুকত্রয় হইতে কখনও মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণু উৎপন্ন হইতে পারিত না। "মহদ্দীর্ঘবদ্‌বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" (২) এই সূত্রে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর-কৃত খণ্ডন পরিহার করিতে যাইয়া তর্করত্ন মহাশয় প্রথমেই এই বিষয়ে লিখিতেছেন :—"

"কার্য্যকারণয়োরস্তি সাজাত্যং শ্রুতিসম্মতম্।
ফলেন তত্তু নির্ণেয়ং প্রতিবন্ধিনিবর্ত্তকম্॥ (৩)

"একেন মৃণ্ময়েন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইত্যাদি। 'শ্রুতিদ্বারা কার্য্য-কারণের সাজাত্য উপদর্শিত হইয়াছে।' হরিবোল হরি! গোড়াতেই গলদ! এখানে উপক্রম পরিত্যাগ করিয়া ও শব্দের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই তর্করত্ন মহাশয় স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে লিখিত আছে ;—

শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গুরুগৃহ হইতে পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা তাঁহাকে অভিমানী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত তমাদেশ মপ্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি"—তুমি নিজের গুরুর নিকট কি সেই বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত শ্রুত হয়, যাহা বিচারিত হইলে অমত (অবিচারিত) মত (বিচারিত) হয়, যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। এই কথা শুনিয়া অন্য বস্তুর শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান হইতে অন্য বস্তুর শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান অসম্ভব মনে করিয়া শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন "কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি" হে ভগবন্ যে বস্তুর শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা অশ্রুত অমত ও অবিজ্ঞাত বস্তু শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত হয়, সে বস্তু কি প্রকার? ইহার উত্তরে পিতা বলিয়াছেন, যথা "সোম্যৈকেন মৃণ্ময়েন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব

(১) প্রথম মুণ্ডক, ৭ম মন্ত্র।
(২) ব্রহ্মসূত্র—২ অ ২ পা।
(৩) দ্বৈতোক্তি রত্নমালা।

সত্যম্।" ইত্যাদি ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে একের জ্ঞানের দ্বারা অন্য বস্তুর জ্ঞান একেবারে অসম্ভব নহে, যদিও ঘটের জ্ঞানের দ্বারা পট জ্ঞাত হয় না, তথাপি উপাদান কারণ জানিলে সমস্ত কার্য্য দ্রব্যের জ্ঞান হয়। যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত মৃণ্ময়ের জ্ঞান হয়। তাহার কারণ এই যে, বিকার বাচারম্ভণ মাত্র অর্থাৎ বিকারের আলম্বন বাগিন্দ্রিয়—বিকার নামে মাত্র, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য।

এই স্থলে "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" এই অংশ দৃষ্টান্ত, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" এই অংশ দৃষ্টান্ত-হেতু—ইহা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। এখানে শ্রুতিতে কার্য্যকারণের সাজাত্য বোধক কোন্ শব্দ আছে, তাহা তর্করত্ন মহাশয় ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলেই হইত। "সাজাত্যমুপদর্শিতম্" বলিয়া কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞা করিলেই সাজাত্য প্রতিপাদকত্ব সিদ্ধ হয় না। তাহার হেতুও নির্দ্দেশ করা উচিত। উপক্রম যে তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় শঙ্কা করিয়া অদ্বৈতবাদি-মত এক কথায় খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে ঐক্য প্রদর্শিত হয় নাই, কেন না, সাজাত্য না থাকিলে নানা বস্তুর ঐক্যের সম্ভাবনাও হইতে পারে না। (১) তর্করত্ন মহাশয়ের চতুঃসূত্রীর ভামতীও দেখা নাই, এ কথা আমরা এই অংশ পাঠ করার পূর্ব্বে কখনও মনে ভাবিতে পারি নাই। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই চতুর্থ সূত্রের "তত্রকিঞ্চিৎ পরিণামি নিত্যং" এই ভাষ্যপ্রতীক গ্রহণ করিয়া ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তর্করত্ন মহাশয় আর এরূপ অসার কথা লিখিতে সাহস করিতেন না। কার্য্য-রূপে নানাত্ব ও কারণ রূপে অভেদ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং (২) অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এই কথা বিস্তৃতভাবে ভামতীতে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা হইল না। তর্করত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্তস্থল পাঠ করিয়া দেখিবেন। পরের সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে না জানিয়া খণ্ডন করা কথনই উচিত নয়। [ক্রমশঃ।

---

(১) নচ ন তেষাং সাজাত্যং কিন্ত্বৈক্যমিতি যুক্তম্ সাজাত্যবিরহে নানাবস্তূনামৈক্যস্য সম্ভাবয়িতুমযোগ্যত্বাৎ।

(২) কার্য্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥

'য'এর কথা।

[শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ]

বাঙ্গালায় "য" ও "জ" এই উভয় বর্ণের একরূপ উচ্চারণ করিয়া একটিকে বলি অন্তঃস্থ অপরটিকে বলি বর্গীয় "জ"। বাঙ্গালায় "য"এর চিরকালই বর্ত্তমানের অনুরূপ উচ্চারণ ছিল একথা মনে হয় না, কারণ বাল্যকালে (অর্থাৎ ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে) কিন্তু, খিয় পাঠশালার পড়ুয়াদের পড়িতে শুনিয়াছি। স্কুলের ছাত্ররূপে আমরা পড়িতাম "বা'ক্য" অর্থাৎ 'বা'এর পরে ঈষৎ ইকারের টান, কিন্তু পাঠশালায় পড়ান হইত "বাকিয়"। হিন্দুস্থানীরাও এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহারা "কন্যা" শব্দটিকে উচ্চারণ করে "কনিয়া" (ইয়া বড় তাড়াতাড়ি), পশ্চিম বঙ্গবাসী বলে ক'ন্না (ন্না-এর পূর্ব্বে ঈষৎ ইকার) আর পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলে "কঁন্না"।

"য" এর যে এইরূপ উচ্চারণ সে কথার প্রমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের (এবং পূর্ব্বের তথা কথিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের) স্বরসন্ধিতে আছে, যথা ই+অ=য। দুটি স্বরের তাড়াতাড়ি পর পর উচ্চারণই স্বরসন্ধি, সুতরাং নি+আস=ন্যাস, এই উভয় স্থানেই উচ্চারণ একরূপ হইবে, তবে প্রথমটির দ্রুত উচ্চারণেই দ্বিতীয়টির জন্ম।

৺ লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণের পাদটীকায় পড়িয়াছিলাম য, ড ও ঢ শব্দের আদিতে থাকিলে য, ড ও ঢ বলিয়া উচ্চারিত হয় অন্যত্র য়, ড় ও ঢ় বলিয়া উচ্চারিত হয়। সূত্রটি অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের। কিছুদিন পরে কয়েকটি কথা পাই সেখানে 'য' সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় নিয়মটির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, যথা অযোধ্যা, সরযূ, যুযুৎসু, যুযুধান। বলা বাহুল্য, এগুলি সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত বানান। হিন্দীভাষার বানান অজোধ্যা, সরজু। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি "অযোধ্যা" কথাটির যেরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক বাঙ্গালার বানানে দাঁড়ায় "অয়োদিয়া"। অবশ্য 'ধ' বর্ণটি তিনি কিছু কোমল ভাবেই উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আর তিনি বি এন্ ডব্লিউ রেলের সেওয়ান ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া টিকিট চাহিয়াছিলেন তাই বুঝিয়াছিলাম "অযোধ্যা" যাইতে চাহেন, নতুবা উচ্চারণ শুনিয়া আমার বুঝিবার সামর্থ্য হইত

না। যে কয়টি নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল পূর্ব্বে দেখাইয়াছি "কায" আবার তাহার সংখ্যা বাড়াইতে উদ্যত হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে হিন্দীভাষীদের মধ্যে "য"এর প্রকৃত উচ্চারণ এখনও আছে, তাহারা লেখে "জব্", "জো", "জৈসা" "অজোধ্যা", "সরজু" প্রভৃতি আর যে বাঙ্গালা ভাষায় "য" এর প্রকৃত উচ্চারণ জানা নাই সেই বাঙ্গালায় লেখা যায় "যখন", "যে", "যেমন", "অযোধ্যা", "সরযু" প্রভৃতি। আবার যখন পূর্ব্বে "বাক্য" কথাটির উচ্চারণ "বা'ক্ক" না হইয়া "বাকিয়" ছিল, তখন এবং তাহার পূর্ব্বের হাতের লেখা পুথিতে "জখন", "জে" প্রভৃতি দেখা যাইত।

কিরূপে এই হাতের লেখার "জে" "যে"তে পরিবর্ত্তিত হইল তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল কৃত্তিবাসী রামায়ণের আধুনিক সংস্করণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই এই বানান পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী। তাঁহারা স্থির করিলেন যখন "জে" শব্দটি সংস্কৃতের "যদ্" শব্দজাত, তখন ইহাকে "যে" না করিলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবে। প্রথম প্রথম যে সকল বাঙ্গালা পুথি ছাপা হইত, সম্পাদকেরা সে সকল ক্ষেত্রেও এই পণ্ডিতের দলের পন্থা অনুসরণ করিতেন। এই সম্পাদকগণ স্বয়ং ভ্রান্ত অথচ তাঁহারা মনে করিতেন "গ্রন্থকার হয়ত ঠিক লিখিয়াছিলেন কিন্তু লেখক অনুলিপি করিবার সময়ে বর্ণাশুদ্ধি ঘটাইয়াছে।" পুথি সম্পাদনের অনুরূপ একটি ভ্রমের কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে যে ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল" মুদ্রিত হয়, তাহার ব্যাখ্যায় "করতার" শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছিল "তাঁর কর" অর্থাৎ "তাঁর কিরণ"। অথচ ধর্ম্মমঙ্গলের বহি যিনি পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে, এই "করতার" ও "কত্তার" শব্দ ধর্ম্মের একটি নাম।

সংস্কৃত শব্দের "য" কিরূপে "জ"এ পরিণত হইয়াছিল এখন সেই সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিব। এখন সকলেই জানেন সংস্কৃতের "কার্য্য", "অদ্য" প্রাকৃতে "কজ্জ" "অজ্জ", তাহা হইতে বাঙ্গালার "কাজ" ও "আজ" হইয়াছে। প্রাকৃতজনের উচ্চারণে অসামর্থ্য নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিয়াছে। "য"এর প্রকৃত উচ্চারণের সময় (অর্থাৎ দ্রুত ই য় উচ্চারণ) জিহ্বা তালুর সহিত কোনস্থানেই সংলগ্ন হইবে না, তখন ইহার উচ্চারণ অনেকটা অস্পষ্ট বা অর্দ্ধোচ্চারিত "জ" এর ন্যায় মনে হয়। জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর কিঞ্চিৎ অধিক নিকটস্থ হইলেই [illegible]চারণের কাছাকাছি হয় আর তালুতে স্পর্শ করিলেই "জ" হইয়া

দাঁড়ায়। জিহ্বার জড়তা হেতুই এরূপ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যে জড়তার জন্য "কার্য্য" স্থানে "কজ্জ" হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই "যদি" স্থানে "জদি", বা "যদ্" শব্দজাত "যাহার" না হইয়া পুরাতন বাঙ্গালায় "জাহার" হইয়াছিল।

যাঁহারা "কার্য্য" হইতে "কাজ্" বলিয়া "কায" লেখেন, তাঁহারাই "পর্ণ" হইতে জাত "পান" না লিখিয়া "পাণ" ও "পুরাতন" জাত "পুরা (অ)ন" না লিখিয়া "পুরাণ" লিখিতেছেন। সংস্কৃতের ণত্ববিধানের নিয়ম বিকৃত সংস্কৃতে শব্দে খাটান উচিত কি না ইহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। আর যদি, যখন, যাহার প্রভৃতি শব্দে 'য'এর পরিবর্ত্তে 'জ' লিখিলে বাঙ্গলা ভাষার ক্ষতি কি ?

গোবর্দ্ধন-ধারণ।

["ওপারের কথা"র লেখক]

গল্পটী এই :—বর্ষার শেষে বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীগণ মিলিত হইয়া একটী যজ্ঞ করিতেন। উহার নাম ইন্দ্রযজ্ঞ। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ইন্দ্রের পূজা করা ; কারণ তৎপ্রদত্ত বৃষ্টিতে শস্য জন্মাইলে ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা জীবনধারণ করেন ও গাভীগণ দুগ্ধবতী হয়। এই যজ্ঞের আয়োজন হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমরা ত কৃষি নহি, বরং গাভীগণই আমাদের অবলম্বন ; সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য, উক্ত দিবসে গাভীসমূহকে উত্তমরূপে ভোজন করান ও উহারা গোবর্দ্ধন-গিরির আশ্রিত বলিয়া উক্ত গিরির পূজা কর্ত্তব্য ; আরও বিধেয়,ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্ত-গণকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা।" শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্ত ভোজন করিলেন ও উপযুক্ত গো-সেবা হইল। গোবর্দ্ধনও মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণই মূর্ত্তিমান্ গিরি সাজিয়া অন্নব্যঞ্জনের সমাদর করেন।

পূজা পাইলেন না বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন ও মেঘদলকে আহ্বান করিয়া বৃষ্টি দ্বারা বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। মেঘগুলি প্রভুর আদেশ-পালনে বদ্ধপরিকর হইল। সুতরাং বৃন্দাবনবাসীদের সহিত গোগণের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগি

সাত দিবস উহা একটী মাত্র অঙ্গুলির উপর ধরিলেন। এই উপায়ে বৃন্দাবন রক্ষা পাইল ও ইন্দ্র হার মানিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন।

যজ্ঞ পঞ্চ প্রকার যথা, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞের দুইটী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বাহ্যিক ও মুখ্য। ঋষিযজ্ঞের গৌণ উদ্দেশ্য পবিত্র গ্রন্থপাঠ করিয়া জ্ঞান-অৰ্জ্জন করা ও মুখ্য উদ্দেশ্য অজ্ঞানীকে জ্ঞান-দান করা। দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম কাৰ্য্য। ইহার একটী উদ্দেশ্য দেবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান ও অপর উদ্দেশ্য সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত উপরি জগৎস্থ লোক-সমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন। পিতৃযজ্ঞের প্রথম উদ্দেশ্য, পূর্ব্বপুরুষগণের কৃত উপকারের জন্য তর্পণাদি কৰ্ম্মদ্বারা কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করা ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাঁহাদের আত্মার ও মনের কল্যাণে কৰ্ম্মসাধন। নৃযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ও দুঃখিতের দুঃখমোচন; গৌণ উদ্দেশ্য স্বার্থপরতাকে বলিদান দেওয়া। ভূতযজ্ঞের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য আহারের পূর্ব্বে ভূতলোকের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নত্যাগ ও আহারান্তে প্রাণীগণের জন্য অবশিষ্টাংশ উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করা; অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্য সৰ্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা। সুতরাং ইহা হইতে বোধগম্য যে চিত্তের উৎকর্ষতাসাধন যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইন্দ্রযজ্ঞ দেবযজ্ঞভুক্ত ও গিরিযজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন কৰ্ম্মহেতু নৃযজ্ঞ ভুক্ত। কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য উন্মুক্ত প্রকৃতির পূজা, একত্র প্রীতিভোজন ও গোসেবা। যাবতীয় সৎগুণসম্পন্ন মহোদয়গণ সেকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। রজঃ ও তমোগুণের পরিবর্ত্তে তাঁহারা অধিক মাত্রায় সত্বগুণে পূরিত হইতেন বলিয়া জাগতিক যাহা কিছুতে তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন। কাহারও প্রীতিবর্দ্ধন করিলে বিশেষতঃ সত্বগুণসম্পন্ন জীবের ও আৰ্ত্তগণের সেই প্রকার কৰ্ম্মদ্বারা কৰ্ম্মকৰ্ত্তার বা কর্ত্রীর মন-প্রাণে সত্বগুণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চিত হয়। বৈদিক যুগে বিরাট প্রকৃতির সৌষ্ঠব সূৰ্য্য, বরুণ, অগ্নি, পবন ইত্যাদি পূজিত হইত। সেকালের মহোদয়গণ সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন যে, মানব-মনকে যাবতীয় অগুণ হইতে কেবলমাত্র সদ্‌গুণ দ্বারা পূরিত করিতে হইলে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ ও উহার নিৰ্ম্মলতার, বিশুদ্ধতার ও চিরনূতনত্বের পূজা অর্থাৎ আদর করা জীবের পক্ষে ধ্রুব সুফলপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণও প্রকৃতি সেবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার যাবতীয় লীলা উন্মুক্তস্থানে সাধিত হইয়াছিল। প্রকৃতির বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুণগান প্রকৃতি-সেবক ছাত্র-ছাত্রী এক মুখে নয় সহস্রকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াও নিজ

নিজ সামর্থ্যকে বা বাকৃচাতুর্য্যতাকে ধিক্কার দিয়া থাকেন। মনে হয়, প্রকৃত প্রকৃতিসেবকই মানব-হৃদয়ের ও চিত্তের উৎকৃর্ষতা কতটুকু সাধিত হইতে পারে, ইহা জগৎকে প্রতীয়মান্ করাইয়াছেন।

কেবল মাত্র এক ঈশ্বর এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও ত্রাতা হইলেও দেবতা ও উপদেবতাগণ বিশ্বের কর্ম্মচারিস্বরূপ অবস্থিত। মনের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতানুসারে এই নশ্বর দেহপাতের পর জীব মন ও আত্মা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম দেহে বিশ্বপতির বিরাট আলয়ে কেহ পুত্র, কন্যা বা প্রণয়িনী ভাবে, কেহ দেবতা বা উপদেবতা আকারে ও কর্ম্মচারী-চারিণী ভাবে ও কেহ প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়াও নিকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্মসাধন করেন। ইন্দ্র শ্রীভগবানের বারিবর্ষণকারী কর্ম্মচারী মাত্র। কর্ত্তার আরাধনায় না থাকিয়া কেবল মাত্র কর্ম্মচারীর আরাধনায় কালাতিপাত করিলে জীবের পক্ষে উত্তরোত্তব উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অলীক আশা মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক যুগের অর্চ্চনাদি কর্ম্মের সহিত তৎকালীন ধর্ম্মকর্ম্ম একত্রীভূত করিয়া গিরিযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন।

গৃহ বা সমাজ-সংস্কারের বা জাতীয় জীবন-গঠনের সুসিদ্ধ সোপান **একতা।** কিন্তু সংস্কারকের সততার, কার্য্যকুশলতার ও মানবের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমের উপর এই সোপানের ভিত্তি স্থাপিত হইলে সংস্কারাদি কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয়। পুরাতন ধারা হইতে নূতন ধারায় প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে প্রবর্ত্তকের উদ্ভাবনা-শক্তির আবশ্যক। সেই উদ্ভাবনায় এমন উপকরণ থাকা অত্যাবশ্যক, যাহা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া পরে সেই কার্য্য বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয়। গিরিসম্মিলন, গিরিপূজা, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন ও গো-সেবা কর্ম্মদ্বারা নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ব্রজবাসী-বাসিনীগণ এক একটী কর্ম্মে যোগদান করিবেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল। ফলে তাহাই হইল ও সমগ্র বৃন্দাবনবাসী বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। সেই প্রীতির বা উৎফুল্লতার কারণ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিন্তায় ভোজ্য সেব্য সামগ্রী হইলেন। ফলতঃ প্রত্যেক [illegible]বাসিনী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন যে, "আমি শ্রীকৃষ্ণের"। এ চিন্তা প্রবল হইলে জীব আত্মহারা অবস্থায় উপনীত হয়। তৎপরে তাঁহারা আহার করিতে বসিলেন। আত্মহারা অবস্থায় আপনারা আহার করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকেও খাওয়াইলেন। কিন্তু এমনি তদ্গতচিত্ত হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের [illegible] কথা বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই অন্নব্যঞ্জনাদির সমাদর করিতেছেন এই

কথা হৃদয়ে জাগরুক রহিল। মনে হয়, লেখক এই ঘটনাকে নিজ কল্পনাবলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মূৰ্ত্তিমান্ গিরি সাজিয়া উদর পূর্ণ করেন।

নিজ নিজ মনকে আয়ত্ত বা আত্মাভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইলে মানুষের সুখ-শান্তির তৃষ্ণার নিবৃত্তি সম্ভব। জীবদেহস্থিত আত্মা, পরমাত্মার অণুর অণু। সুতরাং জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ইত্যাদি আত্মার উপাদান। একমাত্র মনের দ্বারা চালিত হইয়া জীব অভাব ও অশান্তির দ্বারা নিষ্পেষিত। কিন্তু ক্রমশঃ মনকে সদ্‌গুণ দ্বারা পরিপূরিত করিতে সক্ষম হইলে সেই মনে দিনের দিন আত্মার যাবতীয় সদ্‌গুণ মুকুলিত হয়। মন হইতে নিস্তার পাইবার উপায় বৈরাগ্য বা যোগ। রাসলীলায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈর্ষা, কুৎসা, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসত্যাদি হইতে বিরত হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য বাচ্য। তদ্রূপ উক্ত যাবতীয় অগুণাদি হইতে মনকে উদ্ধার করাই প্রকৃত যোগবাচ্য। বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলে বা উক্ত উপায়ে যোগমুক্ত হইলে জীবের বুঝা সহজসাধ্য যে, তিনি মানব হইয়াও 'সেই তিনি' অর্থাৎ সোহং বা 'আমি তোমার'। জীবদেহের ভরণকৰ্ত্তা মন, সুতরাং এই দেহভার বহন করিয়া মন হইতে পূর্ণমাত্রায় অব্যাহতি পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ মনকে সম্বল করিয়া বা মনের অস্তিত্ব অন্ততঃ চোদ্দ-আনা পরিমাণে না লোপ করিয়া যে কোন জীব 'স্বামী' বা 'সোহং' উপাধি গ্রহণে প্রয়াসী এবম্প্রকার কার্য্য তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ নহে কি? সাধারণ জীবের পক্ষে এই অবস্থাপন্ন হওয়া সুকঠিন বলিয়া "আমি তোমার" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া বিশেষ সুফলপ্রদ। 'আমি তোমার' অর্থে আমার দেহ, প্রাণ, মন ও সংসার বিশ্বপতির বা বিশ্বজননীর যিনি আমার প্রকৃত পিতা, বা মাতা বা স্বামী। "আমি তোমার" কথার পরিবর্ত্তে "আমি তাঁহার" কথা ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানময় পিতা, প্রেমময়ী জননী ও সর্ব্বগুণাকর স্বামী যখন 'আত্মা' ভাবে প্রধানতঃ আমার এই দেহে ও মনের নিম্নস্থ পাটে অবস্থিত, তখন আমি সুধাপূর্ণ বা সুধামুখী মন—কারণ পরম সুধা-ময়ের প্রতি ধাবিত—এত সন্নিকটস্থ প্রিয়তমের সহিত ঘনিষ্টতর "আমি তাঁর" কথার পরিবর্ত্তে "আমি তোমার" এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব না কেন? "আমি তোমার" সম্বন্ধ স্থাপনে লাভ; ১। ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব—কারণ যাহা কিছু এতদিন "আমার" বলিয়া পরিগণিত ছিল, উহার স্বামীত্ব প্রকৃত মালিকের হস্তে ন্যস্ত হইল; ২। ধৰ্ম্মজীবন লাভের মূলমন্ত্র 'বৈরাগ্য' ব্রত উদ্‌যাপনে ও ৩। যোগাভ্যাসে যত্নশীল-কারণ মনকে দেহ-

স্থিত আত্মার সহিত পিতা বা মাতা বা স্বামী সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত করিতে সচেষ্ট ; ৪। ক্রমশঃ মনের অতীতাবস্থায় উপনীত হওয়া—কারণ 'আমি' অর্থাৎ 'মন' কর্ম্মকর্ত্তা না হইয়া অল্পে অল্পে এই দেহ ও সংসার আত্মার লীলাভূমি হইয়া পড়ে ; ৫। ক্রমশঃ জাগতিক অভাব ও অশান্তি হইতে নিস্তার পাইবার আয়োজন—কারণ মনের পরিবর্ত্তে আত্মা কর্ত্তা সাজিলে সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর ; ও ৬। ক্রমশঃ চৈতন্যে বা আত্মায় অধিষ্ঠিত হইয়া "মহাভাব" বা "সমাধি" অবস্থা পাইবার ইহাই বিপুল আয়োজন।

বীজের প্রসার।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

উদ্ভিদ্ জগতের ব্যাপকতা স্মরণ করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। একটু জল ও রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলেই মাটিতে অসংখ্য গাছ গজাইয়া উঠে। এই দারুণ গ্রীষ্মে ছাদের উপর দুইটা ফুল গাছের পাত্র রাখিলে তাহাতে রাশি রাশি আগাছা জন্মে। তাহার পর ভগ্ন অট্টালিকায়, গৃহের কোণে, অলিতে গলিতেও ঘাস আর আগাছার উপদ্রব। মনে হয় যেন মাটির ভিতর এমন একটা শক্তি আছে যাহার বলে তাহার নিজের ধূলিকণা গুলা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন "স্মরণ্ স্মরণ্ স্বগৃহ-চরিতম্ দারুভূতো মুরারিঃ" তেমনি অপার-আনন্দে ধূলিকণার নয়নরঞ্জন দারুব্রহ্মে পরিণতি হয় বলিয়া মনে হয়। প্রবালের দেহ-কঙ্কাল জমিয়া প্রসান্তসাগরে দ্বীপের উৎপত্তি হইলেই তাহার উপর নারিকেল গাছের আবির্ভাব হয়।

পূর্ব্বে একদল দার্শনিক ছিলেন যাঁহারা বলিতেন অশরীরি হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ওসব বাজে কথায় কাণ দেয় না। ভগ্ন মন্দিরের প্রাচীর ফুঁড়িয়া বটগাছ গজায়—সেও বটগাছের বীজের পরিণতি. আর প্রবাল দ্বীপে নারিকেল গাছের জন্মও নারিকেল হইতে। উদ্ভিদের বীজের মধ্যে জীবনীশক্তি বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারে এবং বীজগুলি নানারকম উপায়ে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে পারে।

বটগাছ ভাল উর্ব্বরক্ষেত্রে বহু চেষ্টা করিলেও জন্মে না অথচ গৃহস্থের অবনতির সময় তাহার ভাঙ্গা প্রাচীরে শিকড় নামাইয়া শীঘ্র তাহাকে গৃহহীন করিতে সহায়তা

করে। যে জলা জমিতে ধান জন্মে সে জলাজমিতে কৃষ্ণচূড়া বা রসাল জন্মে না। মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন তরুর ক্ষেত্র বিভিন্ন। তাই যাহাতে ঠিক নিজ নিজ অনুকূলক্ষেত্রে গিয়া শিকড় গাড়িতে পারে সেই উপায় করিয়া দিবার জন্য বিধাতা বীজগুলিকে চারিদিকে ছড়াইবার শক্তি দিয়াছেন।

দোপাটী গাছের বীজ দেখিলে মনে হয় প্রকৃতিকে সাজাইবার জন্য ভগবান কত প্রকার বিচিত্র উপায় অবলম্বন করেন। দোপাটী ফুলের বীজের ভিতর চারটি স্প্রিংএর মত শুষ্ক ডাঁটা থাকে। তাহার চারিদিকে বীজ থাকে। বীজের আধারটি দুর্ব্বাসা মুনির মত যেন ক্রোধে ফাটিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। একটু জোরে বাতাস বহিলে বা কোন পশুপক্ষীর বা বৃক্ষশাখার সামান্য স্পর্শ পাইলে বীজাধার একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া যায় আর ভিতরের স্প্রিংগুলার ঠেলা পাইয়া বীজগুলা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাল্যকালে আমরা সকলেই বোধ হয় পাকা দোপাটীর বীজ লইয়া এই খেলা খেলিয়াছি।

একরকম ঘাসের বীজ আছে তাহাদের গায়ে খুব সরু সুঁয়ো দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলা এমন ভাবে সংন্যস্ত যে বায়ুর তাড়নায় সেগুলা একদিকেই ঘুরিতে ঘুরিতে যায়। শেষে যেখানে মাটি ভিজা সেইখানে লাগিয়া গিয়া ঘাস উৎপাদন করে।

জলের সাহায্যে জীবজন্তু যেমন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছের বীজগুলিও তেমনি ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গে উপনিবেশস্থাপন করিবার জন্য জলের সাহায্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অনেক জলজ বৃক্ষের বীজ ভাসিয়া একস্থল হইতে অপর স্থলে চলিয়া যায় এবং অনুকূল ক্ষেত্রে যুটিয়া উঠে। পদ্ম প্রভৃতির বীজের ভিতর একটু বায়ু আবদ্ধ থাকে যাহাতে তাহারা ভাসিতে পারে। নারিকেল সমান পরিমাণের জলের অপেক্ষা লঘু তাই উহারা বহুদিন সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া প্রবাল দ্বীপগুলিকে সজীব করে। বরষার বারিধারায় কত বীজ এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে গিয়া বৃক্ষে পরিণত হয় তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। বারির চলৎশক্তির আনুকূল্যে উদ্ভিজ্জগত আত্ম-প্রসার করে।

তাহার পর বায়ু। বলা বাহুল্য, ক্ষুদ্র বীজগুলি বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া সর্ব্বত্র উপনিবেশ-স্থাপন করে। কত বীজ যে বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সাদা চোখে আমরা বুঝিতে পারি না। এই সকল ক্ষুদ্র বীজাণুর কথা ছাড়িয়া দিলে অনেক বড় গাছের বড় বীজ বায়ুর সাহায্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা আমরা প্রত্যেকেই দেখিতে পাই। আমরা তুলার বীজগুলা পরিত্যাগ

করিয়া তুলা লইয়া শয্যা প্রস্তুত করি। কিন্তু বিধাতা তুলার সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ বীজগুলাকে লইয়া বায়ুবক্ষে অনুকূল ভূমির অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিবার জন্য। অনেক বীজে সুঁয়ো আছে। এমন কি আফিমের বীজে সরু সরু তাঁতের মত কাঁটা আছে বলিয়া অহিফেন গাছ ছড়াইয়া পড়ে। ঢ্যাঁড়সের বীজেও ঐ রকম সুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুপক্ষীর দ্বারাও উদ্ভিদ-জগতের প্রসার হয়। অনেক কণ্টকময় বীজ পশুপক্ষীর লোমে ও পক্ষে সংবদ্ধ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশে এক রকম বন্যবৃক্ষ আছে তাহার ছোট ছোট বীজগুলা জোঁকের মত কাপড়ে চোপড়ে আট্‌কাইয়া যায়। বাল্যকালে আমরা সেগুলা পরস্পরের মাথার উপর লাগাইয়া দিতাম। সেগুলা অবশ্য এই শ্রেণীর বীজ, এই রকমের বীজ ঘাসের চোরকাঁটা। পক্ষীরা অনেক ফল মুখে করিয়া অপর স্থলে লইয়া যায়। সেই সকল ফলের বীজ পরে পাদপে পরিণত হয়। অনেক বীজ আবার পক্ষীদের পুরীষের সঙ্গে বাহির হইয়া অনুকূল ক্ষেত্রে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। শুনিয়াছি ভগ্ন প্রাচীরে বটবৃক্ষের আবির্ভাব এইরূপে হইয়া থাকে।

প্রেমের স্বর।

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম এ]

(কাপ্তেন ডি এল্ রিচার্ডসন রচিত ইংরাজী কবিতা হইতে)

ভয়ঙ্কর এই মরুভূমি মাঝে, দীর্ঘ-পথ-শ্রান্তি করিতে হরণ
অবসাদ মাঝে দিতে প্রফুল্লতা, থাকে হেথা যদি মায়ামন্ত্র কোন,
তবে সে প্রেমের মধুময় স্বর, হৃদয়ে যাহার উঠে প্রতিধ্বনি,
জ্যোৎস্না প্লাবিত হ্রদের মাঝারে, অনিল-তরঙ্গে, সঙ্গীত যেমনি।

দুর্গম এ পথ হ'ত কি ভীষণ, পথিকের হৃদে হ'ত কি ক্লেশ
স্বরগের এই মিলন-গানের, না থাকিত যদি জীবনে রেশ,
সেই অজানিত দেশের লাগিয়া, কাঁদিত নিঃসঙ্গ কতই এ প্রাণ,
'পাপীরা যেথায় ভুলিয়াছে পাপ, শ্রান্তরা যথায় লভিছে নির্ব্বাণ!'

সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়।

(লেখক মোহাম্মদ কে, চাঁদ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রতিবাদ।)

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় ভাবিয়াছেন যে, আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বিরোধী হইয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এই হেতু তিনি প্রতিবাদ করিতে গিয়া একটা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমার বোধ হয়। কি হেতু মুসলমানেরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সভায় যোগদান করেন না, তাহাই প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য। কারণ আমি অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের মনোভাব জানি। যখন বাঁকিপুরে বিষয়-নির্ব্বাচন সভায় এ বিষয়ে কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন আমি তাঁহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম মাত্র। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বিরোধী নহি, বরং আমি হিন্দু-মুসলমান-মিলন প্রত্যাশী।

অনেকেই জানেন, আজকাল বাঙ্গালা দেশে বহুসংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। যদি তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া সাহিত্য সম্মিলনরূপ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দিরে আসিয়া মিলিত না হন, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় মুসলমান সাহিত্যিকের যোগদানেই বা কি ফল হইবে? সভাস্থলে মুসলমান-সাহিত্যিকের সংখ্যার অল্পতাহেতু তাঁহারা কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না অথবা হস্তক্ষেপ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এইজন্য আমি যোগদান না করিবার কারণ কি, তাহাই সাহিত্য-সমাজে জানাইবার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সভাস্থলেই হউক, আর মাসিক পত্রিকাতেই হউক, যদি মুসলমানেরা তাঁহাদের ওরূপ লেখার উপর মন্তব্য-প্রকাশ করেন বা মিলনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করেন, অমনি হিন্দুরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কোন-না-কোন রকমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। রাখালরাজ বাবু কি অস্বীকার করেন যে মুসলমানবিরুদ্ধ কথা তাঁহারা মাসিক পত্রিকায়, ইতিহাসে, উপন্যাসে, নাটক বা কাব্যে লিখেন না বা লিখেন নাই? যদি বলেন যে লেখার গতিরোধ করা সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যও নহে বা সাধ্যও নহে, তবে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য বা সাধ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল বৎসরান্তে একবার করিয়া

সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে পরস্পর দেখাদেখি করা? তাও দেখি, কেবল দেখা-দেখি মাত্র। কোনও সাহিত্যিকই কোনও সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসাও করেন না যে আপনি কে, এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন। এরূপ আলাপন করিলেও বুঝিতাম সে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। সে যাহাই হউক তাহা আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। তবে যাহা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা পরিত্যাগ করা হিন্দুদিগের উচিত। দেশের অনিষ্টজনক কার্য্যের গতিরোধ করিবার জন্য দেশস্থ সকল গণ্যমান্য লোক যেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, অক্ষম হইলে রাজপুরুষগণের সাহায্য চাহিয়া থাকেন, তেমনই সেই সকল গণ্যমান্য লোকের দ্বারা যে ইহার প্রতিকার হইতে পারে না তাহাই বা কিরূপ কথা। আমরা তো Defence of India Actএর ন্যায় Act পাশ করিতে বলিতেছি না যে, "ব্যক্তিগত ভাবে কত লোককে শাসন করিব।" শাসনের আবশ্যক কি? আমি তো বলিয়াছি যে সাহিত্যিকের হিসাবে "এখানে রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিয়া সম্মিলন-কার্য্যে উৎসাহ দিয়া থাকেন···। অতএব তাঁহারাই ইহার কর্ণধার·········এতদ্ব্যতীত যাঁহারা নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে ও মাসিকপত্রিকার প্রবন্ধে মুসলমানের উপর ঘৃণার উদ্রেক করেন, অনৈতি-হাসিক বা ইতিহাস প্রমাণবিরুদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া মুসলমানের প্রাণে আঘাত করেন, তাঁহারাও এখানে উপস্থিত থাকেন।" অতএব তাঁহাদিগকে বর্ষে বর্ষে একবার করিয়া এরূপ অনুরোধ করা যাইতে পারে যে, যে সকল লেখায় মুসলমানেরা দুঃখিত বা মর্ম্মাহত হন সেই সকল লেখা লিখিতে নিবৃত্ত হওয়া প্রত্যেক সাহিত্যিক বন্ধুর উচিত। যেহেতু দেশের উন্নতির দিন আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ-সাগরে ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া আসিতেছে। যাহাতে ঘৃণা, দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা এই অল্পকাল স্থায়ী চড়া ধৌত হইয়া অপসারিত না হয় এবং যাহাতে উক্ত সাগর একেবারে চড়া পড়িয়া গিয়া মিলনরূপ সমতলভূমির সহিত সমতল হইয়া যায় সে বিষয়ে প্রত্যেক সাহিত্যিকের চেষ্টা করা উচিত। যতদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন যে-কোন উন্নতির কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। বঙ্গভাষার উন্নতি করিতে গেলে মুসলমানদিগকে আবশ্যক। দেশের রাজনৈতিক উন্নতি করিতে গেলে মুসলমান ব্যতীত সে উন্নতির চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না। জাতীয় একতা ব্যতিরেকে দেশের উন্নতির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

রাখালরাজ বাবু প্রতিবাদস্থলে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রমাণানুযায়ী আওরঙ্গজেব ও সিরাজ-উদ্দৌলা অত্যাচারী ছিলেন বলিলে মুসলমানেরা বিরক্ত হইবেন কেন? তবে যদি ৺নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় স্বপ্নকল্পিত অত্যাচারকে বাস্তব ধরিয়া তাঁহাকে অত্যাচারী বলা হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরা বিরক্ত না হইবেন কেন? যাহা প্রকৃত ইতিহাসে নাই, তাহা যদি অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে রাখালরাজ বাবুও কি রাগ করেন না? যদি সিরাজ-উদ্দৌলার প্রকৃত ইতিহাস অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বহু পরিশ্রম সহকারে গবেষণা করিয়া শিক্ষিতসমাজে প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে সিরাজ-উদ্দৌলার উপর যে সকল অযথা কল্পিত কলঙ্কের বোঝা চাপান হইয়াছিল, তাহা হইতে কি সিরাজ মুক্ত হইতে পারিতেন? আজও পর্য্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে অঙ্কিত কলঙ্কের চিত্র অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মন হইতে দূরীভূত হয় নাই। আওরঙ্গজেবের ন্যায় অত্যাচারী অনেক হিন্দুরাজাও ছিলেন, তাই বলিয়া তাঁহার সেই অত্যাচার-কাহিনীর অতিরঞ্জিত বর্ণনাকেও কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ও সেই সকল কাহিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া উক্ত সম্রাটকে নিষ্ঠুর, পাষণ্ড, মুসলমানকুলকলঙ্ক প্রভৃতি বলিলে কি মুসলমানেরা দুঃখিত হইবেন না?

আওরঙ্গজেব রাজ্যলোভে পিতাকে কয়েদ রাখিয়াছিলেন এবং রাজ্য কণ্টক-শূন্য করিবার জন্য ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসপ্রমাণ সাপেক্ষ হইলেও হিন্দুদিগের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার কি অভাব আছে? যদি রাখালরাজ বাবু অস্বীকার করেন তো আমি তাঁহাকে শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত "মধ্যযুগে ভারতে সামাজিক অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলি। প্রবন্ধটি 'সাহিত্যসংহিতা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। রাখালরাজ বাবু 'কায়স্থ পত্রিকা'য় প্রকাশিত ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞার কথা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কায়স্থের ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করাতে জাতীয় রেষারেষী প্রকাশ পায় না। ইহা সামাজিক রেষারেষী মাত্র। কারণ কায়স্থ কায়স্থই এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই। কায়স্থ মুসলমানও নন বা ব্রাহ্মণ মুসলমানও নন। উভয়ই হিন্দু, তবে সে রেষারেষী সামাজিক ভিন্ন কি হইতে পারে? কখনও কায়স্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিতে ভুলিবেন না বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আহূত হইলে ভক্তিসহকারে তাঁহার বাটীতে আহার করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। তখন সেরূপ মনোমালিন্য মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না। এবং এরূপ মনোমালিন্যকে জাতীয় বিদ্বেষ বলা যাইতে পারে না। ইহা সামাজিক মতদ্বৈধতা। কিন্তু হিন্দুর নিকট মুসলমান যে শৃগাল, কুক্কুর অপেক্ষাও

ঘৃণ্য তাহা কি রাখালরাজ বাবু অস্বীকার করেন? যেরূপ কায়স্থে কায়স্থে মনোমালিন্যের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সে অবস্থায় একজন কায়স্থ অপর একজন কায়স্থকে স্পর্শ করিলে কি তাঁহার জাতি যাইবে, না যায়? কিন্তু রাখালরাজ বাবু জানেন, যদি কোন মুসলমান কোন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের বাটীর যে অংশে আহার্য্য দ্রব্য থাকে, তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তিনি সেই সকল দ্রব্য ফেলিয়া দিয়া তথায় গোময়-লেপন করিয়া থাকেন। কিন্তু সেস্থলে শৃগাল কুকুর গেলে ওরূপ করেন না। পূর্ব্বে মুসলমানদিগকে হিন্দুরা 'পারিয়া' 'চণ্ডাল' প্রভৃতি জাতির ন্যায় অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতেন এবং এক্ষণে পল্লিগ্রামে এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ঐরূপ ঘৃণা করিয়া থাকেন। আমি জানি একবার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহার দালান-গৃহ পূজার দালান বলিয়া তন্মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। রাখাল-রাজ বাবু মনে রাখিবেন যে, এই দালান সে সময় পূজার দালান ছিল না। বহু পূর্ব্বে পূজার দালানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া তিনি তন্মধ্যে মুসলমানকে যাইতে দিয়া অপবিত্র করিতে দেন নাই। আমাকে যে সময় যাইতে দেন নাই সে সময় দালান গানবাজনার দালান হইয়াছিল। কায়স্থের মধ্যে বা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে রাখালরাজ বাবু কর্ত্তৃক উক্ত দলাদলি বা রেষারেষী থাকিলে তিনি কি কখনই কায়স্থকে বা ব্রাহ্মণকে ঐরূপ ঘৃণা করিয়া দালান মধ্যে যাইতে নিষেধ করিতেন? কখনও না। তবে এক্ষণে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতটা ঘৃণার ভাব নাই। নানা কারণে অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দুরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, মুসলমান ছাড়িয়া কোন কাজই সমাধা হইতে পারে না। তাই হিন্দু-মুসলমানের সহিত মেশামেশির দিকে প্রধাবিত হইয়াছেন। রাখাল-রাজ বাবু 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র শ্রাবণ সংখ্যায় মুসলমান-ঘৃণাব্যঞ্জক প্রবন্ধ দেখিতে পান নাই। তিনি বিশেষ ভাবে দেখেন নাই বলিয়া দেখিতে পান নাই। রাখালরাজ বাবু জানেন যে, ইংরাজ লেখকেরা "মোহাম্মদের পর্ব্বতসকাশে-গমন" একটি অনৈতিহাসিক ব্যঙ্গোক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ইতিহাস-প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। ইহা তাহাদের ব্যঙ্গোক্তি মাত্র। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার বেকন তাঁহার নির্ভীকতা (Boldness) শীর্ষক প্রবন্ধে, লজ্জাহীনতা যে নির্ভীকতা নহে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উদাহরণটির উল্লেখ করিয়াছেন;—

"Mahomet made the people believe that he would call

an hill to him,... ... The people assembled; Mahomet called the hill to come to him again and again; and when the hill stood still, he was never a whit abashed, but said, '*If the hill will not come to Mahomet, Mahomet will go to the hill.*' So these men, when they have promised great matters and failed most shamefully, yet (if they have the perfection of boldness) they will but slight it over, and make a turn and no more ado."

গত শ্রাবণ মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র ৬৫৭ পৃঃ ২স্তম্ভ ১৪শ পংক্তিতে লিখিত "প্রয়োজন হয় তিনি আমাদের নিকট আসিতে পারেন। পর্ব্বত মোহাম্মেদ নিকট কিহেতু যাইবে?"—বেকনকল্পিত এই মিথ্যা কথার পুনরুল্লেখ করাতে কি রসিকতা করা ও মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেওয়া হয় নাই? রাখালরাজ বাবু জানেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া মুসলমানদিগের পরম পূজনীয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল মুসলমানই তাঁহাকে 'নবী', 'রসুল' প্রেরিত পুরুষ বলিয়া সম্মান ও ভক্তি ও প্রেম করিয়া থাকেন। তাঁহার নামের অপবাদ যে কিরূপ মর্ম্মপীড়ক ও অসহনীয়, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। 'ভারতবর্ষে' খলিফা ওমরের আদেশে আমর কর্ত্তৃক আলেকজিন্দ্রিয়ার ভুবন-বিখ্যাত প্রাচীন লাইব্রেরী ধ্বংসের অনৈতিহাসিক অপবাদের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। রাখালরাজ বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক গবেষণাকারী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্। তিনি নিশ্চিতই জানেন যে, মিশর মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার বহু পূর্ব্বে উপরোক্ত রাজকীয় পাঠাগার রোমকসম্রাট থিওডোসিয়সের আমলেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব ঘোর ইসলামবিদ্বেষী খ্রীষ্টান মিশনারী লেখকগণ কল্পিত কথার উপর নির্ভর করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করাও কি মুসলমান-বিদ্বেষের চিহ্ন নহে? ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমানেরা ঘোর মূর্খ জাতি। তাঁহারা কোরান ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই তাঁহাদের পাঠোপযোগী বোধ করেন নাই বলিয়া তাই খলিফার আদেশে এমন বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারে সঞ্চিত অমূল্য রত্নস্বরূপ গ্রন্থ সকল ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে", ২২০ পৃঃ ১৩-১৬ পংক্তিতে আর একটী নূতন কথা পাওয়া গেল। বইগুলি নাকি আলেকজান্দ্রিয়া হইতে

আরবে লইয়া গিয়া তথায় রন্ধন-কার্য্যের জ্বালানির স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইসলামধর্ম্মের বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা রটনা মধ্যযুগে খ্রীষ্টানেরা যে কতই করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। সেই সকল মিথ্যা অপবাদের পুনরুল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগের প্রাণে ব্যথা দেওয়া আজকাল এরূপ বিদ্বোন্নত ব্যক্তিগণের উচিত নহে।

যদি সত্য বলিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানেরাও কি এরূপ করে নাই? যখন স্পেনদেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করা হয়, তখন খলিফা ২য় হাকামের বিরাট রাজকীয় পাঠাগারে সঞ্চিত ৬ ছয় লক্ষ পুস্তক অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। সেই পাঠাগারে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, প্রভৃতি বিদ্যার যাবতীয় মূল্যবান গ্রন্থ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টান বিজেতারা পাঠাগারের প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে কক্ষটি কেবল কোরান-বিষয়ক গ্রন্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, ঐ গ্রন্থগুলি কি? তদুত্তরে বলিল—'All Korans' ('সবই কোরান')। শ্রবণ মাত্রেই আদেশ দিল 'বিধর্ম্মীর ধর্ম্মগ্রন্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল।' অতএব এই আদেশানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত ৬ লক্ষ গ্রন্থের সবই বিনষ্ট করা হইল। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অতএব একটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। রাখালরাজ বাবু বলিয়াছেন, 'যবন' বলিলে ঘৃণা প্রকাশ হয় না। 'যবন' Ionian হইলে, মহাভারতের যে 'যবন' যতুগৃহ দগ্ধ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল, রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে যে যবনের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা কাহারা? রাখালরাজ বাবু যদি প্রাণ খুলিয়া সত্য বলেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না যে, 'যবন' বলিলে ঘৃণা প্রকাশ হয় না। আমি সাহিত্যিক-কুলতিলক ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠ পরম ভক্তিভাজন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' হইতে একটি মাত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিনি মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন:—

"ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—'আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়ারের খোয়াড় আগুনে পুড়াইয়া মাতা বসুমতী আবার পবিত্র করিব।.........চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নি-সংস্কৃত করিয়া খড়কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই।'.........।" ১৮শ পরিচ্ছেদ/১১২ পৃঃ ২খণ্ড।

রাখালরাজ বাবু আর কি বলিতে চান। এই গ্রন্থখানি আবার নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করে ও তৎসঙ্গে তাহাদের অন্তরে যে ঘৃণার ভাব আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান ঘৃণার কথা আছে কি না, তাহা রাখালরাজ বাবুকে অধিক বলিতে হইবে না। বঙ্কিম বাবুর মতাবলম্বী দুইজন কবির গ্রন্থই ইহার দৃষ্টান্ত। রাখালরাজ বাবু জানেন 'পলাশীর যুদ্ধের' ও 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' অনেকস্থানেই 'যবন' বলিয়া মুসলমানদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক ছিল কি না, তাহা রাখালবাবুকে বলিতে হইবে না। পদ্মিনী উপাখ্যানের "একতায় হিন্দুরাজগণ, সুখেতে ছিলেন যখন" অংশ 'পদ্যপাঠ' নামক গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছিল। এবং এই পদ্যপাঠ তখনকার বিদ্যালয়ের একমাত্র কবিতা পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' তো সেদিন পর্য্যন্ত মধ্য ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক ছিল। যাহা হউক অধিক বলিয়া মনে দুঃখ বৃদ্ধি করা ভাল নহে। তবে আমি বলি যে, সাহিত্যসম্মিলনই হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য দূর করিবার প্রকৃত স্থল। যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য দূর হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই উচিত। এ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলেই তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যেন উহা কিছুই নহে, এইরূপ আমাদিগের হিন্দুসাহিত্যিক ভ্রাতারা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে যে বিষময় ফল ফলিতেছে; তাহাতে যে বিচ্ছেদসাগর গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে, তাহা তাঁহারা জানিয়াও জানিতেছেন না। যে লেখাতে বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব আসে, সেরূপ লেখা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায় দোষ কি? এরূপ অনুরোধ কি ব্যক্তিগত শাসন হইল? কখনও নহে, জাতীয় ভাষার, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্মিলিত সাহায্যের আবশ্যক। অতএব যাহাতে মিলন হয় ও সকল মুসলমান সাহিত্যিক আসিয়া দ্বিত্বভাব ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে যোগদান করত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে একত্র মিলিত হয় তজ্জন্য হিন্দুসাহিত্যিক ভ্রাতাগণের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

হিন্দু-মুসলমান।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধলেখক মৌলভী মোহাম্মদ কে, চাঁদ মহাশয় গত চৈত্র মাসের 'অর্চ্চনা'য় "সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন মুসলমান সাহিত্যসেবীগণ বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করেন নাই। মৌলভী সাহেবের মনে হয় যে "হিন্দু-সাহিত্যিকেরা মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ করা, রাজললনাগণের উপর বৃথা কলঙ্কারোপ করা" এবং মুসলমানদিগের সম্বন্ধে "নিদারুণ শেলসদৃশ বাক্যবাণ ব্যবহার করা আজও পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহারা হিন্দুর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন।" তাঁহার মতে "সাহিত্য-সম্মিলন সভাই ইহার প্রতিকারের একটি প্রকৃষ্ট স্থল।" সাহিত্য-সম্মিলন তাহা করে নাই বলিয়া স্বভাবতঃ মৌলভী সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশাখের 'অর্চ্চনা'য় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি মনে করেন, চাঁদসাহেবের কারণগুলা "সম্পূর্ণ কাল্পনিক।" "কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি একজন মুসলমানের অন্যায় ব্যবহারে সমগ্র মুসলমান জাতিকেই গালাগালি দেন তাহা হইলে তিনিও যেরূপ ভ্রমে পতিত হন, মৌঃ চাঁদ মহাশয়ও সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য বাস্তবিকই সমাজ দায়ী হইতে পারে না। বাঁকিপুরের সম্মিলনের জন্য রায় মহাশয় ও অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় প্রাণ-পাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সুতরাং সম্মিলনের উপর চাঁদসাহেবের অভিমানটুকু তিনি হজম করিতে পারেন নাই। মৌলভী সাহেবের পত্রে যেমন মনের অভিমানটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, রায়মহাশয়ের পত্রেও তেমনি তাঁহার সংযত উদারতাটুকু দেদীপ্যমান। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন "হৃদয় উদার করিলে কোথাও দোষ দেখিতে পাইবেন না আর যদি দোষ দেখিব ইচ্ছা করেন তবে সম্মিলনের শত দোষ দেখিতে পাইবেন।"

* *
*

কিন্তু রাখালরাজ বাবুর মিষ্ট কথায় মৌলভী সাহেবের অভিমান দূর হয় নাই। তিনি এবারকার 'অর্চ্চনা'য় হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে অনেকগুলি পুরাণ কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনেক অপ্রিয় কথা মাঝে মাঝে স্পষ্ট করিয়া বলিলে সমাজের হিত হয়। তাই আমরা মৌলভী সাহেবের পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

* *
*

তর্কটা মৌঃ চাঁদ সাহেবের বা রায় মহাশয়ের নিজস্ব নহে। প্রকৃত পক্ষে রায় মহাশয় ও মৌলভী সাহেব উভয়েরই অভিমত যে বাঙ্গালাসাহিত্যে বাঙ্গালীর উভয় পক্ষের কাহারও মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঘা শুকান, প্রাণে শান্তি দেওয়া। রক্ত গরম করিয়া দিয়া জাতীয় বিদ্বেষ বর্দ্ধিত করা সৎসাহিত্যের কর্ত্তব্য-গণ্ডীর বাহিরে। মৌলভী সাহেবের অভিমানটুকু শুধু তাঁহার নিজের নহে। অনেক মুসলমান-সাহিত্যসেবীর মধ্যেও এই অভিমান বদ্ধমূল। আমি সাহিত্যসেবার প্রথম অবস্থায় 'নবনূর' ও 'কোহিনূরে'র লেখক ছিলাম। হিন্দুসাহিত্যিকগণ আসর জমাইবার জন্য তুই একটা বে-ফাঁস কথা বলিয়া মুসলমানদের প্রাণে বিশেষ রকম ব্যথা দেন, সে কথা তখন নিত্যই শুনিতাম। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এমন কোনও লোক লেখনী ধরেন না যিনি স্বেচ্ছায় মুসলমানদের অবমাননা করিতে চাহেন। অনেকটা রীতির দোষে, অনেক সময় গল্পের প্লট জমাইবার জন্য হিন্দু লেখকগণ মুসলমানের প্রাণে ব্যথা দেন। একটু চেষ্টা করিলেই এই অন্যায়টুকু বন্ধ করা যাইতে পারে। মৌলভীসাহেবের তুইখানি চিঠির ফলে কতকটা কাজ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

* *
*

রীতির দোষে ঐ "যবন" কথাটা আজিও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। একটু জোর করিয়া বলিতে গেলে শত্রুকে 'যবন' বলিতে হয়, অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে যেন সেটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোঁড়ামী দেখাইতে হইলে ব্রাহ্ম-সমাজকে গালি দেওয়া এক সময় বাঙ্গালা নাটকের রীতি ছিল। যবন কথার অর্থবোধ সম্বন্ধে আমি "যবনতত্ত্ব" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। রাখাল-রাজ বাবুর সহিত আমারও অভিমত যে, 'যবন'-কথার অর্থ প্রথমে ছিল "য়োনীয়" (Ionian) গ্রীক। কিন্তু উহার যাহাই অর্থ হউক, এখন বাঙ্গালা

দেশের অর্দ্ধেক মুসলমান অধিবাসী ঐ কথাটার ব্যবহার উঠাইয়া দিতে চান, তখন ঐ কথাটা সাহিত্যে রাখিতে হইবে কেন? "নেড়ে" কথাটার উৎপত্তিও আমার মনে হয় সরল। মুসলমানেরা মাথার চুল কামাইত বলিয়া তাহাদিগকে "নেড়ামাথা" ও "নেড়ে" বলা হইত। কিন্তু এ কথাটা বলিলে ইতর-ভদ্র সকল মুসলমান অবমানিত হন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ভ্রাতৃ-বিরোধ নিবারণ করিবার জন্য যে লোক—লেখাতেই হউক বা কথাবার্ত্তায় হউক—এ দুইটা কথা বর্জ্জন করিতে না পারে সে দেশের শত্রু। হিন্দু-লেখকগণ একটু সাবধান হইলেই মুসলমান-বাঙ্গালীকে আর অভিমান করিতে হয় না।

* *
*

চাঁদসাহেব চাহেন যে, সাহিত্য-সম্মিলনে এ বিষয়ের আলোচনা হয়। যদি তাহা এতদিন না হইয়া থাকে তো সে দোষ তাঁহার এবং বন্ধুবর মৌঃ আব্দুল-গফুর সাহেব প্রভৃতির। সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তারা প্রত্যেক লেখকের নিকট প্রবন্ধ চাহিয়া পাঠান। সেই সময় চাঁদসাহেব এ বিষয় লিখিয়া পাঠান নাই কেন? সম্মিলন-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িলে নিশ্চয় সুফল ফলিত। তাঁহার উদ্যমে এবিষয় 'রেজলিউসান' হইতে পারিত। অবশ্য এ কার্য্য যেমন অপরেরও কর্ত্তব্য, তেমনি তাঁহারও কর্ত্তব্য। যদি অপরে দোষী হন তিনিও কি দোষী নহেন? আশা করি আগামী বারের সম্মিলনে কোনও হিন্দু কি মুসলমান লেখক যাহাতে উভয় পক্ষের কোনও সাহিত্যিক জাতীয় বিদ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবেন এবং প্রস্তাব করিবেন।

* *
*

"হিন্দুর নিকট মুসলমান যে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও ঘৃণ্য"—এ কথায় মৌলভী সাহেব সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর অবিচার করিয়াছেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ অনেক সময় উভয় সম্প্রদায়ের লোকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে পারে না বটে, কিন্তু সে মিলনের অভাব যে ঘৃণায় প্রতিষ্ঠিত এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। আমরা হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে, মুসলমানের প্রতি ঘৃণা আধুনিক হিন্দুর প্রাণে আদৌ নাই। যেটুকু সামাজিক পার্থক্য আছে তাহা ধর্ম্মমূলক, তাহা বোধ হয় চিরদিনই থাকিবে। তবে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ মিলন উভয় পক্ষের অন্ততঃ স্বার্থসিদ্ধির

জন্যও অবশ্যম্ভাবী। সে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া সম্পূর্ণ বাঙ্গালী জাতি গঠন করিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে সকল হিন্দুলেখক অথবা মুসলমানের মনে কষ্ট দিবেন তিনি বাঙ্গালীজাতির শত্রু, এ কথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

* *
*

প্রতিভা

আজকাল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে মাতৃভাষা সেবার জন্য কৃতবিদ্য ভারতবাসীগণ যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ প্রত্যেক প্রদেশের মাসিক সাহিত্যের আধিক্য হইতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা, গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষা যতটা উন্নতি করিয়াছে, আধুনিক হিন্দী ততটা উন্নতি করিতে পারে নাই। তাহার কারণ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান মাত্রেই ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাঁহাদের মাতৃভাষা সেবা করিবার বাসনা হইলেই উর্দ্দু ক্রিয়াপদ রাখিয়া ফারসী ও আরবী শব্দে নিজেদের রচনা গুরুপাক করিয়া ফেলেন। এদিকে হিন্দু পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-বহুল ভাষা লিখিয়া হিন্দীর পুস্তকের ভাষা একেবারে খাঁটী বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালার মত করিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং আজকাল কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর নিকট যেমন হিন্দী ভাষা সহজবোধ্য, হিন্দুস্থানী শিক্ষিত লোকের নিকটও তেমনি লিখিত বাঙ্গালা ভাষা প্রাঞ্জল বলিয়া মনে হয়। ভাষার এই বিশেষত্বের জন্য আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা মহাশয়ের সম্পাদিত "প্রতিভা" মাসিকপত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমরা যে দুই সংখ্যা "প্রতিভা" পাইয়াছি, তাহাতে 'অর্চ্চনা' প্রভৃতি মাসিকপত্র হইতে দুই একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা মহাশয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সখ্যতা-স্থাপন করিবার অবসর দিয়াছেন। ইঁহার বাঙ্গালী-প্রীতির অপর পরিচয় আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। "ন্যায়মূর্ত্তি স্যর গুরুদাস"কে লেখক মহাশয় ইংরাজী শিক্ষার সুফলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইংরাজি শিক্ষার কেবল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করিয়া স্যর গুরুদাস কু-ফলটুকু সম্যকরূপে বর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আজ তিনি ভারত-পূজ্য। আমরা 'প্রতিভা'র দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ফরাসীর চক্ষে হিন্দু থিয়েটার।*

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম এ, ও শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন।]

একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া অনেকক্ষণ ঝাঁকানি খাইতে খাইতে নানা প্রকার সংক্রামক রোগের জীবাণুপূর্ণ রাস্তা দিয়া, চারিধারে কাদা ছড়াইতে ছড়াইতে কলিকাতার দেশী পল্লী অভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তার পাশে দোকান ঘরে কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে। দীপগুলি ছোট ছোট, না আছে চিম্‌নি না আছে কাঁচের ফানুস্। মিট্‌মিটে আলোয় মোটেই দীপ্তি নাই, আছে কেবল অপর্য্যাপ্ত ধোঁয়া ও তাহার অন্ধকার। চারি ধারেই স্যাঁত্‌সেঁতে ভাব। জলা ভূমির বাষ্প যেন সর্ব্বদাই দেহ ঘিরিয়া রহিয়াছে, মনে হয় যেন শিরা উপশিরায় প্রবেশ করিয়া শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। এই তরল বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল যেন জ্বরের প্রকট মূর্ত্তি— যেন নিতান্ত সজীব ভাবেই সকলকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে; তাহা নানা প্রকার ক্ষার দ্রব্য অর্দ্ধগলিত শাক্ সবজী, কৃষ্ণাঙ্গগণের ঘর্ম্মাক্ত দেহ এবং গোলাপ-চন্দন-বাসিত দেশী তামাকু হইতে নিঃসৃত ত্মকারজনক ঘ্রাণের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অবশেষে ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া পৌঁছিলাম। নাট্যশালার অধ্যক্ষ দেশীয় লোক। তিনি নিজেই আবার কয়েকখানি নাটকের রচয়িতা। সেগুলি এই রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হইয়া থাকে। এই সকল নাটক বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল অথচ কুসংস্কারান্ধ দেশীয় লোকগণের রুচিরই প্রকৃত পরিচায়ক। ইহারা স্বপ্নের বাস্তবতা হইতে আপনাদিগকে কখনও মুক্ত করিতে পারে না বলিয়া রঙ্গালয়েও 'অপেরা' ও পরী রাজ্যের কুহকের একত্র সমাবেশ দেখিতে ভালবাসে। আমরা উপরে উঠিয়া আমাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বক্সে গিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, বক্স শ্রেণীর উদ্গত অংশগুলি মুসলমানী ধরণের খিলানযুক্ত তোরণ দ্বারের ন্যায় গঠিত। এই সুন্দর নাট্যশালাটি নয়নাভিরাম উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত—

---

* জুল বোয়ার ফরাসী হইতে। এই পুস্তক (Visions Le L'Inde) ১৯০৩ অব্দে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া মসিয়ে বোয়া জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পান, সেইজন্য জ্বরের বিভীষিকার কথা ভুলিতে পারেন নাই।—লেখক।

ইহাতে যেন ইংরাজী অপেক্ষা ইতালীয় প্রভাবই বেশী। সামান্য সজ্জা-গৃহের ভিত্তিগাত্রও ধ্যাননিমগ্ন সাধুগণের চিত্রে পরিশোভিত। দেখিতেছি, এদেশের লোকেরা নাট্যশালায় আসিয়াও ভগবৎ চিন্তা হইতে বিরত হয় না। নীচে বেঞ্চির উপর স্থূলোদর গম্ভীর মূর্ত্তি বাঙ্গালী বাবুরা ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের বুকে ভাঁজ করা চাদর বাঁধা। এদেশের মধ্য শ্রেণীর লোকদিগের ইহাই নাকি পরিচ্ছদের বিশেষত্ব। অন্য বক্সগুলি খালি পড়িয়াছিল। আমরা ব্যতীত অপর কোনও ইউরোপীয় দর্শক উপস্থিত ছিল না। মধ্যস্থিত বক্সটিতে ('রয়াল বক্সে') একজন রাজা বসিয়া আছেন। তাঁহার উষ্ণীষের হীরক খচিত পালক সংযুক্ত শিরপেঁচটি হঠাৎ দেখিলে প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত মনে হয়। দেখিলাম, যৌবনের সহজ সারল্য ও ঐশ্বর্য্যের বিলাস জড়িমার সহিত কেমন যেন পাশবিক ভাবও তাঁহার চক্ষে স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সন্নিকটে খাস বিলাতী ও জমকাল দেশী পোষাকের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যে সজ্জিত পাগড়িধারী পারিষদবর্গ ভিড় করিয়া ঘিরিয়া বসিয়াছে। উচ্চে পর্দ্দার অন্তরালে সুবর্ণখচিত অবগুণ্ঠনগুলি ইতস্ততঃ বিকম্পিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। নারীগণের পেলব দেহলতার নিরুদ্বেগ স্পন্দন ও সুতীক্ষ্ণ নয়নের কুতূহলী চাহনী জাফরীর ফাঁক দিয়াও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহারাই অবরোধবাসিনী বঙ্গললনা। সজীবতায়, অঙ্গসৌষ্ঠবে, নিষ্ঠা ও মনীষায় ইহারা ভারতের অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া। ইহাদিগের সৌন্দর্য্য সুষমা স্বভাবতঃই ইতালি ও ফরাসী দেশের সুন্দরীগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিনয়ের যে সকল অংশ করুণ রসবহুল, সেই সব স্থলে আশা ও নিরাশার শিহরণ বিকম্পনাদি লক্ষ্য করার জন্য খোদাই কাজ করা ভিত্তি সংলগ্ন কাষ্ঠের ফাঁক দিয়া আমার সোৎসুক দৃষ্টি সেই সকল মহিলা শ্রেণীর প্রতি ধাবিত হইতেছিল। দূরে—গ্যালারির উপর—অদৃশ্যপ্রায় সাধারণ জনগণের অজ্ঞেয় হৃদয়গুলিও সমভাবেই স্পন্দিত হইতেছিল। দেশীয় রঙ্গালয়ের ঐক্যতানিক গীতবাদ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। তিন চারিজন বাদক কতকগুলি অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিয়া বয়স্ক বালকগণের যন্ত্রণাপীড়িত ক্রন্দনধ্বনির ন্যায় এক প্রকার একঘেয়ে রকমের সুর বাহির করিতেছিল। কাইরো নগরের নাট্যশালায় সুরসংযোগে আরব রাগ-রাগিণীর যেরূপ আলাপন শুনিয়াছিলাম, ইহাও কতকটা সেইরূপই বটে, তবে ইহাতে কোনওরূপ কর্কশতা নাই। এখানকার সঙ্গীতে মিশর দেশের সেই কি-জানি-কেমন শ্লেষব্যঞ্জক ভাব বড়

দেখিতে পাইলাম না—সেরূপ কণ্ঠ-উচ্চারণেরও (guttural) প্রাচুর্য্য নাই। শত সহস্র বৎসরের সেই করুণ চিরন্তন বেদনার সুর পূর্ব্বেরই ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত যৌবনের চটুল চাপল্য ও মাদক বিহ্বল ব্যলীকতাও যে না মিশিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। এখানকার শ্যামাঙ্গিনী অভিনেত্রীগণের কেমন যেন গ্লানি বিহীন সংযত ভাব। এই রঙ্গালয়ের কক্ষগুলি যেন তাহাদের নিকট দেবালয় তুল্য পরম পবিত্র স্থান। রঙ্গমঞ্চে স্ব স্ব ভূমিকা-অভিনয়ের জন্য গায়ে রং ও পাউডার মাখিয়া তাহারা যে আর্য্যনারী-গণের প্রতিভূস্বরূপা তাঁহাদেরই ন্যায় শ্বেতবরণী হইয়া আসিয়াছে।

অপরাধী।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

"ছিঃ! ছিঃ! কি কর?"

আমি আমার সখের ক্যামেরাটি ভাঙ্গিতেছিলাম। স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়া খুব জোরে "রসের লেন্সে"র উপর মোটা হাতুড়ির ঘা মারিলাম। স্ফটিক লেন্স শত টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কল্যাণী কোহিনুর হীরার মত একটা টুক্‌রা হাতে লইয়া বলিল—"ছিঃ! ছিঃ! এ কি পাগলামী?"

আমি বলিলাম—শুনিবে কল্যাণী?

আমার চোখে কি অগ্নি ছিল জানি না। সে বলিল—থাক্ পরে শুনব, স্থির হও।

আমি কিন্তু স্থির হইতে পারিলাম না, তাহাকে শুনাইলাম। যে প্রাণের আগুন হাত-পা হাড়-মাস গুলাকে পুড়াইতেছিল, সেই আগুনই আমার মত স্বল্পভাষীকে বাগ্মী করিয়া তুলিল।

সেদিন উপেন্দ্রের বাড়ী ফটো তুলিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে গিয়াছিলাম কৌতুক করিতে, শেষে কিন্তু—যাক্ সে কথা। উপেন্দ্র-গৃহিণী সবিশেষ অবগত ছিলেন যে, আমি তাঁহার স্বামীর বহুদিনের বন্ধু। আমার নাম শুনিলে তিনি কোনও প্রকারেই উপেন্দ্রের চেয়ারের হাতের উপর বসিয়া বিলাস-বিলোল কটাক্ষে ক্যামেরার দিকে চাহিয়া ফটো তুলাইতেন না। আমি খুব মোটা ময়লা কাপড় পরিয়া, গায়ে লংক্লথের কোট দিয়া, চীনার দোকানের নয় সিকা দামের ক্যাম্বিসের

জুতা পায়ে দিয়া ফটো তুলিতে গিয়াছিলাম। তাহার বাড়ীর চাকর-বাকর অবধি কেহ রহস্য প্রকাশ করে নাই। আমার নাম হইয়াছিল—গিরিধারী বাবু।

কিন্তু দ্বিতীয় প্লেট যেমনি খুলিয়াছি, উপেন্দ্রের কন্যা শান্ত আসিয়া বিষম গোল বাঁধাইল। সে ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল—নলিন বাবু ?

বলে 'অমৃতং বাল-ভাষিতম্'। কিন্তু অমন সাপের বিষের মত অনিষ্ট ঘটাইতে অপর কোনও কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার জননী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল—যাইবার সময় যে দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া পলাইল, ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিতেই গল্পের রাজপুত্র পাষাণ হইত। "নলিন বাবু" বলিয়াই শান্ত তাহার সেই নবনীত করে আমার ক্যামেরার তিনটি সরু কাষ্ঠপদের একটি ধরিয়া টান মারিল, তাহাতে ক্যামেরা ভগ্ন-উরু দুর্য্যোধনের মত ঝুঁকিয়া পড়িল। প্লেটখানায় রৌদ্র লাগিয়া খারাপ হইল। একে উপেন্দ্র-গৃহিণীর কটাক্ষাঘাতে হাত পা একটু কাঁপিতেছিল, তাহার উপর সকল দিক সামলাইতে গিয়া স্লাইডটি ভূপতিত হইল। কাজেই শান্ত আসিবার পূর্ব্বে উপেন্দ্র-দম্পতির যে যুগলরূপ ক্যামেরাবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহাও ধ্বংস হইল। মোটের উপর বালিকার এক অসংযত স্নেহ-সম্ভাষণে এত সাজ-সরঞ্জাম, এত ষড়যন্ত্র, এত পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড হইল। বালিকা বিজয়-গর্ব্বে করতালি দিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জোর করিয়া ধরিলাম। সেই ননীর মত দেহ, সেই গোলাপের মত মুখ, সেই বিজয়-গর্ব্বিত দুষ্ট চক্ষুর লালিত্যে আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কথা ভুলিয়া গেলাম। তাহাকে তুলিয়া লইয়া বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিলাম। সে শূন্যে হাত পা ছুঁড়িতেছিল, আমার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলাম—শান্ত! তুমি ভারি দুষ্টু! দেখ দেখি কি করলে ?

সে সেই বিভীষিকার দিকে চাহিল—সে চাহনিতে আত্মগ্লানি ছিল না, অনুতাপ ছিল না, আমার দুঃখের জন্য কাতরতা ছিল না। চিত্রকর মনের ভাব চিত্রে ফলাইয়া স্বহস্ত-চিত্রিত আলেখ্যে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কেশরী হরিণ মারিয়া যেমন গর্ব্বিত হয়, শান্ত তেমনি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিল, তেমনি গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল। সে বলিল—এতা কি ?

আমি বলিলাম—ছবির কল।

সে বলিল—কি তবির কল্ ?

আমি তাহাকে বুঝাইলাম যে সেই যন্ত্রের সাহায্যে লোকের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে পারে। তাহাদের ঘরে অনেকের ফটোগ্রাফ ছিল—শান্ত বুঝিল। কিন্তু শেষে বলিল—আমাল তবি ক'লে দাও।

কাল তুলিয়া দিব, বৈকালে তুলিব, মধ্যাহ্নে তুলিব। তাহাতেও না, সে এক হাতে আমার হাঁটুর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল অপর হাতে ক্যামেরার দিকে দেখাইতে লাগিল, আর এক একটা ওজরে অন্ততঃ পাঁচটা করিয়া 'না' বলিতে লাগিল। আমি শেষে আধ ঘণ্টার সময় চাহিলাম—তাহাতেও সে সম্মত হইল না। সে বলিল—একুনি।

অগত্যা তাহার সহিত প্রতারণা করিতে হইল। তাহাকে তাহার পিতৃ-পরিত্যক্ত কাষ্ঠাসনে বসাইলাম। শিশু ভারি সুখী। ক্যামেরা ঠিক করিলাম। বলিলাম—"ন'ড় না, চোখ বুজো না"। সে স্থির হইয়া বসিল। আমি আবরণ মুক্ত করিলাম। প্রকৃত ছবি তুলিতে যাহা যাহা করিতে হয় সকলই করিলাম। সে বড় তৃপ্তিলাভ করিল, মধুর অধরে বড় মধুর হাসি হাসিল। শেষে বলিল—'তবি দাও'।

তাহাকে বুঝাইলাম যে কলের ভিতর ছবি তৈয়ারি হইতেছে। সময় লাগিবে। সে কিছুতেই ছাড়িবে না। তাহার পিতা আমার কথার সমর্থন করিল। তবে আমি সেদিন নিষ্কৃতি পাইলাম।

তাহার পর আমাকে দেখিলেই শান্ত বলে—"তবি?" আমিও প্রতিজ্ঞা করি—"কাল দ'ব"। তুষ্ট শিশু একটার পর একটা নূতন খেয়ালে মাতিয়া যায়, আমার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। আমার কিন্তু প্রত্যহ আত্মগ্লানি হইত, প্রত্যহ মনে করিতাম কল্য ক্যামেরা লইয়া গিয়া শান্তর ছবি তুলিব।

সেদিন মহা-উল্লাসে উপেন্দ্রের বাড়ী ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলাম। মনে মনে শান্তর আনন্দের হাসিটুকু কল্পনা করিতেছিলাম, সে ক্যামেরা দেখিয়া করতালি দিয়া নাচিবে, সে চিত্র মানস-চক্ষে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ তাহাদের বাটী গিয়া শুনিলাম—শান্ত মামার বাড়ী গিয়াছে।

বড় আত্মগ্লানি হইল। প্রাণের মধ্যে বড় যন্ত্রণা হইল। আপনার উপর বিরক্ত হইলাম, নিজের দীর্ঘসূত্রতার নিন্দা করিলাম। নিজেকে ঘোর অপরাধী বিবেচনা করিলাম, অথচ স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলাম এতটা আত্ম-তিরস্কার নিরর্থক।

কাল উপেন্দ্রের বাড়ী গিয়াছিলাম। সকলে বসিয়া আছে কিন্তু কাহারও

মুখে কথা নাই, কাহারও দৃষ্টিতে জ্যোতিঃ নাই, আমার নিকট যেন তাহারা সপরিবারে অপরাধী, কেহ সাহস করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে পারে না।

আমি কথা কহিলাম। খুব আস্তে বলিলাম—"কি ব্যাপার ?"

আমার সেই মৃদু শব্দগুলা যেন সেই ঘরের গাঢ় নিস্তব্ধতার কাছে অপরাধী বলিয়া মনে হইল।

উপেন্দ্র একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চাহনিতে আমার বুকের রক্ত অবধি জমিয়া গেল। উঃ! কি ভীষণ, কাতর চাহনি!

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—কি—ব্যা—

সে বালকের মত কাঁদিয়া বলিল—ভাই! শান্ত!—তুমি কি তার ছবি তুলেছিলে?

আমি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলাম—না।

সে দুই হস্তে আমার স্কন্ধ ধরিয়া বলিল—আহা! বাছার আমার কোন চিহ্ন রহিল না! একখানা ছবিও না! ওঃ!

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। যে কথাটা বুঝিতেছিলাম সে কথাটা বিশ্বাস করিতে প্রাণ চাহিল না। আমি নলিনের ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলাম।

সে চোখ্ মুছিতে মুছিতে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া বলিল—তিন দিনের জ্বরে।

আমি বলিলাম—অঁ্যা!

সে ধীরে ধীরে বলিল—আহা! শান্ত আপনাকে বড় ভালবাসত। বিকারের সময় অনেকবার আপনার নাম করেছিল—নলিন বাবু—তবি—তবি—

সে আর বলিতে পারিল না। অগ্রজের মত সেও কাঁদিতে লাগিল।

এবার আমার চক্ষের বাঁধ ভাঙ্গিল। উঃ! কি অপরাধই করিয়াছিলাম!

*　　*　　*　　*　　*

আমি ক্যামেরা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছিলাম—কল্যাণী এক কোণে দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছিতেছিল। তবু সে শান্তকে কখনও দেখে নাই। আহা! সে পারিজাত কুসুমের কোন চিহ্নই এ জগতে রহিল না—একখানা ছবিও না!

কবি ভুবনমোহন।

[শ্রীননীগোপাল মজুমদার।]

বঙ্গবাণীর যে সকল সেবককে কালবশে আমরা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যাঁহাদিগের নাম, যে কারণেই হউক, বাদ পড়িয়া গিয়াছে, ভুবনমোহন তাঁহাদিগের অন্যতম। কত লেখকের নাম আমরা ভুলিয়াছি, ভুলিয়া যাইব, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ভুলিতে হইবে—অকৃতীর সন্ধান কে রাখে?—কিন্তু ভুবনমোহন অকৃতী নহেন, তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না—তাঁহার সন্ধান আর কেহ না রাখুক, অন্ততঃ তাঁহার স্বদেশবাসী রাখিবে।

বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ২২শে আষাঢ় শনিবার খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থবংশে ভুবনমোহনের জন্ম হয়। শ্রীপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বঙ্গজ কায়স্থগণের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এই স্থান পরিচিত। ভুবনমোহনের পিতার নাম তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী, মাতা ভগবতী দাসী। তারকচন্দ্র যশোহরের এক থানায় মুহুরিগিরি করিতেন। পরে মুহুরি-গিরি ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদের উকীল হন। ১২৪০ সালে মুর্শিদাবাদের কোর্ট উঠিয়া গেলে তিনি কলিকাতায় যাইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হইয়াছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি যথেষ্ট পয়সা পাইতেন; ইহা ছাড়া তাঁহার সম্পত্তির আয়ও নিতান্ত কম ছিল না। তিনি দেবসেবায় বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রের দারিদ্র্যবিমোচনেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। মন্দিরস্থাপন, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সৎকর্ম্মে তিনি নিজের নাম রাখিয়া গিয়াছেন। কালীঘাটে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি ঘাট এখনও আছে। কলিকাতায় ওকালতি আরম্ভ করিয়া পুত্র ভুবনমোহনকে ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পিতা পুত্র ভবানীপুরেই একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। কলিকাতায় আসিবার চারি বৎসর পরে চক্র-বেড়িয়ায় তারকচন্দ্র একখানি বাটী ক্রয় করেন। ১২৪৫ সালের ১৬ই বৈশাখ তাঁহারা সপরিবারে এই চক্রবেড়িয়ার বাটীতে উঠিয়া আসেন। ভুবনমোহন বেশী দিন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। মিশনারীদের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে ইংরাজী তিনি সামান্যই শিখিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। ইংরাজীশিক্ষার প্রসার তখনও এদেশে তেমন হয় নাই; পারস্য ও উর্দ্দু ভাষাই তখনকার লোকে বেশী

শিখিত। কোর্টেও এই দুই ভাষা চলিত। ভুবনমোহনও প্রচলিত রীতি অনুসারে ঘরে বসিয়া মৌলবীর নিকট উক্ত দুই ভাষা শিক্ষা করেন। ১২৪৬ সালে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১২৪৭ সালের ৩০শে ফাল্গুন হাতের সোণার বালা খুলিয়া রাখিয়া ভুবনমোহন সদর দেওয়ানী আদালতে যাইয়া উকীল হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। তখনও এদেশে পরীক্ষা দিয়া উকীল হইবার প্রথা হয় নাই। যাঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয়, ওকালতীর সনন্দ তাঁহারা সহজেই পাইতেন। সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট্ স্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট্ নিয়ম করিলেন, যে, পরীক্ষায় পাশ না হইলে কেহ উকীল হইতে পারিবেন না। ভুবনমোহন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উকীলবন্ধুদিগের মধ্যে কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, শ্রীনাথ দাস, গোপাললাল মিত্র, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হেমবাবু তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া ভুবনমোহন সাহিত্যের আস্বাদ পাইলেন। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল যাহা তাঁহাকে কাব্যচর্চ্চায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। ১২৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহাদের ভবানীপুরের বাটীতে দিকসুই নিবাসী কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন ও বাঁশবেড়িয়ার শ্রীধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তখনকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ কথক ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করেন। ভুবনমোহন সংস্কৃত জানিতেন না। কথকদিগের মুখে এই প্রথম তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনিলেন। সংস্কৃত শ্লোক যে কত মধুর, অমৃতময় তাহা এই প্রথম জানিতে পাইলেন। সংস্কৃতছন্দের গীতিময় উল্লসিত ঝঙ্কার তাঁহার চিত্তকে মুগ্ধ করিল, নন্দিত করিল, পিপাসু করিল। সে মোহ সঙ্গীতের জন্য, সে আনন্দ শব্দকৌশল-সম্ভূত, সে পিপাসার কারণ সংস্কৃত কাব্যের উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। সংস্কৃত ভাষা না জানিলেও তাহার ধ্বনি তাঁহাকে জানাইয়া দিল, এমন ছন্দ, এমন শব্দসম্ভার, এমন পদলালিত্য আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি—ভারতবাসীর আপনার বলিতে যদি কিছু থাকে, তাহা এই। ভুবনমোহন ভাবিলেন, এমন সুন্দর জিনিষ অবহেলা করিবার নহে। সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণে কয়েকটি বাঙ্গালা শ্লোক রচনা করিবার ইচ্ছা হইল। উৎসাহের অভাব ছিল না, ইচ্ছা অচিরে কার্য্যে পরিণত হইল। কথকেরা দেখিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে। তাঁহাদের বিস্ময়ের কারণ আরও হইল এই, ভুবনমোহনের কোনও কোনও শ্লোক অবিকল সংস্কৃতছন্দের নিয়মানুযায়ী হইয়াছিল। সেই সকল সংস্কৃতছন্দের নাম কথকদিগের মুখেই

প্রথম শুনিলেন। ছন্দ কি, এবং কিরূপে তাহার নিয়ম শিক্ষা করা যায় জানিতে উৎসুক হইলেন। রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুমে' ছন্দঃ শব্দের উপর যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে তাহা পড়িয়া তাঁহার কতকটা জ্ঞান হইল। কিন্তু, পিপাসা মিটিল না। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী এবং চিরঞ্জীবের বৃত্তরত্নাবলী দেখিয়া লইতে ছাড়িলেন না। সংস্কৃত তো বুঝিতেন না, কোনও ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া উহার মোটামুটি অর্থটা বুঝিয়া লইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার অভ্যাস হইল, সংস্কৃতকাব্য পাইলেই, বুঝুন আর না বুঝুন, আগাগোড়া পড়িয়া যাইতেন। কিছুদিন এইরূপ করিয়া সংস্কৃতছন্দে তাঁহার ব্যুৎপত্তি পাকা হইল। অনেক সংস্কৃত শব্দও শিখিয়া ফেলিলেন।

১২৫৭ সালের ২৩শে বৈশাখ ভুবনমোহনের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রথমা বলিলাম, কেন না, ভুবনমোহন আবার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার তারিণী নামে এক কন্যা ও গঙ্গেশ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। ভুবনমোহনের দ্বিতীয় বার বিবাহ ১২৫৭ সালের ২৭শে মাঘ পুঁড়ার লোকনাথ বসুর কন্যার সহিত হয়। ইনি একটি কন্যা রাখিয়া কয়েক বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন। ইহার মৃত্যুর পর ভুবনমোহন খুলনা জেলার উৎকুলনিবাসী রামচন্দ্র বসুর কন্যা সৌদামিনী দাসীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের সময় ভুবনমোহনের পূর্ব্ব দুই পক্ষের সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পত্নী এখনও জীবিত আছেন। ইহার গর্ভে ভুবনমোহনের ভূপতি ও গীষ্পতি নামে দুই পুত্র এবং দুই কন্যা হয়। ইঁহারা এখন ভবানীপুরের বাটিতেই বাস করেন। প্রথম পুত্র বিষয়কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পুত্র পূর্ব্বে 'হাওড়া হিতৈষী' নামে একখানা কাগজ চালাইতেন; কাগজখানি এখন উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককে ইঁহারা ভুবনমোহনের জীবন সম্বন্ধে নানা মাল-মশলা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সময়েই ভুবনমোহনের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। শ্রুতবোধ, ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তরত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার ছন্দোগ্রন্থ সকল দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, উহাতে যত প্রকার ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ দেওয়া আছে, তত প্রকার ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লিখেন। "ছন্দঃ-কুসুম" নামক গ্রন্থ এই ইচ্ছারই ফল। উহার 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলিয়াছেন, "আমি ইহা পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন মানসে প্রস্তুত করি নাই, সংস্কৃত ছন্দঃ সকল সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইলে সুললিত এবং সুশ্রাব্য হইতে পারে কি না ইহা পরীক্ষা

করণার্থে রচনা করিয়াছিলাম।" হেমবাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ছন্দঃকুসুম রচিত হইলে হেমবাবুর খিদিরপুরের বাসায় একটা বৈঠক করিয়া তাঁহার গ্রন্থ পড়া হয়। হেমচন্দ্র ছন্দঃকুসুমের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, কিন্তু বলিলেন—এই গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দের যে সকল বাঙ্গালা উদাহরণ আপনি দিয়াছেন, সেগুলি আমার নিকট কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। এই সকল ছন্দঃ অবলম্বন করিয়া আপনি যদি একখানি কাব্য লিখিতে পারেন তবে, আপনার কৃতিত্ব স্বীকার করিতে পারি। ভুবনমোহন সংস্কৃত ছন্দে একখানি কাব্য লিখিবেন অঙ্গীকার করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি "পাণ্ডবচরিত" নামে এক কাব্য লিখেন। সে কথা পরে বলিতেছি। ১২৭০ সালের ফাল্গুন মাসে ছন্দঃকুসুম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকা হইতে জানা যায়, ভুবনমোহনের পরম বন্ধু বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। এবিষয়ে তিনি আর এক ব্যক্তির সহায়তা পাইয়াছিলেন, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। রামনারায়ণ তাঁহার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া সংশোধিত করিয়া দেন। ছন্দঃকুসুম প্রকাশিত হইলে তখনকার অনেক কাগজে ইহার প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার "রহস্যসন্দর্ভে" লিখিলেন, "শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। * * * * ঐ গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থ, তাহার ভাষানুবাদ, ও ভাষায় ঐ সকল ছন্দের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দৃষ্টান্তগুলিই নূতন পদার্থ; কারণ এতৎপূর্ব্বে কেহ তোটক প্রভৃতি তিন চারিটা ছন্দোভিন্ন অন্য কোনও ছন্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সিদ্ধকাম হয়েন নাই। এইক্ষণে চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা সম্যক্ সফল হইয়াছে, এবং তদর্থে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ও মাত্রাছন্দ বাঙ্গালাতে রচিত হইতে পারে, এবং লঘু ও গুরুর প্রকৃত উচ্চারণ করিলে তাহাতে তাহাদের কান্তির হানি হয় না। অধিকন্তু যাঁহারা কহেন যে মিত্রাক্ষর ভিন্ন বাঙ্গালাতে ছন্দ হয় না, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিবেন যে, ছন্দের অনন্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ মিত্রাক্ষর নহে; তাহা অলঙ্কার মাত্র, এবং তাহার ত্যাগে ছন্দের কিছুমাত্র হানি হয় না।" (রহস্যসন্দর্ভ—সম্বৎ ১৯২১, ২ পর্ব্ব, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১৫) ছন্দঃকুসুম প্রকাশিত হইলে লালমোহন বিদ্যানিধি কাব্যনির্ণয় গ্রন্থে, ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকায় উহার বহু শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত,

করেন। কবি হেমচন্দ্র মাইকেলের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিতে যাইয়া ভুবনমোহনের ছন্দঃকুসুমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বাঙ্গালা ছন্দঃ রচনা হইতে পারে এবং ভুবনচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত ছন্দঃকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা যাইতেছে। কিন্তু বোধ হয় যে, যতদিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, ততদিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইহা ছন্দঃকুসুমখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সময় ভুবনমোহনের ছন্দঃকুসুম বাহির হয়। হাইকোর্টে তিন বৎসর 'প্রাক্টিস্' করিবার পর তিনি মুন্সেফ্ হইলেন। মুন্সেফ্ হইয়া তিনি প্রথমে বাঁকুড়ায় গেলেন। সেখানে একক্রমে সাত বৎসর ছিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ১২৭৪ সালের ২২শে পৌষ তারিখে শ্রীপুরের বাটিতে ভুবনমোহনের পিতা তারকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভুবনমোহন বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া নেত্রকোণায় যান। জেলার জজ্ টনিসাহেব তাঁহার কাজকর্ম্মে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। নেত্রকোণায় তিন বৎসর কাটিয়া যায়। ভুবনমোহন এই সময় রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং ছয় মাসের ছুটি লইয়া ভবানীপুরের বাটীতে আসেন। বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিকিৎসায় ভুবনমোহন আরোগ্যলাভ করেন। ছুটি ফুরাইলে তিনি বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম সবডিভিসনে মুন্সেফ্ হইয়া যান। তখন স্বনামধন্য বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় জেলার জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহিত ভুবনমোহনের খুব সদ্ভাব ছিল। হেমচন্দ্রের কথামত তিনি পূর্ব্বে পাণ্ডবচরিত নামে সংস্কৃত ছন্দে একখানি কাব্য লিখেন, কিন্তু এতদিন তাহা ছাপান নাই। এই সময় উহা রমেশবাবুকে দেখাইলেন। রমেশবাবু তাঁহাকে উক্ত কাব্যখানি মুদ্রিত করিতে উপদেশ দেন। ১২৮৩ সালের চৈত্র মাসে কলিকাতা ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া পাণ্ডবচরিত প্রকাশিত হয়। ভুবনমোহন তখন বনগ্রামে। এখানে পাঁচ বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকায় বদলি হন। ঢাকায় কিছুদিন কাজ করিয়া তিন মাসের ছুটিতে ভুবনবাবু ভবানীপুরে আসেন। ভবানীপুরে ছুটি কাটাইয়া, ডায়মণ্ডহারবারে যান। সেখানে এক বৎসর কাজ করিবার পর পেন্সন্ লন। সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার পনের বৎসর কাজ হইয়াছিল। মাসিক ৪০০৲ টাকা মাহিনা পাইতেন, উহার তৃতীয়াংশ তাঁহার পেন্সন্ হইল। ১২৮৯ সালে, তাঁহার অবসর-গ্রহণের কিছুদিন পরে, ভুবনমোহন একবার বাটী হইতে রাগ করিয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হন। গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ঘুরিয়া দুই মাস পরে বাটী ফিরিলেন। এই সময় তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তি খুব প্রবল হইয়াছিল। সাত্ত্বিক আহার করিতেন, নিত্য পূজা করিতেন, সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি একখানি গ্রন্থও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—অবশ্য উহা গদ্যে, কিন্তু সে গ্রন্থ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বার বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।

জীবনের শেষভাগ তিনি কাশীতে কাটান। ১৩০১ সালের আশ্বিন মাসের ৺শারদীয়া পূজার পরবর্ত্তী দ্বাদশী তিথিতে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জীবনের বিবরণ সংক্ষেপে বলিলাম। তাঁহার কাব্যসম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। *

সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লেখার চেষ্টা কে প্রথম করেন তাহা জানি না। ভারতচন্দ্রের 'শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা' সংস্কৃত ছন্দে রচিত। তাঁহার সেই 'ছলচ্ছল, টৈলটুল, কলক্কল তরঙ্গা' বাঙ্গালী পাঠক কখনও ভুলিতে পারিবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন লেখক বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দঃ বসাইতে আবার চেষ্টা করেন। একজন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, আর একজন ভুবন-মোহন রায়চৌধুরী, বলদেব পালিত আর একজন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার কাব্যে দুই একটা সংস্কৃত ছন্দঃ চালাইয়াছেন। হেমচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দে "দশমহাবিদ্যা" লিখেন। শুনিয়াছি ভুবনবাবুর দেখা দেখিই তিনি উক্ত কাব্য-রচনা করেন। বলদেব পালিতের 'ভর্ত্তৃহরি' কাব্য ১২৭৯ সালে, অর্থাৎ ভুবনমোহনের ছন্দঃকুসুম বাহির হইবার নয় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। ভর্ত্তৃহরিকাব্য আগাগোড়া সংস্কৃত ছন্দে। ভুবনবাবু ছাড়া আর সকলেই ইচ্ছামত সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বলদেববাবুর 'কাব্যমঞ্জরী'তে সংস্কৃত ছন্দে রচিত কবিতা একেবারেই নাই। কিন্তু ভুবনমোহন সংস্কৃত ছন্দঃ ছাড়া অন্য ছন্দে কোনও কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার পুত্রেরাও জানেন না। তাঁহার ছন্দঃকুসুম গ্রন্থে ১৮৩ রকম সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালা উদাহরণ আছে। এই গ্রন্থের শেষে ১৫টা পারসী ছন্দেও কতকগুলি শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। ভুবনমোহনের নিজের ব্যবহারের জন্য যে ছন্দঃকুসুমখানি ছিল তাহা পাইয়াছি। উহাতে পারসী ছন্দগুলির বাঙ্গালা উদাহরণের পাশেই পারস্য ভাষায় প্রচলিত কতিপয় শ্লোক স্বহস্তে টুকিয়া রাখিয়াছেন। ছন্দঃকুসুমে প্রদত্ত উদাহরণ-গুলির মধ্যে ভাবের একটা পারম্পর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। কাব্যচ্ছলে গ্রন্থে কৃষ্ণের মানভিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। কবি ছন্দের লক্ষণ সংস্কৃতছন্দে গ্রথিত পদ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাণ্ডবচরিত কাব্যখানি ছন্দঃকুসুমের সাহিত্যস্বরূপ রচিত হয়। দ্বাবিংশতি সর্গে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। এক এক সর্গ এক অথবা দুইটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় বলিতেছেন, "আদৌ সংস্কৃতছন্দঃ সকল সাধুভাষায় ব্যবহারের উপযোগিতা প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্যে সংস্কৃত ভাষার সহিত তদ্গর্ভজাতা প্রাকৃত ভাষার ভেদভাব নিরাকরণে পুনর্ম্মিলনসম্পাদন, আমার এই পুস্তকরচনার উক্ত দুই উদ্দেশ্যমাত্র;

* তাঁহার কাব্যসম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। 'প্রবাসী' বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল। 'অর্ঘ্য'—শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২০ সাল। 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন'—ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

তদ্ভিন্ন আর 'কিছুই বাসনা নাই।" কবি এই কাব্যের উপাদান মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভুবনমোহনের কাব্য সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র মহাশয় 'অর্ঘ্য' পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভুবনমোহনের কাব্য হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। সেগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাহুল্যহেতু উদ্ধৃত হইল না। কবির রচনায় শব্দনির্ব্বাচন ক্ষমতা বেশ প্রকাশ প্রায়। ছন্দের উপর তাঁহার কি অসাধারণ অধিকার ছিল তাহাও বুঝা যায়। শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দঃ বসাইবার যাহা দোষ তাহাও উহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল অবিকল সংস্কৃত শব্দ আছে, হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়মে পড়িলে সেগুলি নিতান্ত খাপছাড়া শুনায় না। কিন্তু বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ক্রিয়াপদের অনুরূপ নহে ; সেগুলিকে ঐনিয়মে পড়িলে নিতান্ত কদর্য্য শুনায়। বিশেষতঃ কেবল সংস্কৃত শব্দ লইয়া বাঙ্গালাভাষা চলে নাই, চলিতে পারে না, বা চলিবে না। প্রাকৃত শব্দ না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্য থাকিত না। প্রাকৃত শব্দ, অর্থাৎ যে সকল শব্দ উচ্চারণের খাতিরে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সকল শব্দের উপর সংস্কৃতের হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়ম চালান অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়মে এই সকল প্রাকৃত শব্দ বা ক্রিয়াপদের উচ্চারণ কখনই সঙ্গত নহে, তাহা হাস্যোদ্দীপক হয় মাত্র। এখানে একটি মজার কথা বলি। ভুবনবাবু ছন্দঃকুসুম যখন হেমচন্দ্রের খিদিরপুরের বাসায় গিয়া পড়িয়া শুনান, তখন একজন রসিক ব্যক্তি সহসা হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে কৈলাসদাদা চাদর আন"। তিনি ঠিকই ধরিয়াছিলেন। ছন্দঃকুসুম বা পাণ্ডবচরিতে যে খানে বড় বড় সমাসগর্ভ বা ক্রিয়াপদ বিরল কবিতা আছে, সে খানে কবির লেখা বড় মধুর, সুন্দর হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলে, অন্যান্য স্থানে রচনা "কৈলাসদাদা চাদর আন" গোছেরই হইয়াছে। সে যাহা হউক, শত দোষ থাকিলেও ভুবনবাবুর কাব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। তাঁহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল, তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে তাহার প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখিবেন, ইঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের কথা তিনি যেন বিস্মৃত না হন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতার স্বনামধন্য সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও 'কেশরঞ্জন পঞ্জিকা' প্রকাশিত করিয়াছেন এবং এই দুর্ব্বৎসরেও উহা বিনামূল্যে সাধারণকে বিতরণ করিতেছেন। পঞ্জিকাখানি সাধারণের উপকারে আসিবে। আনন্দের সহিত আমরা উক্ত পঞ্জিকা এই সংখ্যা 'অর্চ্চনা'র সহিত গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরণ করিলাম।

অর্চ্চনা, ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য। *

[অধ্যাপক—শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ।]

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বামধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহতদীয়াং প্রকটয়ন্,
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই শ্রীচৈতন্যকৃপালাভজন্য চৈতন্যাষ্টক নামক গ্রন্থের যে শ্লোকটী পাঠ করিলাম, তাহার অর্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তিনি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব, কৌতূহলপরবশ হইয়া কোনও প্রণয়িজনবৃন্দের অনির্ব্বচনীয় মধুররসরাশি অপহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগেরই কান্তি উপরে প্রকাশ করিয়া স্বীয় কান্তি আচ্ছাদিত করিয়াছেন। ভক্তপ্রধান শ্রীপাদরূপ গোস্বামী এই যে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌররূপ বর্ণনা করিলেন ইহা কিরূপ; এই শ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই গৌররূপ, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, তাহা তাঁহার নিজের রূপ নহে, তিনি কোনও ক্রীড়া প্রকটনার্থ কুতুকী হইয়া (যেমন সাধারণ ক্রীড়ক ক্রীড়া প্রদর্শন কালে করে) স্বীয় রূপ পিহিত করিয়াছেন। যদি তাই হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত রূপ কি? কেনই বা তিনি নিমাই হইয়াও, শ্রীচৈতন্য হইয়াও গৌরাঙ্গ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে—যেরূপ ভাবে আমাদের দেশে এক বিরাট ভক্তসম্প্রদায় বুঝিয়া থাকেন—সেইরূপ ভাবে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে ভাল করিয়া তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে হয়—জন্মাবধি তিরোধান পর্য্যন্ত তাঁহার সমুদয় কার্য্য অনুসন্ধান করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস শ্রীহট্টপ্রদেশে। বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গাবাস বাসনায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্র একজন স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে ইঁহাদের ৮টী কন্যা জন্মে ও শিশু অবস্থাতেই কালপ্রাপ্ত হয়। পরে বিশ্বরূপ নামে ইঁহার জ্যেষ্ঠ জন্মগ্রহণ

* সংসঙ্গ সভায় ইহা লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

করেন। ইনি অকৃতদার ছিলেন, এবং ইনিও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পর যাঁহার আবির্ভাব জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ বরেণ্য, যাঁহাকে আমার বলিয়া বঙ্গবাসী, আমরা অন্যের নিকট শ্লাঘ্য এবং যাঁহার জন্য আজ বঙ্গবাসী, জনসাধারণের নিকট পূজ্য, সেই প্রবরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্য হইতেই অসাধারণমেধাবী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, শ্রীহট্টাদি প্রদেশে কলাপ ব্যাকরণ প্রচলিত, ইনি সেই কলাপ ব্যাকরণ প্রথমে অধ্যয়ন করেন। পরে কলাপ ব্যাকরণের একখানি 'পঞ্জি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহা এখন আর পাওয়া যায় না। আমরা দেখিতে পাই তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ ছাত্রবৃন্দ বলিয়াছিল, আপনার পঞ্জিদ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকি। যাক্ এই ভাবে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রে ও তৎকাল-প্রচলিত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থায় বড়ই চপলস্বভাব ছিলেন। কথিত আছে, পূজাজপপরায়ণা কামিনীগণের পূজোপহার ছলপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি প্রথমতঃ "লক্ষ্মীমণী" নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন তৎকালে লক্ষ্মীদেবীর কাল হয়। তিনি গৃহে আগমন করিয়া পতিহীনা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগবিধুরা জননীর প্রীতিকামনায় পুনরায় "বিষ্ণুপ্রিয়া" নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমরা অনুমান করি, সম্ভবতঃ গুণান্বিতা প্রথমা পত্নীর প্রতি বদ্ধানুরাগ প্রযুক্ত দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কারণ আমরা বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুদেবীর বড় একটা উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াও তিনি মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এমন কি, শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে মাতৃদেবীর নামে পৃথক ভাবে মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন। কুলিনগ্রামে অবস্থান সময়ে মাতার স্বহস্ত পাক অন্ন পরম প্রীতিভরে ভক্ষণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশাগত বৈষ্ণবদের নিকট হইতে মাতৃসন্দেশ সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, তাঁহার এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও পুত্রাদি হয় নাই। তিনি এই সময় অধ্যাপনা কার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া নানাস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিংবদন্তি আছে, নিম্বার্কমত প্রচারক কেশবাচার্য্য নামক কাশ্মীরদেশীয় কোনও দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া এই নবীন পণ্ডিতের

নিকট পরাজিত হইয়া যান। প্রবাদ আছে, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—এবং রঘুনাথ শিরোমণি (কানভট্ট) মহাশয়ও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। একদা তিনি রঘুনাথ শিরোমণিকে স্বরচিত গ্রন্থখানি দেখিতে দেন, ইহাতে রঘুনাথ শিরোমণি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য, দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলেন, আমিও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার এই গ্রন্থখানি এত ভাল হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ থাকিতে কেহই আমার এই গ্রন্থের আদর করিবে না। ইহা শুনিয়া চৈতন্যদেব স্বরচিত গ্রন্থখানি তদ্দণ্ডেই গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া দেন, এবং বলেন, ভাই আজ হইতে তোমার গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হউক। আমরা এরূপ মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগ কোথাও দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, যে ঘটনাস্রোত তাঁহাকে এত মহান্ করিয়া তুলিয়াছে, সেই ঘটনাস্রোত এবার তাঁহার নিকট আসিয়া সংযুক্ত হইল, তিনি পিতৃকৃত্য সাধনবাসনায় গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম সংদর্শন করিয়া কি যেন তাঁহার পুরাণ স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইল, হঠাৎ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমময় ভাব জাগিয়া উঠিল, সেই হইতে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পথের পথিক হইলেন। যে পথে গমন করিলে লোক জন্মমরণ বর্জ্জিত হয়, তিনি সেই পথের সন্ধান পাইলেন। গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি দীক্ষিত হইলেন। আমরা এই দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই নিমাই-চন্দ্রকে চৈতন্যচন্দ্ররূপে পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত দেখি। তখন হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ হইতে থাকে। তিনি নিরন্তর নামজপে রত থাকিতেন ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। কখনও কখনও ভাবাবেশে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন। একদিন ভাবাবেশে ছাত্রদিগকে তাড়া করিয়াছিলেন, তাহাতে ছাত্রগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। গয়া হইতে আগমনের পর হইতেই একে একে ছাত্রগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে প্রকাশ্য রাজপথে তাড়া করাতে তাহারা তাঁহাকে নিরতিশয় নিন্দা করিতে লাগিল। এদিকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দৈবযোগে কেশব ভারতী নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আমরা দেখিতে পাই, তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পরও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণে একান্ত বিরত থাকিয়া কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনই করিতেন। আমরা দেখিতে পাই, তিনি প্রথমতঃ ঈশ্বরপুরীর শিষ্যত্ব, পরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। এই উভয় সাধুপুরুষই শঙ্করাচার্য্যসম্প্রদায় ভুক্ত। কেন না—শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ী

সন্ন্যাসিগণ, গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, কানন, পর্ব্বত, সরস্বতী, এই দশ নামে খ্যাত। অতএব পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতী ইঁহারা শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু ইনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীগণের ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন না, প্রত্যুত নানাস্থানে বেদান্ত শাস্ত্রের দোষই দেখাইয়াছেন। কাশীতে অবস্থান কালে যখন কাশীবাসী শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্যাদি দর্শনে বিস্মিত হইয়া এক সভায় মিলিত হন, তখন প্রকাশানন্দ নামক এক শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী—(যাঁহার ভক্তিযাজন সময়ের নাম প্রবোধানন্দ—যিনি পরে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীবৃন্দাবন শতক এবং শ্রীবৃন্দাবন রসামৃত নামক গ্রন্থাদি রচনা করেন তিনি) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (আমরা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি দেখাইতেছি।)

সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখি যে তোমায় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥

তখন শ্রীচৈতন্যপ্রভু উত্তর করেন—

প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সভাতে মোরে বসতি না যুয়ায়॥

এই শ্লোকে প্রভু নিজকে হীন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াছিলেন। তাহার কারণ, পূর্ব্বে যে দশ আখ্যাধারী সন্ন্যাসিদিগের নাম বলিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে আচার্য্য কোনও কারণে গিরি ও পুরীর দণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং ভারতী সম্প্রদায়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধেক করিয়া দেন, ইহাতে ভারতী-সম্প্রদায় হীন রূপে শঙ্কর-সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য। তাই প্রভু নিজকে হীন সম্প্রদায় বলিয়াছেন। তার পর কেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন তাহা বলিতেছেন :—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদে অধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন ॥

তখন প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন—

কৃষ্ণভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেন তার কিবা দোষ ॥

তখন চৈতন্যদেব বলেন—

এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন ॥

এই বলিয়া তিনি বেদান্তশাস্ত্রে শঙ্করভাষ্যের উপর কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করেন। এবং বলেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

এই ভাবে মায়াবাদের নিন্দা তিনি বহু বার করিয়াছেন। যখন পুরিধামে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার বিচার হয়, তখনও তাঁহাকে ঠিক এই ভাবে উত্তর প্রদান করিতে দেখি। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয়—তিনি আগমোক্ত মার্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আগম শব্দে তন্ত্রশাস্ত্র—তন্ত্রশাস্ত্রেই আমরা পূর্ব্বোক্ত মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং নামক বচন দেখিতে পাই এবং তন্ত্র শাস্ত্রেই বলিয়া থাকে—

"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ণচান্যথা।"

এবং ঐ শাস্ত্রেই আছে—"আগমোক্ত বিধানেন কলৌদেবান্‌যজেৎ সুধী।" চৈতন্যদেবেরও ইহাই মূলমন্ত্র ছিল—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈবকেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনামানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥"

তিনি তন্ত্র মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়াই হয় ত বৈষ্ণব মহাপ্রভুরা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ নাই; তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন শক্তিপূজা ও জপাদির বিধান আছে, তদ্রূপ বিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুমন্ত্র জপেরও বিধান আছে। তবে হয়ত শক্তিপূজায় ছাগ ঘাতাদির বিধি দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন তন্ত্রশাস্ত্রে কেবলই ছাগঘাতাদির তথা পঞ্চমকারেরই বিধি আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও মার্গের উল্লেখ নাই। এই প্রকার ধারণার মূল যে অজ্ঞতা তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় মতের

মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। দীক্ষা গ্রহণ, নাম জপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য যে তন্ত্রোক্ত তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। তবে কেন যে এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে একটা পার্থক্য ভাব লক্ষিত হয়, তাহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। যাক্, আমরা প্রসঙ্গক্রমে একটু অবান্তর বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

শ্রীচৈতন্যপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর কখনও শ্রীধামবৃন্দাবন, কখনও বা শ্রীক্ষেত্র এইরূপ করিয়া শেষে শ্রীক্ষেত্রেই ছিলেন—আমরা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার জীবনকাল, আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত-লীলা এই তিন ভাগে দেখিতে পাই। সংক্ষেপে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥
২৪শ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহাতে কীর্ত্তন বিলাস॥
২৪শ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর ২৪শ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাল সকলে॥

এই হইল তাঁহার সংক্ষেপে কার্য্যকাল বর্ণনা। আমরা প্রথমে যে বিষয়ের উল্লখ করিয়াছি—এইবার তাহার সমাধানের প্রয়াস পাইব। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই বিষয়টীই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং এই বিষয়ের উপরেই তাঁহার অবতারত্ব নির্ভর করে।

আমরা দেখিতে পাই—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা কালে তিনি রথের অগ্রে অগ্রে একটী শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে গমন করিতেন। শ্লোকটী এই—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিতমালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ॥
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপারলীলাবিধৌ।
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

ইহা শৃঙ্গার রসের শ্লোক। এখন আমাদের ভাবিবার বিষয়, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া এরূপ সময়ে কেন এই বিরুদ্ধার্থ যুক্ত শ্লোক পাঠ করিতেন। আমরাও যেমন ইহার ভাবার্থ নির্ণয় করিতে পারি না, তদ্রূপ তদানিন্তন অনেকেই ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। কেবল শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় ইহার ভাব প্রথমে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন; তিনি ইহার ভাব অন্য একটী স্বরচিত শ্লোকে আভাষে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

প্রিয়ঃসোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ।
তথাহং সারাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং॥
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে।
মনোমে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

অর্থাৎ কোনও সময়ে গ্রহণ উপলক্ষে প্রভাসতীর্থে বৃন্দাবনের নন্দ প্রভৃতি গোপ-বৃন্দ ও গোপীকাগণ স্নানার্থ আসিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণও দ্বারবতী হইতে সমস্ত যাদবগণ ও কামিনীগণ পরিবৃত হইয়া স্নানার্থ ঐ প্রভাসতীর্থে আসিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনবাসী গোপ ও গোপীগণের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় সেখানকার ভাব লইয়া—যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের উক্তিতে আছে—

"আহুশ্চতে নলিনাভপদারবৃন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদিবিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার কূপপতিতোত্তরণাবলম্বম্,
গেহং যুষামপিমনস্যুদিয়াৎসদানঃ॥"

সেই স্থানে প্রধানা গোপী অর্থাৎ শ্রীরাধার মুখে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক সন্নিবেশ করিয়াছেন।

আমরা –"যঃ কৌমার হরঃ"—ইত্যাদি শ্লোক ও শ্রীরূপগোস্বামীর –"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ"—ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমরা এইস্থলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার পাইলেও আমার মন সেই যমুনাপুলিনসংস্থিত তমালকুঞ্জের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। এখানে রথের সম্মুখে মহাপ্রভুকেও তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধার মত অবলোকন করি। এইটীই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মমতের, সাধারণ ধর্ম্মমত হইতে পৃথকত্ব। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সাধুবৃন্দ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্যদেব রাধা ভাবে সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহ্যিক গৌরবর্ণ ঐ শ্রীরাধারই—অনিন্দ্যসুন্দরসুধাকরমনোহরগৌরবর্ণ। তিনি অন্তরে কৃষ্ণ,

বাহিরে রাধা। তিনি গোপী ভাব লইয়াই ভজনা করিতেন। সর্ব্বদা সেই গোপী ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিতেন।

একদা দক্ষিণ দেশীয় ভূস্বামী বৈষ্ণব প্রধান শ্রীরামানন্দ রায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া নিজস্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিলে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—

গৌরদেহ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহোনা স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥

এই তাঁহার নিজ শ্রীমুখের উক্তি। এখন আমরা শাস্ত্রে কি দেখিতে পাই—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে আছে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽস্য গৃহ্নতোঽনুযুগে তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, সত্যযুগে "শুক্লা"বতার ত্রেতায় রক্তা-বতার "ইদানিং কৃষ্ণতাং গতঃ" এই বলায় দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান "শ্রীকৃষ্ণ" এখন "পারিশিষ্য ন্যায়" প্রযুক্ত কলিতে "পীত" অবতার—শ্রীরাধা ভাবভাবিত এই শ্রীচৈতন্যদেব। মহাভারতেও আমরা দেখি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

এই প্রমাণলব্ধ পুরুষ শ্রীচৈতন্যকেই বুঝাইয়া থাকে। আরও শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥

এই প্রমাণলব্ধ পুরুষ কেবল শ্রীচৈতন্যদেবেই সম্ভব হয়। অতএব আমরা যে প্রথমে বলিয়াছি এই গৌরকান্তি তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার নিজবর্ণ অন্য আছে, তাহা সুসঙ্গত হইতেছে। অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীধামবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ করিতে করিতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে সুখভোগ করিয়াছিলেন, সেই তন্ময়ত্ব সুখ উপভোগ করিবার জন্যই তিনি অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ভাবিত হইয়া অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ থাকিলেও ত্বিষা অর্থাৎ কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ব্যবহার দ্বারা সংকীর্ত্তন প্রায় এক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এখন কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব সমস্ত জাতিকে বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া একাকার করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত বিরাট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই তাহার উদাহরণ দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এরূপ উক্তির মূল দেখিতে পাই না। অন্ততঃ শ্রীচৈতন্যদেব যে বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিবার পক্ষপাতী ছিলেন, এ কথা তাঁহার কার্য্যাবলি আলোচনা করিলে বোধ হয় না। তিনি নিজে কখনই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ অন্ন গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র রায় পরম ভাগবত ও পরম প্রিয় হইলেও জাতিতে শূদ্র বলিয়া তিনি তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে নিকৃষ্ট এক সনাড়িয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে কেন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার রীতিমত কারণ দেখাইয়া দেন। তাঁহার জলপাত্র ও বহির্ব্বাস ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণই বহন করিত, এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ আছে—একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"বর্ণাশ্রমাচারবতাপুরুষেণপরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥"

এইস্থলে তিনি বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়া হরির আরাধনা করিতে উপদেশ দিতেছেন। তবে যে যবন হরিদাস প্রভৃতিকেও নাম বিতরণ করিতে দেখি, তাহা নাম-বিতরণ মাত্র। ঐ যবন হরিদাস কখনই এক পংক্তিতে বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিত না, এমন কি মহাপ্রভু ও ভক্তগণ পিণ্ডার উপর থাকিলে তিনি পিণ্ডার নিম্ন ভাগেই বসিয়া থাকিতেন, এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। আর ইদানিং শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে যেমন মহাপ্রসাদে আর জাতিবিচার দেখা যায় না, সে সময় তদ্রূপ ছিল না—আমরা দেখিতে পাই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারাই মহাপ্রসাদ আনান হইত। প্রসাদ গ্রহণ সময়ে ও জাত্যনুসারে পংক্তিভেদ দৃষ্ট হইত। এই সব দেখিয়া তিনি যে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে যে আমরা এখন "জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব" এই লৌকিক উক্তি দেখি, উহা তাঁহার পর হইতে হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এইরূপ হইয়াছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই; প্রত্যুত, তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণই দেখিয়া থাকি।

এই ভাবে আমরা এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যতই আলোচনা করি, আমরা সবিশেষ গুণ ভাগই দেখিয়া থাকি। তিনি দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-ভ্রমণ প্রসঙ্গে গিয়া তর্কে বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এবং তদ্দেশবাসী বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট—

"আত্মারামাশ্চমুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ ॥"

এই শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সুধীবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় কার্য্য শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে আমরা বহুলপরিমাণে দেখিয়া থাকি। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না।

এই মহাপুরুষের তিরোধান এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। শেষাবস্থায় তিনি মুহুর্ম্মুহু ভাবাবেশ হইতে থাকেন। ভাবাবেশ কালে তাঁহার গাত্রের সন্ধিসকল শ্লথ ও অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িত—

"প্রতিরোম কূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গাম কদম্ব প্রকার ॥
প্রতিরোমে স্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা যমুনার ॥"

এই ভাবে প্রতিক্ষণই তাঁহার সাত্ত্বিক ভাব প্রকট হইত। সম্মুখে কোনও ভাবোদ্দীপক বস্তু দেখিলেই তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন লীলা মনে হইয়া ভাবাবেশ হইত। চটকপর্ব্বত দেখিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধন-লীলার ভাব উদয় হইয়াছিল। পরিশেষে একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে—

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া বলিল।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিল ॥

এই ভাবে তাঁহার তিরোধান হয়। সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া যে পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পথের পথিক হইয়া কত সংসার তাপক্লিষ্ট ব্যক্তি, মরুতাপে তাপিত ব্যক্তি সুশীতল পানীয়ের ন্যায়, বিমল শান্তিধারা পাইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব জন্য পৃথিবী ধন্যা, ভারতবর্ষ ধন্য, তথা আমাদের বঙ্গভূমি ধন্যা। আর আমরা বঙ্গবাসী বলিয়া আমরাও ধন্য। শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তি ওঁ।

অন্ধ।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল।]

"তোমার কি এতদূর সাহস হবে? তা' ত বিশ্বাস হয় না!"

রহমন হস্তস্থিত একটী ফটোচিত্রের দিকে তাকাইয়া এই কথাগুলি বলিল। তাহার ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া ছবিখানি সে যথাস্থানে রাখিয়া দিল। ছবিখানি এক অসামান্যসুন্দরী স্ত্রীলোকের ফটো। তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় যেন হাসিতেছে! প্রথম দৃষ্টিতে ছবিখানিকে জীবন্ত স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়াই ভ্রম হয়। এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য, অসীম রূপরাশি পুরুষমানুষকে অনায়াসেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিতে পারে!

রহমন মনে মনে কি এক মতলব আঁটিল। ছবির দিকে তাকাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার নিজের উপরও বিশ্বাস হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে, পাছে দু'দিন বাদে, এ মোহের ঘোর কেটে যায়! আর আমরাও পরস্পরের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠি। আমাদের এ অনুরাগ যে আজীবন স্থায়ী হবে, তা' জোর করে বলা বড় শক্ত।"

সে অধীর ভাবে ঘড়ির দিকে তাকাইল, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণপ্রায়। তখন বারান্দায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় লাগিল। আপাদমস্তক আবৃতা এক স্ত্রীলোক একাকিনী গাড়ী হইতে নামিল। রহমন আর কালবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে উপরের ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল।

"সব ঠিকঠাক?" স্ত্রীলোকটি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল।

"নিশ্চয়ই, সব প্রস্তুত। অত সন্তর্পণে কথা কহিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এ বাড়ীতে এখন কেহই নাই। চাকর ও বাবুর্চ্চি দু'জনকেই স্থানান্তরে পাঠিয়েছি।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটি আরাম-কেদারার উপর বসিয়া পড়িল। রহমন প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। স্ত্রীলোকটি রহমনের অঙ্গুলীর মধ্যে নিজের অঙ্গুলিগুলি

সন্নিবেশ করিয়া কেদারার বড় হাতার উপর তাহাকে টানিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্ত্রীলোকটি মেজের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"রহমন! আমার বড় ভয় পাচ্ছে!" রহমনের মুখের দিকে তাকাইয়া এ কথাগুলি বলিতে তাহার সাহস হইল না।

"এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? এ অবস্থায় সকল স্ত্রীলোকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু ভয় পাবার কোনও কারণ নাই। আজীবন আমি তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসব। প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও তোমাকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করব। তুমি কি অতীতের সে সব কথা ভুলে গেলে, পিয়ারা! বাল্য-কালেই আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। সে আলাপ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ সদ্ভাবে পরিণত হ'ল। তখন মনে করেছিলাম, একদিন তোমাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করে জীবনের সকল তাপ শীতল করব। কিন্তু আল্লা সে সাধে বাদ সাধলেন। কোথা হতে বন্ধু জাহির এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়াল। তোমার পিতা তা'কেই আমার অপেক্ষা যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে তার হস্তেই তোমাকে সমর্পণ করলেন। সেদিন প্রাণের মধ্যে যে অব্যক্ত যন্ত্রণারাশি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এ যাবৎ তা'দের দাহনে ভস্মীভূতপ্রায় হয়েছি। এত কষ্টের মধ্যেও এক সান্ত্বনা ছিল যে, মধ্যে মধ্যে বন্ধুর বাড়ী তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে প্রাণ অনেকটা শান্ত হ'ত। কিন্তু সেই অবধি অপর কোনও স্ত্রীলোককেই ভালবাসতে পারি নাই। বিবাহও করি নাই। ভগবান আজ যখন আবার সুদিন মিলায়েছেন, তখন তাহা আর উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁরই অসীম করুণারাশি বক্ষে ধরে, এস আজ আবার আমরা সংসারপথে অগ্রসর হই। তুমিও আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাস!"

রমণী মুখে আর ইহার কোনও উত্তর দিল না। কেবল মাথা নত করিয়া প্রণয়াস্পদের হস্ত চুম্বন করিল। পরে আর্দ্রনয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"হাঁ, আমার বিশ্বাস, তুমি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। দাম্পত্য-জীবনে সুখের আস্বাদ কণামাত্রও ভোগ করি নাই। স্বামীর ভালবাসা লাভ করবার জন্য আমি বড়ই লালায়িত হয়েছিলাম, কিন্তু তা'র পরিবর্ত্তে আমার ভাগ্যে কেবল অবহেলা ও উপেক্ষা লাভ হয়েছে। যাক্, ও সব বিষয়ের উল্লেখ করে এখন আর কোনও লাভ নাই।"

"ও সব কথা আলোচনায় আর ফল কি! বিগত জীবনের পৃষ্ঠায় যা' কিছু অঙ্কিত হয়েছে, সে সব মুছে ফেল। অতীতকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দাও। আমরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে দূরদেশে গিয়ে নূতন বাসা নির্ম্মাণ ক'রব। এখানে

থাক্‌লে, অনেকে আমাদের বিদ্রূপ করতে পারে, জাহির ফিরে এসে আমাদের সুখের পথে আবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারব। জাহির নির্ব্বোধ, তাই এমন রত্ন চিনতে পারলে না! তুমি এখানে একটু বিশ্রাম কর। ব্যস্ত হ'বার প্রয়োজন নাই। এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে।"

"এ সব বিষয় ভাবতে ভাবতে অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি সব ভুলে তোমারই চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম। দেখো, দু'দিন বাদে যেন বিরক্ত হয়ে আমাকে চরণে ঠেলো না।"

"আজকের দিনে আর ওসব অমঙ্গলের কথা তুল্‌ছো কেন? মনে কর, আজ যেন তুমি আবার নূতন ভাবে দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করছো। তোমার পূর্ব্বেকার অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত একেবারে ভুলে যাও।"

রমণী মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে সব ভুলতে এখনও অনেক দিন লাগবে। রহমন! একবার ভাব দেখি কি মহামূল্য রত্ন পশ্চাতে ফেলে যাচ্ছি। তোমার প্রেম লাভের জন্য কি মহা ত্যাগস্বীকারই আমাকে করতে হচ্ছে। সে কথা ভাবতেও আমার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠে!"

"ওঃ! শিশুকন্যার কথা বলছ!"

রমণী তাহাকে অঙ্গুলীসঞ্চালনের দ্বারা থামিতে বলিল।

"ও কথা আর তুলো না। তুমি জান, আরও অনেক দিন পূর্ব্বে এ প্রস্তাব একবার আমাকে করেছিলে। তখন আসতে পারতাম, কিন্তু ওর জন্যই আসতে পারি নাই। আজ আর মনকে দমন করতে না পেরে চলে এসেছি। সে তখন ঘুমাচ্ছিল! জীবনে বোধ হয় আর সে চাঁদ মুখ দেখতে পাব না! রহমন, এ কষ্ট ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই অনুভব করিতে পারে না! বাছার ঘুমন্ত মুখে অশ্রুসিক্ত বিদায়ের শেষ চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়ে এসেছি। চুম্বনে শিশু শিহরিয়া উঠিল; একবার মনে হল, বুঝি বা জেগে উঠে; তা'হলে আর আসা হত না। জাহিরের আত্মীয়েরা অবশ্য তাকে সযত্নে লালনপালন করবে বলেই বোধ হয়! সেও খুব শান্ত, সুবোধ। একবার তা'কে দেখলে, কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারবে না। না, না, ও কথা ছেড়ে দাও। এস, আমরা অন্য বিষয়ে কথা কই।" রমণী বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। ঘরের ভিতর তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এই বাড়ীতেই পূর্ব্বে জাহির থাকত না?"

"হাঁ, তোমাকে বিবাহ করবার পূর্ব্বে, সে এ বাড়ীতেই থাকত। এ বাড়ী তা'রই ছিল, পরে আমাকে বিক্রয় করে।"

"কি মজার কথা! আজ আবার এতকাল পরে আমরা সেই বাড়ীতেই বসে, তা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি।"

"তুমি যে আসল কথা ভুলে যাচ্ছ। তোমার এতে দোষ কি, বল? জাহিরই ত তোমাকে একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেল! তার পর পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেল, তার আর দেখা নাই। স্বামীর এ উপেক্ষা ও অবহেলা স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য!"

রমণী তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"এ কথা সত্য। কিন্তু হঠাৎ তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হলো তা বুঝতে পারলাম না। বিবাহের পূর্ব্বে ও কিছু পরেও তার স্বভাব চরিত্র এমন খারাপ হয় নাই। কোথায় আছে, তারও সংবাদ দেয় না। মধ্যে দু' একখানা পত্র লিখেছিলো; তাও পাগলের প্রলাপ মাত্র, অর্থ করা দুরূহ; আবার চিঠিতে তার ঠিকানাও দেয় নাই।"

"এ রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও স্ত্রীলোক আছে। তা'র প্রতি অনুরক্ত হয়ে, তোমাকে সে একেবারে ত্যাগ করে চলে গেছে। যাক্, আজ থেকে তুমি আমার হ'লে; আর জাহিরের সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রয়োজন নাই।"

রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিল,—"প্রথম হ'তেই অত্যাচার আরম্ভ করো না। সে সব কথার আলোচনা এত শীঘ্র ত্যাগ করতে পারা কি সম্ভব? যে সব বিষয় ভাবতে ভাবতে কত বিনিদ্র রজনী কেঁদে কাটিয়েছি, আজও সে কথা মনে পড়ায় চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আজ আর আমার সে দিকটা তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা করি না। আজ হ'তে আবার নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করাই সঙ্গত। জাহির বলে যে, কোনও লোক পৃথিবীতে ছিল, তা ভুলে যাবার চেষ্টা করবো। তবে কিছু দিন সময়—ও কি, বাইরের দরজার কড়া নাড়ে কে?"

তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় আবার ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। রহমন ভ্রূকুটি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় স্ত্রীলোকটিকে চুপি চুপি বলিয়া গেল,—"পিয়ারা, তুমি না হয় পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা কর গে। কি জানি এমন সময় কে আবার জ্বালাতে এল! যেই আসুক, আমি পাঁচ মিনিটে তা'কে বিদায় করবার চেষ্টা করবো। তোমাকে বেশীক্ষণ একলা বসে থাকতে হবে না।"

স্ত্রীলোকটি ত্রস্তভাবে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলে, রহমন ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। পরে নীচে নামিয়া বাহিরের দরজা খুলিতেই সম্মুখে এক দীর্ঘকায় মূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল অস্ফুটস্বরে দু'টি কথা তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে নির্গত হইল,—"কি হে?"

"কি, রহমন, তুমি? আমি মনে করেছিলাম, তোমার লোক জন কেউ হবে। চল, উপরে যাই। আর কেউ আছে না কি?"

রহমনের মাথা ঘুরিতেছিল। কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া ফেলিল।

"না, আমি একলা। জাহির, এতকাল পরে তুমি যে হঠাৎ আজ এখানে আসবে, এ একেবারে আশাতীত। এস, ভিতরে এস।"

লোকটি অতি সন্তর্পণে দেওয়াল ধরিয়া অগ্রসর হইল। উপরের ঘরে গিয়া রহমন দেখিল, তাড়াতাড়িতে পিয়ারা তাহার গাত্রাচ্ছাদন কেদারার উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জাহির যদি তাহা দেখিয়া চিনিতে পারে! আসন্ন বিপদে উদ্ধারলাভের জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

জাহির এক হাত টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার ধারে দাঁড়াইল। তাহার নীল চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি রহমনের মুখের উপর নিবদ্ধ। জাহির মৃদু মৃদু হাসিতেছে। রহমনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, জাহির বোধ হয় সব জানিতে পারিয়া সেখানে তাহার স্ত্রীর অন্বেষণে আসিয়াছে। কিন্তু মুখের ভাবে ত রাগ বা হিংসার চিহ্নমাত্র প্রকটিত নাই! এ কি প্রহেলিকা? গভীর সন্দেহ-দোলায় তাহার মন দুলিতে লাগিল।

"রহমন, দোস্, আমাকে একবার আলিঙ্গন কর'! আমি বহুদিন তোমার স্পর্শসুখ অনুভব করি নি।"

রহমন বন্ধুকে কম্পিত কলেবরে আলিঙ্গন করিল। জাহির তখন তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে বলিল,—"আজ এত দিন পরে এই পুরাতন স্থানে বন্ধুর সহিত আলিঙ্গন কি সুখের! হায়, যদি আজ আমি দৃষ্টিশক্তি না হারাতাম!"

রহমন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ সব কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জাহির ধীরে ধীরে বলিল,—"তা ত ঠিক। তুমি সে কথা জানবে কি

করে ভাই! এই যে চোখ দেখছো, নীল, আকর্ণ বিস্তৃত,—কিন্তু সব অন্ধকার, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যতদিন বেঁচে থাকবো, কিছুই দেখ্‌তে পাবো না। অচেনা পথে যখন চলি, তখন পা টলতে থাকে; মদ না খেলেও লোকে মনে করে আমি মাতাল হয়েছি। কিন্তু এ বাড়ীতে আসতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি; এ যে আমার চির-পরিচিত স্থান! ভাই, তোমার কাছে এসে, আজ মনে তবু অনেকটা শান্তি পাচ্ছি। অনেক চেষ্টা করে, মনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে তবে আজ এখানে আসতে পেরেছি। এ মুখ যে আর তোমাদের সম্মুখে দেখাতে পারবো, সে দুরাশা হৃদয় হতে একেবারে দূর করেই দিয়েছিলাম। একটু বসি; তোমার সঙ্গে ভাই অনেক প্রাণের কথা আছে। সে সব কথা আর কা'কেও সাহস করে বলতে পারি নি। এক গ্লাস জল দাও, গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। তুমি কথা কচ্ছো না কেন? তোমার হয়েছে কি? 'এসে পর্য্যন্ত যে তোমার মুখে একটা কথাও শুনতে পাই নি। খুব রাগ হয়েছে আমার উপর—নয়? তা ত হবারই কথা!"

রহমন হতবুদ্ধি হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে এতক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। এমন পদ্মকোরকের ন্যায় নীল বিস্তৃত চক্ষুদ্বয়! এ ব্যক্তি অন্ধ? তাও কি বিশ্বাস হয়! নিশ্চয়ই দৃষ্টিশক্তিহীনতার ভাণ করিয়া আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে। পিয়ারা বোধ হয় ঘরের ভিতর হইতে সব টের পাইতেছে। সে যদি একটু সাবধান হয়, তবেই আজ বন্ধুর নিকট মানরক্ষা! নচেৎ এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বে উহার মুখে যে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ছিল, আজ তাহা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, দেখছি। জাহিরের প্রশ্নে তাহার চৈতন্য হইল। বুঝিল, এখন চুপ করিয়া থাকিলে বন্ধুর মনে সন্দেহের মাত্রা নিশ্চয়ই ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

"জাহির, কথা আর কি বলবো? তোমার ভাবগতিক দেখে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি যে চোখে দেখতে পাও না, তা আমি পূর্ব্বেও বুঝতে পারি নি, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কথা কি সত্য?"

"এ কথা সত্য। দুরদৃষ্টবশতঃ আমি যথার্থই আজ দৃষ্টিশক্তিহীন। আমি নিজেই প্রথম বুঝতে পারি নাই, কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন আমার হয়েছে! জীবনে কি ভীষণ মৃত্যুদণ্ড স্বেচ্ছায় বরণ করে লয়েছি। তুমি জান না, আজ এখানে আসবার পূর্ব্বে আমি কত ইতস্ততঃ করেছি। এ অবস্থায় তোমাদের সম্মুখীন হ'তে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরে ভাবলাম, আমার দুঃখ কষ্ট

ভোগের কথা শুনলে তুমি নিশ্চয়ই সহানুভূতি প্রকাশ করবে। রহমন, আমার ভীষণ অধঃপতন হয়েছিল। শয়তান আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। সংসর্গ-দোষে একেবারে পাপের পঙ্কিল সাগরের তলদেশে ডুবে গেছলাম; সবেমাত্র দু' এক দিন হ'ল আবার সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠেছি। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল; এখন আবার একটু আধটু প্রকৃতিস্থ হয়েছি বলে মনে হয়। প্রবল ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে আমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল; কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়েও আল্লার কৃপায় আজ আমি রণে জয়ী হয়েছি। আশা করি, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার এমন পতন হবে না! কিন্তু ভাই, পাপের বড় ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে,—অমূল্য চক্ষুরত্ন আমার চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে!

সঙ্গদোষে স্বভাব চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে। ঘোর অত্যাচার ও অনাচারের ফলে নানাবিধ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তির পীড়া জন্মে। পরে অর্থাভাবে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি একেবারেই হারাই। পূর্ব্বে যদিও মধ্যে মধ্যে গৃহে ফিরিবার কথা ভাবতাম, কিন্তু অন্ধ হওয়ার পর হ'তেই সে দুরাশা একেবারে ত্যাগ করি। যাদের মনে অশেষ দুঃখকষ্ট দিয়ে, একপ্রকার নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে চলে আসি, আজ অন্ধ হয়ে কোন্ সাহসে আবার তা'দের গলগ্রহ হয়ে সেবা শুশ্রূষা ভোগ করতে যাব? দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর হতেই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়; কিন্তু তখন আর উপায় নাই! হায়, আল্লা কেন পূর্ব্বেই আমার চৈতন্য করাইয়া দেন নাই! কিন্তু তাহ'লে ত আর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত না!"

বাল্যের পুরাতন বন্ধুর নিকট মনের ভার লাঘব করিয়া, জাহির অনেকটা শান্তি অনুভব করিল। দু' এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল,—"ভাই, মনস্থ করেছি, আর সংসারে প্রবেশ করব না। ফকিরের বেশ ধরে দূরদেশে আল্লার নাম করে ঘুরে বেড়াব। চক্ষু হারিয়েছি, স্ত্রীকন্যার ভালবাসা, স্নেহলাভে বঞ্চিত হয়েছি, এতেও বোধ হয় আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই। তাই খোদার নাম করে, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবো স্থির করেছি। চিরদিনের জন্য স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করে যেতে মনের মধ্যে যে কি কষ্ট হচ্ছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না। শিশুকন্যার জন্য প্রাণ কত কাতর হয়, তা মুখে বল্লে বিশ্বাস করবে না; যদি হৃদয় চিরে এ যন্ত্রণা দেখাবার হ'ত, ত দেখাতাম! এখনও মধ্যে মধ্যে এ অভাগার স্কন্ধদেশে তার কচি হাত

দু'খানির কোমল স্পর্শ অনুভব করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।—ও কি, কিসের শব্দ ?"

রহমন শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ ঘর হইতে উত্থিত স্ত্রীলোকের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"না, না, ও কিছু নয়; আমার কাশির শব্দ। কি বলছিলে, বল না।"

"আমি মক্কা যা'বার সঙ্কল্প করেছি। তাই একবার লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ছেলেবেলা হ'তেই তোমার নিকট প্রাণের কথা কয়ে অনেকটা শান্তি পেতাম। তাই আজ আবার ছুটে এসেছি। একটু পরেই চলে যাব। আর যাবার সময় একবার স্ত্রীকন্যার সংবাদটা জানবার জন্য প্রাণ বড় কাতর হয়ে উঠলো। তাদের চিন্তায় মক্কাতে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত মনে খোদার নাম করতে পারবো না! যদি কখনও সুবিধা পাও, আমার স্ত্রীকে এ সব কথা বুঝিয়ে বলো। তবে আমি চলে গেলে, তা'রা দুদিন বাদে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে যাবে। তখন আবার সুখে স্বচ্ছন্দে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারবে। আল্লা, তাদের সুখে রাখুন!"

জাহির চুপ করিল। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ জল পড়িতে লাগিল। রহমন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"ভাই, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। কেন, তুমি বৃথা এ সব সন্দেহ করছো? আমি বেশ জানি, তুমি চলে যাওয়াতে, তোমার স্ত্রী তোমার জন্য বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। তুমি এ অবস্থাতেও ফিরে গেলে, সে দাসীর ন্যায় প্রাণপণ তোমার সেবা করবে। এ তুমি স্থির জেনো। আর স্ত্রী কন্যার বিষয়ও ত তোমার ভাবা উচিত। তা'রা এখন কিরূপ নিঃসহায় অবস্থায় আছে, একবার ভেবে দেখি। তোমার অবস্থায় পড়লে, আমি নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে যেতাম।"

"রহমন, তোমার কথা শুনে, আবার আমার ঘরে ফিরে যেতেই লোভ হচ্ছে। একবার পিয়ারার নিজমুখে শুনতে ইচ্ছা যায় যে, তা'কে এত দুঃখ কষ্ট দিলেও, সে এখনও আমাকে ভালবাসে, আমার প্রতি সে এখনও অনুরক্ত। ভাই, আমাকে দেখলে কি সে যথার্থই সন্তুষ্ট হবে? তাই, বন্ধুর সহিত প্রতারণা করো না। সত্য কথা খুলে বল। একে ত দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মরছি, তা'র উপর যদি আবার বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করতে হয়, তা'হলে বোধ হয় আমাকে আবার আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে!"

"না, না, কোনও ভয় নাই। আমি যা বলছি, সব সত্য। তুমি নড়ো না; চুপ করে বস। আমি এখনই আসছি।" রহমনের ভয় হইল, পাছে জাহির এখনই স্ত্রীর অবর্ত্তমানে বাড়ী চলিয়া যায়। তাহ'লেই ত পুনর্ব্বার বিপদপাতের সম্ভাবনা। সে পাশের ঘরের দরজার নিকট গিয়া পিয়ারাকে বাড়ী যাইতে সঙ্কেত করিল। এমন সময় স্কন্ধদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখে জাহির। সর্ব্বনাশ, তবে কি সত্যই সে অন্ধ নহে, তাহাদের অভিসন্ধি ধরিবার জন্য এতক্ষণ ছল করিতেছিল! তাহার সমস্ত দেহ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল,—"একি, তুমি কেমন করে এখানে এলে? এই বল্লে চোখে একদম দেখতে পাও না!"

"ভাই, এ স্থান যে আমার বড় পরিচিত! তোমার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে আমি এখানে এসেছি। এ বাড়ীর তুমি যেখানে যেতে বলবে, আমি সেখানেই যেতে পারি। আচ্ছা, দেখ, এই পাশের ঘরে গিয়ে টেবিল হ'তে তোমার একখানা বই আনছি, টেবিলের উপর বই পাব ত?"

রহমন নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই জাহির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রহমনের অন্তরাত্মা গুরু গুরু কাঁপিতে লাগিল। সব বুঝি বিফল হইল! সে মনে মনে আল্লার নাম স্মরণ করিতে লাগিল। তাহাদের ষড়যন্ত্র ত সব বাহির হইয়া পড়িবেই; তাহার উপর এ দৃশ্য দেখিলে জাহিরেরও জীবনের সকল সুখ শান্তিই একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে! আল্লা কি তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাদের দু'জনকেই এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন না!

জাহির ঘরের ভিতর ঢুকিল। টেবিলের পাশেই চেয়ারে তাহার স্ত্রী বসিয়াছিল। স্বামীকে নিকটে আসিতে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পাশ কাটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় বোধ হয় তাহার বস্ত্রাঞ্চল জাহিরের গাত্রস্পর্শ করিল। অন্ধ স্বামী কিছুই টের পাইল না। আল্লা যে তাহার অমূল্য চক্ষুরত্ন চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আজ তাহার সার্থকতা রহমন ও পিয়ারা লক্ষ্য করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল!

পিয়ারা বাহিরে আসিয়া গাত্রাচ্ছাদন তুলিয়া লইয়া রহমনকে চুপি চুপি বলিল,—"খোদা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি শীঘ্র ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি ওঁর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবো।" বলিয়াই সে তীরের ন্যায় বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

জাহির হাসিতে হাসিতে পুস্তক হস্তে হাজির হইল। বন্ধুর হাতে বইখানি

দিয়া বলিল,—"দেখলে, যা বলেছি, তা ঠিক! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, রহমন, আমার মনে হলো, ঘরের ভিতর থেকে কে যেন আমার গা ছুঁয়ে চলে এল। কেউ কি তোমার সঙ্গে কিছু পূর্ব্বে কথা বলছিল? আমি যেন ঘরের ভিতর হ'তে অন্য ব্যক্তির মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম!"

"জাহির, এ সবই তোমার ভ্রান্তি মাত্র। এথেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একজন সঙ্গী তোমার বিশেষ দরকার। নচেৎ যে কয়দিন বেঁচে থাকবে, তোমার কষ্টের সীমা থাকবে না। এ অবস্থায় স্ত্রী ভিন্ন আর কেউই তেমন যত্নে তোমার তত্ত্বাবধান করবে না। একটু বস। স্থির হও। দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। বিশ্রামের পর গাড়ী ডেকে, আমি তোমাকে বাড়ী রেখে আসবো।"

"ভাই, তাই হোক্! আমার আর কোনও আপত্তি নাই।"

মিলনের অন্তরায়।

(প্রত্যুত্তর)

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি এ।]

বন্ধুবর মৌঃ মোহাম্মদ কে চাঁদ আমার যুক্তির উদ্দেশ্য ভাল বুঝিতে পারেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম "ইহা (সাহিত্য-সম্মিলন) ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ব্রাহ্ম হিন্দু, বৌদ্ধ কাহারও নহে, ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকের।" তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাহিত্যসেবার সময় আমাদের হিন্দু মুসলমান নাম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করিতে হয়। স্যর রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাইরে" পুস্তকে কিম্বা (শ্রী) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "স্রোতের ফুলে" কোথায় হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা সাহিত্যসম্মিলন বা সাহিত্যপরিষদ দেখিবেন না। তাহার প্রতিবাদ করিতে হয় হিন্দুসমাজ করুন কিম্বা হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র বলিয়া যাঁহাদের দাবী আছে তাঁহারা করুন অথবা যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারেন। ঐতিহাসিক ভ্রম হয়, ঐতিহাসিকগণ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় যে, সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টা

করিয়াছিলেন, তাহাতে মুসলমানের কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন, এ কথা তিনি মনে রাখেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা মুসলমান না হইয়া খ্রীষ্টান হইলেও অক্ষয় বাবু এইরূপই করিতেন।

এইবার মোহাম্মদ কে চাঁদ মহাশয়ের লেখা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিনি "বহুবচন" ব্যবহার করিয়া কিরূপ ভ্রম করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন "সভাস্থলেই হউক, আর মাসিকপত্রিকাতেই হউক, যদি মুসলমানেরা তাঁহাদের ওরূপ লেখার উপর মন্তব্যপ্রকাশ করেন বা মিলনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করেন, অমনি হিন্দুরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কোনও রকমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। রাখালরাজ বাবু কি অস্বীকার করেন যে, মুসলমান বিরুদ্ধ কথা তাঁহারা মাসিক পত্রিকায়, ইতিহাসে, উপন্যাসে, নাটক বা কাব্যে লিখেন না বা লিখেন নাই?" এখানে দেখিতেছি, আমাকেই লক্ষ্য করিয়া "হিন্দুরা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ আমার ন্যায় একজন নগণ্য ব্যক্তি যে কিরূপে "হিন্দুরা" হইতে পারে তাহা বুঝিলাম না। আর আমার ন্যায় নিরামিষাশী ব্যক্তি যে কিরূপে খড়্গ-হস্ত হইতে পারে তাহাও বুঝিলাম না। সে কথা যাউক, চাঁদ মহাশয় যে, আবার ২।৪জনের জন্য "হিন্দুরা" শব্দ ব্যবহার করিলেন, তাহা কি ঠিক হইয়াছে?

ইহা অসম্ভব নহে যে, কোনও কোনও গ্রন্থকার মুসলমানের চরিত্রাঙ্কনে কোনও মুসলমানকে হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা আবার হিন্দুকেও ত হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যদি কোনও গ্রন্থকার কেবল উত্তম চরিত্রই চিত্র করেন, তাহা হইলে গ্রন্থের প্লট্ জমিবে কি না সন্দেহ। গ্রন্থকারকে মানব চরিত্রের সব দিক দেখাইতে হইবে। সুতরাং যদি হীনচরিত্র মুসলমান হয় তবে মুসলমান মহাশয়েরা চটিবেন, সে যদি হিন্দু হয় তবে হিন্দুরা চটিবেন, সে যদি হিন্দুস্থানী হয় তবে হিন্দুস্থানী খাপ্পা হইবে, আর যদি সে ব্রাহ্মণ হয় তবে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইবে। এরূপ ভাবিলে ত গ্রন্থ লেখা চলে না। কোনও মুসলমান সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি অনৈতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে মুসলমানের প্রাণে আঘাত লাগিবে কেন? একজন মুসলমান সম্বন্ধে যদি কোনও লোকের ভ্রান্তধারণা থাকে তবে তাহাতে সকল মুসলমানের চটিবার কারণ কি? যদি মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও হিন্দু গ্রন্থকার গ্লানিকর বিষয় লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে সমস্ত মুসলমান সমাজের ক্ষুব্ধ হইবার কথা। আর তাহাই বা কেন? হিন্দু সমাজও তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন। কিন্তু একজন হিন্দু গ্রন্থকারের অপরাধের

জন্ত মুসলমান সমাজ কি "হিন্দুরা" অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন? ব্যক্তিগত অপরাধের জন্ত সমস্ত সমাজকে অপরাধী করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

চাঁদ মহাশয় বলিয়াছেন "কায়স্থের ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করাতে জাতীয় রেষা-রেষি প্রকাশ পায় না। ইহা সামাজিক রেষারেষি মাত্র। কায়স্থ কখনও ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিতে ভুলিবেন না বা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক আহূত হইলে ভক্তিসহকারে তাঁহার বাটীতে আহার করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।" হইলই বা সামাজিক রেষারেষি? কতকগুলি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে স্থান বিশেষে এমন সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে যে, পরস্পরের সহিত মিলনের অন্তরায় ঘটিয়াছে, পরস্পরের সহিত রীতিমত বিবাদ চলিয়াছে! তবে তাহাতে সমস্ত সমাজের কিছু যায় আসে নাই। এইরূপ একদিন বৈগু বড় কি কায়স্থ বড়, এই কথা লইয়া অনেক কলঙ্কজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেইরূপ যদি মুসলমান সম্বন্ধে কোনও হিন্দু লেখকই এইরূপ লেখেন, তাহাতে মুসলমানগণ ব্যথিত হইবেন। তখন পার্থক্য এই দাঁড়াইবে যে, মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী, আর ব্রাহ্মণ বা বৈগুেরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা ধরিলে বোধ হয় প্রায় সমান হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই কতকগুলি লোকের ব্যবহারে সমাজের এক অংশ মনঃকষ্ট পাইতেছেন, তাহা লইয়া সাহিত্য-সম্মিলনে কথা উঠিবে কেন?

চাঁদ মহাশয় আর একটি ভ্রম করিতেছেন মুসলমানকে "জাতি" বলিয়া। আমি বলি, বাঙ্গালার সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালায় কথা বলেন তাঁহারা বাঙ্গালী জাতি। ইহাই হইল আমাদের সাহিত্যিকের সংজ্ঞা। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী হইলেই বাঙ্গালী, তাঁহার মাতৃভাষা যাহাই হউক না কেন। বাঙ্গালার মুসলমান জন্মতঃ বাঙ্গালী, হয়ত দশ বিশটা পরিবারে আরব পারস্তের রক্ত প্রবাহিত থাকিতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালার মুসলমান একটা পৃথক্ জাতি হইল কিরূপে? পদ্মিনী উপাখ্যানে যাঁহাদিগকে মুসলমান না বলিয়া যবন বলা হইয়াছে, তাঁহারা ত বিদেশাগত একটা জাতি। বাঙ্গালার মুসলমানের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্পর্ক। বাঙ্গালার দেশী খ্রীষ্টানেরা, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ বা ফরাসীর সহিত একজাতিত্ব দাবী করিলেও যেরূপ হয়, চিতোর আক্রমণকারী মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার মুসলমানের একজাতিত্ব দাবী করাও সেইরূপ। ইয়ুরোপের কোনও খ্রীষ্টান রাজার সম্বন্ধে কোনও গ্লানিকর ব্যাপার প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার দেশী খ্রীষ্টান সমাজের যেরূপ ক্ষুব্ধ হইবার কথা, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে বাঙ্গালার মুসলমানদিগেরও সেইরূপ হওয়া

উচিত। একধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া যদি তিনি স্পেনের বা মিশরের মুসলমান রাজাদের সহিত জ্ঞাতিত্ব দাবী করেন, তাহা হইলে সহানুভূতির পরিধিটা আর একটু বাড়াইয়া সকলের সহিত মানবজাতির জ্ঞাতিত্ব দাবী করিতেও পারেন।

তবে একটা কথা উঠিতে পারে, জাতির টান বড় না ধর্ম্মের টান বড়? আমার ত মনে হয় জাতির বা ভাষার টানই বড়। আমি নিজের সম্বন্ধে তিনটি টানের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব। যখন ধর্ম্মের কথা উঠিবে তখন বাঙ্গালী বিহারী নির্ব্বিশেষে ঠাকুরবাড়ীতে ঝুলন দেখিতে যাইব তখন বিহারী হিন্দুর সহিত আমার জ্ঞাতিত্ব। যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সভা হইবে তখন হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর সহিত মিলিব। আবার যখন ছত্রীজাতির যুবক সভার অধিবেশন হয় তখন আমি ছত্রীরূপে তাহাদের সহিত মিশি। সমাজের ব্যাপার জীবনের অল্পক্ষণ জুড়িয়া থাকে, ধর্ম্মের ব্যাপার দিবসে ২।৪ ঘণ্টা, আর ভাষার ব্যাপার সমস্ত ক্ষণ। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার টান বা জাতির টান, ধর্ম্মের টান অপেক্ষাও অধিক। এইজন্যই বাঙ্গালায় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ বর্ত্তমানের সভাতে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা করিয়া লওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম।

সেই জন্যই বলি,সাহিত্য-সম্মিলনে ধর্ম্মের ব্যাপার বা সামাজিক ব্যাপার লইয়া বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে যতটুকু হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন তাহা সাহিত্য-সম্মিলন করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যপরিষদ বা সাহিত্য-সম্মিলন এখনও সমালোচনায় হাত দেন নাই।

যাহা প্রথমে বলা উচিত ছিল, তাহা শেষেই বলি। আমি কখনই ভাবি নাই যে, চাঁদ মহাশয় "হিন্দু মুসলমানের বিরোধী হইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।" আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে, কে চাঁদ মহাশয় যে বিষয়গুলিকে হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় মনে করিতেছেন আমি বলি সেগুলি কিছুই নহে। পূর্ব্বে কোনও কোনও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মনোবিবাদ ছিল তথাপি মুসলমানেরা সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আজকাল সংবাদপত্র হওয়াতেই অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও লোকে বড় করিয়া দেখিতেছে, তাই মিলনের অন্তরায়ের কথা উঠিতেছে। যে ব্যাপার লইয়া ঘটনার কালে কোনও কথাই উঠে নাই, সে সকল দৃষ্টান্ত এখন তুলিয়া ফল কি? যেমন সাহিত্যপরিষদে অনেক শিক্ষিত মুসলমান যোগদান করেন নাই, সেইরূপ অনেক হিন্দুও যোগদান করেন নাই।

পূজার দালানে প্রবেশের সম্বন্ধে যে অস্পৃশ্যতার কথা উঠিয়াছে তাহার

সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা উঠিবে, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও কথা না বলাই ভাল, তবে চাঁদ মহাশয় এ কথা স্মরণ রাখিবেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে বিলাত ফেরত হিন্দু, দীক্ষিত ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সকলেরই আসন মুসলমানের সমান। যে সকল শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য মনে করেন বা ঘৃণা করেন, তাঁহারা কেহ সম্মিলনে যোগদান করেন না। যেদিন সাহিত্য-সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গ একবাক্যে মুসলমানগণকে ঘৃণা প্রদর্শন করিবে, সেদিন মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অভিযোগের কারণ হইবে, কিন্তু তখন সম্মিলনের মৃত্যু ঘটিবে। নতুবা ২।৪ জন প্রতিনিধি সেরূপ করিলে, সেরূপ প্রতিনিধিগণই তাড়িত হইবেন। সমাজের কে কোথায় কাহার প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শন করিতেছে, তাহা লইয়া সম্মিলনের মাথাব্যথা কিসের ?

শিয়া সুন্নিতে বহুবিষয়ে মনোবিবাদ সত্বেও যেরূপ উভয় সম্প্রদায়ের লোকে মুসলমান লীগে যোগদান করিতেছেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মনোবিবাদ সত্বেও (আংশিক রূপে) তাঁহারা উভয় দলেই যেমন সাহিত্যিকরূপে সম্মিলনে যোগদান করিতেছেন, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকেও তাহাই করিতে হইবে। "জনকয়েক হিন্দু বা জনকয়েক সাহিত্যিক আমাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন", এ কথা মনে রাখিলে তাঁহারা মিলিতে পারিবেন না। লোকে পুত্রশোক পাইয়াও হাসি-মুখে সংসারের কাজ করিয়া যায়, আর কোথায় কে কি বলিয়াছেন বলিয়া অভ্যর্থনা সমিতি বা সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের উপর রাগ করিলে চলিবে কেন ?

যদি কোনও সংবাদপত্র, মাসিকপত্র বা পুস্তকে কোনও আপত্তিকর বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকে যেরূপ প্রতিবাদ করেন, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। ইহার জন্য তাঁহাদের মুসলিম লীগও আছেন। সাধারণতঃ যে সংবাদপত্রে আপত্তিকর লেখা বাহির হয়, তাহাতেই প্রতিবাদ পাঠান নিয়ম, তিনি প্রকাশিত না করিলে অন্য সংবাদপত্রে পাঠাইতে হয়, কে চাঁদ মহাশয় এরূপ কিছু করিয়াছিলেন কি ? এরূপ করিবার সাধারণের যেরূপ অধিকার, তাঁহারও সেইরূপ অধিকার ছিল। তিনি সে অধিকার বুঝিয়া না লইলে দোষ কাহার ?

ভেক-তত্ত্ব।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" যখন নীরদমালা আকাশ ছাইয়া ফেলে, তখন আর আকুল হইয়া কোকিল কুজন করে না। সুরসিক কবি তাহার সরস কৈফিয়ত দিয়াছেন—

"দর্দ্দুরাঃ যত্র বক্তারঃ তত্র মৌনং হি শোভনং"।

কিন্তু কবিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলেও, "কটুরব" ভেককুল আমাদের প্রাণে প্রাবৃট-জল-স্নাতা পল্লীজননীর সিক্ত মুখের অসংখ্য স্মৃতির উদ্রেক করে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নীরব নিশীথে যখন কর্কশ-কণ্ঠ দর্দ্দুরকুল শব্দায়মান ঝিল্লি-কীটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তখন কোন্ শব্দটা অধিক কর্কশ, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া নির্ভুল রায় দিতে একটু সময় লাগে। কিন্তু এই দুইটা শব্দের সঙ্গে একটু বর্ষার টিপ্ টিপ্ শব্দ, মাঝে মাঝে একটা গ্রাম্য কুক্কুরের রব ও তাহার প্রতিধ্বনি একত্র মিলাইলে যে অসংখ্য স্মৃতি আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে, তাহা অমূল্য। তাই যেমন বাঙ্গালী আজীবন কাক, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়াকে ভুলিতে পারে না, তেমনি ব্যাঙ্ ও ঝিঁঝিঁপোকা, শিবা ও সারমেয়ের বেসুর কর্কশ স্বর আজীবন বাঙ্গালীর স্মৃতি-মন্দিরে বিরাজ করে।

বিজ্ঞান-জগতেও ভেকের একটা বিশেষ আদর আছে, অবশ্য তাহার রূপের জন্য বা তাহার কণ্ঠস্বরের জন্য নহে। কুমীর, কচ্ছপ, জলঢোঁড়া, গোসাপ প্রভৃতি খাঁটি উভচর বটে, কিন্তু মণ্ডুক যেমন খেচর ও জলচর, ঠিক সে রকম উভচর ইহারা কেহই নয়। ব্যাঙের জন্ম জলে; শৈশবে ও বাল্যে ইহা খাঁটি জলচর, যৌবনে তবে সে খেচর হইবার অধিকার পায়। মশক প্রভৃতি অনেক কীট পতঙ্গ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী জীবনযাত্রা আরম্ভ করে জলে, কিন্তু শেষে পূর্ণা-বয়ব হইয়া স্থলে ও বিমানে বিহার করে। মেরুদণ্ডযুক্ত জীবদের মধ্যে কেবল মণ্ডূক জাতির জীবনের ইতিহাসটা ঐ প্রকারের। তাই জীব-বিজ্ঞানে শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে মৎস্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম, স্তন্যপায়ী ব্যতীত অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচর বলিয়া একটি জীবশ্রেণীর বিভাগ আছে। কোনও কোনও জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মৎস্য ও আম্ফিবিয়াকে ইক্‌থিওড্‌সিডা নামক বড় শ্রেণীর অন্তর্ভূত করেন। কিন্তু অ্যাম্ফিবিয়া যে মৎস্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম বা স্তন্যপায়ী নয়, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

ভেক সর্ব্বদেশে পাওয়া যায় এবং ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীও বড় কম নয়। জীবজন্তুদের সাধারণ গুণ ও দেহের গঠন দেখিয়া বিজ্ঞান তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ করে। সেই বিভাগ মত ভেক নয় পরিবারভুক্ত। সেই নয়টি পরিবারে আবার ৯২ শ্রেণী আছে এবং সেই ৯২ শ্রেণী ৪০০ জাতিতে বিভক্ত। আমি ইংরাজি শব্দ speciesকে জাতি বলিতেছি, কারণ সাধারণতঃ এক শ্রেণী বা জিনাসের দুই জাতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দোঁ-আঁসলা শাবক সন্তানোৎপাদন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়। অশ্ব ও গর্দ্দভের পুত্র অশ্বতর শাবক উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু আরবী ঘোড়া ও ফকীরের টাট্টুর মিলনে যে ঘোড়া জন্মে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে। আরবী ঘোড়া ও ফকীরের টাট্টু এক জাতীয় জীবের দুই প্রকার বা variety. সেই রকম ৪০০ জাতীয় ভেকের যে অসংখ্য প্রকার আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা ত আসল ভেকের (Ranidæ) জাতির সংখ্যা। ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাড়ে নয় শত জাতি আছে। আমরা মোটামুটি আমাদের দেশে সোনাব্যাঙ, কোলাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ ও গেছোব্যাঙ দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের চোখে এই সকল ভেকের মধ্যে জাতির ও প্রকারের পার্থক্য যথেষ্ট আছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশের মণ্ডূক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বাদে ৪৩ শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রত্যেক শ্রেণী আবার নানা জাতিতে বিভক্ত—আবার এক এক জাতীয় ভেকের মধ্যে নানা প্রকারের ভেক আছে। ভেক-জগত যে কত বিস্তৃত, ইহা হইতে বুঝা যায়।

দর্দ্দুর অণ্ডজ। বলা বাহুল্য, উচ্চশ্রেণীর সকল জীবই অণ্ডজ। মানুষ, হাতী, কুকুর, বাঘ, খরগোস, মহিষ, টিয়াপাখি, কচ্ছপ, গোখরো সাপ, মশা, পিপীলিকা, ভেটকী মাছ এবং কতক কতক প্রবাল জীব সবাই অণ্ডজ। তবে মানুষের ডিম মাতৃজঠরে বাড়িতে থাকে, মানব-শিশু পূর্ণাবয়ব হইলে তবে সে ভূমিষ্ঠ হয়; হাতী, ঘোড়া, কুকুর, শৃগাল, মেষ, মহিষ, সবারই জন্ম-বিধি ঐ প্রকার। কিন্তু টিয়াপাখি বা পায়রার ডিম পূর্ব্বেই বাহির হয়। পক্ষী ডানা ঢাকা দিয়া বুকের তলায় সযত্নে তা দিয়া তবে শাবককে পূর্ণাবয়ব করে। তখন ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হয়। সাপ, কচ্ছপ, কুমীর, মশা প্রভৃতির ডিমের ব্যবস্থা অনেকটা ঐ প্রকার। কিন্তু এই সকল জীবের ডিম্বের একটা নিয়ম আছে। স্ত্রীলোকের দেহের মধ্যে "ডিম্বকোষ" নামক একটি অবয়ব আছে। যৌবনে সেই ডিম্ব-কোষের ডিম্ব তাহাদের দেহের জরায়ু প্রভৃতি অন্য অবয়বে আসিয়া পড়ে।

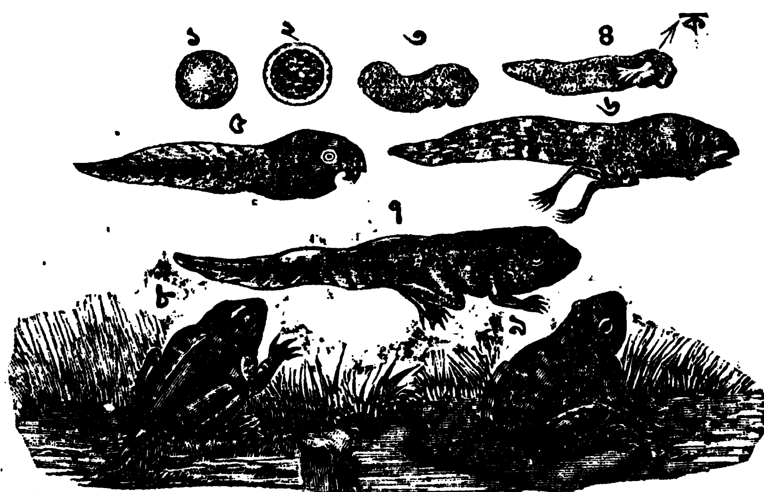
পুরুষ-জীবের শরীরে শুক্র থাকে। স্ত্রীলোকের ডিম এক প্রকার জীব-কোষ মাত্র—সর্ব্বত্রই অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয়। সেই কোষের মধ্যে একটি খুব সূক্ষ্ম কৃষ্ণকায় দানা থাকে—তাহাকে বলে nucleus, তাহার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে—সেই পদার্থেই জীবে পরিণত হইবার শক্তি নিহিত। পুরুষ জীবের শুক্রেতে সামান্য কীটাণুবৎ পদার্থে জীবনীশক্তি আছে। যখন এই কীটাণুবৎ পদার্থ স্ত্রী-দেহের সেই ডিম্বের সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর পদার্থের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে, তখন নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। জীবের ডিম্ব এইরূপে Fertilised বা উর্ব্বর হয়। প্রায় সকল উচ্চ জীবের সেই ডিম্ব ও শুক্রের মিলন স্ত্রীলোকের দেহের মধ্যে হইয়া থাকে। এ কার্য্যভার মদনদেবের উপর।

কিন্তু কোনও কোনও জীবের ডিম্ব ও শুক্রের মিলন দেহের বাহিরে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মৎস্য এই শ্রেণীর জীব, ইহারা ডিম পাড়ে, পুরুষ-মৎস্য তাহার ঘ্রাণে কামোন্মত্ত হইয়া যায়। তাহাদের দেহ ইহাতে শুক্রস্খলন হয়। বাহিরে নদীর স্রোতে বা সরোবরের শান্ত জলে দুই পদার্থের সংযোগ হইয়া ডিম্বগুলি উর্ব্বর হয়। সকল মাছের ডিম পাড়িবার এ ব্যবস্থা নয়, হাঙ্গর প্রভৃতির অণ্ড দেহের ভিতর সফল হয়।

আমাদের কটুরব দর্দ্দুরের কিন্তু ডিম্ব উর্ব্বর করিবার পদ্ধতি উক্ত প্রকারের। উর্ব্বর না হইয়াও জীবের শরীর হইতে ডিম্ব বাহির হয়—গৃহে একটি হংসী পুষিলে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমার একটি চীনদেশের হংসী আছে। জাহাজেই তাহার সহচরের মৃত্যু হয়। আমি কলিকাতায় তাহার "জোড়া" পাই নাই বলিয়া তাহাকে একেলা রাখিয়াছি। এই হংসীটি দুই তিন মাস অন্তর সাত আট দিন ধরিয়া একাধিক্রমে প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম পাড়ে। সেগুলা অনুর্ব্বর ডিম্ব—সাধারণ কথায় তাহাদের বলে "বাওয়া ডিম।" সে ডিম্বের মধ্যে হংসের শুক্রকীট নাই বলিয়া সে ডিম্বে শাবক উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আকারে প্রকারে, গন্ধে, স্বাদে "বাওয়া ডিম" ও আসল "উর্ব্বর" ডিমে কোনও প্রভেদ নাই।

হংসী যেমন উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর উভয় প্রকারের ডিম পাড়ে, ভেকী কেবল অনুর্ব্বর অণ্ডই প্রসব করে। এ কথা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা খুব সহজ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি ভেকী ধরিয়া কাচের পাত্রে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে সে অণ্ড প্রসব করে। কিছুদিন পরে যে অণ্ড গাঁজিয়া যায় তাহা আর সফল হয় না। ইহারা পুকুরে এই প্রকারে ডিম পাড়ে। কেবল যে পুকুরের

জলেই পাড়ে তাহা নহে—কখনও পুকুরের ধারে কখনও স্যাঁতসেঁতে জমিতে গাছের পাতায় তাহারা অণ্ড-প্রসব করে। এ সময় প্রায় সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে ভেক থাকে। আকাশে কালো মেঘ উঠিলেই ভেক ডাকিতে আরম্ভ করে—তাহাদের সঙ্গীতে (?) মুগ্ধ হইয়া ভেকী তাহাদের নিকটস্থ হয়। ভেক গ্যাঙোর গ্যাঙোর করিয়া থপ্‌থপ্ করিয়া নাচিয়া ভেকীর হাতের ভিতর দিয়া হাত দিয়া তাহাকে খুব চাপিতে থাকে। অবশ্য ভেকের আলিঙ্গন না পাইলেও ভেকী অণ্ড-প্রসব করে। তবে বোধ হয়, পরস্পরের মিলন-সুখ অণ্ড প্রসবে সহায়তা করে। সেই অণ্ড থাকে এক তাল জেলির মত পদার্থের মধ্যে, ডিম দেখিতে কাল কাল বীজের মত, সংখ্যায় বিস্তর। পাখীর ডিমের ভিতরের শ্বেত পদার্থটার মত এই চটচটে নাল-হড়হড়ে পদার্থ ডিমের রক্ষার জন্য। মাঝের কালো দানা পাখীর ডিমের কুসুমের মত—তাহারই মাঝে আসল জীবনী-শক্তি-যুক্ত ডিমের সাঁর। ভেকী ডিম পাড়িলে ভেক সেই পদার্থের উপর আপনার বীজ ছাড়ে। শুক্রকীটের একটা লক্ষণ এই যে, সেটা সর্ব্বদাই স্পন্দনশীল। স্পন্দিত হইতে হইতেই সেই শুক্রকীট ডিম্বের কালো আবরণ ভেদ করিয়া ডিমের সারাংশের মধ্যে প্রবেশ করে। উভয় সারে মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন ডিম উর্ব্বর হয়।



ডিম্ব "সফল" হইলেই কালো আবরণটার ভিতর জল ঢুকিয়া সেটা ফাঁপিতে থাকে, ফাঁপিয়া বড় হয়। এই প্রবন্ধের প্রথম চিত্রটা সেইরূপ সফল ডিম্বের।

বলিয়াছি, স্পন্দনই শুক্রকীটের লক্ষণ। অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও শুক্রকীট স্পন্দন করিতে থাকে, তাহাতে আবরণের ভিতর ডিম ফাটিয়া দুই খণ্ড হয়, ক্রমে অনেক টুক্‌রা দানা দানা হইয়া সমস্ত ডিমটা টেঁপারি ফলের মত দেখিতে হয়। কি প্রকারে ক্রমশঃ ঐরূপ হয় তাহা আমি অন্য প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কারণ সকল জীবের—অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর জীবের—জীবনরহস্য এ তত্ত্বে নিহিত। যাহা হউক, ডিমের ভিতর নানা প্রকার অদল বদল হইয়া ক্রমে ভেকের ছানা বাহির হয়। ৩য় চিত্র ভেক-শিশুর প্রথম অবস্থার।

কোনও কোনও মেরুহীন জীবের "বাওয়া ডিমের বাচ্ছা" হয়—অর্থাৎ কেবল মাতৃ-অণ্ডে শিশুর উদ্ভব হয়। তাহাদের বিষয় নানাপ্রকার তর্ক আছে। কোনও কোনও বিজ্ঞানবিদের অভিমত যে, সেই সকল জীবের একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গ বিদ্যমান। আবার কোনও কোনও অণ্ড গাছের কলমের মত। সে সকল কথা অন্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। কিন্তু এতদিন সর্ব্ববাদীসম্মত ধারণা ছিল যে, মেরুদণ্ডযুক্ত উচ্চশ্রেণীর জীবের "বাওয়া ডিমে" শাবক হয় না, পুরুষের শুক্র না মিলিলে ডিম্ব আদৌ উর্ব্বর হয় না। ১৯১০ সাল হইতে এখন সে ধারণা উল্টাইয়াছে, এবং ভেক-ডিম্বের পরীক্ষা দ্বারা মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ভেকীর অণ্ড ভেকের শুক্রের দ্বারা উর্ব্বর না হইলেও ভেক-শিশু উৎপন্ন হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষা-ফল বিজ্ঞান-জগতে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে।

এ পরীক্ষা করিয়াছিলেন প্রথমে ১৯১০ সালে মুসো বাটেলোঁ (M. Bataillon) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। এই পরীক্ষা বর্ণনা করিয়া সার রে ল্যাঙ্কেষ্টার "বাওয়া ডিমের বাচ্ছা" ব্যাঙের নাম দিয়াছেন— "পিতৃহীন ভেক।" এইরূপ সন্তানোৎপাদনের ইংরাজী নাম—Parthenogenesis বা "কুমারীর সন্তান-প্রসব"।

বাটেলোঁ সাহেব বেশ পরিষ্কার জলে ভেকীকে ডিম পাড়িবার অবসর দিয়াছিলেন। সে জলে মোটে ভেকের শুক্র ছিল না। তিনি বহুদিন ধরিয়া প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিরূপে ভেকের শুক্রকীট ভেকীর অণ্ডের কালো চামড়া ভেদ করিয়া ডিমের সারের মধ্যে প্রবেশ করে। তিনি খুব দক্ষতার সহিত সরু স্থচ দিয়া সেইরূপ ভাবে ডিমে ছিদ্র করিয়া দিলেন। ছিদ্র হইবা মাত্রই ডিম্বের ভিতরে স্পন্দন আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ ডিম ফুটিয়া ব্যাঙাচি বাহির হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষা বর্ণনা করা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। যাহা হউক, পরীক্ষা যে নির্ভুল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ অন্যান্য পণ্ডিতেরাও এ পরীক্ষা করিয়াছেন। এবং ল্যাঙ্কেষ্টার সাহেব স্বয়ং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথমে জড়পিণ্ডের মত শিশু বাহির হইয়া তাহা ব্যাঙাচিতে পরিণত হয়। তখন ভেক-শিশু একেবারে মৎস্যের মত জলচর। মৎস্যের সঙ্গে ইহাদের মোটামুটি পার্থক্য এই যে,ইহাদের গাত্রে শুল্ক থাকে না এবং মাছের মত ইহাদের পাখা থাকে না। 'অবশ্য অনেক মৎস্যের গাত্র মসৃণ থাকে। সুতরাং এক পাখনার অভাব ব্যতীত মৎস্যে ও ব্যাঙাচিতে কোনও বাহ্য প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থ চিত্রে আমি একস্থল ক চিহ্নিত করিয়াছি। ছোট ব্যাঙাচির মাথার দুই পার্শ্বে ঐ রকম অঙ্গ থাকে। মাছের "কান্‌কো"র ঢাকনি তুলিলে লাল কাঁটা কাঁটা যে কান্‌কো যন্ত্র থাকে, তাহার দ্বারা মাছেরা জল হইতে অম্লজান টানিয়া লইয়া রক্ত পরিষ্কার করে। আমাদের ফুস্‌ফুস যে কার্য্য করে, মাছেদের ঐ যন্ত্রদ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হয়। জলের সঙ্গে অম্লজান মিশ্রিত থাকে, শিশু ব্যাঙাচি ঐ ক-চিহ্নিত যন্ত্র (gills) দ্বারা জল হইতে অম্লজান টানিয়া লয়। ইহাদের মুখের নীচে দুইটি গোল "থুবনী" থাকে। তাহার সাহায্যে তাহারা কঠিন পদার্থে সংবদ্ধ থাকিতে পারে।

ব্যাঙাচির বাহিরের কান্‌কো বেশী দিন থাকে না। প্রথমতঃ সে বাহিরের কান্‌কোর দ্বারা শ্বাস লয় বটে কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের কানকোর ঢাকনী গজায় ও ভিতরে মাছের মত কানকো তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে বাহিরের কানকো শুকাইয়া যায়; তখন ঠিক মাছের মত ভেক-শিশু ভিতরের কানকোর দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে, অর্থাৎ জলে মিশান অম্লজান টানিয়া লয়। আমি কাচের পাত্রে রাখিয়া দেখিয়াছি, দশ বারো দিনে বাহিরের কান্‌কো শুকাইয়া ব্যাঙাচির ভিতরের কান্‌কো কার্য্যক্ষম হইয়াছে। ৫ নং চিত্র সে অবস্থার ব্যাঙাচির। এ সময় ইহাদের মস্তকের ও দেহের বর্ণ খুব কালো, শরীরটা স্বচ্ছ, তাহার ভিতর পাকানো নাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙাচি অবস্থায় ভেক উদ্ভিদ্-ভোজী। ব্যাঙাচির জীবনী-শক্তি খুব প্রবল। কারণ লাল মাছের সহিত স্বচ্ছ জলে ইহারা যত স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, মাটি-গোলা ঘোলা জলেও ইহারা প্রায় সেইরূপ স্বচ্ছন্দে বাস করে। আমি উভয়বিধ

জলেই ব্যাঙাচি রাখিয়া দেখিয়াছি, প্রচুর পরিমাণে শৈবাল ঝাঁঝি, পাটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও ব্যাঘাত হয় না। প্রায় এক মাস পরে তবে ব্যাঙাচির প্রথম পাদোদ্গম হয়। ৬ নং চিত্র সেইরূপ ব্যাঙাচির। প্রথমে মনে হয়, ইহারাই সম্মুখের পদ—কিন্তু তাহা নহে। এই সময় তাহাদের ভিতরের ফুস্‌ফুসও প্রায় নির্ম্মিত হইয়া উঠে এবং তাহাদের শরীরের রক্ত কান্‌কো ছাড়িয়া ফুস্‌ফুসে যায় অম্লজান গ্রহণ করিতে। ভেকের মুখও ক্রমশঃ বড় চওড়া হইতে আরম্ভ করে। অবশ্য অমন সুন্দর মুখ কিছু একদিনের সৃষ্টি নয়, তাই ক্রমশঃ দেহের পরিণতির সহিত মুখেরও পরিণতি হয়। প্রথম পা দুইটি পশ্চাতের। প্রায় মাসাবধি পশ্চাদের দুই পদের সাহায্যে খেলিয়া বেড়াইবার পর তবে সম্মুখের পা গজাইয়া উঠে। এই অবস্থায় ব্যাঙাচির বেশ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমশঃ সম্মুখের অঙ্গ লম্বা হইতে থাকে। চতুষ্পদ ব্যাঙাচির (৭ম চিত্র) লাঙ্গুল ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া লাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদ ব্যাঙাচিতে পরিণত হয় (৮ম চিত্র) এবং ক্রমশঃ লাঙ্গুল খসিয়া ব্যাঙাচি একদিন লাফ্ মারিয়া একেবারে পূর্ণাবয়ব ভেকে পরিণত হয়; খেচর জীব হইয়া জলের ধারে কচুবনে বসিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া খায়।

ভেকের জন্মবিধিও যেমন অপরূপ, তাহাদের ভোজনবিধিও তেমনি অপূর্ব্ব। যতদিন ব্যাঙাচি থাকে ততদিন সে উদ্ভিদভোজী, কিন্তু ভেক হইয়াই সে একেবারে পোকা মাকড় ধরিয়া জঠর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। দেহের যেমন পরিবর্ত্তন হয়, ইহাদের রুচিরও তেমনি পরিবর্ত্তন ঘটে।

ব্যাঙের রূপ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ বড় করিতে চাহি না। ব্যাঙের বাহ্য দেহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের গলা বা ঘাড় নাই। হাত অপেক্ষা পা অনেক বড় বলিয়া ভেকের চলন অমন কুৎসিত। হাতের মাত্র চারিটি আঙ্গুল—পায়ের আঙ্গুলগুলা যেমন চামড়া-জোড়া, হাতের আঙ্গুলগুলা তেমন নয়। ইহাদের হাতের বুড়া আঙ্গুলের চিহ্নমাত্র চামড়ার ভিতর থাকে—বাহিরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রকট নহে। মণ্ডূক-দেহ খুব নরম—ইহাদের গাত্রে কোন প্রকার শুল্ক বা লোম নাই। ভেকের চক্ষু বেশ বড়—ড্যাবডেবে। ঠিক চক্ষের নিম্নেই দুই পার্শ্বে যে দুইটা কালো দাগ আছে, সেই দুইটা উহাদের কাণ। আমাদের কাণের ভিতর যে চামড়ার পটহ আছে, তাহাতে ব্যোমের হিল্লোল লাগিলে তবে আমরা শুনিতে পাই। আমাদের বাহিরের কাণ বা হাতীর কুলার মত কাণ ব্যোমের স্পন্দন ধরিবার যন্ত্র মাত্র, আমাদের আসল যন্ত্র সেই পটহ হইতে আরম্ভ। ভেক-তাত্ত্বিক

পণ্ডিতেরা সেই কালো অংশ দুইটা ভেকের পটহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভেকের যেমন ঘাড় নাই, তেমনি তাহার কাণ নাই এবং দুইটা ছিদ্র ভিন্ন নাসিকাও নাই। তাই তাহার মুখ অত কুশ্রী! ব্যাঙ্ বসিয়া থাকিলে মনে হয় যে, তাহার কোমর ভাঙ্গা। কিন্তু বাস্তবিক সে কোমর-ভাঙ্গা নয়। তাহার মেরুদণ্ড ও কোমরের হাড়ের সংযোগ-স্থল ঐরূপ দেখিতে হইয়াছে।

ভেকের শীকার ধরিবার বিশেষত্ব আছে। ঈশপের গল্পে আছে যে, ভেকের ত্রস্ত ভাব দেখিয়া শশকেরা আত্মহত্যার সঙ্কল্প বিসর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভেক শীকার ধরিবার সময় তুড়ুক তুড়ুক করিয়া লম্ফপ্রদান করে, আর সাপের মত চেরা জিহ্বা বাহির করিয়া পোকা ধরে। ইহাদের জিহ্বাও অপূর্ব্ব। আমাদের জিহ্বা যেমন মুখের পিছনদিকে বদ্ধ সম্মুখদিক অসংলগ্ন, উহাদের তেমনি জিহ্বা নীচের চোয়ালের সামনের দিকে আবদ্ধ, ভিতর দিকটা অসংলগ্ন—অর্থাৎ ঠিক আমাদের জিহ্বার উল্টা। উহারা যখন জিহ্বা বাহির করে, উহাদের জিহ্বার ভিতর দিকটা বাহিরে আসে, আমরা জিহ্বা বাহির করিবার সময় সম্মুখের অংশটি বাড়াইয়া দিই মাত্র। মণ্ডূকের রসনায় আঠা থাকে—উল্টা জিহ্বাটা বাহির করিয়া পোকার গাত্রে লাগাইতে পারিলেই হইল। ইহাদের দাঁত কাঁটার মত, আর কেবল উপরের মাড়িতে আছে।

দর্দ্দুরের ভিতরকার অবয়বাদি প্রায় মানুষের মত, অবশ্য অনেক বিষয়ে ছোট ছোট পার্থক্য আছে। সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। কেবল একটা কথা মোটামুটি বলিয়া রাখি যে, ইহাদের বক্ষাস্থিও আছে, মেরুদণ্ডও আছে—কিন্তু পাঁজরা নাই। তাই তাহাদের পেটের দিকটা অত তুলতুলে নরম। পাঁজরা নাই বলিয়া মণ্ডূক ঠিক অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীবের মত ফুসফুস ফুলাইয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। ইহারা মুখ নাড়িয়া বাতাস গিলিয়া ফুস্‌ফুসে পাঠায়। ব্যাঙের চামড়ার ছিদ্র দিয়াও শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অনেক ষটপদের মত ইহাদের গাত্রের রন্ধ্র দিয়া অঙ্গারজান নির্গত হয়।

ভেক নানা বর্ণের হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় এক প্রকার ভেক আছে, যাহাদের দেহের বর্ণ সেখানকার গাছপালার অনুরূপ। আমাদের দেশের বড় 'সোণা ব্যাঙের দেহ যখন সূর্য্যের আলোকে ঝক্‌মক্ করে, তখন বলিবার উপায় নাই যে, ভেক বড় কুৎসিত জীব।

সর্প ভেকভূক। আর ভেকভূক ফরাসী জাতি। শুনিয়াছি, চীনদেশের রন্ধনশালাতেও ভেকের আদর আছে। আমাদের দেশের অনেক আদিম জাতি সর্প ও মূষিক ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহারা মণ্ডূক খায় কি না বলিতে পারি না। তবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিধান আছে যে, পাগলের পক্ষে সোণা ব্যাঙের ঝোল প্রশস্ত।

অন্তরে।

[শ্রীঅবনীকুমার দে।]

চাহি না তোমারে আমি নিমিষের তরে কভু,
তুমি যে আমারি চির অনাদি অনন্ত প্রভু।
কি সাধ্য আমার বল তুষি তোমা' প্রাণসখা!
চাহি না দেখিতে তোমা' যদি নাহি দাও দেখা।
কি দুঃখ রেখেছ হেথা কিছু না খুঁজিয়া পাই,
থাকে যদি দেহ মোরে আমি যে গো তাই চাই।
শুধু আলো শুধু সুখ সে ত মহা অন্ধকার,
তোমারে ভোলায়ে রাখে মোহপাশে বার বার।
তুমি ত ভুলিতে নার কেমনে ভুলিব আমি,
তোমারি এ পূর্ণ অঙ্গ তোমাতেই পূর্ণ স্বামী।
নিশিদিন চিত্ত মোর সমর্পিয়া তব করে,
তোমারি এ চিত্তখানি রেখেছি তোমারি তরে।
কা'রো নাহি অধিকার এ চিত্ত মাঝারে মোর,
অন্তরে অন্তরে গাঁথি রচিয়াছ মায়া ডোর।
সকলের মূলে তুমি হে অনন্ত মূলাধার!
জগত-জীবন-স্বামী তুমি নাথ সবাকার।
পরম উপাস্য মম হে দেব মহিমাময়!
তোমারি পবিত্র প্রেমে তোমাতে হইব লয়।
যতই তোমার তরে অন্তরে ডাকিতে পারি,
তত সে নিকটে তব—তত আমি মনে করি।

আনো ঘোর অন্ধকার প্রলয়ের রুদ্রতাল,
উল্লাসে নাচিব আমি হে অনন্ত মহাকাল।
আনো দুঃখ আনো ক্লেশ আনো দৈন্য যন্ত্রণায়,
সকলি করিব নাথ' নিবেদন তব পায়।
তোমারই দান তব—তোমাকেই নিতে হবে,
এ অনন্ত গুরুভার তোমাতেই লয় পাবে।
তুমি যে গো নির্ব্বিকার নিখিল-জগতস্বামী,
তুমিই অন্তরে মোর হে মম অন্তরযামী!
কি সাধ্য তোমার প্রভো! ঠেলিবে চরণে মোরে,
বাঁধিব চরণ তব—তব রচা কর্ম্মডোরে।
আমি দাসী তুমি নাথ প্রকৃতি-পুরুষ মোরা,
আমি ছাড়া তুমি নও আত্মায় আত্মায় যোড়া।

কোবে।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম, এল্, এম্, এস্।]

প্রত্যূষে মোজী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের জাহাজখানি ধীরে ধীরে অন্তর্দ্দেশীয় সাগরের মধ্য দিয়া কোবে অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। "হণ্ডো" ও "কিউসিউ" পরস্পর বহুদূরবর্ত্তী হইলেও, সাগর মধ্য পর্ব্বতাকীর্ণ হওয়ায় আমরা একবারও গিরিবহুল স্থলভূমির দৃশ্য হারাই নাই। সর্ব্বক্ষণই কোনও না কোনও পর্ব্বতের পাদমূল দিয়া কিম্বা কোনও পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া সমস্ত পথটুকু অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। চারিদিকে কি মনোরম দৃশ্য!

সেদিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। সন্ধ্যার ঘনান্ধকার সে ছবিখানিকে ঘেরিতে পারিল না। চন্দ্রকর-বিধৌত সে দৃশ্য আরও মনোরম দেখাইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় একটার সময় জাহাজখানি কোবেতে পৌছিল। একজন জাপানী ডাক্তার সদলবলে ষ্টীমারে করিয়া যাত্রীদের পরীক্ষা করিতে আসিলেন। জাপানী রাজকর্ম্মচারী এই প্রথম দেখিলাম। সকলেরই পরিচ্ছদ সামরিক পরিচ্ছদের ন্যায়, বুকে দুই সারি করিয়া পিত্তলের বোতাম, হাতে ও গলায় জরি। তবে পদের তারতম্য অনুসারে চাকচিক্যের স্বাতন্ত্র্য ছিল। সকলেরই মুখে একটু উদ্ধত ভাব, যেন আপনাদের স্বাধীনতা গর্ব্বে গর্ব্বিত। জাহাজের কাপ্তেন প্রভৃতি সাহেব কর্ম্মচারী সকলকেই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইতে হইল।

কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা বেশ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিদেশী জাহাজ বলিয়া যেন পরীক্ষা কিঞ্চিৎ কঠোর। আবশ্যক মত ইংরাজীতে দুই চারিটা প্রশ্ন করিলেন। সে ইংরাজী খুব কাঁচা। পরীক্ষা শেষ হইলে "Good night" বলিয়া আপনাদের ষ্টীমারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কোবে বন্দরটী জাপানীদের জাহাজ ও নৌবাহিনী গঠনের একটী প্রধান কেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ অর্ণবপোত অর্দ্ধ গঠিত অবস্থায় দেখিলাম। জাপানীরা নৌ-গঠন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

কূলেতে নামিয়া দেখি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নানাবর্ণে অলঙ্কৃত বহুতর রিক্সা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিবামাত্র রিক্সাওয়ালারা ঘেরিয়া ফেলিল। সকলেই ভাঙ্গা ইংরাজীতে দু' একটা কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। এখানকার রিক্সাওয়ালাদের পরিচ্ছদ বেশ একটু নূতন ধরণের। পায়ে খুব মোটা নীল কাপড়ের বুট জুতা হাঁটু অবধি আসিয়াছে। জুতার তলা এক ইঞ্চি পুরু চামড়ায় নির্ম্মিত। ইহা অনেকটা রাইডিং বুটের মত, কিন্তু চামড়ায় প্রস্তুত নহে। হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঐরূপ নীল মোটা কাপড়ের ইজের। গায়ে ঐ কাপড়ের চায়না কোট। সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিরোদেশ ছোট টোকার মত টুপীতে আবৃত। সমস্ত অঙ্গের মধ্যে কেবল কব্জী হইতে হাত দু'টী ও মুখখানি অনাবৃত। ইহারা চীনা রিক্সাওয়ালাদের মত অত বলিষ্ঠ নহে, এবং অত দ্রুত টানিতেও পারে না, কিন্তু পোষাক, কায়দায় সকল রিক্সাওয়ালাদের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে। রিক্সা ব্যতীত অন্য কোনও যান দেখিলাম না। প্রায় সকল যাত্রীই এক একখানি রিক্সা লইয়া আপনাপন গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। আমিও একখানি রিক্সা লইয়া জাহাজ পরিত্যাগ করিলাম।

বন্দ—কোবে সহরটীর পশ্চাতে পাহাড় এবং সম্মুখে সমুদ্র। সহরের এক ধারে সমুদ্র উপকূলে "বন্দ" অবস্থিত। ইহা একটী প্রায় ১০০ শত ফুট প্রশস্ত পথ। সমুদ্রের ধারটী প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। পথের অপর পার্শ্বে ঠিক সমুদ্রের দিকে সম্মুখ করিয়া সুরম্য ও সুবৃহৎ সৌধাবলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথটী সান্ধ্যবায়ু সেবনের পক্ষে অতি মনোরম স্থান। এই স্থানে বসিয়া নানা দেশীয় অর্ণবপোতগুলির গতিবিধি বেশ লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে বসিবার জন্য লৌহাসন রক্ষিত হইয়াছে। সৌধগুলির প্রায় অধিকাংশই প্রস্তর গঠিত

ও সুউচ্চ, ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য জাতীয় কন্সল বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের থাকিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকগুলির উপর পতাকা-দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। দু'একটীতে পাশ্চাত্য হোটেল আছে। এই সকল সুবৃহৎ অট্টালিকার অলিন্দে বসিয়া সমুদ্রের সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ করা যায়। এখান হইতে নানা স্থান পরিদর্শনের খুব সুবিধা। কারণ, এখানে রিক্সাওয়ালাদের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা আছে। এখানকার রিক্সাগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দ্বিচক্র যানের মত চক্র-বিশিষ্ট এবং বহু যানের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকা হাতোবা—বন্দের অনতিদূরে "আমেরিকা হাতোবা" বা জাহাজে উঠিবার প্রকাণ্ড জেটী। সমস্ত জেটীটা প্রস্তর নির্ম্মিত এবং অতিশয় প্রশস্ত হইয়া রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। যেন মনে হয়, প্রশস্ত রাস্তা দিয়া একেবারে জাহাজে উঠিলাম। কোবে বন্দরটী জেটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। বড় বড় জাহাজগুলি বন্দরেই থাকে। জেটী হইতে একখানি ছোট ষ্টীমার আরোহী লইয়া বন্দরে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত ভ্রমণকারীরা এখান হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া থাকেন। জেটীর এক পার্শ্বে একটী বৃহৎ কাষ্ঠের একতলা গৃহ। তাহার শিরোদেশে একখানি বৃহৎ কাষ্ঠফলকে বড় বড় করিয়া লেখা "Baggage keeper". এইখানে যাত্রীরা আপনাদের মালপত্র রাখিয়া জাহাজে নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইতে পারেন। এখান হইতে তাঁহাদের মাল যথাসময়ে জাহাজে প্রেরিত হইয়া থাকে। এজন্য যাত্রীকে আর মাথা ঘামাইতে হয় না। কারণ জাহাজে মাল লইয়া আরোহণ করিতে যাওয়া বড় সহজ কার্য্য নহে।

রাত্রে এ স্থানটী বড়ই মনোরম শোভা ধারণ করে। অনেকগুলি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ পথের ও জেটীর চারি পার্শ্বে স্থাপিত। আশে পাশে "কাফে" বা কাফিখানায় আনন্দের ফোয়ারা চলিতেছে। দলে দলে যুবক যুবতীরা রিক্সা করিয়া নৈশ-বায়ু উপভোগ করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকে।

কোবে—সমুদ্রতীর পরিত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিদেশীদের চক্ষে একটা অভিনব দৃশ্য আসিয়া পড়ে। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কঙ্করময়, বিশেষত্ব কিছুই নাই। মনুষ্য চলাচলের জন্য পথের দুই পার্শ্বে কোনও বাঁধান স্থান নাই। সকলকেই রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিতে হয়। তবে এখানকার বিশেষত্ব এই যে, এত বড় সহরে পথে অশ্বযান কচিৎ দৃষ্ট হয়। সকলেই রিক্সা ব্যবহার করে। আরও বিশেষত্ব এই যে, বড় বড় পথ

গুলিতে দুই পার্শ্বে টেলিগ্রাফের প্রকাণ্ড স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জাপানের অন্যান্য বৃহৎ সহরের মত, এখানে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী বা বৈদ্যুতিক আলোক নাই। রাস্তার ধারে প্রায় কেরোসিন তেলের আলোই জ্বলিয়া থাকে। আজকালকার কথা বলিতে পারি না, এত দিনে হয়ত বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত হইয়া থাকিতে পারে।

বড় রাস্তাগুলির দুই ধারেই অধিকাংশই কাঠের বাড়ী। জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঠের বাড়ীর প্রচলন। ভূমিকম্পের ভয়ে সাধারণ লোকে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী নির্ম্মাণ করিতে চাহে না। বাটীগুলি প্রায় দ্বিতল। নীচে দোকান, উপরে কেহ কেহ বসবাস করিয়া থাকেন। দোকানের নামের জন্য এখানে কাষ্ঠফলক প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে বেশ একটা অভিনব উপায় দেখিলাম। দ্বিতলের কোনও একটা জানালার মধ্য দিয়া একটা বাঁশ বা কাষ্ঠদণ্ড মাছধরা ছিপের মত বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার অগ্রভাগ হইতে দড়ি দিয়া একটা প্রকাণ্ড চিত্র-বিচিত্র পতাকা লম্বিত। তাহার আশে পাশে ও মধ্যে দোকানের বিবরণী লিখিত আছে। অনেকস্থলে এরূপ নিশানের পরিবর্ত্তে 'চাইনীজ' লণ্ঠনের মত লম্বা কাগজের লণ্ঠনের গায়ে দোকানের নাম লিখিত। রাত্রে তাহার মধ্যে বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হয়, এজন্য খরিদ্দারের দোকান অনুসন্ধান করিয়া লইবার কোনও অসুবিধা হয় না। কোনও কোনও দোকানের নাম ইংরাজীতে লেখা। এগুলির জন্য প্রায়ই কাষ্ঠফলক ব্যবহৃত হইয়াছে।

দোকানগুলি এই সকল নিশানে সজ্জিত থাকায়, রাস্তায় প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন কোনও উৎসব হইতেছে। নানা বর্ণে চিত্রিত জাপানী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া জাপানী পুরুষ ও রমণীরা সর্ব্বদাই কেনা-বেচায় ব্যস্ত। তাহাদের মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব। পুরুষেরা অনেকে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু রমণীরা আপনাদের জাতীয় রমণীয় বেশভূষা ত্যাগ করে নাই। তাহাদের মস্তকে সুচিকণ উন্নত কবরী, পদে মখমলের বেড় দিয়া কাষ্ঠপাদুকা বাঁধা, অঙ্গে বহু বর্ণ বিচিত্রিত "কিমনো" *। আমার মনে হয়, জাপানী রমণীরা পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলে অতিশয় কদর্য্য দেখিতে হইত। ইহাদের দেশীয় পরিধেয় এত সুন্দর যে, অনেক পাশ্চাত্য রমণীকেও এই বেশে সজ্জিত দেখিলাম।

আগুন লাগিবার খুব ভয় থাকায় পথের মাঝে মাঝে টেলিফোন করিবার স্তম্ভ সর্ব্বত্র বিরাজমান। এখানে আর একটী প্রথা প্রচলিত দেখিলাম।

* জাপানীদের ঢিলা দেহাবরণ।

মাল বহিবার জন্য গো-শকটের পরিবর্ত্তে কলিকাতার ময়লা-ফেলা গাড়ীর মত ছোট গাড়ীতে করিয়া একজন লোকে মাল লইয়া যায়। ইহা বেশ সুবিধাজনক মনে হইল। আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থা হইলে খুব ভাল হয়। এখানে রাস্তায় দ্বিচক্রযানের প্রচলন খুব বেশী।

কোবের অধিকাংশ রাস্তাই অপ্রশস্ত। বড় বড় রাস্তাগুলির মধ্যে "মতোমাচি দোরি" "সান্নো মিয়াদোরি" ও "সাকেয়ি মাচি" উল্লেখযোগ্য। "মতোমাচি" অনেকটা আমাদের বড়বাজারের মত সর্ব্বদাই লোকাকীর্ণ ও নানাপ্রকার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। "সান্নোমিয়া দোরি"তেও অনেক দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। "সাকেয়ি মাচি" বেশ সুপ্রশস্ত পথ। ইহার দুই পার্শ্বে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়েরা এইখানেই বিপণি-স্থাপন করিয়াছে। এই পথ দিয়া একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে অনেকগুলি মুদ্রা পরিবর্ত্তনের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীরা এখানে আপনাদের মুদ্রা দিয়া জাপানী মুদ্রা ক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল দোকানের মাথার উপর বৃহৎ অক্ষরে কাষ্ঠফলকে "Exchange" এই কথাটী লেখা থাকে। বড় বড় "কাফে" গুলিও এই পথে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোবের সাধারণ রাস্তাগুলি আলোকিত করিবার জন্য আলোকস্তম্ভ ব্যবহৃত হয় না। ছোট রাস্তাগুলিতে মাঝে মাঝে বাটীর প্রবেশ-পথের মাথার উপর একটী করিয়া লোহার ব্র্যাকেট লাগান আছে। কাঠের প্রাচীরে ইহা অতি সহজেই সংলগ্ন করা যায়। তাহার উপর কাচের লণ্ঠনের মধ্যে চিমনি দিয়া আলো জ্বালান হয়। বড় রাস্তাগুলিতেও ঐরূপ বন্দোবস্ত, কিন্তু দোকানের আলোকে সে রাস্তাগুলি সন্ধ্যার পর বড়ই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ছোট রাস্তাগুলিতে সরকার হইতে জল দিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। অধিবাসীদের আপন আপন গৃহ-সম্মুখ জলসিক্ত করিতে হয়। এইরূপে অতি সহজেই সমস্ত পথটীতে জলসেচন হইয়া থাকে। বিকাল বেলায় যখন পুরুষেরা আপন আপন কার্য্যে বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট বালতি করিয়া রাস্তায় জল ছিটাইয়া দেয়। তাহারা তখন বেশভূষায় সজ্জিত থাকে না, গৃহ-কার্য্য করিবার জন্য অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। অনেকের নগ্ন বক্ষ। জাপানীদের মধ্যে যে এখনও আদিম সভ্যতা বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

জননী ভারতবর্ষ।*

(৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুকরণে)

[শ্রীসত্যসাধন মুখোপাধ্যায়।]

১

পুণ্য ভারত ধন্য ভারত ধন্য গো মাতা ভারতবর্ষ।
মহিমা মা তোর অসীম অপার জলধির মত অতলস্পর্শ॥
গরজি যেথায় উঠিল অয়ি মা ভীষণ আরাবে পাঞ্চজন্য।
রক্ষিতে সব ধার্ম্মিক বরে করি ধরিত্রী পিশাচ শূন্য॥
কোরাস—পূত হইলা পৃথিবী আজি গো তোমার রাজীব চরণ চুমি।
ধ্বনিত হইল বিশাল গগন দশদিশি পূরি ভারতভূমি॥

২

আঁধারে আছিল মাগো যে বিশ্ব ফুটিল তাহাতে আলোক পুণ্য।
ছুটিল তাহাতে প্রবাহ অতুল জাগাল পৃথ্বী সে দেশ ধন্য॥
যে দেশ প্রথমে বিতরে ধর্ম্ম যাহাতে দীপ্ত অর্দ্ধ বিশ্ব।
ভক্তি আনত শীর্ষ যাদের লুটায় তাহারা তোমারি শিষ্য॥
কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি।

৩

গগন ভেদিয়া উঠিল কাহার ওঁকার ধ্বনি জীমূত মন্দ্রে।
শিহরি পুলকে উঠিল বিশ্ব ধ্বনিত হইল রন্ধ্রে রন্ধ্রে॥
সেই বীর বাণী লইল পৃথিবী মহাসমাদরে বক্ষে ধরিয়া।
সেই মহাতানে মুগ্ধ জলধি আছাড়ি পড়িছে চরণ লেহিয়া॥
কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি।

৪

মূরজ মন্দ্রে উঠিল যেথায় নিমাই কণ্ঠে অমিয় তান।
সে মহাছন্দে ডুবিল বিশ্ব কাঁদিল যতেক পাপীর প্রাণ॥
কোথায় এমন প্রেমের ঠাকুর বিতরে এ হেন ত্যাগ-ধর্ম্ম।
দেব বাণী সম কার হেন বাণী আলোকিয়া হৃদি পশিছে মর্ম্ম॥
কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি।

---

* কবি বালক। তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য এ কবিতাটি প্রকাশ করিলাম। অঃ সঃ

৫

জয়দেব যেথা গাহিল গীতি কাকলীতে তার ভরিল বঙ্গ।
লহরীতে তার বহিল অজয় নাচিল ঊর্ম্মি শোভি বরাঙ্গ ॥
এযে সেই দেশ যেথায় প্রতাপ সমরে মাতিল মোগল সঙ্গে।
এযে সেই দেশ যেথায় বিজয় জিনিল লঙ্কা ফিরিল রঙ্গে ॥

কোরাস—পূত হইলা ইত্যাদি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রাতকাণা—কৌতুক-নাট্য, মূল্য ।৶০ ছয় আনা। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। যে কয়জন নবীন নাট্যকারের বঙ্গ-রঙ্গালয়ে নাম হইতেছে,এই গ্রন্থপ্রণেতা নির্ম্মলশিব বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার দুই একখানি নাটক ইতিপূর্ব্বে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে, এবং সম্প্রতি সমালোচ্য গ্রন্থখানিও 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। ইহা অনাবিল হাস্যরসে পূর্ণ। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এই গ্রন্থের কলেবর ক্ষুদ্র। পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও কম। সুতরাং সখের থিয়েটারে ইহার বিশেষ আদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানি পাঠে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

ঠাকুরদাদার গল্পের ঝুলি—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। শ্রীকমলপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য /১০। প্রাপ্তিস্থান, কল্যাণপুর, হাবড়া।

'নিবেদনে' জানিলাম, এই পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত এবং ইহা ধারা-বাহিক প্রকাশিত হইয়া ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সম্পাদক হয়ত সাধু ইচ্ছায় এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 'ব্যবসাদারী' দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিবার উপায় নাই। গরীব বালকের পক্ষে 'একেবারে পাঁচ সিকা, দেড় টাকা দিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা বড়ই কষ্টকর' বিবেচনায় সম্পাদকপ্রবর প্রতি খণ্ডের মূল্য /১০ ধার্য্য করিলেন বটে, কিন্তু ৩০ খণ্ডে পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া 'গরীব বালকে'র নিকট উক্ত পাঁচ সিকা বা দেড় টাকার পরিবর্ত্তে ৩।৶০ গ্রহণ করিবেন কেন, তাহার উত্তর কি? বিকট ব্যবসাদারী নহে কি?

এই গল্পের ঝুলি আবার 'সচিত্র'। 'নিশি বিশের জ্বালায় ছুটে এলো' ছবিখানি কাষ্ঠফলকের প্রতিকৃতি। ইহাতে ছেলে ভুলিবে কি?

এই দুই সংখ্যায়—কয়েকটী গল্প আছে, তন্মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'দেবরথ' উল্লেখযোগ্য। গল্পের ভাষা বালকদের উপযোগী এবং উপকথাগুলি শিক্ষাপ্রদ। উপকথার ভাগ কমাইয়া পৌরাণিক গল্পের সংখ্যা বাড়াইলে পুস্তকখানির উপকারিতা বাড়িবে। আশা করি, পরের সংখ্যা হইতে ইহার বিশেষ সংস্কারসাধন হইবে।

অর্চনা, ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

পঞ্চভূত।

১। পৃথিবী।

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

'ভাষাপরিচ্ছেদ'কার লিখিয়াছেন,—"ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতানি"—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই কয়টী দ্রব্যের নাম পঞ্চভূত। তন্মধ্যে ক্ষিতি বা পৃথিবীর ১৪টী গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার। এই ১৪টী গুণের মধ্যে গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে,—অন্য কোনও দ্রব্যে থাকে না।' তাই ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ক্ষিতাবেব গন্ধঃ"। 'সুগন্ধি জল' 'সুরভি সমীরণ' ইত্যাদি রূপে জল ও বায়ুতে যে গন্ধের অনুভব হয়, তাহা তদন্তর্গত পার্থিব ভাগের গন্ধ। এই জন্যই পার্থিব অংশের সহিত অমিশ্রিত জল বা বায়ুতে কোনই গন্ধোপলব্ধি হয় না। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীধরাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, শঙ্কর মিশ্র ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই কথাই স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)।

সংস্কার ত্রিবিধ,—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। তন্মধ্যে বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কারই পৃথিবীতে থাকে। বাণাদি পার্থিব পদার্থে বেগ প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয়। একটী বৃক্ষের শাখা নীচের দিকে টানিয়া আবার ছাড়িয়া দিলে তাহা যথাস্থানে গিয়া অবস্থিত হইয়া থাকে। শাখার এই পূর্ব্বস্থানে নিয়মতঃ

(১) "সুগন্ধি সলিলং সুগন্ধিঃ সমীরণ ইতি প্রত্যয়াদ্ দ্রব্যান্তরেঽপি গন্ধোঽস্তীতি চেন্ন, পার্থিবদ্রব্যসমবায়েন তদ্‌গুণোপলব্ধেঃ। কথমেষ নিশ্চয় ইতি চেৎ তদভাবেঽনুপলম্ভাৎ।" —ন্যায়কন্দলী, ২৯ পৃঃ।

"যত্তু সুগন্ধি সলিলং সুরভিঃ সমীরণ ইতি তৎপার্থিবকুসুমাদ্যধিবাসনিবন্ধনম্।"—কিরণাবলী, ৪৬-৪৭ পৃঃ।

"জলাদাবপি গন্ধোঽস্তি, ভবতি হি সুরভি জলং সুরভিঃ সমীরণ ইতি প্রতীতিরিতি চেৎ ন, তত্র অন্যোপাধিকত্বাৎ। ন হি কুসুমাদ্যধিবাসাবসরমপহায় প্রতীতিরিয়মুদেতি।"—কণাদ-রহস্য, ৪-৫ পৃঃ।

"জলাদেঃ কুসুমাদিসম্পর্কাদৌপাধিকমেব গন্ধবত্ত্বং ন তু স্বাভাবিকম্।"—সূক্তি, জগদীশ হস্ত-লিখিত পুঁথির ৫ পৃঃ।

অবস্থান দেখিয়াই শাখাদিতে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কল্পিত হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার অনুমেয়,—তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। গুরুত্ব গুণেরও প্রত্যক্ষ হয় না,—পতন দেখিয়া তত্তৎপদার্থের গুরুত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। বল্লভাচার্য্যের মতে অধঃসংযোগাবচ্ছেদে গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় (২)।

শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, কপিল, হরিত ও চিত্র—এই সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতেই থাকে। পৃথিবীর রসও ষড়্‌বিধ,—তিক্ত, কটু, কষায়, মধুর, অম্ল, লবণ। শিবাদিত্য, স্বকৃত "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে চিত্ররসও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"রসোঽপি মধুরতিক্তকটুকষায়াম্ললবণচিত্রভেদাৎ সপ্তবিধঃ।"—(সপ্তপদার্থী, ২০ পৃঃ)

কিন্তু "তর্কভাষা"র 'ন্যায়প্রদীপ' নামক টীকায় বিশ্বকর্ম্মা চিত্ররস স্বীকারের অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রূপাদি ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ, কাজেই একই আশ্রয়ে নীল পীতাদি রূপদ্বয় থাকা সম্ভবপর নহে; এখন চিত্ররূপ স্বীকার না করিলে আসনাদি অবয়বী নীরূপ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ বলিয়া আসনাদি পার্থিব পদার্থের অতীন্দ্রিয়ত্বের আপত্তি হয়। সুতরাং চিত্ররূপ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু রসনেন্দ্রিয় দ্রব্য গ্রাহক নহে, কাজেই নানা রসবিশিষ্ট অবয়বের দ্বারা যে অবয়বী নির্ম্মিত হইবে, তাহা নীরস হইলেও ক্ষতি নাই (৩)।

সুরভি ও অসুরভি এই দ্বিবিধ গন্ধই পৃথিবীতে বর্ত্তমান। অধিকাংশ তার্কিকেরাই চিত্রগন্ধ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সুরভি কপাল ও অসুরভি কপালিকা দ্বারা যে ঘট নির্ম্মিত হয়, তাহা নির্গন্ধ। তাদৃশ ঘটে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহা অবয়বের গন্ধ। কিন্তু "গন্ধো দ্বিবিধঃ সুরভিরসুরভিশ্চ।" ভাষ্যের এই অংশের ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—"অসুরভিঃ সুরভ্যন্যগন্ধঃ, তেন দুর্গন্ধভিন্নস্য চিত্রস্য সত্ত্বেঽপি ন দ্বৈবিধ্যব্যাঘাতঃ।"

---

(২) "গুরুত্বং পতনানুমেয়ম্। অধঃসংযোগাবচ্ছেদেনাপি প্রত্যক্ষমিতি বল্লভাচার্য্যাঃ।"—কণাদরহস্য, ৮ পৃঃ।

(৩) "ননু ষড়্‌রসা হরীতকীতিব্যবহারাদেবং চিত্ররসোঽপি স্যাদিতি চেৎ। নৈবম্। রূপাদের্ব্যাপ্যবৃত্তিত্বনিয়মেনৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি রূপদ্বয়ং স্পর্শদ্বয়ং বা ন সম্ভবতীতি চিত্ররূপস্য তথাবিধস্পর্শস্য বানঙ্গীকারেঽবয়বিনো নীরূপত্বাদ্যাপত্তাবতীন্দ্রিয়ত্বাদ্যাপত্তিস্তত্র বাধিকা। অত্র তু রসনস্য দ্রব্যাগ্রাহকত্বান্নীরসত্বেঽপি বাধকাভাবাৎ।"—ন্যায়প্রদীপ, ১২৯ পৃঃ।

অর্থাৎ এখানে অসুরভি পদের অর্থ সুরভি ভিন্ন গন্ধ, সুতরাং দুর্গন্ধ ব্যতীত চিত্র-গন্ধ থাকিলেও গন্ধের দ্বৈবিধ্যের ব্যাঘাত হইল না। কাজেই বলিতে হয়, জগদীশ, চিত্ররূপের ন্যায় চিত্রগন্ধও স্বীকার করিতেন। এই গন্ধবত্বই পৃথিবীর লক্ষণ,—যাহার গন্ধ আছে, তাহাই পৃথিবী। এখন আপত্তি হইতে পারে, পাষাণাদি পার্থিব বস্তুতে গন্ধ নাই, সুতরাং পৃথিবীর গন্ধবত্ব—এই লক্ষণ অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত হইয়া পড়িল। সমস্ত লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলেই অব্যাপ্তি দোষ হয়। ইহার সমাধান এই যে, পাষাণেও গন্ধ আছে, তবে সে গন্ধ অনুৎকট বলিয়া উপলব্ধ হয় না। পাষাণ-ভস্ম চূর্ণে যখন গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, তখন পাষাণেও গন্ধ আছে, ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। যে দ্রব্যের ধ্বংসে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এই উভয়ের উপাদান কারণ একই। দৃষ্টান্ত—মহাপট ধ্বংস জন্য খণ্ডপট। ভস্মের উপাদানে গন্ধ ছিল বলিয়াই ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি হয়, এখন পাষাণও সেই গন্ধবদবয়বের দ্বারা আরব্ধ বলিয়া তাহারও যে গন্ধ আছে, ইহাতে অনুমানই প্রমাণ।

পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত—না উষ্ণ, না শীত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—পৃথিবীর চারিটী গুণই পাকজ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগবশতঃ বিজাতীয় রূপরসাদি পৃথিবীতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটে প্রথমাবস্থায় শ্যামরূপ থাকে, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। বিজাতীয় রসাদিও অগ্নিসংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগ্নিসংযোগে বিজাতীয় স্পর্শের স্পষ্ট প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি হয় না বলিয়া পাকজ স্পর্শে অনেকের বিপ্রতিপত্তি আছে। সেইজন্য ভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীধরাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্য উভয়েই স্পর্শের পাকজত্বসিদ্ধির উপায় নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—স্তম্ভাদি পার্থিব পদার্থে স্পর্শের পাকজত্ব, অনুমানরূপ প্রমাণবলে সিদ্ধ হইবে। স্তম্ভাদির স্পর্শ পাকজ, যেহেতু তাহাতে পার্থিব স্পর্শত্ব আছে, দৃষ্টান্ত ঘটাদির স্পর্শ। ঘটাদির স্পর্শ যে পাকজ, তাহাও অনুমানগম্য। অনুমানের আকার এই,—'ঘটাদিস্পর্শঃ পাকজঃ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি তদ্‌গতগুণত্বাৎ, তদ্‌গতরূপবৎ।' ঘটাদিতে একেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত যে যে গুণ আছে, তাহা পাকজ, দৃষ্টান্ত রূপ, রস ও গন্ধ। রূপ কেবল চক্ষুর্দ্বারা, রস কেবল জিহ্বাদ্বারা ও গন্ধ কেবল নাসিকাদ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। সেই দৃষ্টান্তে ঘটাদির স্পর্শও যখন কেবল ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তখন স্পর্শও পাকজ। কেবল ঘটাদির গুণ হইলেই যে পাকজ হইবে, তাহা

নহে; এই জন্য 'একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি' বলা হইয়াছে। ঘটাদিগত সংখ্যাদি-গুণ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—তাহা চক্ষুঃ ও ত্বক্—উভয় ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার কেবল একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেই পাকজ হয় না। তাহা হইলে জ্ঞানাদি ও শব্দেরও পাকজত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে; কেন না জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব্দও এক এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—জ্ঞান, ইচ্ছাদির কেবল মনের দ্বারা ও শব্দের কেবল কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। তা'ই 'তদ্গতগুণত্বাৎ' বলা হইয়াছে। একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া যাহা ঘটাদির গুণ, তাহাই পাকজ। জ্ঞান বা শব্দ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও তাহা ঘটাদির গুণ নহে। জ্ঞানাদি আত্মার গুণ, শব্দ আকাশের গুণ। কাজেই আর ব্যভিচার হইল না (৪)। উদয়নাচার্য্যও নানা বিচারের পর অনুমানরূপ প্রমাণবলেই পার্থিব স্পর্শের পাকজত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন (৫)।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ এই কয়টী গুণের পরিচয় দেওয়া আর আবশ্যক মনে করি না,—পরত্ব ও অপরত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,—এই দুইটী গুণ দ্বিবিধ, কালিক ও দৈশিক। জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বকে কালিক এবং দূরত্ব ও নৈকট্যকে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব বলা হয়।

এই পৃথিবী দ্বিবিধ,—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত পৃথিবীই অনিত্য। অনিত্য পৃথিবীরই অবয়ব আছে, পরমাণু নিরবয়ব।

[ক্রমশঃ।

শিশুর বর্ণমালা।

[শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ।]

পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতঃ দুই প্রকারের বর্ণমালা আছে, সংস্কৃত ও ইয়ুরোপীয়। ইয়ুরোপীয় বর্ণমালা সীরিয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত, আরবী বর্ণমালার উদ্ভব সেই বর্ণমালা হইতে। সংস্কৃতের বর্ত্তমান বর্ণমালা যে আদিম নহে, অন্য কোন

(৪) "অপ্রতীয়মানপাকজেষু স্তম্ভাদিষু স্পর্শস্য পাকজত্বমনুমানাৎ স্তম্ভাদিষু স্পর্শঃ পাকজঃ পার্থিবস্পর্শত্বাদ্ ঘটাদিস্পর্শবৎ ঘটাদিস্পর্শস্যাপি পাকজত্বমেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি তদ্গুণত্বাৎ তদ্গতরূপবৎ।"—ন্যায়কন্দলী, ৩১ পৃঃ।

(৫) "তস্মাৎ পার্থিবস্পর্শোঽপি পাকজঃ পার্থিববিশেষগুণত্বাদ্ গন্ধবদিত্যবধেয়ম্।"—দ্রব্যকিরণাবলী, ৪৯ পৃঃ।

বর্ণমালা হইতে গৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুমান করেন। কিন্তু সে বর্ণমালা কিরূপ ছিল আর কোন্‌কালে ইহা গৃহীত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক, এই দুই বর্ণমালারই আদিম রূপ আমরা এখনও শিশুর প্রথম বর্ণমালায় দেখিতে পাই, এ কথায় বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না।

শিশু যখন প্রথম অব্যক্ত শব্দ করিতে শিখে, তখন সে জিহ্বা ভাল করিয়া নাড়িতে পারে না, কেবল মুখব্যাদান পূর্ব্বক কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত করে, তখন একটি স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহাই সংস্কতের "অ" এবং সমস্ত ইয়ুরোপীয় বর্ণমালার এবং সীরিয়, আরবী প্রভৃতি বর্ণমালার আদি অক্ষর "আ" (A), এই উভয় বর্ণেরই উচ্চারণ প্রায় একরূপ, স্থানে স্থানে নাম বিভিন্ন। তাহার পরে শিশু মুখ বন্ধ করিতে গেলে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করে, তাহাতে যে বর্ণের উচ্চারণ হয় তাহা "ব"। ইহা হইতে ইংরাজীর এ বি, (A B) গ্রীকের অ্যাল্‌ফা বিটা, আরবীর আলিফ্‌ বে, প্রভৃতির উদ্ভব বলিয়া বোধ হয়।

শিশুর এই 'অ' 'ব' উচ্চারণের পূর্ব্বে তাহার প্রথম জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে 'আমাদের ভীরু-বাঙ্গালী জাতির শিশু সূতিকাগারের মৃত্তিকায় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠে, আর সাহসী ইয়ুরোপীয় জাতির শিশুও অট্টালিকার কক্ষের মেঝেতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠে। তখন সকল শিশুই একটা অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ করিয়া থাকে। এখন শিশু যদি প্রথম স্বর উচ্চারণ করিয়া মুখমধ্যস্থ বায়ুটুকু বাহির করিবার সময় মুখের মধ্য দিয়া বাহির না করিয়া ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া নাসিকার মধ্য দিয়া বাহির করে, তবে গোড়া হইতে যথাক্রমে ৩টি বর্ণের উচ্চারণ হয়, "অ, উ, ম্‌"। তাই এই তিনটি মিলিয়াই কি বেদের প্রণবের উৎপত্তি?

কণ্ঠ হইতে নির্গত বায়ু যদি কণ্ঠের পরে তালুতে আঘাত করে তবে 'অ'র পরে 'ই', তৎপরে মুখবন্ধের সময়ে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে 'উ'। কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ না করিয়া যদি তন্মধ্যে একটি চোঙার আকার করা যায়, তবেই ঠিক 'উ', এই চোঙা বা নলটি একটু দীর্ঘ করিলেই 'ও'। তাই ইয়ুরোপীয় বর্ণমালার স্বরে ক্রমান্বয়ে "অ, ই, ও" এবং সংস্কতের বর্ণমালায় "অ ই উ" এই ৩টি স্বর দেখিতে পাই। ইহাদের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই আকারই শিশুর বর্ণমালায় প্রথমে থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ ঐ ঔ প্রভৃতি মিশ্রস্বরের উচ্চারণ শিশু করিতে পারে না।

সংস্কতে ব্যঞ্জনবর্ণের ৩টি বিভাগ দেখিতে পাই। 'ক' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত স্পর্শ

বর্ণ, শ ষ স হ উষ্মবর্ণ এবং য র ল ব এই ৪টি অন্তঃস্থ বর্ণ। শিশু কবর্গ, তবর্গ ও পবর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক,গ ত,দ ও প,ব এই ছয়টি বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। শিশু 'চল্' বলিতে 'তল্' বলিবে এবং 'কাঁটাল' বলিতে 'কাঁতাল' বলিবে। আবার 'খাবো' বলিতে 'কাবো' বলিবে এবং 'ঘা' বলিতে 'গা' বলিবে। অর্থাৎ শিশুর বর্ণমালায় চবর্গ ও টবর্গের এবং অবশিষ্ট বর্গের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির যথা 'খ' 'ঘ', 'থ, ধ' এবং 'ফ' 'ভ'এরও স্থান নাই।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ইংরেজেরা 'তুমি' বলিতে 'টুমি' বলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাহেবেরা দন্ত্য তবর্গ উচ্চারণ না করিয়া মূর্দ্ধন্য টবর্গ উচ্চারণ করে। কিন্তু ইংরেজের টি (t) বর্ণ মূর্দ্ধন্য নহে, দন্ত্য। এই দন্ত্য টি একটু জোরে উচ্চারিত হয় বলিয়া অনেকটা মূর্দ্ধন্য ট-এর কাছাকাছি শোনায়। কোন কোন ইয়ুরোপীয় জাতির টি বর্ণের উচ্চারণ ঠিক তএর ন্যায়।

এই ক গ, ত দ, ও প ব-এর উচ্চারণ এত সহজ এবং স্বরবর্ণের এত কাছাকাছি বলিয়াই প্রাকৃত ভাষায় অনাদি অযুক্ত এই বর্ণ কয়টির লোপ হইত ; যথা —নকুল স্থানে নউল, সাগর স্থানে সাঅর, সীতা স্থানে সীআ, ইত্যাদি।

উষ্ম বর্ণের মধ্যে 'স' ও 'হ' এবং অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে 'ল' তাহার প্রথম সম্বল। কিন্তু এই 'স' আদি অপেক্ষা পদের অন্তে উচ্চারণই তাহার পক্ষে সহজ এবং 'হ'ও অর্দ্ধোচ্চারিত। 'স' ও 'হ' উভয় বর্ণই প্রথমে বিস্ময়, ভয়, ক্রোধ, কষ্ট প্রভৃতি প্রকাশার্থ পদের অন্তেই ব্যবহৃত হয়, যথা উস্, আহ্। জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তে স্পর্শ না করাইয়া দন্ত ও জিহ্বার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিয়া জোরে বায়ু নির্গত করিলে "স" আর জিহ্বাগ্র উত্তোলন না করিয়া "স" উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে "হ" উচ্চারিত হয়। ইহাতেই বোধ হয় আরবীয়েরা "সিন্ধু" "সপ্ত" প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত "স" স্থানে "হ" উচ্চারণ করিয়া "হিন্দু", "হপ্ত" বলিত। "হ" ও "ঃ" প্রায় একরূপ বর্ণ। তজ্জন্য সংস্কৃতেও "উস্" স্থানে "উঃ" হইত।

শিশুর প্রথম বর্ণমালায় যেমন চবর্গের স্থান নাই, তেমনি রোমান কোন বর্ণমালায় এবং আরবী কোন বর্ণমালায় "চ" নাই। আরবীয়েরা "চ"এর স্থানে "জ" উচ্চারণ করিত। রোমান বর্ণমালাতেও এখন ২।৩ টি অক্ষর সহযোগে "চ" বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ করা হয়। তামিল বর্ণমালাতেও চবর্গ নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, তামিলভাষীরা তাহাদের বর্ণমালা সংস্কৃতের বর্ণমালা হইতে লইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান হয়, সংস্কৃতের আদিম

অবস্থায় অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যদিগের বৈদিক ভাষারও পূর্ব্বের বর্ণমালায় "চ" বর্গ ছিল না। "চ"এর উচ্চারণ কি তবে চীনাদের নিকট প্রাপ্ত?

রোমান ও আরবী বর্ণমালাতে এবং তামিলের বর্ণমালাতেও দেখিতে পাই খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ এই দশটি মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে অধিকাংশই নাই। কেবল থ, ফ, ভ এই তিনটির অনুরূপ বর্ণ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, বৈদিক ভাষার আদিম অবস্থায় হয়ত মহাপ্রাণ বর্ণগুলি ছিল না। অনুরূপ বর্ণ বলিলাম এই কারণে যে, সংস্কৃতের ফ ও ভ ইংরাজীর এফ্ (f) বা ভি (v) হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। সংস্কৃতের ফ ও ভ কেবল ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কিন্তু ইংরাজীতে দন্ত ও ওষ্ঠ উভয়ের সাহায্য প্রয়োজন। একটি অল্প বধির লোকে "এস্" বলিতে "এফ্" বলিত অর্থাৎ তাহার বর্ণমালায় "স"এর স্থানে সর্ব্বত্র "ফ" হইত, এই "ফ" অবশ্য দন্তৌষ্ঠ্য।

রোমান বর্ণমালায় ও শিশুর বর্ণমালায় প্রথমে "শ"এর স্থান নাই। শিশু যেমন বড় হইয়া কষ্টে "শ" বলে, ইংরাজেরা তেমনই এস্ ও এচ (sh) যোগে "শ"এর কাজ চালাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আরবীয়েদের বর্ণমালায় "শ" আছে কিন্তু "প" নাই। "প"এর কার্য্য "ব" দিয়া চলে।

"চ"এর সম্বন্ধে একটি শেষ কথা বলিয়া লই। সকলেই জানেন "চ" তালব্য বর্ণ, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এমন কি নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে যেরূপ "চ" উচ্চারিত হয় তাহা তালব্য "চ" নহে, দন্ত্য "চ"।

য (y) র, ল, ব (w) এই চারিটি স্বরেরই বিকৃতি। শিশু ইহার মধ্যে 'ল' বর্ণই প্রথম উচ্চারণ করিতে পারে। জিহ্বার মূলের দুই পার্শ্ব ঈষৎ উত্থিত হইয়া মুখ নির্গত বায়ুর সাহায্যে জোরে মুখের মধ্যে পড়িলে "ল" হয় এবং জিহ্বার মধ্যভাগের দুই পার্শ্ব ঐরূপে পড়িলে "র"। 'ল' অপেক্ষা 'র' উচ্চারণ কঠিন। চীনাদের ভাষায় "র" যুক্ত কোন শব্দ নাই। চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতের 'র' যুক্ত নামগুলির 'র' স্থানে 'ল' করিত। প্রাকৃত জনও এইরূপ 'র' স্থানে 'ল' করিত বলিয়া "হরিদ্রা" স্থানে "হলদ্দা" হইত এবং এই কারণেই সংস্কৃতেরও "রঘু" "লঘু" একার্থক। র, ড় ও ল'এর অভেদের সূত্র এই কারণেই হইয়াছিল।

শিশুর বর্ণমালায় অন্য কোন যুক্ত ব্যঞ্জনের স্থান থাকে না, কেবল তাহার উচ্চারিত বর্ণ সে দ্বিত্ব করিতে পারে। সে 'কম্ম' 'অক্কা' সহজেই বলিতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণেই সংস্কৃতের যুক্ত বর্ণগুলি প্রাকৃতে এইরূপেই পরিবর্ত্তিত হইত।

"রত্নমালা"-পরীক্ষা।

(২)

[শ্রীহারাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।]

মহর্ষি বাদরায়ণ স্বীয় শারীরকসূত্রে ছান্দোগ্য এবং মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে বর্ণিত এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব এবং জগদভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ ২৩ সূত্র) "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ ১৪ সূত্র) "প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ ৬ সূত্র) ইত্যাদি সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ স্বীয় পূর্ব্বোক্ত মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ঐ সকল স্থলে এবং অন্যান্য স্থলেও বহুল যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা উক্ত মতের উপপাদন করিয়াছেন। পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় প্রবলবেগে এই মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু তিনি সূত্র, ভাষ্য ও ভামতী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের প্রামাণিক গ্রন্থে প্রদর্শিত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের কোন সদুত্তর দেন নাই অথবা সুমীমাংসা করেন নাই।

ইহার পর, পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় লিখিতেছেন যে, "এই নিমিত্ত কারণবৃত্তি বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদকগুণসকল, কার্য্যদ্রব্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইয়াও, কার্য্যদ্রব্যে স্বসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করিয়া, কারণদ্রব্যের সাজাত্য সম্পাদন করিয়া থাকে, এইরূপ স্বীকৃত হইতেছে (১)।" এখানে "এই নিমিত্ত" (অতঃ) এই অংশের দ্বারা তর্করত্ন মহাশয়, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি" এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার মতে যে কার্য্যকারণের সাজাত্য সমর্থিত হইয়াছে, সেই স্বীয় সম্মত শ্রুতিবোধিত সাজাত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত উপক্রমবিরুদ্ধ হইয়াছে। উপসংহারেও "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য দ্বারা অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত উপসংহারেরও বিরোধী হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের দ্বৈতমতেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে;

(১) "অতঃ কারণবৃত্তয়ো বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদকা গুণাস্তে সাক্ষাৎ কার্য্যদ্রব্যমসংস্পৃশন্তোঽপি তত্র স্বসজাতীয়ং গুণান্তরমারভমাণাঃ কারণদ্রব্যসাজাত্যং নির্ব্বর্তয়ন্তীত্যুপগম্যতে।"—দ্বৈতোর্জ্জিরত্নমালা, ৫১ পৃষ্ঠা।

বহুপূর্ব্বে মাধ্বমতাবলম্বী সুপণ্ডিত দ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন (২)। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণের ঐ সকল ব্যাখ্যান্তর উপক্রমের বিরোধী বলিয়া আদরণীয় নহে। উপক্রমের সহিত বিরোধ-পরিহার করিয়া তাহার অনুকূলভাবে উপসংহারের অর্থ অবধারণ করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষি জৈমিনি-প্রমুখ মীমাংসকগণের মত। মীমাংসা দর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় পাদের প্রথমাধিকরণে এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

জ্যোতিষ্টোম প্রকরণগত শ্রুতিতে "প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি, স তপোঽতপ্যত, তস্মাত্তেপানাত্রয়ো দেবা অসৃজ্যন্তাগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ তে তপোঽতপ্যন্ত, তেভ্যস্তেপানেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অসৃজ্যন্তাগ্নেঋর্গ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদ আদিত্যাৎ সামবেদঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া, পরে "উচ্চৈঋর্চা ক্রিয়তে, উপাংশু যজুষা, উচ্চৈঃ সাম্না" এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দ বেদ-বিশেষের বোধক এবং মন্ত্রবিশেষেরও বোধক (৩); এইজন্য এখানে "উচ্চৈ-ঋর্চা ক্রিয়তে" ইত্যাদি বিধিবাক্যে ঋক্ প্রভৃতি শব্দ বেদবোধক অথবা মন্ত্র-বোধক—এইরূপ সংশয় করা হইয়াছে। অতঃপর, "শ্রুতের্জাতাধিকারঃ স্যাৎ" এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে, এখানে ঋগাদিশব্দে ঋগাদিমন্ত্রই বুঝিতে হইবে; শ্রুতিতে 'ঋচা ক্রিয়তে' ইত্যাদিরূপে ঋগাদি উল্লিখিত হইয়াছে; ঋক্, যজুঃ ও সামশব্দের মন্ত্রেই শক্তি, লক্ষণার দ্বারা বেদ বোধিত হইয়া থাকে। উপরিকথিত বিধিবাক্যে যদি ঋক্প্রভৃতি শব্দ ঋক্প্রভৃতি বেদের বোধক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। এই লক্ষণা স্বীকারই দোষ।

ইহার পর, "বেদো বা প্রায়দর্শনাৎ" এই সিদ্ধান্ত সূত্রের দ্বারা স্থির করা

---

(২) "আহ নিত্যপরোক্ষং তু তচ্ছব্দোহ্যবিশেষিতঃ।
ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ॥
'আদিত্যোযূপ' ইতিবৎ সাদৃশ্যার্থা তু সা শ্রুতিঃ।"
"অতত্ত্বমিতি বা ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতম্।"
—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।

(৩) পাদবদ্ধ মন্ত্রের নাম ঋক্, গীতিবিশিষ্ট মন্ত্রের নাম সাম ও গদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম যজুঃ।—"তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।" "গীতিষু সামাখ্যা।" "শেষে যজুঃশব্দঃ।" মীমাংসাদর্শন, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ সূত্র।

হইয়াছে যে, এইস্থলে উপক্রমে ঋক্‌প্রভৃতি শব্দ কেবল মন্ত্রবোধক নহে, কিন্তু মন্ত্র-ব্রাহ্মণসমুদায়াত্মক বেদের (৪) বোধক। এই প্রবল উপক্রমের অনুরোধে, উপসংহারস্থিত ঋক্‌, যজুঃ ও সাম শব্দও মন্ত্রমাত্রবোধক নহে, কিন্তু মন্ত্রব্রাহ্মণ-সমুদায়রূপবেদবোধক, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। এখানে উপক্রম অর্থবাদ এবং উপসংহার বিধি; তথাপি উপক্রম প্রবল বলিয়া আদৃত হইয়াছে। উপক্রম প্রথমে বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে; উপসংহার তখনও নিজের স্বরূপ-লাভ (স্বার্থবোধন) করে নাই বলিয়া উপক্রমের বাধক হইতে পারে না; পরে যখন উপসংহার আত্মলাভ (স্বার্থবোধন) করে, তখন একবাক্যতার অনুরোধে উপক্রমের অবিরোধে আত্মলাভ (স্বার্থবোধন) করিয়া থাকে। এইরূপে মীমাংসাদর্শনে উপক্রমের অধিক বলবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয় এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল। যাঁহারা বিশেষ জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শাবরভাষ্য, তন্ত্র-বার্ত্তিক, শাস্ত্রদীপিকা, মীমাংসাকুতূহল প্রভৃতি গ্রন্থ পরিশীলন করিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে উপক্রমে, একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; উপসংহারে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ স্বীকার না করিলে এবং উক্ত মহাবাক্যকে জীব ও ব্রহ্মের সাদৃশ্যপ্রতিপাদক অথবা জীবব্রহ্মের অভেদনিষেধকরূপে বিবৃত করিলে, উপক্রমের একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞার সহিত উপসংহারের বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব মীমাংসাদর্শনের পূর্ব্বোক্ত অধিকরণের সহিত দ্বৈতবাদিগণের উক্ত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট বিরোধ দাঁড়াইতেছে, ইহা নিঃসংশয়রূপে বুঝা যাইতেছে। এইজন্য দ্বৈতবাদিগণের উক্ত সিদ্ধান্ত মীমাংসানুগত নহে বলিয়া বিচার-নিপুণ মনীষিগণের উপেক্ষণীয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় এইস্থলে বলিয়াছেন যে, "কারণবৃত্তি বিজাতীয়-ব্যবচ্ছেদক গুণ কার্য্যদ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে।" এই নিয়ম সাধারণভাবে মানিলে, 'দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণ এসরেণুতে স্বসজাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন করুক' এইরূপ আপত্তি হয়; এইজন্য একটু আগে যাইয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন যে, কারণবৃত্তি বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক গুণ এখানে তাদৃশ বিশেষ-গুণকেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কারণবৃত্তি বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক বিশেষ-গুণই কার্য্যদ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করিয়া থাকে। দ্ব্যণুকের পরিমাণ

(৪) "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্র, ১ম খণ্ড, ৩৩ সূত্র।

বিশেষগুণ নহে বলিয়া এসরেণুতে স্বসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে না। কিন্তু চৈতন্য ব্রহ্মের বিশেষ গুণ, সে-ই বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদক, অতএব ব্রহ্মকার্য্য জগতে অবশ্যই ব্রহ্মগত-চৈতন্য চৈতন্য উৎপাদন করিবে (৫)।

এখানে তর্করত্ন মহাশয় সজাতীয় ও বিজাতীয় শব্দ অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখনভঙ্গী অস্পষ্ট, তাই তিনি কোন্ ধর্ম্ম দ্বারা সাজাত্য অথবা বৈজাত্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট বলিয়া দেন নাই। "বিজাতীয়ব্যবচ্ছেদকাঃ" এই বিশেষণ অব্যাবর্ত্তক বলিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ বিজাতীয়ের ব্যাবর্ত্তক সকল গুণই হইতে পারে। কোন কোন আপাতদর্শী প্রাচীন তার্কিক "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণানারভন্তে" এই ব্যাপ্তির অনুসরণ করিয়া জগতে চৈতন্যের আপত্তি দিয়াছিলেন। মহর্ষি বাদরায়ণ "মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায় ২য় পাদ ১১ সূত্র) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়া উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য শঙ্করও ঐ সূত্রের তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী আপাতদর্শী তার্কিকগণ ঐ ব্যাপ্তির সঙ্কোচ করিয়া 'কারণগত বিশেষগুণ কার্য্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করিয়া থাকে'—এইরূপ ব্যাপ্তি স্থাপন করিয়া তদনুসারে জগতে চৈতন্যের আপত্তি দিয়াছিলেন। এই আপত্তি নূতন নহে; ইহা বহু বৎসরের পুরাতন আপত্তি। অমলানন্দযতি-প্রণীত "বেদান্তকল্পতরু" গ্রন্থে প্রথমে এই আপত্তি পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে;—

"আরভেত গুণং কার্য্যে সজাতিং সমবায়িগঃ।
বিশেষগুণ ইত্যস্যা ব্যাপ্তেঃ কা নু প্রতিক্রিয়া॥"

ইহার পর, গ্রন্থকার অমলানন্দ "উচ্যতে, ন তাবদস্তি বিশেষগুণঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ-সন্দর্ভের দ্বারা বিশেষগুণের খণ্ডন করিয়াছেন। এইস্থলে গ্রন্থকার প্রথমতঃ ন্যায়াচার্য্য উদয়ন প্রণীত "স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদোচিতাবান্তরসামান্যবিশেষবন্তো বিশেষগুণাঃ" এই বিশেষগুণলক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার পর, প্রসিদ্ধতার্কিক ব্যোমশিবাচার্য্য প্রণীত "স্বসমবেতবিশেষণবিশিষ্টত্বে সতি স্বাশ্রয়ৈকজাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বং বিশেষগুণত্বম্" এই বিশেষগুণলক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (৬)। বিশেষগুণের সম্ভাবিত লক্ষণান্তরও এই ভাবে খণ্ডন করিতে

---

(৫) "দ্বৈতোক্তিরত্নমালা" ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) কাশীতে লাজারস্ কোম্পানীর মুদ্রিত "বেদান্তকল্পতরু" ২৬২ পৃষ্ঠা ও "বেদান্ত-কল্পতরু পরিমল" ৪১৮—৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইবে, ইহা বলিয়া দিয়াছেন (৭)। অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষগুণ দূরে থাকুক, গুণপদার্থই স্বীকার করেন না। শ্রীহর্ষপ্রণীত "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে "রূপাদীনাং গুণত্বস্যৈব নিশ্চেতুমশক্যত্বাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থসন্দর্ভের দ্বারা গুণের খণ্ডন করা হইয়াছে (৮)। এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে; সকলের পক্ষেই এখন এই সকল গ্রন্থ সুলভ; অতএব আমরা এখানে এই সকল গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অনর্থক বর্দ্ধিত করিব না। এখন তার্কিক-প্রবর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, যাঁহারা গুণ বা বিশেষগুণ কিছুই স্বীকার করেন না, তাঁহাদের প্রতি বিশেষগুণঘটিত উক্ত ব্যাপ্তিবলে আপত্তি দেওয়া চলে কি? তিনি যদি অদ্বৈতবাদিগণকৃত পূর্ব্বোক্ত খণ্ডনের উদ্ধার করিয়া বিশেষগুণঘটিত উক্ত ব্যাপ্তির স্থাপনপূর্ব্বক আপত্তি দিতেন, তাহা হইলেই সুসমীচীন হইত। তাহা না করিয়া, পুরাতন খণ্ডিত আপত্তিটীর পুনরাবৃত্তি করিয়া এরূপ পিষ্টপেষণ করায় তাঁহার কি লাভ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তার্কিকপ্রবর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত বিশেষগুণঘটিত ব্যাপ্তি তার্কিকমতেও নির্দ্দোষ নহে। 'কারণগত বিশেষগুণ কার্য্যে সজাতীয় গুণান্তর

---

(৭) দিনকরীগ্রন্থে বিশেষগুণের একটী লক্ষণ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। দিনকর ভট্ট গুণত্বজাতি মানেন না, এইজন্য এই লক্ষণ তাঁহার প্রণীত নহে। "বিশেষগুণত্বং চ ভাবনান্যো যো বায়ুবৃত্তিরবৃত্তিস্পর্শাবৃত্তিধর্ম্মসমবায়ী তদন্যত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্।" গুণত্বজাতি না মানিলে এই লক্ষণ করা যায় না। দীধিতিকার, দিনকর ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গুণত্বজাতি খণ্ডন করিয়াছেন। সে খণ্ডনের যথাযথ উদ্ধার অদ্যাবধি কেহ করিতে পারেন নাই। পদার্থতত্ত্বনিরূপণের টীকায় রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার গুণপদ শক্যতাবচ্ছেদকরূপে গুণত্বজাতি সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু এই রীতিতে জাতিসিদ্ধি জগদীশগদাধরপ্রমুখ প্রামাণিক তার্কিকগণের সম্মত নহে। (অনুমিতি,—"পূর্ণায় পরমাত্মনে" এই অংশের জগদীশ ও গদাধর কৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) অতএব নৈয়ায়িক মতেই গুণত্বঘটিত উক্ত লক্ষণ হয় না। "বিশেষগুণ" এরূপ পরিভাষার বিশেষ প্রমাণ বা ফলও দেখিতে পাওয়া যায় না। অদ্বৈতবাদিগণ গুণ, জাতি প্রভৃতি কোন পদার্থই স্বীকার করেন না। "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে"র চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই সকল পদার্থ খণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহাদের মতে জাতিই নাই, তাঁহাদের মতে গুণত্বজাতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব এই গুণত্বঘটিত বিশেষগুণত্বও অদ্বৈতবাদিগণের মান্য হইতে পারে না।

(৮) লাজারসের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" ৫৭৯—৫৮১ পৃষ্ঠা অথবা চৌখাম্বার "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" ১০৭১—১০৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উৎপন্ন করে।'—এখানে কোন্ ধর্ম্মের দ্বারা সাজাত্য গ্রহণ করিতে হইবে? গুণত্ব অথবা স্ববৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যরূপত্বাদিধর্ম্মের দ্বারা সাজাত্য ধরিলে শ্যাম-কপাল-দ্বয়-নির্ম্মিত ঘটে রক্তরূপের আপত্তি হইয়া পড়ে। এই আপত্তিনিবারণের জন্য যদি স্ববৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যব্যাপ্যনীলত্বাদিধর্ম্মের দ্বারা সাজাত্য লওয়া হয়, তাহা হইলে চিত্ররূপ স্থলে ব্যভিচার হইয়া পড়ে। সুরভি ও অসুরভি কপাল দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন ঘটে কোন গন্ধই উৎপন্ন হয় না, এই ঘট নির্গন্ধ হয় (৯)। এইস্থলেও উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হয়। এইরূপ নানারস ও নানাস্পর্শ বিশিষ্ট নানা অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন অবয়বী নীরস ও নিঃস্পর্শ হয়। যদি চিত্রগন্ধ চিত্ররস ও চিত্রস্পর্শ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার এই সকল স্থলে আছেই। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, চিত্রগন্ধ ও চিত্ররস সম্প্রদায়স্বীকৃত নহে। স্নেহ প্রভৃতিও বিশেষগুণ (১০)। সেস্থলে গুণত্বব্যাপ্য-ব্যাপ্য ধর্ম্মরূপে আমরা কোন ধর্ম্মই পাই না। যদি তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথের নবীন মত অবলম্বন করিয়া তর্করত্ন মহাশয় চিত্ররূপ প্রভৃতি অস্বীকার করেন (১১) এবং পূর্ব্বোক্ত স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদিরূপ হইতে অব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদিরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে এরূপ বলেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিস্তার নাই। দীধিতি-কার স্বপ্রণীত "পদার্থতত্ত্বনিরূপণে" যেমন চিত্ররূপ খণ্ডন করিয়াছেন, তেমনই গুণত্বজাতিও খণ্ডন করিয়াছেন (১২)। বিশেষগুণত্ব গুণত্বঘটিত; এইজন্য এই নবীন মতানুসারে বিশেষগুণ-ঘটিত উক্ত ব্যাপ্তি হইতেই পারে না। যে মতে যে পদার্থ স্বীকৃত নহে, সেই মতে সেই পদার্থঘটিত নিয়ম কিরূপে হইতে পারে?

---

(৯) "সুরভ্যসুরভিকপালদ্বয়নির্ম্মিতনির্গন্ধঘটে"—মুক্তাবলীপ্রকাশ—পৃথিবীনিরূপণ।

(১০) "বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকোদ্রবঃ।
অদৃষ্টভাবনাশব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ॥" ভাষাপরিচ্ছেদ।

(১১) "চিত্রমপি নাতিরিক্তং রূপং সমানাধিকরণবিজাতীয়রূপসমুদায়াদেব তথাবিধব্যবহারোপপত্তেঃ। নীলাদের্নীলাদ্যতিরিক্তরূপাজনকত্বাচ্চ।
মুক্তাবলী, ১০০ তম কারিকাব্যাখ্যা। পদার্থতত্ত্বনিরূপণ ৩৩ পৃষ্ঠা।

(১২) "এবং গুণত্বমপি ন রূপাদিচতুর্বিংশত্যাবেকা প্রত্যক্ষসিদ্ধা জাতিঃ। অতীন্দ্রিয়েষু প্রত্যক্ষাযোগাৎ। তুরগাদেরুৎকৃষ্টগতিমত্ত্বে ব্রাহ্মণাদেশ্চ দোষাদ্যভাবেঽপি গুণব্যবহারাচ্চ। একস্য কার্য্যতাবচ্ছেদকস্য বিরহেঽপি যেন কেনাপি রূপেণ কারণতাদ্যনুগমব্য জাতিকল্পনে চাতিপ্রসঙ্গো জাতিসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চেতিদিক্।"
—পদার্থতত্ত্বনিরূপণ ৫১—৫২ পৃষ্ঠা।

দীধিতিকারকৃত চিত্ররূপের এই খণ্ডন পরবর্ত্তী তার্কিকগণের সম্মত নহে। তার্কিকপ্রধান জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কামৃতে চিত্ররূপ স্বীকার করিয়াছেন (১৩)। তর্কসংগ্রহে চিত্ররূপ স্বীকৃত হইয়াছে। দীপিকা ও নীলকণ্ঠীতে যুক্তি দ্বারা চিত্ররূপ স্থাপন করা হইয়াছে (১৪)। পদার্থ তত্ত্বনিরূপের টীকাকার রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কারও শিরোমণির উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তিনি শিরোমণির মতে গৌরব উদ্ভাবন করিয়া, চিত্ররূপ স্বীকারে লাঘব দেখাইয়া চিত্ররূপ স্থাপন করিয়াছেন (১৫)। অতএব দীধিতকারের পরবর্ত্তী এই সকল তার্কিকের মতেও উক্ত ব্যাপ্তি ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইবেন যে, 'কারণগত বিশেষগুণ কার্য্যদ্রব্যে স্বসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে'—এরূপ নিয়ম নব্য ও প্রাচীন সুবিখ্যাত তার্কিকগণের মধ্যে কাহারও মতেই সুসঙ্গত নহে। দীধিতিকার ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের মতানুসারে উক্ত ব্যাপ্তি দুষ্ট, দীধিতিকারের পরবর্ত্তী জগদীশ তর্কালঙ্কারপ্রমুখ তার্কিকগণের মতেও ঐ ব্যাপ্তি দোষগ্রস্ত। এরূপ স্থলে তার্কিকপ্রবর তর্করত্ন মহাশয় কাহার মত অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যাপ্তির উপন্যাস করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি সগর্ব্বে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তর্করত্ন মহাশয়ের গর্ব্বাড়ম্বর (১৬) লক্ষ্যচ্যুত-সায়ক ধানুষ্কের বৃথা গর্ব্বাড়ম্বরেরই অনুকরণ করিতেছে!

যাঁহারা জগতের সত্তা স্বীকার করেন, "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়ে তাঁহাদের মত লইয়াই জগতের চৈতন্যাপত্তিদোষের সমাধান করা হইল, অর্থাৎ জগতের সত্তা

---

(১৩) "রূপং পৃথিবীতেজোজলবৃত্তি তচ্চ শুক্লকৃষ্ণরক্তপীতচিত্রাদিভেদেন বহুবিধং পৃথিবীবৃত্তি।"—তর্কামৃত, ৮ পৃষ্ঠা।

(১৪) নির্ণয়সাগরের পুস্তক, ৫০—৫১ পৃষ্ঠা।

(১৫) মুদ্রিত সটীক পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, ৩৩—৩৫ পৃষ্ঠা।

(১৬) "তর্কাতিদুর্গমগিরিপ্রকটপ্রভাবঃ
পঞ্চাননোবিবিশতন্ত্রবনান্তচারী।
অদ্বৈতদিগ্‌দ্বিপবলাবগমায় তেষাং
মৌলৌ করোতি কতিচিৎ করজাঙ্কপাতান্॥"

—দ্বৈতোক্তি রত্নমালা।

স্বীকার করিলেও জগতের চৈতন্যাপত্তি হইতে পারে না, ইহা দেখান হইল। বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জগতের বাস্তব সত্তাই অঙ্গীকৃত হয় নাই; জগতের বস্তুতঃ সৃষ্টিই হয় নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের মত। অতএব উক্ত ব্যাপ্তি বলে সেই গগন-কমলিনীকল্প জগতে চৈতন্যের আপত্তিই দেওয়া যায় না।

পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যদি চৈতন্যস্বরূপ হয়, তাহা হইলেও জগৎ অনির্ব্বচনীয় বা জড় হইতে পারে না; চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে চৈতন্যস্বরূপ জগৎই উৎপন্ন হওয়া উচিত (১৭)। এ কথার উত্তর পূর্ব্বে প্রথম প্রবন্ধে কিছু দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, যাঁহারা জগতের সত্তাই স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট এই আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর।

বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও প্রবন্ধ একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল বলিয়া এবারে এই খানেই বিশ্রাম লইতেছি।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জগতের সত্তা কেন অঙ্গীকৃত হয় নাই, এই বিষয়ে বারান্তরে বিশেষ আলোচনা করা হইবে।

[ক্রমশঃ।

"ঘোড়ার ডিম।"

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নানা প্রকার আজগুবী সমাচারে মানুষকে বিস্মিত করে, অনেক অসম্ভবকে অলীকতার গণ্ডীর বাহির করিয়া দেয়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এ কথা বিদিত। কিন্তু বিজ্ঞান যখন আবহমানকাল প্রচলিত বয়োবৃদ্ধ প্রবচনের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করে, তখন আমরা প্রবচনেরই বিজ্ঞতা মানিয়া চলি—বিজ্ঞানকে বিজয়ী বীরের সম্মানটুকু দান করি না। বিজ্ঞান বহুদিন বলিয়া দিয়াছে যে, "ঘোড়ার ডিম" অলীক নয়, তাহার একটা অস্তিত্ব আছে; কিন্তু প্রবচন বলে —" 'ঘোড়ার ডিম' মানে বাজে কথা, ভুয়ো কথা, ছাই ভস্ম, খাবিস, কারণ ঘোটকী ত আর হংসী বা মোরগীর মত ডিম পাড়ে না"। বিজ্ঞান বলে—"না, না, ঘোড়ারও ডিম হয়, কথাটা একেবারে অলীক নয়"। সাদা ভাষা বলে—"হয়

(১৭) দ্বৈতোক্তি রত্নমালা, ৫২ পৃষ্ঠা।

হ'ক—আমি অমন সরস শব্দটুকু বর্জ্জন করিতে পারিব না। কেহ বাজে কথা বলিলে তাহার উত্তর হইবে—'ঘোড়ার ডিম'।"

গতবারের "ভেক-তত্ত্ব" প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, খুব নিম্নশ্রেণীর জীব ব্যতীত সকল জীবেরই জন্ম অণ্ডে। শাস্ত্রে আছে—বিশ্বটাই ব্রহ্মার অণ্ড। সত্য-মিথ্যা জানি না, কিন্তু এ কথাটা ঠিক যে, জীবের মধ্যে ব্রহ্মার যে সৃষ্টি-শক্তি আবদ্ধ আছে, সে শক্তির কার্য্য হয়—অণ্ডে। অর্থাৎ অণ্ডের দ্বারা সৃষ্টি বাড়ে। মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, ষট্‌পদ, মাকড়শা প্রভৃতি অণ্ড প্রসব করে, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে ছাগল, ভেড়া, মেষ, মহিষ, কুকুর, শৃগাল, হাতী, ঘোড়া, নর, বানর সকলেরই জীবদ্দশার প্রথম বিকাশ ডিম্বে। এত বড় মানুষ—চিন্তাশীল জীব—বিশ্বজগতের এক রকম ভাগ্যনিয়ন্তা—তাহাকেও প্রথমে পোকা-মাকড়, মাছ, পাখী প্রভৃতির মত ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইতে হয়। অবশ্য নর, বানর, মেষ, মহিষ প্রভৃতির ডিম্বের সহিত হংসী কুক্কুটী প্রভৃতির ডিম্বের একটা খুব বিশেষ পার্থক্য আছে। মাছ, পাখী, উভচর ভেক, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির অণ্ড যেমন তাহাদের শরীরের বাহিরে পরিণত হয়, ঘোড়ার ডিম বা মানুষের ডিম সে রকম দেহের বাহিরে পরিণত হয় না। এক কথায় ইহারা ডিম পাড়ে না। পুরুষের শুক্রকীট রমণীর দেহের মধ্যে অণ্ডের সঙ্গে মিশিলে আসল ডিম্বের জন্ম হয়। ঠিক সেই সময় হইতেই মানুষের সৃষ্টি। স্ত্রীলোকের রজঃ বা পুরুষের শুক্র মানুষ নয়। কিন্তু যে শুভমুহূর্ত্তে এতদুভয়ের মিশ্রণ হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মানুষের প্রথম জন্ম। সেই মিশ্রণ হইলেই মানবীর অণ্ডের সৃষ্টি হইল। ইহাই মানবীর অণ্ড।

তবে হংসীর অণ্ডের মত মানবীর অণ্ড বা অশ্ব-ডিম্ব ভূমিষ্ঠ হয় না। এই কথাটা আলোচনা করিলেই অশ্ব-ডিম্বে ও হংসী-ডিম্বে যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্যটুকুর কারণ পাওয়া যাইবে। হংসীর ডিম্ব দেহের বাহিরে পরিণত হয়, তাই তাহাকে প্রকৃতির অসংখ্য শক্তির সহিত যুঝিতে হয়, অনেক পদার্থ তাহার উপর শক্তি পরীক্ষা করে। তাই তাহার একটা কঠিন আবরণের আবশ্যক হয়। সুতরাং যে সকল জীব ডিম পাড়ে তাহাদের ডিমের আবরণ থাকে। যে সকল জীবের ডিম্বের পরিণতি মাতৃ-জঠরে, তাহাদের আর কঠিন আবরণের আবশ্যক হয় না। তাই ঘোড়ার ডিমের "খোলা" থাকে না। এই আবরণ ব্যতীত এতদুভয় প্রকার অণ্ডে আরও একটা পার্থক্য আছে। যে সময় ডিমের ভিতর নানা প্রকার অদল বদল হইয়া ক্ষুদ্র কোষ জীবের অবয়ব

লাভ করে, সে সময় তাহার পুষ্টির জন্য পরিপোষণ-পদার্থের আবশ্যক হয়; যে সকল জীব মাতৃজঠরে পরিণত হয়, অর্থাৎ যাহাদের জননীরা ডিম পাড়ে না, ভ্রূণগুলিকে দেহের মধ্যে রাখে,—তাহারা মাতার দেহ হইতে পুষ্ট হয়, মাতৃদেহের নানারূপ পদার্থ হইতে নিজের দেহ রচনা করিবার উপাদান লাভ করে। সুতরাং সে সকল ডিমের সঙ্গে বিধাতাকে পরিপোষক-উপাদান রাখিতে হয় না। কিন্তু যে জীবকে মাতৃজঠর হইতে ডিম্বাবস্থায় বাহির হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদিগকে এই দুর্গম সংসারপথের পাথেয়স্বরূপ কতকটা সম্পত্তি দান না করিলে বিধাতাকে আমরা বলিতাম পক্ষপাতদুষ্ট। তাই তিনি হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, ভেকের ডিম প্রভৃতির মধ্যে অনেকটা পরিপোষক-পদার্থ রাখেন। আমরা হংসীর ডিম্বে যখন জঠর জ্বালা নিবারণ করি, তখন হংসীর প্রকৃত ডিমের আহার্য্যটুকু উদরসাৎ করি মাত্র। তাহার মধ্যে যে আসল অণ্ডটুকু থাকে তাহা খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেটুকু হয়ত এক ইঞ্চির এক ভাগের ১৩০ কি ১৫০ ভাগ। সুতরাং আমরা দেখি যে সকল ডিম্ব মাতৃদেহের ভিতর পরিণত হয় ও যে সকল ডিম্ব দেহের বাহিরে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে—বাহিরে বর্দ্ধমান ডিমের কঠিন আবরণ থাকে এবং সেই আবরণের মধ্যে প্রকৃত ডিম্বের পরিপুষ্টির জন্য অনেকটা পদার্থ থাকে।

ঠিক যে মুহূর্ত্তে মানুষের বা কুকুরের বা ঘোড়ার বা প্রজাপতির জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যে উহারা নিজ নিজ পিতামাতার রূপ পায় না, তাহা বলা বাহুল্য। ঠিক্ সজীব অণ্ডের উদ্ভবের সময় হইতে, পিতামাতার মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট জীবের উদ্ভব-কালের মধ্যে, অণ্ডের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে। মানুষের ডিমের পরিবর্ত্তনগুলি পরীক্ষা করিলে কতকগুলা বড় কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙাচীর যেমন অনেকগুলা পরিবর্ত্তনের পর ভেকত্ব লাভ হয়—মানুষের ডিমের ভিতরের শিশুরও তেমনি নানা রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তবে নরদেহ লাভ হয়। এই রকম পরিবর্ত্তন সকল উচ্চ-শ্রেণীর জীবের অণ্ডের ভিতর হইয়া থাকে।

আপনারা মনে করিতে পারেন যে, কুকুরের বাচ্চা যেমন ক্রমশঃ বাড়িয়া বড় সারমেয়ের আকার ধারণ করে, কিম্বা খোকামণি যেমন শশীকলার মত বাড়িয়া ৩॥০ হাত মানুষে পরিণত হয়—অণ্ডের ভিতরের পরিবর্ত্তনগুলা সেই প্রকারের। অর্থাৎ হাত, পা, মুখ, চোখ, মাথা বা শিরদাঁড়া যদিও প্রথম

অবস্থায় ঘোড়ার ডিমের ভিতর অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয় তবু সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হাত, পা, মুখ, চোখ, মাথা, শিরদাঁড়া—সবই পরিণতবয়স্ক অশ্বের সেই সব অবয়বের অনুরূপ। তবে সেগুলা অপরিণত শিশুর বলিয়া অতি ক্ষুদ্র ও অপরিণত। ঘোটকীর ডিম্ব যেমন এক ইঞ্চির একশত বিশ ভাগের এক ভাগ সেই পরিমাণে সেই ডিমের ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ছোট। এ ধারণাটা মোটেই নির্ভুল নয়। ঘোড়ার ডিমের ভিতরকার শিশু ঘোড়ার ছায়া মাত্র বা মানুষের ডিমের ভিতরের শিশুর রূপ মানুষের রূপের সংক্ষিপ্ত চিত্র মাত্র—এ ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন।

প্রথম অবস্থায় সকল জীবের অণ্ডের ভ্রূণ এক রকম দেখিতে। সে সময় ব্যাঙ্, ছুছুন্দর, খরগোষ, কচ্ছপ, মানুষ, ভোঁদড়, ঘোড়া বা কাটবিড়ালী, মৌমাছি বা হাতী সকলেরই ভ্রূণের আকৃতি এক। সে অবস্থায় সকল ভ্রূণ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সরল-শরীর এক-কোষময় আদিপ্রাণী প্রোটোজোয়ার মত দেখিতে। তাহার পরের অবস্থায় ভ্রূণের চেহারা হয় নানাপ্রকার কৃমি-কীটের মত। সে সময় সেই কৃমি-কীটের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর সকল ভ্রূণের আকৃতি একই প্রকারের। তাহার পর আরও কতকগুলা পরিবর্ত্তনের পর উচ্চশ্রেণীর সকল ভ্রূণের আকৃতি হয় স্কন্ধকাটা ল্যানস্লেট নামক মৎস্যের মত। তাহার পর মনুষ্য-ভ্রূণ মাছের আকৃতি, উভচর ভেকের আকার প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তবে স্তন্যপায়ী জীবের আকার ধারণ করে। স্তরে স্তরে নানা স্তন্যপায়ীর আকার পাইয়া শেষে বানরের আকার ধারণ করে। পরে নরের আকার লাভ করে।

উপরে যে কথা বলিলাম, তাহা হইতে একটা কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সকল জীব একই প্রকারের, তাহাদের ভ্রূণ বহুদিন অবধি একই রকমের থাকে। অর্থাৎ যদি মনুষ্যের পরিবর্ত্তনশীল ভ্রূণ মাত্র এক অবস্থায় ল্যানস্লেট মৎস্যের রূপ ধারণ করে তবু তাহাকে বানরের ভ্রূণের মত একই রকমের পরিণতির চক্রে অধিক দিন থাকিতে হয়। কারণ ল্যানস্লেটের ভ্রূণের ঐখানে শেষ, কিন্তু বানর ও মানুষের ভ্রূণকে ক্যাঙ্গারুর মত মারস্থপিয়াল জীব, ঘোড়ার মত ক্ষুরযুক্ত জীব, কুকুর জাতীয় জীব প্রভৃতির দেহ পর পর পাইতে হইবে। ভূমিষ্ঠ হইবার তিন চারি মাস পূর্ব্বের মানব ও বানর ভ্রূণ পাশাপাশি রাখিলে বলা শক্ত কোন্‌টি কোন্ জীবের ভ্রূণ। তেমনি গাধা, ঘোড়া, জেব্রার ভ্রূণের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের সংস্রব আছে বলিয়া তাহাদের পার্থক্য বহুদিন অবধি বুঝিয়া উঠা কঠিন।

এইরূপ ভ্রূণের দেহের জ্ঞাতিত্বের লক্ষণ অনেক সময় ভ্রূণ ছাড়িয়া শিশুর গাত্রে অবধি ফুটিয়া উঠে। বাড়িতে মুনিয়া পাখী পুষিলে এ কথা বুঝিতে পারা যায়। শৈশবকালে প্রায় সকল মুনিয়া দেখিতে এক রকম, কিন্তু যত দিন যায় তত যেন বিভিন্ন শ্রেণীর মুনিয়ার বিভিন্ন রূপের ছটা ফুটিয়া উঠে। কাহারও বর্ণ কাল হয়, কাহারও গায়ে ছোট ছোট দাগ হয়। আমি যৌবন-লক্ষণের কথা বলিতেছি না। সে তো সকল জীবের মধ্যে দেখা যায়। যৌবনে সিংহের কেশর হয়, মানুষের গোঁফ দাড়ি গজায়, ময়ূরের পুচ্ছ হয়, টিয়াপাখির গলায় "কণ্ঠী" বাহির হয়। এ সকল যৌবন-লক্ষণ। কিন্তু শৈশবকালে টিয়া ও চন্দনার বাচ্ছার বা ফুলটুসি ও মদনার ছানার, এমন কি মোরগ ও ময়ূর শাবকের পার্থক্য কয়জন ধরিতে পারেন? বাঘ ও সিংহের যৌবনের আকৃতি ত অত পৃথক, কিন্তু শৈশবে সিংহশিশুর গায়ে বাঘের মত ডোরা থাকে। সেরকম একটি সিংহ-শিশুর মৃত-দেহ আমাদের যাদুঘরের স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আছে। এই সকল লক্ষণকে শৈশব-লক্ষণ বা juvenile character বলে। আমি গতবৎসর শীতকালে দুইটি বুল্‌বুলি পুষিয়াছিলাম। শৈশবে তাহাদিগকে দেখিয়া সকলকেই বলিতে হইয়াছিল যে, সেগুলি সাধারণ রকমের কাল-বুল্‌বুলি। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাদের একটির উদর শুভ্র হইল এবং মাথার ঝুঁটি দৃঢ় হইল। তখন সকলে বুঝিল উহা কাঠ্‌রা বুল্‌বুলি।

তাহা হইলে আপনারা এখন বুঝিলেন যে ঘোড়ার ডিমের ভিতরের ঘোড়ার ভ্রূণ জন্মলাভ করিয়াই অশ্বের রূপ পায় না। পোকা-মাকড়, মাছ ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অশ্বভ্রূণ শেষে যেরূপ আকৃতি পায় তাহা গাধা, জেব্রা, কোয়াগা প্রভৃতি জীবের মত। শেষে সে ঘোড়ার রূপ পায় বটে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরও তাহার দেহে এমন সব শৈশব-লক্ষণ থাকে যাহা হইতে তাহার নিকট-আত্মীয়দের পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। আমি ঘোড়ার কথা বলিলাম কারণ আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি না আপনাদের মনুষ্য জাতির বিখ্যাত সুন্দরীদের জ্ঞাতি-ভগ্নী ওরাঙ-ওটাঙের কন্যা; অথবা আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অতি কান্তদেহ, শান্ত-স্বভাব তাঁহারা বরবপু পাইবার পূর্ব্বে মাতৃ-জঠরে এক একবার প্রটোজোয়া কৃমি, লানস্‌লেট, ভেক, কেঙ্গেরু, গরু, কুকুর প্রভৃতির অনুরূপ দেহ ক্ষণকালের জন্যও ধারণ করিয়াছিলেন। কথাটা বিরক্তিকর বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্‌দিগের অনুশীলন ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই বেশ-পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? ঘোড়ার ডিমের ভিতর যখন ঘোড়ার ভ্রূণ জন্মিল তখন সে ছোটখাট একটি ঘোড়া হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত। এত রকম সাজসজ্জা করিয়া কৃমি, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতির অনুরূপ রূপ ধরিতে ধরিতে অশ্বের রূপ ধরিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার পর কুকুর শৃগালের ভ্রূণই বা বহুদিন এক প্রকার থাকে কেন, আর শূকর ও শৃগালের ভ্রূণের পার্থক্যটা, কুকুর ও শৃগালের ভ্রূণের পার্থক্য ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বা ফুটিয়া উঠে কেন?

এই সকল ভ্রূণের সাদৃশ্যের মধ্যে বিজ্ঞান এক বিশেষ বিধির প্রক্রিয়া দেখিয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত যে, কোনও জীবের জাতীয় পরিণতির ইতিহাসের, সেই জাতীয় প্রত্যেক জীবের নিজের পরিণতির ইতিহাস—পুনরাবৃত্তি মাত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যে সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যজাতি নরত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে সেই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথাটা আরও খুলিয়া বলি—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্য ভ্রূণ প্রথমে এককোষ জীবের আকার ধারণ করে, তাহার পর নানা-প্রকার কীট, ষট্পদ, মৎস্য, সরীসৃপের দেহ ধারণ করে। ইহা হইতে বিজ্ঞান-বিদেরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি ঐরূপে হইয়াছে। এক-কোষ জীব হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া মনুষ্যজাতি জন্মিয়াছে। তাহার অন্যতম প্রমাণ ভ্রূণের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইংরাজ, ফরাসী বিশেষতঃ জার্ম্মান ভ্রূণ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়েরা সকল জীবের ভ্রূণ-তত্ত্ব অনুশীলন করিতেছেন এবং কোন্ ভ্রূণের সহিত মনুষ্যের কোন্ অবস্থার ভ্রূণের সৌসাদৃশ্য আছে তাহা মিলাইয়া মানুষের অভিব্যক্তির ক্রম নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কেবল মানুষের কেন, সমগ্র জীব-জগতের অভিব্যক্তির তালিকা রচনা করিতেছেন।

কিন্তু এইরূপ অনেক অনুশীলন করিয়া পণ্ডিত মহাশয়গণ যে সকল তালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে ঐক্য নাই। আমি প্রবন্ধটি অধিক জটিল করিতে চাহি না। কেবল দুইটি তালিকার উল্লেখ করিব মাত্র। ইংলণ্ডের স্যার রে ল্যাঙ্কেষ্টার অভিব্যক্তির যে ক্রমনির্দ্ধারণ করিয়াছেন, জার্ম্মানীর হিকেল সাহেবের ক্রমের সহিত এ ক্রম মিলে না। ইংরাজ ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের মতানৈক্যের কারণ অবশ্য ইহাঁদের আধুনিক জাতীয় দ্বন্দ্ব নয়। হিকেল প্রসঙ্গ-ক্রমে ভ্রূণ-তত্ত্ব অনুশীলন করিবার যে বাধা-বিঘ্নের কথা বলিয়াছেন, আমার বোধ

হয় তাহার দ্বারা এ বৈষম্যের সমাধান করা যাইতে পারে। মোটের উপর নিয়মটি সত্য যে, কোন জাতির অভিব্যক্তির ক্রম তজ্জাতীয় প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিগত পরিণতির ক্রমে পাওয়া যায়। তবে কেন সেই ক্রম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইল ?

জাতীয় অভিব্যক্তির ক্রম ব্যক্তিত্বের পরিণতির ইতিহাসে পাওয়া যায়--বলিয়াছি বলিয়া ভাবিবেন না যে সকল ক্রমগুলির লক্ষণ ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে লক্ষিত হয়। যদি অভিব্যক্তির ক্রম হয় ক, খ, গ, ঘ, ঙ—তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই ভ্রূণের পরিণতির ইতিহাসে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, দেখিতে পাই না। কখনও পাই ক গ ঙ কখনও পাই খ গ ঙ, কখনও পাই ক খ ঙ ইত্যাদি। কাজেই মাঝের ফাঁক—যাহার চিহ্ন লোপ হইয়াছে সেটা কি ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নয়। অনেকস্থলে ঠিক ক্রমের লক্ষণ ভ্রূণ দেখাইতে দেখাইতে আবার কতকগুলা ব্যতিক্রম দেখায়। যেমন ঠিক ক, খ, গ, ঘ, ঙ—না দেখাইয়া ইহা হয়ত দেখায় ক, খ, G, ঘ, ঙ অথবা ক, গ, S, ঙ। এই G, বা S রূপ ব্যতিক্রম গুলাকে প্রথমতঃ ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে এবং দ্বিতীয়তঃ উহাদের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক গণ্ডগোল বাধে। অন্য জাতীয় জীবের ভ্রূণ লইয়া পরীক্ষা করা যত সহজ, মানুষের ভ্রূণ লইয়া পরীক্ষা করা তত সহজ নয়। কারণ এরূপ অনুশীলন করিতে গেলে নরহত্যা করিতে হয়। ইহাতেই পণ্ডিত মহাশয়দিগের মতানৈক্য হওয়া সম্ভব।

এ প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—

(১) ঘোড়ার ডিম অলীক নয়।

(২) ঘোড়া ডিম পাড়ে না বটে কিন্তু দেহের মধ্যে ডিম রাখে এবং তাহাতে অশ্ব-ভ্রূণের পরিণতি হয়।

(৩) ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি সকল জীবের ভ্রূণ নানাপ্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।

(৪) এই সকল ব্যক্তিগত রূপান্তর ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির জাতীয় অভিব্যক্তির ক্রম সূচনা করে এবং

(৫) ভ্রূণে সকল ক্রম ঠিক যথাযথ পাওয়া যায় না এবং মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মানুষের অভিব্যক্তির ক্রম বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত পরিণতির ক্রম জাতীয় অভিব্যক্তির ক্রমের পুনরাবৃত্তি—এ নিয়মকে হিকেল সাহেব অভিব্যক্তির মূল নিয়ম বা **fundamental law** বলিয়াছেন।

প্রতীক্ষা।

[শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি, এ।]

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় কারেণ্টান নগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাদাম ডিডের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এখানে বৈঠক বসিলেও সেই রাত্রের বৈঠকের কিছু বিশেষত্ব ছিল। দুই দিন পূর্ব্বে মাদাম ডিডে প্রচার করেন যে, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সে রাত্রে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিবেন না। অন্য সময় হইলে হয়তঃ সে নগরের কেহ মাদামের এই আকস্মিক ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করিত না; কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন ফ্রান্সের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কেতন উড্ডীন হইয়াছে। তখন, ফরাসী-বিপ্লবের অরাজকতায় সকলে শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছিল। বিশেষতঃ ধনীদিগের পক্ষে তখন বড়ই দুঃসময়। বিন্দুমাত্র সন্দেহে তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত। সুতরাং মাদামের এই আকস্মিক ব্যবহারের ফল যে কোন মুহূর্ত্তে শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই, দুই রাত্র মজলিস বন্ধ রাখিবার পর মাদাম সহসা আবার উৎসবের আয়োজন করায় সভাস্থ সকলেই অতিমাত্র বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত মাদামকে লক্ষ্য করিতেছিল।

সেই বিপ্লববাদের অভিব্যক্তির সময় মাদাম কারেণ্টান নগরে কি ভাবে বাস করিতেন, সাধারণে তাহাকে কি চক্ষে দেখিত, তাহা জানা আবশ্যক। মাদামের স্বামী ফরাসী-বাহিনীর লেপ্‌ট্‌নাণ্ট-জেনারেল ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া, তিনি রাজধানী মধ্যে বাস নিরাপদ নহে বিবেচনায় কারেণ্টানে আগমন করেন। এখানে তাঁহার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সুদূর দেশে তিনি কতকটা নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার ধারণাই সত্য হইয়াছিল। কারণ এই বিপ্লবে উত্তর ফ্রান্সের ন্যায় দক্ষিণ ফ্রান্সে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হয় নাই। মাদাম এখানে আসিয়া স্থানীয় রাজপুরুষ ও অধিবাসীবৃন্দের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ তাহাকে ঘৃণা বা হিংসা না করে তজ্জন্য সকলকে প্রত্যহ নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও ব্যবহারের মাধুর্য্যে তিনি সকলকে বশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টত্রিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহে পূর্ণযৌবনের লাবণ্য না থাকিলেও তখনও যে তিনি সুন্দরী ছিলেন তাঁহা সকলেই স্বীকার করিত। ক্ষীণ, সুগঠিত দেহে একটা কমনীয়তা তখনও বিরাজ করিতেছিল। কথা কহিবার সময় আবেগে তাঁহার মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিত। কৃষ্ণতায় উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়ে সর্ব্বদা করুণার ধারা প্রবাহিত হইলেও এক শান্তশীতল জ্যোতিঃ তাহা হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে জানাইত যে, তিনি নিজ সুখের জন্য জীবনধারণ করিতে ছিলেন না। অতি অল্প বয়সে এক ঈর্ষাপরবশ বৃদ্ধের সহিত মাদামের বিবাহ হয়। স্বামীর ব্যবহারে ও সর্ব্বদা উচ্ছৃঙ্খল রাজসভার সংসর্গে বাস করাতে তাহার মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জ্যোতির পরিবর্ত্তে বিষাদের কালিমায় আবৃত হইয়াছিল। তাঁহার নারী-হৃদয় ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই কে তাহাকে অচল শিলাখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল,—ফলে, অতৃপ্ত বাসনারাশি তাহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে সুপ্ত ছিল। এই কারণে মাদামের বহির্সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্যটা আরও রমণীয় ছিল। এই সৌন্দর্য্যই সময়ে সময়ে তাঁহার বদনে প্রতিভাত হইত। তাঁহাকে দেখিলেই সম্মান করিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহার ব্যবহারে ও কথায় এক অব্যক্ত মাদকতা মাখান ছিল—সে মাদকতা শুধু যৌবন-লাবণ্যভরা নারীতেই সম্ভবে। সরল ব্যক্তি প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু তাঁহার গৌরব-মণ্ডিত আত্মসম্ভ্রম প্রাণে শঙ্কার সৃষ্টি করিত। তাহারা বুঝিত যে, মাদামের আত্মা সাধারণ মানবের আত্মা অপেক্ষা অনেক উচ্চে বিচরণ করে।

শুধু একটি বৃত্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল—সেটি মাতৃস্নেহ। তাঁহার হৃদয়ের সব বৃত্তিগুলি একমাত্র পুত্রের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। এই পুত্র দূরে থাকিলে তিনি নিজ দুর্ভাগ্যে আক্ষেপ করিতেন, কল্পিত শঙ্কায় কাতর হইতেন, আর নিকটে আসিলেও তাহাকে দেখিয়া কখনও পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই পুত্রের জন্যই তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাহার আর কোন আত্মীয় ছিল না। এই পুত্র তাহার স্বামীর বংশের একমাত্র প্রতিনিধি। সুতরাং অতি যত্নে, অনন্যসাধারণ ক্লেশস্বীকার করিয়া তিনি এই পুত্রটিকে লালনপালন করিয়াছিলেন। পুত্রও মাতাকে যথার্থই ভাল বাসিত। স্নেহের চক্ষে তাহারা পরস্পরের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এই যুবক সাবলেপ্টনাণ্টের পদ লাভ করিয়া ফ্রান্সের তৎকালীন রীতি-অনুযায়ী রাজপুত্রের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিপ্লব-

বাদীরা যখন প্রচার করিল যে, রাজবংশীয়ের সহিত যাহারা বিচরণ করিবে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে, তখন তিনি পুত্রের অনুগামী হইলে তাহাকে হয়তঃ পথের ভিখারী হইতে হইত। পুত্র কুশলে থাকিলেই তাঁহার শান্তি, এই ভাবিয়া পুত্রকে ছাড়িয়া তিনি কারেণ্টনে আসিলেন ও স্থানীয় সকলকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রধান হইবার চেষ্টা সে যুগে বড় নিরাপদ ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি যখন মাতৃত্বের মূর্ত্তি ধরিয়া দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে দেখা দিতে লাগিলেন, দ্বিধাশূন্য হইয়া সকলের দুঃখ দূর করিতে লাগিলেন, ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতে লাগিলেন, তখন দরিদ্রগণ তাঁহাকে ভক্তির অঞ্জলি দিতে লাগিল। এদিকে নিত্য নূতন উৎসবের দ্বারা তিনি ধনীদেরও বশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাটীতে নগরের প্রোকিউরার, মেয়র, প্রেসিডেণ্ট, সরকারী উকিল ও এমন কি সাধারণ-তন্ত্রের বিচারালয়ের বিচারকবৃন্দ পর্য্যন্ত পদার্পণ করিতেন। ইহাদের মধ্যে, প্রথমোক্ত চারিজনের শুধু এই সুন্দরী বিধবাটীর উপর নহে, তাহার বিপুল সম্পত্তির উপরও বিলক্ষণ লোভ ছিল। এই সরকারী উকিল পূর্ব্বে মাদামের এটর্ণী ছিলেন—সুতরাং তিনি মাদামের সম্পত্তির পরিমাণ পর্য্যন্ত বেশ জানিতেন। বহু দিনের ব্যবহারেও মাদাম ইহাকে চিনিতে পারেন নাই। এ ব্যক্তি নিজ মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া মাদামের সহিত মৌখিক সদ্‌ব্যবহার করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল।

কাউণ্টেস কারেণ্টান নগরের সকলের হৃদয়ে এমন একটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, যখন এক সন্ধ্যায় তাহারা সহসা শুনিল যে, কাউণ্টেস তাহাদিগকে নিজ প্রাসাদে অভ্যর্থনা করিতে অক্ষম তখন সত্যই তাহারা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ইহার কারণ জানিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহাদের শত প্রশ্নের উত্তরে কাউণ্টেসের বৃদ্ধা পরিচারিকা বৃজিটি শুধু জানাইল যে, তাহার মনিব গৃহ মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না—এমন কি, বাটীর কাহারও সহিত নহে!

তখন চিরন্তন প্রথানুযায়ী উক্ত নগরের সকলে নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রয়োগে কাউণ্টেসের এই আচরণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "কাউণ্টেসের পীড়া হইলে নিশ্চয়ই ডাক্তার ডাকা হইত। কিন্তু ডাক্তার সারাদিন আমার বাটীতে দাবা খেলিয়াছে। ডাক্তার পরিহাস করিয়া

আমায় বলিতেছিল যে, আজকাল এক রকমের ব্যাধিরই আধিক্য দেখা যাইতেছে······তাহা দুরারোগ্য !”

কাউন্টেস যে এ বয়সে উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবেন তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিল না। পরদিন কিন্তু সকলের মনে এক সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। কারণ সে দিন বৃজিটি অন্যদিন অপেক্ষা অধিক বাজার করিয়াছিল। ঘটনাটা সত্য। সেদিন বাজারে একটি মাত্র শশক বিক্রয়ার্থ আসে। বৃজিটিই তাহা অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করে। তারপর নগরের বৃদ্ধরা বলিল, তাহারা প্রাতঃ-ভ্রমণে যাইয়া কাউন্টেসের বাটীর সাম্‌নে দিয়া বেড়াইবার সময় লক্ষ্য করিয়াছে যে, মাদামের বাটীতে খুব কাজের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সকলে এ সম্বন্ধে আবার গবেষণা আরম্ভ করিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালেও যখন সকলে জানিল যে, কাউন্টেস তখনও সুস্থ হন নাই, তখন তাহারা নগরের মেয়রের ভ্রাতা এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর বাটিতে মজলিস বসাইল। নগরের সকলেই এই বৃদ্ধকে সম্মান করিত। কাউন্টেসও তাহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। বৃদ্ধের বাটীতেও সকলে কাউন্টেসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। সরকারী উকিল নাটকীয় কলা-কৌশলের সহিত বর্ণনা করিল যে, কাউন্টেসের পুত্র আসিবে। মেয়র বলিল, কোন পুরোহিত ‘লাভেণ্ডী’ হইতে পলাইয়া আসিয়া কাউন্টেসের নিকট আশ্রয় লইয়াছে। জেলার প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, কোন চৌয়ান বা ভেণ্ডিয় দলপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া এখানে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, কোন পদস্থ ব্যক্তি কারাগার হইতে পলাইয়া আসিয়া কাউন্টেসের নিকট আশ্রয় লইয়াছে। মোটের উপর সকলেরই কথার তাৎপর্য্য, কাউন্টেস কোন বিপন্নের প্রতি দয়া দেখাইতে গিয়া তৎকালীন আইন অনুযায়ী ‘অপরাধিনী’ হইয়াছেন ও এজন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে ফাঁসী যাইতে হইবে। শুধু সরকারী উকিল বলিলেন, “যাহাই হউক, এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, এ ব্যাপার লইয়া মোটে আন্দোলন না করিয়া কাউন্টেসকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করা।” তিনি আরও বলিলেন, “যদি তোমরা এই ঘটনাটা প্রচার করিতে থাক, তাহা হইলে আমাকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ফলে কাউন্টেসের প্রাসাদে খানাতল্লাস হইবে— আর তারপর—” তিনি বলিতে বলিতে চুপ করিলেও সকলে তাঁহার বাকি কথা-টুকুর মর্ম্ম বুঝিয়াছিল।

উক্ত নগরে কাউন্টেসের যে কয়জন যথার্থ বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত

কাউণ্টেসের এই আচরণে শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তৃতীয় দিনে কমিউনের প্রকিউরার তাঁহার পত্নীকে দিয়া কাউণ্টেসকে জানাইলেন যে, তিনি যেন সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বের ন্যায় আবার উৎসবের আয়োজন করেন। বৃদ্ধ বণিক কিন্তু আরও একটু সাহসী হইয়া সেই প্রাতে কাউণ্টেসের বাটী উপস্থিত হইলেন। দ্বার পার হইয়াই তিনি লক্ষ্য করিলেন, কাউণ্টেস বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। অনুকম্পা-কাতর প্রাণে বৃদ্ধ ভাবিলেন, সে নিশ্চয় তাহার প্রণয়ীকে বাটীতে আশ্রয় দিয়াছে। কাউণ্টেসের মুখভাব দেখিয়াও তাহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। নারী-হৃদয়ের এই প্রগাঢ় অনুরাগ ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে বৃদ্ধের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি নগরবাসীর মনোভাব কাউণ্টেসকে জানাইলেন ও শেষে বলিলেন, "যদি তুমি কোন পুরোহিতকে আশ্রয় দিয়া থাক তাহা হইলে অনেকে হয়তঃ তোমার পক্ষ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তুমি যদি তোমার প্রণয়পাত্রকে আশ্রয় দিয়া থাক, তাহা হইলে কেহ তোমার প্রতি করুণার লেশমাত্র দেখাইবে না।" এই কথায় কাউণ্টেস শুধু বৃদ্ধের দিকে এক কটাক্ষপাত করিলেন। সে দৃষ্টিতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ছিল—বৃদ্ধের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল!

তারপর তিনি বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গেলেন ও নিজ বক্ষদেশ হইতে একখানি মলিন পত্র বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন ও রুদ্ধ-স্বরে শুধু বলিলেন "পড়ুন"। তিনি অবসন্ন দেহে একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ এদিকে নিজ চশমাজোড়া বাহির করিয়া তাহার কাঁচ দুইখানি পরিষ্কার করিতেছিলেন। সহসা কাউণ্টেস তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।" বৃদ্ধ শুধু বলিলেন, "আমি কি তোমার সহযোগিতা করিতে আসি নাই?" কাউণ্টেসের দেহ কাঁপিয়া উঠিল। এই নগরে তিনি আজ একজন বন্ধু পাইলেন।

বৃদ্ধ পড়িলেন, কাউণ্টেসের একমাত্র পুত্র গ্রেনভাইল অভিযানে যোগদান করে। যুদ্ধে সে বন্দী হয়। সেস্থানের কারাগার হইতে সে মাতার নিকট করুণ অথচ আশাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র প্রেরণ করিয়াছে। কারাগার হইতে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে মাতাকে জানাইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট তিন দিনের মধ্যে সে ছদ্মবেশে মাতার নিকট পৌঁছিবে। যদি সে না আসিতে পারে তাহা হইলে মর্ম্মস্পর্শী বেদনা মাখান ভাষায় মাতার নিকট শেষ বিদায় চাহিয়াছে!

পত্রসমেত বৃদ্ধের হাতখানি কাঁপিতেছিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বুদ্ধি-

মতীর মত কার্য্য করিতে পার নাই। বাটীতে এত খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিলে কেন?" "পুত্র যখন আমার নিকট আসিবে তখন অত্যধিক পথশ্রমে ও অতিমাত্র ক্ষুধার জ্বালায়—" অভাগিনী আর বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ বুঝিলেন। বলিলেন, "আমি আমার ভ্রাতাকে তোমার পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিব।"

অতীতে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে বৃদ্ধ বণিক কার্য্য করিতেন এখন সেই বুদ্ধির সাহায্যে কাউণ্টেসকে কতকগুলি সুপরামর্শ দান করিয়া তিনি প্রাসাদত্যাগ করিলেন। পরে নানাছলে প্রত্যেকের বাটী দেখা দিয়া জানাইলেন যে, সেই সন্ধ্যায় কাউণ্টেস তাঁহার প্রাসাদে আবার মজলিসের ব্যবস্থা করিতেছেন। কাউণ্টেসের বাত হইয়াছিল। গ্রাম্য ডাক্তার ট্রানচিনের ব্যবস্থামত জীবন্ত শশকের চামড়া বক্ষ মধ্যে রাখিয়া দুইদিন বিশ্রাম করাতেই তিনি বিষম বাতব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, নগরের কাহারও বাত হইলে ট্রান্চিন তাহার এই প্রিয় ঔষধটিই সকলকে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিত। অনেকে বৃদ্ধ বণিকের এই কথায় আস্থাস্থাপন করিলেও জনকয়েক ব্যক্তি ইহাতে মোটে সন্তুষ্ট হয় নাই। সরকারী উকিলও তাহাদের মধ্যে একজন।

*   *   *   *   *

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আসিয়া দেখিল, কাউণ্টেস একটি বড় চিম্নীর পাশে একখানি কেদারায় বসিয়া আছেন। তাহারাও অগ্নিকটাহের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে উপবেশন করিল। সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু বৃদ্ধ বণিকের চক্ষেই করুণা ও সহানুভূতি ভাব দর্শনে সাহসী হইয়া কাউণ্টেস অতিমাত্র ধীরতার সহিত সকলের অর্থহীন আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যাবলী সহ্য করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সাধ্যমত তাহাদের আলাপনে যোগদান করিয়া সকলকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কেবল সরকারী উকিল ও একজন বিচারক নীরবে একপার্শ্বে বসিয়া কাউণ্টেসকে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল ও কক্ষের কোলাহল সত্ত্বেও বাহিরের কোন শব্দ শুনিলে উৎকর্ণ হইয়া তাহার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন প্রশ্ন দ্বারাও তাহারা কাউণ্টেসের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিতে প্রয়াস পাইতেছিল। শুধু মাতৃস্নেহের বলে বুক বাঁধিয়া কাউণ্টেস শান্তভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। বস্তুতঃ এক সুদক্ষ অভিনেত্রীর ন্যায় তিনি নিজ ভূমিকা অভিনয় করিতেছিলেন।

তারপর সকলে ক্রীড়ায় বসিলে তিনি 'লোটো' আনিবার ছলে নিজ কক্ষে আসিলেন। সম্মুখে বৃজিটিকে দেখিয়া বলিলেন, "বৃজিটি আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে!" দুঃখ ও মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষুদ্বর্য় জলভারাক্রান্ত হইল। একবার চক্ষে হাত দিবামাত্র পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় অশ্রুরাশি ঝরিতে লাগিল। শয়নকক্ষের দিকে চাহিতেই তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সে তো এখনও আসিতেছে না! সে আসিবে—নিশ্চয় আসিবে। সে বাঁচিয়া আছে—আমার স্থির বিশ্বাস সে বাঁচিয়া আছে। বৃজিটি কিছু শুনিতে পাইতেছ? ওঃ, সে ধরা পড়িয়াছে কি এখন এই নগরের দিকে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য আমি আমার জীবনের বাকী অংশটুকু ছাড়িয়া দিতে এখনই প্রস্তুত।"

কক্ষের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিক আছে কি না তিনি দেখিলেন। তখন চুল্লীমধ্যে অগ্নি পূর্ণতেজে জ্বলিতেছে। জানালার শার্শীগুলি বন্ধ আছে—আসবাবপত্র মার্জ্জিত হইয়া চক্‌চক করিতেছে। দুগ্ধফেননিভ শয্যার দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, কেবল দাসী নহে গৃহকর্ত্রীও শয্যা-বিস্তার কালে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পুষ্পপরাগসহ মাতৃস্নেহের অনাবিল সৌগন্ধ কক্ষটিকে আমোদিত করিতেছিল। পথক্লান্ত সৈনিকের কি অভাব, তাহার সুখের জন্য কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা কাউণ্টেসের মাতৃহৃদয় বেশ বুঝিত। তাই কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্য সু-খাদ্য, শ্রেষ্ঠ মদ্য, নূতন পাদুকা, পরিষ্কৃত বসন সমুদয়ের মধ্যেই মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি হইতেছিল।

সহসা চমকিত হইয়া কাউণ্টেস বলিলেন, "ঐ আটটা বাজিতেছে! সে আসিবে—এখনই আসিবে।"

আর অধিকক্ষণ বৈঠকখানা ছাড়িয়া থাকিতে তাঁহার সাহস হইল না। বৈঠকখানা মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, যদি পথে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়! তখন বৃজিটির স্বামী উৎসুক হৃদয়ে বহির্দ্বারে পাহারা দিতেছিল। আর কাউণ্টেস পথের প্রত্যেক শব্দে চমকিত হইয়া আশা করিতেছিলেন, ঐ বুঝি পুত্র আসিয়া তাহার প্রাসাদ দ্বারে দাঁড়াইল!

* * * * *

ঠিক এই সময়ে এক যুবক প্যারীনগরী হইতে যাত্রা করিয়া কারেণ্টান নগরের দিকে আসিতেছিল। তখন সেনাদল পর্য্যন্ত সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিবার সময় পাইত না। নাগরিকের দল নাগরিকের বেশেই প্রজাতন্ত্রের সেনাদলে

যোগদান করিত। এই যুবকটিও সেনাদলের একজন। সে তাহার দল ছাড়াইয়া আগে আগে আসিতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা তখন শুভ্র রজতকিরণ-ধারা ঢালিয়া ধরাতল প্লাবিত করিয়া দিলেও দূরে পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ ক্রমেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছিল। সুতরাং যুবক ক্লান্ত হইলেও যথাসাধ্য দ্রুত পাদক্ষেপে নগরের দিকে আসিতেছিল। তাহার পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র পেটিকা ও হস্তে একগাছি মোটা লাঠি ছিল।

সে যখন নগরে প্রবেশ করিল তখন নগর নীরবতার শান্তিমাখা ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সে ঘুরিতে ঘুরিতে এক তন্তুবায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া মেয়রের বাটী উপস্থিত হইল। মেয়র তাহাকে পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, হাঁ বড় ঘরের ছেলে বটে!

"তোমার নাম কি?"

"জুলিয়ান জুসিউ"।

"কোথা হইতে আসিতেছ?"

"প্যারী হইতে।"

"তোমার সঙ্গীরা বোধ হয় এখনও দূরে আছে?"

"তাহারা আমার তিন লীগ পিছনে।"

মেয়র তাহাকে কাউণ্টেসের বাটী রাত্রিতে থাকিবার আদেশ দিলেন। সেনাদের এই ভাবে আশ্রয়দান করিতে তখন সকলে বাধ্য ছিল।

তখন রাত্র সাড়ে নয়টা। অভ্যাগতের দল একে একে বিদায় লইতেছিল। তখনও শুধু সরকারী উকিল যায় নাই। কাউণ্টেস কম্পিত-হৃদয়ে তাহার প্রস্থান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সহসা সরকারী উকীল বলিল, "সিট্‌নী! আমি প্রজাতন্ত্রের আইন প্রতিপালন করিতে বাধ্য।" কাউণ্টেসের বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। উকিল বলিল, "তোমার কি আমার নিকট প্রকাশ করিবার কিছুই নাই?"

যথাসাধ্য মনোভাব দমন করিয়া তিনি বিস্ময়সূচক স্বরে বলিলেন, "না।"

উকিল কাউণ্টেসের পাশের চেয়ারে বসিলেন, কোমল স্বরে বলিলেন, "হায়-নারী! এ সময় একটা কথা তোমায় ও আমায় ফাঁসীকাষ্ঠে লট্‌কাইতে পারে। আমি তোমার হাবভাব আগাগোড়া লক্ষ্য করিতেছি ও বেশ বুঝিয়াছি যে, তুমি আজ সকলকে প্রতারিত করিয়াছ। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তুমি তোমার পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছ।"

কাউণ্টেস অসম্মতি-সূচক শিরঃসঞ্চালন করিলেও তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, উকিলের হিংস্র চক্ষু ইহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, "বেশ তাহাকে আসিতে দাও। কিন্তু কাল সকাল সাতটার পর সে যেন এখানে না থাকে। কারণ কাল হয়তঃ সরকারী পরোয়ানা লইয়া আমাকে তোমার বাটী খানাতল্লাস করিতে আসিতে হইবে।"

উদ্‌ভ্রান্ত ও নির্নিমেষ নয়নে কাউণ্টেস তাহার মুখ পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি হিংস্র ব্যাঘ্রের প্রাণেও করুণার ধারা প্রবাহিত করিতে পারিত! তখন সাধ্যমত মিষ্টস্বরে সে বলিল, "আমি তোমার দেশহিতৈষিতা, তোমার বদান্যতা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া প্রজাতন্ত্রের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিব।"

কাউণ্টেস বুঝিলেন, তাহাকে জালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছিল—মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নির্ব্বাতনিষ্কম্প দীপের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

সহসা কে দ্বারে করাঘাত করিল।

ত্রস্তে উকিলের পদনিম্নে জানু পাতিয়া বসিয়া কাউণ্টেস বলিলেন, "তাকে বাঁচাও, ওগো তাকে বাঁচাও!"

লালসামদির নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া উকিল বলিল, "নিশ্চয়, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে—আমাদের প্রাণ বিনিময়েও!"

সে কাউণ্টেসের হাত ধরিয়া তুলিল।

কাউণ্টেস শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, "হায়! আমার সর্ব্বনাশ হইল!"

উকিল বলিল, "মাদাম, এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ আমি তোমার নিকট কিছু চাই।"

কক্ষে কর্ত্রী একাকিনী আছেন এই ভাবিয়া বৃজিট চীৎকার করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী! সে"—আনন্দে জ্ঞানহারা হইয়া সে ঐ কথা বলিতে বলিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু সরকারী উকিলকে তথায় দেখিয়া তাহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না!

খুব সপ্রতিভ ভাবে উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র কথা বলিতেছ, বৃজিট?"

* * * *

সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা না থাকিলেও কাউণ্টেস মানসিক উত্তেজনার

বশবর্ত্তী হইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, দ্বার উন্মোচন করিলেন ও পুত্রকে দেখিতে পাইয়া দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি রুদ্ধ-কণ্ঠে শুধু বলিলেন, "আমার পুত্র, আমার পুত্র!"

তিনি পুনঃ পুনঃ পুত্রের মস্তক চুম্বন করিতে লাগিলেন। অপরিচিত কণ্ঠে সেই সেনা ডাকিল "মাদাম!"

সহসা সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ত্রস্তে পিছাইয়া আসিয়া মাদাম বলিলেন, "এতো সে নহে!"

তাহার দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বৃজিটি বলিল, "হাঃ ভগবন! ঠিক তাহারই মত দেখিতে!"

এক মুহূর্ত্তকাল কেহ কথা কহিল না। কাউণ্টেসের সেই হতাশব্যঞ্জক চাহনীতে সৈন্যটি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল।

কাউণ্টেসের পক্ষে এই আঘাত মর্ম্মান্তিক হইল। তিনি নিজ দুঃখের পরিমাণ এইবার বুঝিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বৃজিটির স্বামী তাঁহাকে ধরিলে তিনি সেনাটিকে বলিলেন, "আমি তোমাকে দেখিতে পারি-তেছি না। আমায় ক্ষমা কর। ভৃত্যগণ তোমার সেবা করিবে।"

বৃজিটি তাঁহাকে টানিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল।

ক্ষণপরে বৃজিটি বলিল, "মা! ঐ সৈন্যটা কি অগষ্টির বিছানায় শয়ন করিবে? অগষ্টির জুতা পায়ে দিবে? অগষ্টির খাদ্য খাইবে? আমার ফাঁসী দিলেও আমি কিন্তু—"

বাণাহত হরিণীর মত কাউণ্টেস চমকিয়া উঠিলেন, আর্ত্তস্বরে শুধু ডাকিলেন, "বৃজিটি!"

বৃজিটির স্বামী ধমক দিয়া তাহাকে বলিল, "তুই কি কর্ত্রীকে হত্যা করিতে চাহিস্ নাকি?"

এই সময় পাশের কক্ষে অগষ্টির ঘরে সেনাটি চেয়ারে বসাতে কক্ষমধ্য হইতে একটা শব্দ আসিল। সে শব্দ মাদামকে বড়ই বিচলিত করিল। তিনি বলিলেন, "আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না। চল সবজীঘরে যাই। রাত্রে বাহিরে কি হইতেছে তাহা সমস্তই সেখান হইতে দেখিতে পাইব।"

এখনও পুত্রকে পাইবার ক্ষীণ আশা তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল।

বাহিরে ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজমান ছিল। সহসা সেনাদল নগরমধ্যে প্রবেশ করাতে তাহাদের কোলাহল কাউণ্টেসের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। প্রতি শব্দে, প্রতি পদশব্দে তিনি আশা করিতেছিলেন, ঐ বুঝি তাঁহার নয়নের মণি, সংসারের একমাত্র অবলম্বন আসিতেছে! আর ক্ষণপরেই তিনি বুঝিতেছিলেন যে, তিনি প্রতারিত হইতেছেন!

আবার সমস্ত নগর নীরব গম্ভীর হইল। সমস্ত রাত্রি পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় সবজীঘরে বসিয়া বসিয়া ঊষাকালে তিনি কক্ষে ফিরিলেন। বৃজিটি সর্ব্বক্ষণই তাহার মনিবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কাউণ্টেস কক্ষে প্রবেশ

করিবার কিছু পরেই সে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু কক্ষদ্বারে পা দিয়াই সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার নারী-হৃদয় বিষম কাঁপিয়া উঠিল। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সে দেখিল, ধরাতলে কাউণ্টেসের মৃতদেহ পড়িয়া আছে!

পার্শ্বের কক্ষে সেই সেনাটি তখন বেড়াইতেছিল ও গুণ গুণ স্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছিল। বুজিটি সিদ্ধান্ত করিল, "আঃ হতভাগা সেনাটা এক রাত্রেই বাড়ীটাকে যেন আস্তাবল করে তুলেছে! নিশ্চয়ই ওর চীৎকার ও পদশব্দে কর্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।"

ঠিক তাই নহে,—আরও একটা মহৎ চিত্তবৃত্তি কাউণ্টেসকে নিহত করিয়াছে। পুত্রের চিন্তাই তাঁহাকে স্বপ্নের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছিল—সেই চিন্তাই তাহাকে সংসার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিল—সন্দেহ নাই। ঠিক যে সময় কাউণ্টেসের পুত্রকে 'লীমর্ব্বিহান' নামক স্থানে পশুর মত গুলি করিয়া মারা হয়, ঠিক সেই সময়ই কাউণ্টেস ধরাশয্যা গ্রহণ করেন। *

সাহিত্য প্রসঙ্গ।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

যাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছু খবর রাখেন, তাঁহারা ভালরূপেই জানেন যে 'কথ্য ভাষা'র প্রচলন লইয়া কতকগুলি মাসিক কিরূপ খেপিয়া উঠিয়াছে। এতাবৎ 'অর্চ্চনা' এবং বর্ত্তমানে 'ভারতবর্ষ' প্রমাণ যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া আসিতেছে যে, চল্‌তি ভাষা সাহিত্যে চলিবে না। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় মন্তব্যসহ পণ্ডিতপ্রবর 'জে বীমস্‌ লিখিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য সমাজের যে অনুষ্ঠান পত্র'খানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা অবিকল পুনর্মুদ্রিত করিলাম। এই পত্রে ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি ও প্রতিপত্তির ইতিহাসও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আশা করি, যুধ্যমান সাহিত্যিকবৃন্দ ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন এবং নিজেদের ভ্রম ও ক্রটীস্বীকারের অবসর পাইবেন।

* * *

দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত 'একাডেমি' গুলি কিরূপে জাতীয় ভাষা গঠনে সহায়তা করিত, এই অনুষ্ঠানপত্রে তাহারও বিশেষ আলোচনা আছে। 'অভিধান প্রস্তুত করাই এই সব সভার মূল কর্ম্ম' ছিল। বাঙ্গালা ভাষারও একটা গতি-নির্ণয়ের জন্য বীমস্‌ সাহেব সেই আদর্শে একটী সভাস্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী হউক বা

---

* বিখ্যাত ফরাসী গল্পলেখক বালজ্যাকের গল্পের অনুবাদ—লেখক।

নাই হউক, বিভিন্ন শাখাসম্বলিত আমাদের সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপে ২।৩ শতাব্দী পূর্ব্বে স্থাপিত একাডেমিগুলি স্ব স্ব দেশের ভাষায় যে উপকার করিতে পারিয়াছে, দুঃখের বিষয় আধুনিক দিনে আমাদের সাহিত্য পরিষৎ তাহার কণামাত্র পারে নাই। ইহা আমাদের গৌরবের কথা নহে—লজ্জার কথা। এখনও যদি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পণ্ডিতবর বীম্‌স্‌ সাহেবের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অশেষ উপকার-সাধন করা হইবে এবং সাহিত্য পরিষৎও গৌরবমণ্ডিত হইবে।

* *
*

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ—(অনুষ্ঠান পত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশ পর্য্যটন বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন। অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। এক দল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা পাঁচটি প্রধান; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইটালীয়, এবং স্পানীয়। তত্তদ্দেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য পুস্তকাদির জন্য এক একটী পৃথক ও সুনির্ণীত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলটিক্ হইতে আল্প পর্য্যন্ত সকল জরমান জাতি, সাবয় হইতে পালারোয় পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা এবং কাটালান গালিসিয়ান; আণ্ডালুসিয়ান কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক এক সুনির্ণীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ ভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ঐ ঐ ভাষার ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডে "হাবলক দি ডেন" লিঙ্কন্ প্রদেশের স্থানীয় ভাষায়, "পিয়র্স প্লোমান" হাণ্টস প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত। বারবর এবং সর ডেবিড

লিণ্ডসে উত্তর প্রদেশীয় ইংরাজি অর্থাৎ "লোলাণ্ড" স্কচে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্ব্বমান্য কোন ভাষার সহিত তুলনা না করিলে খণ্ডদেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না. এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা "লিণ্ডসের" স্কচ. এবং লাংলাণ্ডের ষ্ট্রাফোর্ডশায়র ইংরাজি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সপ্তম হেনরির রাজ্য কালে বিদ্রোহ শান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাশীল ধনগুণবিশিষ্ট মহাত্মাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করাতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতভাব গ্রহণ করিয়াছিল। এবং এলিজেবেথের রাজ্যকালে অদ্বিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখকচূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে ইংরাজি ভাষা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্য, তদবধি আধুনিক ইংরাজি ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তদ্রাজ্যের যেরূপ ছিন্নাবস্থা. ভাষারও তদ্রূপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সে সকল ভাষাই লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেণ্ট এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেন্সল. অর্থাৎ অক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান। নরমান্ পিকার্দে এবং অপরাপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড় বড় লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটী, প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেন্সল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ অব্দে এলিয়াট এবং ১৫৮০ অব্দে মণ্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতাবদ্ধ করেন।

১৬৩৫ অব্দে কার্দিনাল্ রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমি স্থাপন পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

জর্ম্মানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিস্তৃত। সহজেই তদ্দেশে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল, এবং জরমানি রোমরাজ্যের অধীন না হওয়ায় একতা লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্প মাত্রই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়. যথা; ৩৫০ খৃষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগথিক, ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস্, আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান্ ভাষাত্রয় ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা প্রায় হইয়া, "হাইজরমান" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর অপর ভাষা ঐরূপ মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত "লোজরমান" আখ্যা প্রাপ্ত

হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতাভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বির্বরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খৃঃ "কারল দি গ্রেট" কর্তৃক বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস্ থাকা জন্য ভাষাও ফ্রাঙ্কিস্ ছিল। অটফ্রিড রেবেলসের এবং অপর অপর গ্রন্থকারের রচনা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লোজরমানে, কতক সাক্ষণে, কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষা ভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্ষণ কবিরা, কখন স্বাবিয়ান লেখকেরা, কখন লোজরমান গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী, বহুজ্ঞানাপন্ন লথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোডচ এবং ববেরিয়ার ভাষার মধ্যবর্ত্তী সাক্ষণির ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন সহকারে ভদ্র সমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিয়া তাহা ১৫০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে স্থানীয় ভাষা সমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভদ্র সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ঐ মত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভদ্র সমাজে শত শত বৎসরাবধি লাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অনুমান করিতে পারা যায় যে, সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই, ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত ভাষার একতা ও উদ্দীপনা সাহিত্যাদির আলোকাভাবে ইটালী অন্ধকারপূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাত তারার স্বরূপ দান্তে এবং পেত্রার্কার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণ সকল সমস্ত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় "একাডেমি" হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্ণীতাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লরেন্স নগরের একাডেমি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খৃঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীয় ভাষা টস্কান্ নামে বিখ্যাত ছিল। টস্কান্ ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালির অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থাপিত হয়, কিন্তু ফ্লরেন্সের একাডেমি সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েক জন সভ্য মূলসভা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম "একাদামি দেলা ক্রস্কা"। চালুনির মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কার্য্য, এবং রচনা সকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাঁহারা দেশীয় লোকের বিচারশক্তির এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৫৯০ খৃঃ এই সভা হইতে "বকেবলেরিয়া ডিলা ক্রুস্কা" নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

গথদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পেন দেশ মূর্খতান্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয়, এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাষ্টিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে। উসিনা নাহারো এবং রুহো স্পেনের আদ্য বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারত্রয়,—সরবন্টিস্, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খ্রীঃ সর বন্টিস কৃত "ডন্ কুইজট" প্রকাশ হয়। লোপের নাটকাদি তৎপরে, এবং কালদেরণের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চারল্‌স এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে যে মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করত স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই কাষ্টিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাষ্টিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত। কাটালান আরাগণ বিসকে গালিসিয়া আন্দালুসিয়া বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাপর প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়ণের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাষ্টিলিয়ান্ স্পেনের সাধুভাষার পদে অভিষিক্ত হইয়াছে। সর বন্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশ সম্বন্ধে অদ্যাপি আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহা "কাষ্টালো" বলিয়া থাকে। স্পেনে, ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে, এবং তদ্দ্বারা স্পেনের সর্ব্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্টরূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা যাইতেছে। এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত "একাডেমি।"

ফ্লোরেন্সের একাডেমি, এবং তদনুকরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সভ্যেরা পেত্রার্কার গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অপরাপর প্রধান কবিদিগের, অর্থাৎ দান্তে আরিয়স্তো এবং তাসোর রচনা এবং পলসি, বইয়াদো প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপ-কথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল। এতদভিপ্রায়জনিত প্রথা ও কর্ম্মপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন। যে যে শব্দ নিয়ম সঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন, তাহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন,

তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সভার মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য্য হইলে, লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমুদয় আদর্শ সদৃশ হইয়াছে কি না, তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মানুসারে সংশোধিত করত একাডেমির সভ্যদের বিচার জন্য অর্পিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যদ্যপি মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর, এবং বৃথা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধের অনেক অলীক কল্পনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্দারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জ্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্যম হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সৃজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে, ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত, এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূরকল্পিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভদ্র সমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খৃঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খৃঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল বসুএট মালেব্রান্শ এবং আর্ণল্ড্ নামক লেখক সকল অতি পরিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্যম ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ নিজ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য্য গুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেই মত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে সুফল প্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেই মত সাহিত্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতি রোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্থ করিতে সক্ষম নহেন। উত্তম রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থবোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার বিশেষ গদ্য লেখক আপন মাতৃ ভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্য নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোন মতে সক্ষম নহেন। *

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা পদ্ধতি

* "হ্যালমস্ ইউরোপীয় লিটেরেচর" ৪, ২৯৩।

সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চর্চ্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের জ্ঞানকৃত সমবেতচেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃসৃষ্ট। কি প্রকারে জন্মিল, তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্য্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিক্ষম ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি "চসর" নিজ কবিতাবলী সুমিষ্ট করণ জন্য অনেক ফ্রেঞ্চ শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউফিস গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহার পুস্তক মহামান্যও হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে যথার্থ নাম, তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরে প্রচুর শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সামান্য ভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষার ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভদ্র সমাজেরও কথাবার্ত্তা অশ্লীল ছিল। ইউফিসের প্রণালী দ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস্ ১৫৯৭ খৃঃ প্রকাশ হয় এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এ প্রকার বিশুদ্ধ নিয়ম দেখা যায়, যে তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির "আরকেডিয়া" বেকনের সারবত্তী ও গভীরা রচনা, এবং হুকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা, ইংরাজ মাত্রেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খৃঃ প্রকাশিত মিলটনের "আরিওপেজিটিকা" বোধ হয়, ইংরাজি গদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থপত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লিখিত হয়, এবং কবিবর পদ্যে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন. তেমনি তাঁহার এই গদ্য প্রবন্ধ গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য এবং সুমিষ্ট রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর সুলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষণ করে না। প্রাচীনদিগের গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর, ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসন কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা, কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খৃঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজি শব্দ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্য পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজেবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাটিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জনসন, তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকের স্থানীয় অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ অর্থবোধক ইংরাজী শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশ মাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজী ভাষার "মাগ্নাচার্টা" হইয়া, পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

জরমানদিগের ভাষার আত্মোপান্ত জন্ম বৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্কবিতর্ক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে উচিত কি না, তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ সমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয় কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্ষমতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বোধ হয়। বাঙ্গালায় এমত কোন সর্ব্বজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকেরও এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জনসন সদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালীর মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক, সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষাপ্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ এবং এ দেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গ একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা রাজধানী, অতএব আদিসভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্যের তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভ্যগণ অন্যত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের জন্য একটী গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্লরেণ্টাইনদিগের ন্যায় সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখকর হইতে পারে। কলিকাতায় এপ্রকার উদ্যানের অভাব নাই। এবং বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাহ্লাদজনক ও শুভকর

হইবেক। সুখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক দেশের কুশল সাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম্ম। অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্ম্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক। সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে। এবং প্রাচীন কবি-গণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচন সহকারে সঙ্গীতেরও উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথম উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচারের আবশ্যক। ঈশ্বর প্রসাদাৎ সম্প্রতি কলিকাতায় এবং দেশাভ্যন্তরে পল্লীগ্রামেও ইহার অভাব নাই। সভার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার এই হইবে যে, ঐক্য এবং প্রীতিবন্ধনে সকলে বাঁধা থাকিবেন. এবং একতাবলে বলিষ্ঠ হইবেন। পল্লীগ্রামস্থ পণ্ডিতেরা মফঃস্বলে কোন কথা প্রচলিত থাকিলে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কি না এবং সংস্কৃত যে যে শব্দ সহজে অর্থ বোধক হইবেক, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন। বঙ্গভাষা অপার। ইহা প্রণালীবদ্ধ করা মহৎকার্য্য মনে করিলে আহ্লাদ হয়।

অধিকাংশ সভ্যগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন হিতৈষী এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক। অনেক উৎসাহশীল এবং বঙ্গ হিতৈষী ইংরাজ মহাত্মা আগ্রহ সহকারে এবিষয়ে উৎসাহদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা হয়, সভা স্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম গৌরবান্বিত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর সভার অধিপতি পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন।

যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীম্‌স্ সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত প্রস্তাব যে পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি যে সকল বঙ্গ-পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব। ইতি। বঙ্গদর্শন সম্পাদক।

খনা ও লীলাবতী।

[শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষে খনা ও গণিতশাস্ত্রে লীলাবতী অসাধারণ বিদুষী ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিম্বদন্তী মূল করিয়া অনেক গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, দেখা যাউক।

খনার সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে,—অবন্তিদেশে (উজ্জয়িনী নগরে) রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় বরাহ নামে এক অলোকসামান্যপ্রতিভাশালী জ্যোতিষী ছিলেন; তাঁহার পুত্র মিহির; এই মিহিরের স্ত্রী খনা। খনা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জগতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় শ্বশুরকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্বশুর বরাহ আত্মমর্য্যাদাহানিভয়ে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া পুত্র মিহির দ্বারা পুত্রবধূর বধ সম্পাদন করেন।

বরাহ, মিহির এবং খনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন বরাহমিহির অবন্তিদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তিনি লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক, বিবাহপটল, সমাসসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, যোগযাত্রা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা এই কয়খানি গ্রন্থ লিখিয়া অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক, বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে। অন্য গ্রন্থগুলি মুদ্রিত না হইলেও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। বরাহমিহির বৃহজ্জাতকের শেষে [২৬শ অধ্যায়ে] আত্মপরিচয় স্থলে বলিয়াছেন—

আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ
কাপিত্থকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যগ্-
ঘোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥

আদিত্যদাসের পুত্র অবন্তিদেশীয় আচার্য্য বরাহমিহির পিতার নিকট শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া কাপিত্থক গ্রামে উপাসনা দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যদেব হইতে বরলাভ

করিয়া মুনিদিগের মত সম্যক্ অবলোকন করতঃ মনোজ্ঞ হোরাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কাপিত্থক স্থলে কাম্পিল্লক পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহজ্জাতকের ভট্টোৎপল, মহীধর ও মহাদেবকৃত টীকা প্রসিদ্ধ আছে। একটি কেরলী টীকাও আছে। এই কেরলী টীকায় দশমাধ্যায়ের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে—"তথাচার্য্যপুত্রেণোক্তং—যোযোভাবঃ স্বামিদৃষ্টো যুতো বা" ইত্যাদি। এই বচনটি পৃথুযশঃকৃত ষট্পঞ্চাশিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথুযশাঃ নিজেও ষট্পঞ্চাশিকার প্রারম্ভেই নিজকে বরাহমিহিরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ষট্পঞ্চাশিকার প্রথম শ্লোক এইরূপ—

"প্রণিপত্য রবিং মূর্দ্ধ্না বরাহমিহিরাত্মজেন পৃথুযশসা।
প্রশ্নে কৃতার্থগহনা পরার্থমুদ্দিশ্য সদ্‌যশসা॥"

পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অহর্গণানয়ন প্রকরণে "সপ্তাশ্বিবেদসংখ্যং শককালমপাস্য" ইত্যাদি বচন হইতে আমরা জানিতে পারি—৪২৭ শকে [৪৯৫ খৃঃ অঃ] পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচিত হইয়াছিল।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় বরাহমিহির ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন উক্তি নাই। কালিদাস * স্বকৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণে [২২শ অধ্যায়ে] বিক্রমাদিত্য সভাবর্ণনে বরাহমিহিরকে বিক্রমাদিত্য সভার একতম রত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের নিকট বরাহমিহির বরাহনামেও পরিচিত ছিলেন। সংগ্রহকারগণ "তথাচ বরাহঃ" বলিয়া বরাহমিহিরের বচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা অদ্যাপি বরাহসংহিতা নামে পরিচিত।

বরাহমিহির খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অবন্তিদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আদিত্যদাসের পুত্র এবং পৃথুযশার পিতা। তিনি বরাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য সপ্রমাণ হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে বরাহমিহির ভিন্ন বরাহ নামে আর কোনও জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বঙ্গভাষায় রচিত খনার যে সকল বচন আছে, তাহার সকলগুলি এক সময়ে রচিত নহে, ইহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কতকগুলি বচন প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত হইলেও আধুনিক

---

* এই কালিদাস প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস হইতে ভিন্ন। ইনি ১১৬৪ শকাব্দে [১২৪২ খৃঃ অঃ] জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় লিখিত বচনও নিতান্ত অল্প নহে। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে অবন্তি-দেশে কোন বিদুষী রমণীর বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনাপ্রবৃত্তি কতদূর যুক্তিসহ তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কি আকার ছিল তাহা অপরিজ্ঞাত হইলেও নিতান্ত অননুমেয় নহে। অবন্তিদেশে বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা নাই। বঙ্গদেশের বাহিরে খনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতিও নাই। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, খনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে যখন যিনি কোন সংক্ষিপ্ত ও সরল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তখন তিনিই সেই নিয়ম বাঙ্গালা ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিয়া লোক-সমাজে খনার নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন; অনেকেই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। খনার নামে এই সকল বচন প্রচারিত হইল কেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

লীলাবতী সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে,—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামে এক বালবিধবা কন্যা ছিলেন। তিনি পিতার নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত "লীলাবতী" ও "বীজগণিত" নামক প্রসিদ্ধ গণিত পুস্তকদ্বয় রচনা করেন। বাঙ্গালীগণ এই রমণীর নামে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন, অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থেও এই গর্ব্বের পরিচয় পাওয়া যায়। "লীলাবতী" ও "বীজগণিত" যদি প্রকৃতই লীলাবতী নাম্নী কোন্ বিদুষী রমণীর রচিত হয় তবে বাস্তবিকই গর্ব্বের বিষয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে ভাস্করাচার্য্যকৃত পাটীগণিত গ্রন্থের নামই "লীলাবতী" ইহা লীলাবতী প্রণীত নহে। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থের চারিটি খণ্ড; তাহার প্রথম খণ্ড লীলাবতী, দ্বিতীয় খণ্ড বীজগণিত, তৃতীয় খণ্ড গণিতাধ্যায় এবং চতুর্থ খণ্ড গোলাধ্যায় নামে অভিহিত। লীলাবতী গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের নাম নাই, গ্রন্থশেষে—"ইতি শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য্যবিরচিত সিদ্ধাশিরোমণ্যন্তর্গত লীলাবতী সংজ্ঞক পাটীগণিতাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ" এই পরিচয় আছে। "লীলাবতী" লীলাবতীরচিত বলিয়া কেবল বঙ্গদেশেই জনশ্রুতি, অন্যত্র ভাস্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে।

"লীলাবতী"র দুইটি উদাহরণে লীলাবতীর সম্বোধন আছে, * অন্যান্য

* 'অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতি ব্রূহি সহিতান্' ইত্যাদি [সঙ্কলব্যবকলন উদাহরণ]।
'বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি প্রোচ্যতাং' ইত্যাদি [গুণন উদাহরণ]।

উদাহরণে সখে, মিত্র, বালে, গণক, বৎস, নন্দন, ইত্যাদি সম্বোধন আছে। গ্রন্থের নাম "লীলাবতী", নমস্কার শ্লোকেও শ্লিষ্টভাবে লীলাবতী শব্দের প্রয়োগ আছে *। ইহা দ্বারা লীলাবতী নাম্নী কোন রমণীর সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। এই বিষয়ে পশ্চিমদেশে তিনটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—

(১) ভাস্করাচার্য্য স্বীয় কন্যা লীলাবতীর জন্মকুণ্ডলীতে বৈধব্য যোগ দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দেন নাই; এবং তাঁহার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য স্বরচিত পাটীগণিতের নাম লীলাবতী রাখেন।

(২) ভাস্করাচার্য্যের স্ত্রী লীলাবতী বন্ধ্যা ছিলেন; তাঁহার নামের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য গ্রন্থের নাম "লীলাবতী" হয়।

(৩) ভাস্করাচার্য্যের অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তদীয় অধ্যাপক নিজ কন্যা লীলাবতীকে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। লীলাবতীও মনে মনে ভাস্করাচার্য্যকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য "গুরুপুত্রী সহোদরতুল্যা" মনে করিয়া সেই সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন। লীলাবতী সতীত্ব হানিভয়ে অন্য পতি গ্রহণ করেন নাই। ভাস্করাচার্য্য ইহাঁর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই স্বরচিত গ্রন্থের নাম "লীলাবতী" রাখিয়াছিলেন।

ডাক্তার ভাউদাজী কর্ত্তৃক নাসিকে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে ভাস্করাচার্য্যের পুত্রপৌত্রাদির অস্তিত্ব জানা যায়। অতএব দ্বিতীয় জনশ্রুতি অমূলক। প্রথম ও তৃতীয় জনশ্রুতির মূলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি সমূলক হইলেও একটিই সত্য হইবে, পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তিনটিই সত্য হইতে পারে না। কোন জনশ্রুতিতেই লীলাবতীর বিদ্যাবত্তা বা গ্রন্থকর্ত্তৃত্বের প্রসঙ্গ নাই।

শিশুকালে খনা ও লীলাবতীর গল্প শুনিয়া মনে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতাম। খনা সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত দুই একখানি ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠ করিয়া মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, অবন্তিদেশীয়া রমণী বাঙ্গালা ভাষায় বচন লিখিলেন কেন? পরে বৃহজ্জাতক ও ষট্পঞ্চাশিকা অধ্যয়ন কালে

---

* 'প্রীতিং ভক্তজনস্য যো জনয়তে বিঘ্নং বিনিঘ্নন্ স্মৃত
স্তং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদং নত্বা মতঙ্গাননম্।
পাটীং সদ্গণিতস্য বচ্মি চতুরপ্রীতিপ্রদাং প্রস্ফুটাং
সংক্ষিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীম্॥'

বরাহমিহিরের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিয়া সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হয়। লীলাবতী ও বীজগণিত অধ্যয়ন সময়ে লীলাবতীর জনশ্রুতি সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহদ্বয় আমার মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া দেয়। অনুসন্ধিৎসা পরতন্ত্র হইয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

এই বিদুষীদ্বয়ের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পাঠকগণ হতাশ হইতে পারেন, আমিও তাঁহাদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু সত্যের গোপন করিতে পারি না। অনেক স্থলেই কবিকল্পিত সুবর্ণমন্দির ঐতিহাসিকের কঠোর কুঠারাঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, ইহা চিরন্তন প্রথা। আমি ঐতিহাসিক নহি, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহার ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

পক্ষিজাতি ও পতঙ্গ জাতির বিকাশের ভেদ।

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ।]

পক্ষী উড়িতে পারে, পতঙ্গ উড়িতে পারে, সুতরাং উভয়ই একজাতি ইহাই যে সাধারণ ধারণা হইবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, পক্ষী ও পতঙ্গ কেবল যে জীবন-ব্যাপারেই ভিন্ন তাহা নহে, পরন্তু মূল বিকাশেও ভিন্ন।

পক্ষী ও পতঙ্গ যে একজাতি নহে, তাহাদের দেহের মূল গঠনই ইহার অন্যতর প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। পক্ষী মেরুদণ্ডী জীব, কিন্তু পতঙ্গ অমেরুদণ্ডী জীব।

পক্ষী ও পতঙ্গের জন্মেও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষী ডিমে তা দিলেই ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে শাবক বহির্গত হয়। পতঙ্গের ডিমে তা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আপনা হইতেই ডিম ফুটিয়া শাবক নির্গত হয়।

শাবকের লালন-পালনেও, পতঙ্গ, পক্ষীর অনুরূপ নহে। পক্ষীর শাবককে কিছুকাল পিতামাতা আহার যোগাইয়া প্রতিপালন করিয়া থাকে, পতঙ্গ-শাবক পিতামাতার সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজের আহার নিজে যোগাড় করিয়া লয়।

পক্ষী ও পতঙ্গের পক্ষগঠনও একরূপ নয়। পক্ষীর পাখাতে যেরূপ পালক

বা রোম স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায়, পতঙ্গের পাখায় সেরূপ পালক সজ্জিত দেখা যায় না। পতঙ্গের পাখা কাগজের ন্যায় একটীমাত্র পাতলা আবরণ। ইংরেজী পতঙ্গের বিশেষ জাতিবাচক যে "Hymenoptera" নাম পাওয়া যায়, তাহা পাত্‌লা আবরণের অর্থই প্রকাশ করে।

পতঙ্গজাতির উৎপত্তির মূল রহস্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কীটই পতঙ্গের মূলজাতি। শৈশবে অনেক পতঙ্গই কীটরূপে বর্ত্তমান থাকে; বয়স্ক হইলেই ইহাদের পক্ষ উদ্গত হয়। আমাদের "কীট পতঙ্গ" কথায় 'কীট' ও 'পতঙ্গে'র নাম যে এক সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে, তাহা কীটের সহিত পতঙ্গের উল্লিখিত জন্মগত সম্বন্ধ হইতে হইয়াছে বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়।

পতঙ্গের জন্ম সম্বন্ধে আর একটী সত্য এই যে, ডিম হইতে পতঙ্গের জন্ম হইলেও এই ডিমে তা দেওয়ার আবশ্যকতা হয় না, ইহা সূর্য্যোত্তাপের দ্বারা আপনিই ফুটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—

"ইহারা কোথাও বৃক্ষপত্র, কোথাও বা অণ্ড প্রসব করে। প্রসবের পর গর্ভিণী মরিয়া যায়। জগদীশ্বরের কৃপায় সূর্য্যের উত্তাপে ঐ ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।"

পক্ষীর উৎপত্তি ও পাখার গঠনের সহিত পতঙ্গের উৎপত্তি ও পাখার গঠনের তুলনা করিলে ইহাদের প্রথম বিকাশের কৌতুকাবহ রহস্যই আবিষ্কৃত হইতে পারে। পক্ষীর ডিমে তা দ্বারা ছানা ফুটান এবং পতঙ্গের সূর্য্যোত্তাপে ছানা ফুটা এই পৃথক্ প্রক্রিয়া হইতে পক্ষী যে সূর্য্যের অল্প সম্পর্ক বিশিষ্ট স্থানে বা শীতপ্রধান স্থানে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পতঙ্গ সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পর্ক বিশিষ্ট স্থানে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অনুমিত হয়। ইহাদের পাখার গঠনের পার্থক্য হইতেও আমরা উপরিউক্ত তথ্যই লাভ করিতে পারি। পক্ষী আদিতে শীত-প্রকৃতিক স্থানে জাত বলিয়াই ইহার পাখা ঘনসন্নিবিষ্ট পালকাচ্ছাদিত হইয়াছে, আর পতঙ্গজাতি উষ্ণপ্রকৃতিক স্থানে জাত বলিয়াই ইহার পাখা পাত্‌লা আবরণযুক্ত হইয়াছে।

শীতকালে যে পতঙ্গজাতি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানেও বিরল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে যে ইহাদের সবিশেষ বাহুল্য লক্ষিত হয়, ইহাতেও প্রকৃতির উষ্ণপ্রভাবই যে পতঙ্গজীবনের বিশেষ অনুকূল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পক্ষী ও পতঙ্গজাতির দেহে যে যথাক্রমে রক্ত ও রসের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাহাদিগের উৎপত্তির আদিতত্ত্বই আমাদিগকে জ্ঞাপন করে। পক্ষীর রক্ত উষ্ণ সুতরাং শীতপ্রধান স্থানে ইহার প্রথম উৎপত্তি বলিয়া শীত হইতে রক্ষার জন্য ইহার রক্ত যে উষ্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। পতঙ্গের দেহে রক্তের পরিবর্ত্তে রস। ইহা শীতল ও তরল। উষ্ণপ্রধান স্থানজাত বলিয়া শীতল রসই ইহার দেহধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

পক্ষী ও পতঙ্গের বাসস্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পক্ষী নীড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, কিন্তু পতঙ্গ, বাসের জন্য কোন নীড় নির্ম্মাণ করে না। ইহাতেও পতঙ্গকে উন্মুক্ত ও উষ্ণ স্থানের জীব বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

পতঙ্গের সহিত উদ্ভিজ্জ রাজ্যের সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহা যে উষ্ণ স্থানেরই জীব, তৎসম্বন্ধে কম সন্দেহই থাকে। পত্র ও পুষ্প পতঙ্গের কেবল পোষণ করে তাহা নহে, কিন্তু পতঙ্গকে আশ্রয়ও দান করে। তৃণ হইতে গুল্ম, লতা, বীরুধ, বৃক্ষ প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভিজ্জরাজ্যই পতঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্পের মধুপান ও পরাগভক্ষণ দ্বারা পতঙ্গকে জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া পুষ্পবৃক্ষের সহিত যেমন পতঙ্গের বিশেষ যোগ হইয়াছে, তেমনই পতঙ্গ-যোগে পুষ্পে বীজোৎপাদন হয় বলিয়াও পতঙ্গের সহিত পুষ্পবৃক্ষের বিশেষ সম্পর্ক হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জরাজ্যের বিশেষতঃ পুষ্পজাতীয় উদ্ভিজ্জের গ্রীষ্মপ্রধান স্থানেই বিশেষ সমৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। শীতপ্রধান স্থান বিশেষতঃ মেরুপ্রদেশ উদ্ভিজ্জজীবনের পক্ষে অনুকূল নহে, তথায় উদ্ভিজ্জের যেমন অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদের তেমনই একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদের ফুলের দ্বারা পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, আর ফলের দ্বারা পক্ষী আকৃষ্ট হয়। এইরূপে পতঙ্গের দ্বারা ফুলের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়, আর পক্ষীর দ্বারা ফলের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদ্ প্রায়ই অনুচ্চ বলিয়া পতঙ্গজাতি ইহাদিগের মধ্যেই বিহার করে। পক্ষান্তরে পক্ষিজাতি উচ্চ বৃক্ষে বিহার করে। এইরূপে পতঙ্গজাতি আকাশের নিম্নপ্রদেশের জীব, আর পক্ষিজাতি উর্দ্ধপ্রদেশের জীব হইতেছে। পক্ষিজাতির 'বিহগ', 'খগ' নাম তাহাদের উর্দ্ধবিচরণ হইতেই হইয়াছে। "পতন্ সন্ গচ্ছতি" পড়িতে পড়িতে যায়, পতঙ্গ নামের এইরূপ

ব্যুৎপত্তি দ্বারা ইহার উড্ডয়ন ক্ষমতা যে কম তাহাই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ পতঙ্গের পক্ষ ও পক্ষীর পক্ষের তুলনা করিলে পক্ষীর পক্ষ পতঙ্গের পক্ষ অপেক্ষা যে অনেকগুণ দৃঢ় এবং ঊর্দ্ধ ও দূরপ্রদেশে উড্ডয়নের অধিক উপযোগী তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অন্যদিকে পতঙ্গের আবার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রখর রৌদ্রে প্রপীড়িত হইয়া পক্ষিজাতি যখন কুলায়ে বা নিবিড় পত্ররাজি মধ্যে লীন হইয়া অবস্থান করে, পতঙ্গ সকল তখন পক্ষ বিস্তারকরতঃ সূর্য্যকিরণে বিচরণ করিতেই আনন্দানুভব করে, এবং সূর্য্যদেবও তখন পতঙ্গদিগের উপভোগের জন্যই যেন পুষ্প সকলকে বিকশিত করিয়া দিয়া ইহাদিগের সহিত পতঙ্গদিগের ক্রীড়া ও বিহারের সুযোগ সঙ্ঘটিত করিয়া দেন।

সূর্য্যের এক নাম যে 'পতঙ্গ' পাওয়া যায়, তাহা বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা পরিকল্পিত বলিয়াই আমরা মনে করি। সূর্য্য উত্তাপের দ্বারা পতঙ্গ জাতির ডিম ফুটাইয়া ইহাদিগের জীবনদান করেন, তাহাতেই তিনি পতঙ্গ জাতির জীবনদাতা বলিয়া তাহাদিগের পতঙ্গ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। অপরন্তু সূর্য্য ও পতঙ্গ উভয়ই পুষ্পের সৌন্দর্য্যবিস্তারে উভয়ের সহযোগী, সুতরাং সূর্য্যও পতঙ্গেরই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কণ্ঠহার।

(১)

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি, এল।]

যুবতী সুন্দরী—অসামান্যা সুন্দরী! সে তীব্র সৌন্দর্য্য-সুধাপানে পুরুষের চিত্তচকোর উন্মত্ত হইয়া উঠে। বর্ষাসমাগমে নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় যৌবনের ভারে তাহার সমস্ত শরীর নূতন মাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে মাধুর্য্য অলৌকিক হইলেও, দিব্য আভামণ্ডিত বলিয়া মনে হয় না। তাহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শয়তান যে সব স্ত্রীলোককে পৃথিবীতে প্রেরণ করে, তাহাদের এরূপ সুন্দরী করিয়াই পাঠায়!

যুবক তাহাকে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। সে ভালবাসার কোনও সীমা ছিল না; সে ভালবাসা তাহার সিদ্ধির পথে কণ্টকস্বরূপ কোনও

পার্থিব বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য করিত না। সে ভালবাসা আনন্দের অন্বেষণে বৃথা কঠোর পরিশ্রম করিয়া শেষে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সুখভ্রমে দুঃখকেই শিয়রে বরণ করিয়া লয়। বোধ হয়, গত জন্ম-জন্মান্তরের কোনও ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার কোমল সরস প্রাণে এরূপ প্রেম-মরীচিকার সৃষ্টি হইয়াছিল!

যুবতী অপরাপর বিষয়ে তাহার দলের অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় সমভাবাপন্ন না হইলেও, তাহাদের ন্যায় সেও বড় বিলাসিনী ও অব্যবস্থিতচিত্ত। তাহার মানস-সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত সাধ উদিত ও লীন হইতেছে। যুবকও বুদ্ধিমান ও সাহসী, কিন্তু মায়াবিনীর মায়াচক্রতলে নিষ্পেষিত হইলে, সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়; তাহার উপরে উঠিবার আর কোনও সামর্থ্য থাকে না। প্রণয়িনীর চিত্রাঙ্কিতবৎ আকর্ণ বিস্তৃত নীলাভ পদ্মনেত্র দু'টির দিকে চাহিলে, তাহার সহজবুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায়; যুবক একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়।

(২)

যুবতীকে একদিন কাঁদিতে দেখিয়া যুবক কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"একি, কাঁদ্‌ছো কেন?"

যুবতী চোখের জল মুছিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। মুহূর্ত্তপরেই আবার সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যুবক বিস্মিত নেত্রে তাহার সম্মুখীন হইয়া সাদরে তাহার হাত ধরিল। যুবতী তখন ঘরের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া স্রোতস্বিনীর খরপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছিল। যুবক স্নেহার্দ্রকণ্ঠে পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন কাঁদ্‌ছো, বল না?"

ক্ষুদ্র বাড়ীখানির পাদদেশ ধৌত করিয়া নদী ফুলিয়া ফুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি নদীবক্ষে উত্থিত হইয়া ক্রমে তীরের উপর সশব্দে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সূর্য্যদেব সুবর্ণরশ্মি-মণ্ডিত নারিকেল বৃক্ষের শিখর দেশের পশ্চাতে ডুবিয়া গিয়াছে। গোধূলির ধূসর অন্ধকার রাশি নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া কোমল সূক্ষ্ম আবরণ-বস্ত্রের ন্যায় মৃদুসমীরণভরে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কেবল নদীপ্রবাহের কল্‌কল্, ছল্‌ছল্ শব্দ সে গম্ভীর নীরবতার বক্ষে মধ্যে মধ্যে আঘাত করিতেছে।

যুবকের দিকে মুখ ফিরাইয়া যুবতী বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন কাঁদছি, ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি নিজেই জানি না,

কেন কাঁদছি, তোমাকে উত্তর দেব কি করে! আর জবাব দিলেও তুমি তা বুঝতে পারবে না। স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে ফল্গুনদীর ন্যায় অনেক গুপ্ত আকাঙ্খার স্রোত চক্ষুর অন্তরালে বয়ে যায়; তার মর্ম্মস্থল হ'তে যে গভীর দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে বাতাসে কম্পিত হয়ে উঠে, তা'তে তার কণামাত্রও প্রকাশ পায় না। আমাদের কল্পনানেত্রের সম্মুখে কত সোণালী রংয়ের সুখস্বপ্নের ছবি ভাসতে থাকে, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। অনন্ত রহস্যময় নারী-চরিত্রের অবোধগম্য অসামান্য বৃত্তিসমূহের রহস্য-উদ্ঘাটন করবার উপযুক্ত ক্ষমতা ভগবান পুরুষ মানুষকে দেন নাই। তোমার পায়ে ধরি, এ দারুণ মর্ম্ম-ব্যথার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। সে কথা তুমি শুনলে, নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে, আমারও লজ্জার সীমা থাকবে না।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া যুবতী মাথা নীচু করিয়া রহিল। যুবক বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বল না, ব্যাপারটা কি খুলেই বল না। আমাকে কি তুমি এতই নীচ অপদার্থ ভাব যে, তোমার এত বড় একটা দুঃখের কারণকে আমি হেসে উড়িয়ে দেব! এ পর্য্যন্ত আমার কোনও কাজে কি আমার বিষয়ে এ রকম কোনও ধারণা তোমার মনে আমি জন্মিয়ে দিয়েছি?"

যুবতী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—"তবে কি সে কথা শুনতে তোমার এতই ইচ্ছা? কিন্তু শুনে আমাকে উপহাস করতে পারবে না। এ গভীর মর্ম্মবেদনা বরং সহ্য করতে পারছি, তোমার উপহাস কিন্তু তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আমার অন্তরে গিয়ে বিঁধবে।

"কাল সন্ধ্যায় মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরতি দেখতে গেছলাম। মায়ের মন্দির লোকে লোকাকীর্ণ। মন্দিরের মধ্যস্থিত দেবীপ্রতিমা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দেখ্‌তে হয়েছিল। কাঁশর ঘণ্টার শব্দে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠেছে। পুরোহিত মহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত সান্ধ্য-আরতি সম্পন্ন করছিলেন। সে স্থানে তখন যেন একটা ভক্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো।

"আমিও এক মনে চোখ বুঝে দেবীর আরাধনা করতে লাগলাম। একবার হঠাৎ চোখ চাহিতেই দেবীমূর্ত্তির উপর নজর পড়িল। সেদিক হ'তে দৃষ্টি আর ফিরাতে পারলাম না। ঠিক যে প্রতিমার উপরই আমার লক্ষ্য পড়েছিল, তা নয়, তাঁর কণ্ঠদেশস্থ একটি দ্রব্যের উপর—পূর্ব্বে সেটি আর কখনও দেখি

নাই,—তার কি যে মোহিনী শক্তি তা বলতে পারি না, আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া লইল! ভয়ে শিউরে উঠো না—জিনিষটা হচ্ছে মায়ের গলার কণ্ঠহার! আমি জোর করে অন্য দিকে চোখ ফিরালাম। পুনর্ব্বার চোখ বুজে মায়ের আরাধনা করবার জন্য চেষ্টা করলাম; কিন্তু অসম্ভব! আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল! পোড়া চোখ দু'টা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে ফিরে কেবল সেইদিকেই ফিরে যেতে লাগলো। মন্দিরের ভিতরকার, ঝাড়ের আলো সেই কণ্ঠহারের উপর প্রতিফলিত হওয়ায়, উজ্জ্বল পাথরগুলো যেন আরও জ্বল জ্বল করছিল। নানাবর্ণের অসংখ্য উজ্জ্বল চঞ্চল আলোকরশ্মি—লাল, নীল, সবুজ, পীত—জ্বলন্ত অগ্নিকণার ঘূর্ণির ন্যায়, অগ্নিময় প্রেতাত্মার বিহ্বল নৃত্যের ন্যায়, সেই মহামূল্য রত্ননিচয়ের চতুর্দ্দিকে নাচ্‌তে লাগলো!

"আমি মন্দির ত্যাগ করে বাড়ী ফিরলাম, কিন্তু সে চিন্তা মন হ'তে কিছুতেই দূর করতে পারলাম না। মুখে কিছু আহার আর রুচলো না; জোর করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম; কিন্তু পোড়া চোখে কিছুতেই ঘুম আর এলো না। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে গেল; অথচ সে চিন্তার ভার ভূতের ন্যায় আমার ঘাড়ে চেপে রইলো! ভোরের বেলা একটু তন্দ্রা এলে, তারপর—শুনলে কি তুমি বিশ্বাস করবে? তন্দ্রার ঘোরে দেখলাম, এক সুন্দরী স্ত্রীলোক গলায় সেই কণ্ঠহার দুলিয়ে আমার সম্মুখে হাজির হলো। এ দেবীপ্রতিমা নহে—আমাদেরই ন্যায় রক্তমাংসে গঠিত এক নারীমূর্ত্তি। আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপসহকারে হাসতে লাগলো; খানিকক্ষণ পরে তার কণ্ঠহারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমাকে বল্লে,—'দেখতে পাচ্ছো, কেমন ঝক্‌ঝক্ জ্বলছে! যেন নিদাঘের নিশীথে আকাশ হ'তে তারাগুলি সব চুরি করে কে যেন এ মালা গেঁথেছে। দেখতে পাচ্ছো? এ হার গলায় পরা তোমার ভাগ্যে নাই, কখনও হবে না। এর চেয়ে বেশী মূল্যবান হার তোমার থাকতে পারে, কিন্তু এমন উজ্জ্বল রত্নখচিত—এমন সুন্দর—' হঠাৎ আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু সে স্বপ্ন তখনও আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো। তারই স্মৃতি জ্বলন্ত লৌহশলাকার ন্যায় আজ দিনরাত আমাকে দগ্ধ করছে। শয়তানের একি পৈশাচিক লীলা! একি, তুমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলে কেন? আমায় পাগল ঠাওরাচ্ছ, নয়!"

যুবকের মনের মধ্যে চিন্তার যে গভীর ঝড় বহিতেছিল, তাহারই আঘাতে বাহিরে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। যুবতীর শেষ কথায় সে অবনত

মস্তক উন্নত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হায়, অপর কোন রমণীর গলায় সে কণ্ঠহার শোভা পায় নি কেন ? রাজার ভাণ্ডারে সে রত্ন থাকলেও নিস্তার ছিল না। রাণী যদি নিজের গলায় সে হার পরে থাকতেন, তাহ'লেও যে ভাল হতো! শয়তান স্বহস্তে ধরে রাখলেও, নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও তোমার জন্য সে হার আমি ছিনিয়ে কেড়ে আনতে পারতাম! কিন্তু, হায় মা মঙ্গলচণ্ডীর গলা হ'তে—আমাদের গ্রামের আরাধ্যা দেবীর গলা হ'তে—আমি, আমার জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর—না, না,—সে অসম্ভব, অসম্ভব!"

যুবতী অস্ফুটস্বরে গুঞ্জন করিল,—"না, কখনই অসম্ভব হ'তে পারে না!" সে আবার মুখে হাত ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া একদৃষ্টিতে নদীর ঊর্ম্মিমালার প্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া তরঙ্গগুলি ধীরে ধীরে অট্টালিকার পাদদেশে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নিশাদেবী তারকাখচিত নীলাম্বর পরিধান করিয়া প্রেমাস্পদের মিলন-আশায় অভিসারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন।

(৩)

মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মন্দির। চারিদিকে লোকালয়। গ্রামের মধ্য ভাগেই দেবীর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির। গভীর নিশীথের ঘন অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া মন্দিরের নিকট এক মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া দৃষ্ট হইল। এ কি, এ যে আমাদেরই সেই পরিচিত যুবক! যে বিষয়ের চিন্তা মাত্রেই তাহার দেহ আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার এত সাহস তাহার কোথা হইতে আসিল? প্রণয়িনীর জ্বালাময়ী উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য কি এতটা মনের জোর দিয়া দিতে পারে? তাহার পদ্মকোরকবৎ নেত্রের দুই বিন্দু মুক্তাফলের কি এতই অসীম ক্ষমতা? তাহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু সেই ত দাঁড়াইয়া—তাহার ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত! তাহার চঞ্চল দৃষ্টিপাতে, গভীর দীর্ঘশ্বাসে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঘন কম্পনে, কপোলদেশে সঞ্চিত বুড় বুড় স্বেদবিন্দুজালে, প্রাণের অব্যক্ত ভাষা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

যুবক একবারে চারিদিকে তাকাইল। নিকটে জনমানবের উপস্থিতির কোনও চিহ্ন নাই। মন্দিরটি এখন সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত। এক একদিন কোনও অভাগা বা অভাগিনী আত্মীয়স্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষায় দেবীর মন্দিরে হত্যা দিয়া

পড়িয়া থাকে। কিন্তু আজ আর সেখানে কেহই নাই। শয়তান আজ তাহার সহায় হইয়া এমন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য শৃগাল কুক্কুরের চীৎকার ধ্বনি সে গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে!

যুবক অনেকটা নির্ভয় অন্তঃকরণে অগ্রসর হইল। মন্দিরের উপর উঠিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। নির্জ্জন অন্ধকারময় স্থানেও মনুষ্য-কণ্ঠস্বরের ন্যায় অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা বোধ হয় বাতাসের মৃদুমন্দ শব্দ, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, অথবা প্রকৃতিদেবীর অশরীরি আত্মার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর! যুবকের মনে হইতে লাগিল, তাহার সম্মুখে পশ্চাতে, আসে পাশে, মনুষ্যকণ্ঠের চাপা মৃদু স্বর। মনুষ্য গমনাগমনের ধীর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই কোনও অজানা বিপদের আশঙ্কায় সে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

মন্দিরের দ্বারে তিনটি শক্ত চাবির তালা লাগান ছিল। যুবক তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। সে হস্তস্থিত লৌহশলাকার দ্বারা তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর ঢুকিল। পূজারি সন্ধ্যা-আরতি শেষ করিয়া মন্দিরের ভিতর একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছে! সেইটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। এই গ্রামের বাজারে পঞ্চানন্দের বিগ্রহ আছে। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, পঞ্চানন্দ দেব রাত্রে বিশ্রামার্থ দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তজ্জন্যই রাত্রে মন্দিরের ভিতর একটি আলো জ্বালান থাকে। সেই ক্ষীণ আলোকে সে দেখিতে পাইল, দেবীর গলায় কণ্ঠহার জ্বল জ্বল জ্বলিতেছে!

আর তাহাকে পায় কে? এবার এ অমূল্য ধন নিশ্চয়ই তাহার হস্তগত হইবে। প্রেমাস্পদের বদনকমলে আর বিষাদের রেখা তাহাকে দেখিতে হইবে না। এই কণ্ঠহার লইয়া গিয়া সে স্বহস্তে তাহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবে এবং যাহার জন্য গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তাহার বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, প্রণয়িনীর অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা, সে পুরস্কার সে নিশ্চয়ই লাভ করিবে। তাহার দৃষ্টি হইতে পৃথিবীর অন্যান্য সকল মূর্ত্তি, সকল দ্রব্যই একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল, কেবল যুবতীর প্রেমনীরভারাক্রান্ত চিত্রাঙ্কিতবৎ নেত্রদু'টি তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

যুবক সাহসে ভর করিয়া দেবীমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু, এ কি, তাহার পা যে নড়ে না! তাহার মনে হইল, যেন পাষাণের

মেজের সহিত তাহার পা সংলগ্ন হইয়া গিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আতঙ্কে তাহার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। যেন একটা বরফের মত ঠাণ্ডা অস্থিচর্ম্মসার হস্ত তাহাকে অনিবার্য্য বেগে নড়িতে চড়িতে দিতেছে না। উন্মুক্ত দরজা দিয়া সে একবার বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। আকাশের তারাগুলি নিবিড় মেঘজালের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া এক বিরাট অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি গম্ভীরমূর্ত্তি—যেন আসন্ন প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ! তাহার ধারণা হইল যেন দেবীপ্রতিমা, মন্দিরের ভিতরকার অন্যান্য সকল দ্রব্যই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে আর শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাণহীন মন্দিরটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খাইতেছে!

যুবক জোর করিয়া পা চালাইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার—নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরশ্মি অন্ধকারের অপেক্ষা আরও ভয়প্রদ বোধ হইল। যেন অসংখ্য ভীষণতায় নরমূর্ত্তিপূর্ণ জল্পনাপ্রসূত কোনও স্বপ্ন-রাজ্যে সে বিচরণ করিতেছে। সে প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া দেবীর মুখের দিকে তাকাইল। এ কি, এই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেও দেবীর প্রশান্ত বদনে যে গম্ভীর মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া রহিয়াছে! সে নির্ব্বাক হাসি ক্ষণেকের জন্য তাহার চিন্তালোড়িত মস্তিষ্কে শান্তি আনয়ন করিয়া পরক্ষণেই আবার বিস্ময়ে ও ভয়ে তাহাকে আপ্লুত করিয়া দিল। এরূপ অদ্ভুত সর্ব্বগ্রাসী ভয় সে জীবনে আর কখনও অনুভব করে নাই!

সে প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিল। দেবীপ্রতিমা হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহার কম্পান্বিত দক্ষিণ হস্তখানি সেদিকে প্রসার করিয়া দিল এবং পরমুহূর্ত্তেই কোনও ধনী ভক্তের পবিত্র দান সেই মহামূল্যবান কণ্ঠহার দেবীর কণ্ঠদেশ হইতে ছিনাইয়া লইল!

আর কি, ঈপ্সিত ধন ত তাহার হাতের ভিতর! তাহার কম্পান্বিত অঙ্গুলিগুলি অস্বাভাবিক জোরে সেটিকে ধরিয়া রহিল। এবার তাহাকে এ স্থান হইতে পলাইতে হইবে—ইহা লইয়াই চম্পট! কিন্তু চোখ তুলিয়া পথ দেখিয়া লইতে তাহার সাহস হইল না। দেবীপ্রতিমা বা মন্দিরাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তির দিকে সে তাকাইতে পারিল না। তাহার মনে হইল এই সব যেন রহস্যময় ভীতিপ্রদ ভীমকায় মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া মন্দিরের এক কোণে আসিয়া সমবেত হইতেছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া মন্দিরের আলোটা নিভাইয়া দিল।

তখন চোখ খুলিয়া সে একবার চারদিকে তাকাইয়া অমনি এক তীব্র আর্ত্তনাদ মন্দিরকক্ষ বিকম্পিত করিয়া তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে উত্থিত হইল। একি, স্থানটি যে তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ! তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সুচারু বেশে সজ্জিত হইয়া মন্দির-তলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাঁহারা আবার রোষকষায়িত নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেন?

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা কোথায় সব অদৃশ্য হইলেন। পরক্ষণেই তাহার মৃত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়াপ্রতিবেশীর প্রেতাত্মা, ভীষণাকৃতি দৈত্য ও দানবের মূর্ত্তি, রক্তলোলুপ হিংস্র জন্তুগণের সূক্ষ্ম দেহ তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া একে একে সব চলিয়া গেল।

সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দেহের শিরাউপশিরাসমূহ ঘন ঘন জোরে কাঁপিতে লাগিল। এক ঝলক রক্ত তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল। সে দ্বিতীয়বার চীৎকার করিয়া মেজের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সে চীৎকার ধ্বনি বড়ই কর্কশ, পৈশাচিক!

* * * *

পরদিন প্রভাতে পূজারী মন্দিরে আসিয়া দেখিল, যুবক মেজের উপর শুইয়া রহিয়াছে। তাহার চোয়ালে খানিকটা রক্ত বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কণ্ঠহার তখনও তাহার মুঠার ভিতর রহিয়াছে। পূজারীকে নিকটে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবক ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

"এ তা'র জন্য! তা'র জন্য! সে বড়ই কেঁদেছিল!"

যুবকের উন্মত্ত দৃষ্টি দেখিয়া ও প্রলাপ বাক্য শুনিয়া সবাই স্থির করিল যে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে!

পঞ্চভূত।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

দুইটী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, তিনটী দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু—এই ভাবে ক্রমশঃ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। পুঞ্জবাদী বৌদ্ধেরা এ ক্ষেত্রে শঙ্কা করেন যে, এইরূপ অসংখ্য কার্য্যকারণভাব স্বীকার না করিয়া বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকেই ত ঘটাদি দ্রব্য বলিতে পারি। পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া পরমাণুপুঞ্জাত্মক ঘটাদিরও প্রত্যক্ষ না হউক, এ কথা বলিতে পার না। প্রত্যেক পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও পরমাণুপুঞ্জের দৃশ্যত্ব অসম্ভব নহে। যেমন চক্ষুর দোষ জন্মিলে একটী কেশ দেখা যায় না, কিন্তু কেশসমূহ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। ন্যায়সূত্র, ভাষ্য ও বার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থে এই বৌদ্ধমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়স্য পটুমন্দভাবাদ্ বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ।"—৪।২।১৪

ইন্দ্রিয় নির্দ্দোষ হইলেই জ্ঞান যথার্থ হয়, আর ইন্দ্রিয়ের দোষ জন্মিলে জ্ঞানও ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। যাহার চক্ষুঃ আগন্তুক দোষে দূষিত হইয়াছে, সে চক্ষুর্গ্রাহ্য কেশকেও দেখিতে পায় না, কিন্তু কেশগুচ্ছ প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আর যাহার চক্ষুর কোনও দোষ নাই, সে কেশরাশির ন্যায় প্রত্যেক কেশও দেখিতে পায়। কাজেই কেশ অতীন্দ্রিয় নহে। যাহার চক্ষুঃ খারাপ, সেও হয় ত চশমা পরিলে প্রত্যেক কেশও দেখিতে পায়। কিন্তু পরমাণু সেরূপ নহে,—তাহা কদাপি কাহারও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। তাই উদ্যোতকর 'ন্যায়বার্ত্তিকে' বলিয়াছেন,—"পরমাণবস্ত্বতীন্দ্রিয়া দর্শনবিষয়ত্বং ন প্রতিপদ্যন্তে।" ইন্দ্রিয়ের এমন কোনও পটুতা নাই যে, তাহার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বস্তুও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। চক্ষুর সহস্র উৎকর্ষ থাকিলেও সে কখনও গন্ধ, রস বা শব্দের গ্রাহক হইতে পারে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন,—"চক্ষুঃ খলু প্রকৃষ্যমাণং নাবিষয়ং গন্ধং গৃহ্ণাতি।" বার্ত্তিককার উদ্যোতকর ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। (১)

(১) "ন হি চক্ষুঃ প্রকৃষ্যমাণং রসং গৃহ্ণাতি।"—বার্ত্তিক, ৫০৮ পৃঃ।

"ন তু পটুতরং চক্ষুঃ শব্দং গৃহ্ণাতি।"—বৃত্তি, ২০৪ পৃঃ।

সুতরাং যাহা একেবারেই 'অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সমূহেরও কদাপি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তা'ই মহর্ষি, সূত্রে বলিয়াছেন,—"নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ।" বিশ্বনাথ, এই অংশের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"তথা চ স্বাবিষয়ং পরমাণুং সমূহত্বাপন্নমপি কথং চক্ষুর্গৃহ্নীয়াদিতি ভাবঃ।" কেশ কাহারও না কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, এই জন্য তাহার সমূহেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু ঘটাদি বস্তু যদি পরমাণুপুঞ্জাত্মক হয়, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার অদৃশ্যত্বের আপত্তির নিরাস হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা স্বমত স্থাপনের জন্য আর একটা দৃষ্টান্ত দেখায় যে, যেমন অতিদূরে একটী মনুষ্য বা একটী বৃক্ষ দেখা যায় না, কিন্তু সৈন্যবাহিনী বা অরণ্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, সেই রূপ পরমাণুপুঞ্জেরও দৃশ্যত্ব অনুপপন্ন নহে। নৈয়ায়িকেরা পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারেই এ কথারও খণ্ডন করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"সেনাবনাদিবদিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাম্।"—২।১।৩৬

প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব কারণ, কাজেই পরমাণুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—তাহা অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। মনুষ্য বা বৃক্ষে মহত্ত্ব আছে, এই জন্য তাহা অতীন্দ্রিয় নহে; দূরত্বাদি দোষ প্রতিবন্ধক ছিল বলিয়া একটী মনুষ্য বা একটী বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যসমুদায়রূপ সৈন্যবাহিনীর বা বৃক্ষসমূহরূপ অরণ্যের প্রত্যক্ষে দূরত্বাদি দোষের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করি না বলিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ হয়। উদ্ধৃত গৌতম-সূত্রের ব্যাখ্যায় 'ন্যায়সূত্রবিবরণ'কার রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"মনুষ্যবৃক্ষাদেশ্চ প্রত্যেকং মহত্ত্বেন প্রত্যক্ষত্বাৎ তথা প্রত্যক্ষস্য দূরত্বাদিদোষেণ প্রতিবন্ধাদনুৎপত্তিঃ সমুদায়ত্বেন প্রত্যক্ষে চ তদ্দোষস্য প্রতিবন্ধকত্বাকল্পনাৎ তথা প্রত্যক্ষং জায়তে।" (ন্যায়সূত্রবিবরণ, ১০২ পৃঃ)

যদি এইরূপ শঙ্কা করা যায় যে, অনুমানরূপ প্রমাণবলে পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইবে; অনুমানের আকার এই,—'পরমাণবো নাতীন্দ্রিয়া রূপাদিমত্ত্বাৎ, ঘটাদিবৎ'—পরমাণু অতীন্দ্রিয় নহে, যে হেতু তাহার রূপ আছে, যাহার রূপ আছে, সে অতীন্দ্রিয় হইতে পারে না, দৃষ্টান্ত—ঘটাদি। এইরূপে পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইলে পরমাণুপুঞ্জাত্মক ঘটাদির আর অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না। এ শঙ্কার সমাধান এই যে, এই অনুমান নির্দ্দোষ নহে, ইহাতে 'উপাধি' আছে। যাহা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর

অব্যাপক, তাহাকে উপাধি বলে (২)। এস্থলে 'মহত্ত্ব'ই উপাধি। সাধ্য যেখানে আছে, সেখানে মহত্ত্ব আছেই, কিন্তু হেতু পরমাণুতেও আছে, সেখানে মহত্ত্ব নাই। যে স্থলে 'উপাধি' থাকে, সে হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী, তাহা অনুমিত হয়। আবার 'উপাধি'র অভাবকে 'হেতু' করিয়া 'পক্ষে' 'সাধ্যে'র অভাবও সিদ্ধ হইয়া যায়। যথা,—'পরমাণবোঽতীন্দ্রিয়া মহত্ত্বাভাবাৎ'—পরমাণু অতীন্দ্রিয়, যে হেতু তাহাতে মহত্ত্ব নাই। কাজেই পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা আর সিদ্ধ হইল না। 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা'য় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, 'পরম সূক্ষ্ম বলিয়া পরমাণু প্রত্যক্ষের যোগ্য হয় না, সুতরাং তাহা মিলিত হইয়াও প্রত্যক্ষের গোচর হইতে পারে না; পবনসমূহ মিলিত হইলেও তাহা কদাপি চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় হয় না (৩)।'

অবয়বাবয়বি-বাদের বিপক্ষে বৌদ্ধেরা আর একটা শঙ্কা করে যে, শরীরাদি বস্তু যে একটী অবয়বী, ইহা তুমি কিছুতেই বলিতে পার না। একটী বস্তুতে কখনও বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় থাকে না। কিন্তু হস্ত কম্পমান হইলেও শরীর নিষ্কম্প থাকে। এখন কম্পন আর কম্পনাভাব—এই বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের (শরীর যদি একটী অবয়বী হয়) একই শরীরে থাকা সম্ভবপর নহে। আর আমাদের মতে পরমাণুসমুদায়ই শরীরপদবাচ্য, কাজেই তাহার এক অংশে কম্পন ও অন্য অংশে কম্পনাভাব থাকিতে পারে। এই কথার উত্তরে 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন, হস্তের স্পন্দন হইলেই যে শরীরের স্পন্দন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। যখন হস্তমাত্র সঞ্চালনের কারণ উপস্থিত হয়, তখন কেবল হস্ত স্পন্দিত হইবে, আবার শরীর-ক্রিয়ার হেতু উপস্থিত হইলে শরীরও স্পন্দিত হয়। শরীর আর হস্ত ত এক বস্তু নহে,—শরীর অবয়বী, হস্তাদি অবয়ব। সুতরাং হস্তের স্পন্দনের সময়ে শরীর নিঃস্পন্দ থাকিলেও কোনও অনুযোগের কারণ দেখা যায় না (৪)। 'কণাদরহস্যে' শঙ্করমিশ্রও

---

(২) "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা।
স উপাধির্ভবেৎ————" ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৮ শ্লোক।

(৩) "পরমাণবস্তু পরমসূক্ষ্মতয়া ন স্বরূপেণ গ্রহণার্হা ইতি মিলিতা অপি ন গ্রহীতব্যা এব, ন জাতু মিলিতা অপি পবনসমূহা ভবন্তি চাক্ষুষাঃ।"—তাৎপর্য্যটীকা, ২৭৫ পৃঃ।

(৪) "পাণৌ কম্পমানে শরীরকম্পাবশ্যম্ভাবনিয়মাভাবাৎ যদা পাণিমাত্রং চালয়িতুং কারণং ভবতি তদা তন্মাত্রং চলতি, ন শরীরং কারণাভাবাৎ, যদা তু শরীরস্যাপি চলনকারণং ভবেৎ তদা শরীরং চলত্যেব নাস্যাচলনমস্তীতি কুতো বিরোধঃ।"—ন্যায়কন্দলী, ৪০ পৃঃ।

এই ভাবের কথাই লিখিয়াছেন (৫)। অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, পরমাণু-পুঞ্জকে ঘট বলিলে তাহার অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। পরমাণুতে মহত্ত্ব নাই বলিয়া তাহা অতীন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় বস্তু মিলিত হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না।

বিশ্ববিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, "সা চ দ্বিবিধা। নিত্যা চানিত্যা চ। পরমাণুলক্ষণা নিত্যা। কার্য্যলক্ষণা ত্বনিত্যা।" ইত্যাদি প্রশস্তপাদ ভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"মহত্ত্বং ন পরিমাণান্তরং কিন্তু বিলক্ষণসংস্থানবত্ত্বমেব, তদেব চ দ্রব্যস্য প্রত্যক্ষতায়াং প্রযোজকমতঃ প্রত্যেকপরমাণোরপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সংস্থান প্রভেদাবচ্ছিন্নস্য তস্য প্রত্যক্ষত্বং নানুপপন্নমিতি তু নব্যবৌদ্ধাঃ।"—(সূক্তি)।

মহত্ত্ব পরিমাণ নহে,—বিলক্ষণ সংযোগের নামই মহত্ত্ব, ইহাই দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। এই জন্য প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও বিজাতীয় সংযোগবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জাত্মক ঘটের প্রত্যক্ষ অনুপপন্ন নহে—ইহাই নব্য বৌদ্ধদিগের মত। এই মতের উপর এরূপ আশঙ্কা করা যায় না যে, পরমাণু নিত্য, সুতরাং ঘট[illegible]মাণুপুঞ্জাত্মক হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশের প্রতীতি কেমন [illegible] হয়? কেন না, বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, কাজেই পরমাণুরও তাহারা উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করে। "তথা চ ত্রসরেণোর্মহত্ত্বাৎ প্রত্যক্ষং ন তু দ্ব্যণুকাদেস্তদভাবাৎ" ইত্যাদি "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহাদেবভট্ট, পূর্ব্বপ্রদর্শিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের উত্থাপন করিয়া দোষ দিয়াছেন যে, ঘটকে যদি পরমাণুপুঞ্জাত্মক বলা হয়, তাহা হইলে 'ঘট' ইত্যাকারক প্রতীতির বিষয়তা অসংখ্য পরমাণুতে স্বীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হয়, কাজেই অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে (৬)। এই ভাবে অবয়বী সিদ্ধ হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কাজেই তাহা অনিত্য। এই অবয়বধারা অনন্ত হইলে অর্থাৎ অবয়বাবয়বি-প্রবাহের কোথায়ও বিশ্রাম স্বীকার না করিলে পর্ব্বত আর সর্ষপ উভয়েই অনন্তাবয়বারব্ধ বলিয়া তাহাদের তুল্য পরিমাণের আপত্তি হয়। অবয়বের সংখ্যার তারতম্যানুসারেই পরিমাণের তারতম্য হইয়া

---

(৫) পাণ্যবচ্ছেদেন যত্র চলত্বমুপলভ্যতে তত্র পাদাবচ্ছেদেনাচলত্বং তত্রাবয়বিনোঽচলত্বমবয়বস্য পরং চলত্বমবিরোধাৎ।"—কণাদরহস্য, ১২ পৃঃ।

(৬) "অত্র নাস্তিকানুযায়িনঃ...ইত্যাহুঃ। তন্ন ঘট ইত্যাদিপ্রতীতিবিষয়তায়া অনেক পরমাণুষু কল্পনে গৌরবাদিত্যবয়বাতিরিক্তাবয়বিসিদ্ধিরিতি দিক।"—মুক্তাবলীপ্রকাশ, ১৪৮ পৃঃ।

থাকে। এখন পর্ব্বত আর সর্ষপ উভয়ের অবয়বই যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতের অবয়বের সংখ্যা আর সর্ষপের অবয়বের সংখ্যার কোনও বিশেষ থাকিল না। কাজেই সর্ষপের ও পর্ব্বতের সমান পরিমাণ হউক। আপত্তির আকার এইরূপ,—"সর্ষপো যদি সাক্ষাৎপরম্পরাসাধারণমের্ব্বারম্ভকান্যূনাবয়বারব্ধঃ স্যাৎ এতাবৎপরিমাণাধিকপরিমাণঃ স্যাৎ।" অবয়বাবয়বি-ধারার বিশ্রাম স্বীকার না করিলে দ্ব্যণুক আর ত্রসরেণুরও তুল্য পরিমাণের আপত্তি হয়; কেন না, ত্রসরেণুর ন্যায় দ্ব্যণুকও সাবয়বের দ্বারা আরব্ধ হইল। তা'ই—"অনন্তাবয়বারব্ধত্বাবিশেষেণ মেরুসর্ষপাদীনাং পরিমাণভেদানুপপত্তেঃ।" ইত্যাদি 'কিরণাবলী' গ্রন্থের ব্যাখ্যাবসরে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"যদি দ্ব্যণুকং সাবয়বারব্ধং স্যাৎ মহৎ স্যাদিতি মহত্ত্বাপত্তিরেব তুল্যপরিমাণত্বাপত্তিঃ। যদ্বা দ্ব্যণুকত্রসরেণ্বোঃ সাবয়বারব্ধত্বেন তুল্যপরিমাণাপাদনে তাৎপর্য্যম্।"—(প্রকাশ)।

[ক্রমশঃ।

সাহিত্য ও সমাজ।

(মিলনের অন্তরায়)

[শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

'সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায়' বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে মৌলবী কেঃ, চাঁদ মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়ের এই পত্রিকায় মসীযুদ্ধ হইয়াছে। মৌলবী সাহেব সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায়ের জন্য বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত হিন্দুলেখকগণকে দায়ী করিয়াছেন। রাখালরাজ বাবু যথাশক্তি প্রতিবাদ করিয়াছেন। শেষে সম্পাদক মহাশয় উভয়েরই সপক্ষে ও বিপক্ষে কিঞ্চিৎ বলিয়া আপোস-রফার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভালই। কিন্তু উহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর হইয়াছে কি না, আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। চাঁদ সাহেব যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষেরই আছে। নবাবনন্দিনী কতলু খাঁর দুহিতা আয়েসা কেন জগৎসিংহের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে তাহার সদুত্তর পাওয়া যাইত। এখন এ সম্বন্ধে হিন্দুদের কৈফিয়ৎ

এই—উপন্যাস উপন্যাসই, উপন্যাস ইতিহাস নহে। ইহা ত গেল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষের কথা। কিন্তু কেঃ, চাঁদ সাহেব রবীন্দ্রনাথকে কেন যে হিন্দুলেখক-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রচলিত হিন্দু-সমাজের বিধিনিষেধ অমান্য করিতে যিনি গৌরববোধ করেন, তিনি হিন্দু নহেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যিনি মানেন না, তিনি ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই করুন, আর গায়ত্রীর সাধনাই করুন, হিন্দু নহেন। ব্রাহ্মরাও হিন্দু-নামে পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করেন না, ইহা চাঁদ সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও দার্জিলিং পাহাড়ের কাহিনীটিকেও একই ধারার অন্তর্গত করিয়া আমরা বলিতে পারি—গল্প গল্পই, গল্প সত্যঘটনা নহে। অর্থাৎ, এবিষয়ে 'কাফের' হিন্দুদের বলিবার কথা এই—ভাই মুসলমান, তোমাদের মনে আঘাত দিবার জন্য আমরা কিছু লিখি নাই, তথাপি যদি তোমরা ইহাতে দোষ গ্রহণ কর, তবে আমরা নাচার।

কিন্তু আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা কিরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাও দেখা কর্তব্য। প্রথমতঃ, মুসলমান সমাজের মুখপত্র 'মহম্মদী'তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের কথাই বলি। বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি 'কনোজ-কুমারী' নামে একখানি উপন্যাস আছে। উপন্যাস হিসাবে 'কনোজকুমারী'র মূল্য কতটুকু বা কতখানি, না পড়িলে বলা যায় না। বিজ্ঞাপন পড়িলাম, বিজ্ঞাপনের বাহারটাই দেখুন।

"মোসলেম-বিদ্বেষপূর্ণ বিবিধ পুস্তক পড়িয়া যাহারা (যাঁহারা)-মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তাঁহারা একবার কনোজকুমারী পড়িয়া দেখুন, শান্তি (শান্তি) পাইবেন। পত্রে পত্রে জাতীয় মুহাত্ম্য (মাহাত্ম্য) ছত্রে ছত্রে মধু বর্ষণ। আর্য্যদিগের বিশাল ভারতবর্ষ কিরূপে মোসলেম পদানত হইয়াছিল ইহাতে তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বীরশ্রেষ্ঠ সোলতান মোহাম্মদ ঘোরীর ভারতবিজয়, হিন্দু স্বাধিনতার (স্বাধীনতার) অবসান, কনোজরাজ-দুহিতার আশ্চর্য্য প্রেম, কুতুবুদ্দিনের প্রেম প্রত্যাখ্যান, সূর্য্যসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা, পৃথ্বীরাজের ভ্রাতুঃপুত্রী (?) হরণ ও শোচনীয় পরিণাম এবং অপূর্ব্ব মোসলেম মাহাত্ম্যপূর্ণ উপাদেয় উপন্যাস।"

এমন বিজ্ঞাপন পড়িয়াও আর কেহ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করিবার আশা করিতে পারেন কি? এই জাতীয় বিজ্ঞাপন হিন্দু বঙ্কিমের বা ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের কোনও উপন্যাসের বিক্রয়-বাহুল্যের জন্য কোনও পত্রিকায় কেহ দেখিয়াছেন কি? কনোজকুমারী পাঠকের মনে

যে ভাবেরই রেখাপাত করুক, বিজ্ঞাপনটি যে হিন্দুবিদ্বেষপূর্ণ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'কনোজকুমারী'-তে পত্রে পত্রে জাতীয় মাহাত্ম্যই থাকুক, আর ছত্রে ছত্রে মধুই থাকুক, আমরা উহা না পড়িয়াও বিজ্ঞাপন-দাতার কৃপায় (শাস্তি নহে) সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে শাস্তি পাইয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, 'প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক' কনোজ-কুমারী-তে 'কনোজরাজদুহিতার আশ্চর্য্য প্রেম, কুতুবুদ্দিনের প্রেম প্রত্যাখ্যান, সূর্য্যসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা, পৃথ্বীরাজের ভ্রাতুঃপুত্রী (?) হরণ ও শোচনীয় পরিণাম' থাকাতেই কি উহা 'অপূর্ব্ব মোসলেম মাহাত্ম্যপূর্ণ উপাদেয় উপন্যাস' হইয়াছে? 'অপূর্ব্ব' অতি সহজেই হয়, কিন্তু মোসলেম মাহাত্ম্যপূর্ণ হইল কিরূপে? আমাদের বিশ্বাস, উপন্যাসলেখক যদি উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচারে মনোযোগী হয়েন, তবে হিন্দু ও মুসলমানের দোষগুণের বিচার হয়, উভয় জাতির মিলনের পথে কাঁটা পড়ে না। প্রতি-শোধের চেষ্টায় বিরোধ বাড়ে, মিলন সুদূরপরাহত হয়। ঐতিহাসিক হউক বা না হউক, কোনও ঘটনাকে পল্লবিত না করিলে উপন্যাস জমে না, ইহা উপন্যাস-লেখক বা বিজ্ঞাপনদাতা না জানিলেও অনেক উপন্যাস-পাঠক জানেন। কোনও উপন্যাস যদি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক হয়, তবে সেই 'প্রকৃত' ঘটনা যে ঐতিহাসিকের দপ্তর হইতে সংগৃহীত হয়, তাঁহার সহিত অন্য ঐতিহাসিকের মতভেদ আছে কি না, কাহার মত প্রকৃত, কেন প্রকৃত, ইহাও বিজ্ঞাপনে দিলে ভাল হয়, অভাবে উপন্যাসের ভূমিকায় থাকা উচিত।

বলিতে ভুলিয়াছি, কনোজকুমারী উপন্যাস মহম্মদীর পুস্তকবিভাগে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের কথা ছাড়িয়া দেখা যাউক, মহম্মদীর সম্পাদকমণ্ডলী হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন। বিগত ৫ই আশ্বিনের মহম্মদী হইতে 'বকর ইদ' প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বকর ইদ আগতপ্রায়। এই সময় কোরবাণী উপলক্ষে দেশে হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় দেশের দূরদর্শী ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কোরবাণী মোসলমানের পক্ষে অপরিত্যাজ্য ধর্ম্মকার্য্য। ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে মোসলমান সমাজ যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া থাকেন। অবশ্য 'গো-বধ' হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ, তাঁহারা উহা দেখিলে মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন। সেইজন্য আমরা মোসলমান সমাজকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে অনুরোধ করি। যথাসম্ভব গোপনীয় স্থানে হিন্দুর চক্ষের আড়ালে 'কোরবাণী'র চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে দেশে কোনপ্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, এরূপ কার্য্যে কোন পক্ষেরই যোগদান করা উচিত নহে।"—

ভাল কথা। মাত্র বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে কেন, ভবিষ্যতে শান্তির সময়েও যাহাতে দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়, দেশের দুরদর্শী নেতাদের সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইত। অতঃপর মহম্মদী হিন্দু ভ্রাতাদিগকে কি বলিতেছেন শুনুন।—

"এই উপলক্ষে হিন্দুভ্রাতাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি যে, মোসলমান তাঁহাদের মনে আঘাত দিবার জন্য কোরবাণী করে না। ইহা তাহার ধর্ম্মকার্য্য। হিন্দুভ্রাতারা আপনাদের শাস্ত্র ও সংস্কার অনুসারে প্রতিমা পূজা করিয়া থাকেন, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহার মিছিল বাহির করিয়া থাকেন, এসলামে ইহার ন্যায় মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু মোসলমান তাহাতে বাধা দেয় না, ন্যায় ও আইনের হিসাবে দিতে পারে না। ঠিক এইরূপ মোসলমানের গো কোরবাণী হিন্দুর নিকট পাপজনক হইলেও হিন্দুও ন্যায় ও আইনের হিসাবে তাহাতে বাধা দিতে পারে না। হিন্দু যদি বলেন মোসলমান গো কোরবাণী করিলে আমার ধর্ম্মের হানি হয়, আমার ধর্ম্মভাব আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে এই যুক্তি অনুসারে মোসলমানও ত বলিতে পারে, হিন্দু প্রতিমা পূজা করিলে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রতিমার মিছিল বাহির করিলে আমার ধর্ম্মভাবে গুরুতর আঘাত লাগে। অর্থাৎ গো কোরবাণী বন্ধ করিবার পক্ষে হিন্দুর দাবী যতটা, প্রতিমা পূজা বন্ধ করার পক্ষে মোসলমানের দাবী তাহা অপেক্ষা বড় বই ছোট নহে। আশা করি, উভয় পক্ষ স্বদেশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইবেন।"

ন্যায়, আইন আবার যুক্তি! তবে কি মুসলমানের গো-কোরবাণী বন্ধ করিতে হইলে হিন্দুর প্রতিমা পূজাও বন্ধ করিতে হইবে? সম্মুখে দুর্গোৎসব— সমস্যা বটে!

ধর্ম্ম যুক্তির শাসন মানে, কিন্তু আইনের শাসন মানে না। ন্যায়, আইন ও যুক্তি এই তিনটি মানিয়া মুসলমান ভ্রাতারা সকল বিষয়ে চলেন কি না, তাঁহারাই জানেন; হিন্দুরা কিন্তু সকল বিষয়ে ঐ তিনটিকে মানে না, সেইজন্য চোর-পুত্র জেলে গেলে তাহার মাতাপিতা ন্যায়, আইন ও যুক্তি অবহেলা করিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

গো-কোরবাণীতে বাধা দিলে মুসলমানের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেওয়া হয় বলিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা উচিত, বকরিদ পর্ব্বে কোরাণের হুকুম মোতাবেক যে শ্রেণীর গাভী কোরবাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, অধিকাংশ মুসলমান ভ্রাতা তাহাই কোরবাণী করেন কি না। ধর্ম্মকার্য্যের দোহাই দিয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি হিন্দু, কি মুসলমান কাহারও পক্ষে শোভন নহে।

হিন্দুরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রতিমার মিছিল বাহির করেন, মুসলমানরাও

ঢোল-কাঁসী বাজাইয়া মহরমের মিছিল বাহির করেন। ঐ মহরমের মিছিলের সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মের আন্তরিক কোনই যোগ না থাকিলেও অনেক হিন্দু এই ব্যাপারে মুসলমান ভ্রাতাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দেয়। দেওয়াই উচিত। হিন্দুর প্রতিমার মিছিলের সঙ্গে গো কোরবাণীর তুলনাটি আদৌ সঙ্গত হয় নাই।

হিন্দুরা গাভীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে বলিয়াই মুসলমান ভ্রাতারাও তাহাই করুন, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু মুসলমান যেমন তাঁহার দেবতার প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন দেখিলে ব্যথিত হয়েন, হিন্দুর পক্ষেও এই কথাটি খাটে। তথাপি বকরিদ পর্ব্বে গুপ্তস্থানে গো-কোরবাণী করিলে তাহাতে বাধা দিতে যাওয়া বর্ত্তমানকালে কোনও হিন্দুর পক্ষে উচিত নহে। দূরদর্শী হিন্দুরা এইরূপ ব্যাপারে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু দেশে যেমন অশিক্ষিত গুণ্ডা হিন্দুর অভাব নাই, তেমনই অশিক্ষিত গুণ্ডা মুসলমানেরও অভাব নাই। ঐ সকল হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মনে আঘাত দিতে গিয়া দাঙ্গা করে। ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করা উহাদের উদ্দেশ্য নহে, দাঙ্গা করাই উদ্দেশ্য। বিরোধপ্রিয় ঐ সকল হিন্দু ও মুসলমানের কার্য্যে প্রশ্রয় দিলে, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মভাবে বাধা দেওয়া হয় না। ন্যায়, আইন [illegible] পদে পদে অবহেলা করার প্রবৃত্তি যাহাদের প্রবল, সেই হিন্দু বা মুসলমানের কোনও কার্য্যই প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত মুসলমান সমর্থন করেন না। মুসলমানের ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোনও হিন্দুরই উচিত নহে, অপর পক্ষে হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা কোন মুসলমানেরও উচিত নহে। কিন্তু যে কর্ম্মে দেশের হিত না হইয়া অহিতই হয়, তাহা বর্জ্জন করা হিন্দুরও উচিত, মুসলমানেরও উচিত। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশে গোহত্যা নিবারণ উচিত কি অনুচিত, বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজ এ বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা সুখী হইব। গো-মাংস বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল কি না, সে সম্বন্ধে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-গণের মতামত জানাও আবশ্যক।

আর একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। কোনও কোনও হিন্দু প্রতিমার সম্মুখে ছাগ বলি দেয়, কোনও কোনও হিন্দু দেয় না। ইহাতে কোনও হিন্দুরই ধর্ম্মভাব বাধা প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ বকরিদ পর্ব্বে মুসলমান ভ্রাতারা গো-কোরবাণী না করিয়া উট, দুম্বা বা ছাগল—যাঁহার যেমন সঙ্গতি—

কোরবাণীর ব্যবস্থা কারলে, মুসলমানের ধর্ম্মভাব ক্ষুণ্ণ হয় না, হিন্দুর সহিত বিরোধের আশঙ্কাও থাকে না। আমাদের অনেক মুসলমান বন্ধু গোহত্যার বিরোধী। তাঁহারা অবশ্যই অধার্ম্মিক নহেন, অ-মুসলমানও নহেন। বলা বাহুল্য যে, যে যে কারণে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সংঘটিত হয় না, গো-কোরবাণী তাহাদের একটি। ইহা বুঝিয়া উভয়পক্ষের নেতারা আপোস-রফার চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা।*

আবাহন।

[শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।]

মুগ্ধ-বঙ্গ নাচিছে [illegible]
[illegible]-জননী,
[illegible] পরে পূজিবে ভক্ত
এস মা বঙ্গে সিংহবাহিনী।
গন্ধ-বিভোর মত্ত পবন
এসেছে শুভবার্ত্তা লইয়া,
ভিখারী কণ্ঠে আবাহন-গীতি
উঠে বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া।
ঝিল্লী-মুখর-সুপ্ত-পল্লী, যেন মা—
আজিকে উঠেছে জাগিয়া,
ভাণ্ডার শূন্য করিয়া প্রকৃতি
দেছে, সজীব চিত্র আঁকিয়া।
কোথা স্বর্গ, ইহার অধিক—
মূঢ় যে মোরা জানি না কেহ—
বুঝি স্বর্গের গরিমা হরেছে ধরণি
পূত পুলকিত ক্ষুদ্র গেহ।
এস মা পার্ব্বতী, এস ভগবতী,
কর মা মোদের আশিস্ দান,
এস অন্নপূর্ণা। এস মা অপর্ণা!
পতিত পুত্রে কর মা ত্রাণ।

---

* নূতন লেখককে উৎসাহদান ও বঙ্গসাহিত্যে নূতন লেখকের প্রবেশলাভের সহায়তা করা 'অর্চ্চনা'র অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা সেইজন্য 'অর্চ্চনা'য় কয়েক পৃষ্ঠা নবীন লেখকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান যুদ্ধাবসানে 'অর্চ্চনা'র কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে; বলা বাহুল্য, সেই সময়ের 'অর্চ্চনা'র কলেবরের অনুপাতে 'নবীন লেখকের পৃষ্ঠা'র সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে।—সম্পাদক।

সুভদ্রা।

[শ্রীমতী উমালতা ঘোষ।]

নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির, পাণ্ডব শিবির—
স্তিমিত দীপের মালা, রণ-কোলাহল
শ্রান্ত যেন রণবাদ্য রজনী গভীর।
সুষুপ্ত নিদ্রার কোলে, শ্রান্ত সৈন্যদল।

আহতের ক্ষীণ কণ্ঠ, উঠে ধীরে ধীরে
ক্ষতস্রাবে ক্ষীণ তনু, শিয়রে মরণ—
সাথী সাথে নারী এক পশিলা শিবিরে—
ক্ষতে স্নিগ্ধ কর তার দিলা প্রলেপন।

মেলি নেত্র, ক্ষীণস্বরে, কহিল সেনানী
স্নিগ্ধতম করুণার কর-পরশনে—
"ব্যথিতের যত ব্যথা মুছালে জননী!
কে তুমি মা দয়াবতী? কহিবে কি দীনে!"

তীব্র কণ্ঠে, কহি উঠে, সখী সুলোচনা
চিনিয়াছি এই দুষ্টে কৌরব-সেনানী
অপাত্রে অর্পেছ দেবী তোমার করুণা!
এই দুরাচার তব, বিপক্ষ-বাহিনী!

কাতরে বিস্ময়ে কহে সে কৌরব বীর—
"পাণ্ডব বাহিনী মাঝে, বন্দী তবে আমি!"
"চিন্তাহীন হও বৎস,—মুছ অশ্রুনীর।
মাতৃ অঙ্কে সন্তানের, কি ভয় বাছনি!"

সবিস্ময়ে সহচরী হেরিলা আননে,
উঠিয়াছে উদ্ভাসিয়া, স্বরগ গরিমা
স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ উছলে নয়নে,
এ[illegible]ধারে মূর্ত্তিমতী, করুণা মহিমা।

স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি আহতের পানে,
কি যেন বি[illegible]র তৃপ্তি, পশিয়াছে প্রাণে।
চিনিলে কে[illegible] মহাপ্রাণা সতী,
কারুণ্য র[illegible] দে[illegible]ণবতী!

শান্তি।

[শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।]

এতদিন পরে দেব পেয়েছি তোমারে—
দরশে পরশে তোমা' বিশ্বের মাঝারে।
কাননে কাননে ভরা প্রভাতের ফুল—
তোমার হাসিটি যেন করি' মসগুল।
তোমার নিশ্বাস বুঝি মাতায় পবনে—
বায় জ্বালা, কি যে তৃপ্তি মৃদু পরশনে!
তোমার নয়নতারা প্রভাত তপন
বিরাট হৃদয়খানি অসীম গগন।
কত বর্ষ নিশিদিন, শয়নে স্বপনে—,
খুঁজিয়াছি তোমা দেব, নিদ্রা-জাগরণে।
এখন পেয়েছি তোমা' অন্তরে বাহিরে—
কিবা প্রিয়দর্শন—তুলনা নাহিরে!

ঐতিহাসিক স্মৃতি-সহায়।

[শ্রীকালিকানন্দ মাজিলা।]

নিয়ম।—প্রত্যেক স্মরণীয় ঘটনা সম্বন্ধে দুই লাইন কবিতা থাকিবে। কেবল প্রথম লাইনের শব্দগুলির আদ্যাক্ষর সমূহের পর পর মূল্য ধরিলেই ঘটনার সময় নির্ণীত হইবে। যে সব অক্ষরগুলির মূল্য দেওয়া হয় নাই, সেগুলির মূল্য ধরিবার আবশ্যকতা নাই। অক্ষরের মূল্য :—

ক,	চ,	ট,	ত,	প,	হ,	য,	ব,	র,	ল
১	২	৩	৪	৫	৬	[illegible]	৮	৯	০

নির্ণীত খৃষ্টাব্দের প্রথম অঙ্কটী ০ হইলে উহা 'পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ' বুঝিতে হইবে।

১। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব—(কতবপ = ১৪৮৫)

কলুষী তরাতে বঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।
আবির্ভূত নবদ্বীপে সহ সাঙ্গোপাঙ্গ॥

২। টাইমুরের ভারতাক্রমণ—(কটরব = ১৩৯৮)

কঠিন টাইমুর রক্তে বহাইল নদী।
ভয়ে দিল্লীবাসীগণ কাঁদে নিরবধি॥

৩। সোমনাথ লুণ্ঠন—(কলচত = ১০২৪)

করি লুট সোমনাথ চলিল তখন।
রত্ন লভি মামুদ হরষিত মন॥

৪। জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ—(ককযত = ১১৭৪)

করাইল কত যত্নে সমুদ্রের তীরে।
অনঙ্গভীম জগন্নাথের মন্দিরে॥

৫। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু—(করলক = ১৯০১)

[illegible] রাণী ভিক্টোরিয়া লভিলা কবর।
পৃথিবী ব্যাপিয়া উঠে শোকের লহর॥

৬। বুদ্ধের তিরোভাব—(লতযয = ০৪৭৭)

লভে তথাগত মুক্তি যোগী যোগবলে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রচারি ভূতলে॥

৭। পলাশীর যুদ্ধ—(কযপয = ১৭৫৭)

কোন্ যুগে পলাশীর যুদ্ধের ঘটন?
সিরাজের সনে হ'ল ক্লাইবের রণ॥

৮। পানিপথ—১ম যুদ্ধ—(কপচহ = ১৫২৬)

কখন পাঠান চূর্ণ হইল ভারতে?
ইব্রাহিম বাবরের যুদ্ধে পানিপথে॥

৯। পানিপথ—২য় যুদ্ধ—(কপপহ = ১৫৫৬)

কি প্রকারে প্রভুভক্ত হিমুর মরণ?
পানিপথে বৈরাম করিল সংঘটন॥

১০। পানিপথ—৩য় যুদ্ধ—(কযহক = ১৭৬১)

কত যত্নে হনন করিল মহারাষ্ট্রে।
দুরাণী আহ্মদ সাহ পানিপথ ক্ষেত্রে॥

১১। অন্ধকূপ হত্যা—(কষপহ = ১৭৫৬)

কলিকাতা যুদ্ধক্ষেত্রে পল্টনের হার।
মাণিকচাঁদ পাইলেন বন্দীরক্ষা ভার॥

১২। মিউটিনী—(কবপষ = ১৮৫৭)

করিল বারাকপুরে পল্টনেরা যুদ্ধ।
মিউটিনী রূপে তাহা ছাইল দেশশুদ্ধ॥

১৩। সতীদাহ নিবারণ—(কবচর = ১৮২৯)

করুণায় বেণ্টিঙ্কের চিত্ত রহে ভরা।
সতীদাহ নিবারণ করিলেন ত্বরা॥

১৪। বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়—(ককরব = ১১৯৮)

কুমন্ত্রীর কথায় রাজ্য বখ্‌তিয়ারে দিয়া।
পলায় লক্ষ্মণসেন নদীয়া ছাড়িয়া॥

১৫। রণজিৎ সিংহের মৃত্যু—(কবটর = ১৮৩৯)

কোহিনূরে বিমণ্ডিত টোপর রাজার।
রণজিৎ মরণে পঞ্জাব ছারখার॥

১৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—(কষরট = ১৭৯৩)

কর্ণওয়ালিস যত্নে রাজস্বের টান নাই।
দশসালা বন্দোবস্ত হৈল চিরস্থায়ী॥

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা তত্ত্ব।

["ও-পারের কথা"র লেখক।]

মনকে যাবতীয় সৎগুণে ভূষিত করাই প্রকৃত ধর্ম্মবাচ্য। সৎগুণের মাত্রানুসারে জীব ধর্ম্মজগতে ক্রমশঃ শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হয়েন। অজ্ঞানতা বা মোহান্ধতা জীবের শূদ্রাবস্থা। মস্তিষ্ক কর্ষণের কাল বৈশ্যাবস্থা। গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিধিমত পালন ও তৎসঙ্গে মনকে সৎগুণসম্পন্ন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও ধর্ম্মসাধনের কাল ক্ষত্রিয়াবস্থা। পরিশেষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মনকে আত্মায় পরিণত করিবার ঐকান্তিক উদ্যমের কাল ব্রাহ্মণাবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানী বাচ্য হয়েন। সেই অবস্থায় জীব প্রকৃত স্বামী, সোহহং, পরমহংস, রাজর্ষি, মহর্ষি ইত্যাদি পদবাচ্য হয়েন। ইহাই ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ণত্বাবস্থা।

জীবদেহস্থিত মনই প্রকাণ্ড কর্ম্মকর্ত্তা। বাষ্পের অপেক্ষাকৃত স্থূল অবস্থার নাম যেমন জল, আত্মার আংশিক ঘনীভূত অবস্থার নাম মন। মনকে আত্মায় পরিণত করাই দুর্লভ মানব জন্মোচিত কর্ম্ম বা প্রকৃত সাধন। সুতরাং দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় ব্যতিরেকে জীবের শূদ্রত্ব ঘুচা অসম্ভব। মনের যাবতীয় অগুণরাশিকে অল্প সময়ের মধ্যে ধৌত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এই ধৌতকার্য্যে বিশেষ যত্নশীল হইয়া **যাঁহার যাহা জাগতিক কর্ম্ম** উহা কর্ম্মক্ষয় হিসাবে কিন্তু মনঃপ্রাণ ঐক্য করতঃ সাধনের সঙ্কল্প ও চেষ্টা **ধর্ম্মকর্ম্মের নিম্ন অঙ্গ। ধর্ম্মকর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ বা মস্তিষ্ক** মনকে যথাসাধ্য এক চিন্তায় বা কার্য্যে কেন্দ্রীভূত করা ও প্রত্যহ অবকাশ মত নির্জ্জন ও মুক্ত স্থানে পরিভ্রমণ বা উপবেশন করতঃ উচ্চ বা সচ্চিন্তায় বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের নিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির এককালীন পরিবর্দ্ধন যেমন অত্যাবশ্যক, জীবধর্ম্মে বা কর্ত্তব্যকর্ম্মে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম এককালীন সাধন দ্বারা পারিপাট্য অর্জ্জন করা জীবোচিত সাধন। এই প্রকার সাধন ফলে—অবশ্য অধ্যবসায়কে সম্বল করিয়া জীব স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাকুশলতা লাভ করেন। পরে প্রত্যেক চিন্তাবীজ হইতে ইচ্ছালতা দেখা দেয় ও প্রত্যেক ইচ্ছালতা হইতে কর্ম্ম-সুফল উৎপাদিত হয়।

ঘটনাচক্রের পুত্তলিকাবৎ জীব নিজ নিজ ভাবে স্ব স্ব কর্ম্ম সাধন করিতেছেন ও তদ্রূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া জীবধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রত্যেকের বদ্ধমূল ধারণা। ধারণা অর্থে সংস্কার। সংস্কার হইতে চিন্তা ও চিন্তা হইতে সাধ মানব-হৃদয়-নদীতে কত শত বুদ্‌বুদসম অহোরহঃ দেখা দিতেছে ও বিলীন হইতেছে। কিন্তু যখন কোন সংস্কার অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় বদ্ধমূল হয়, উহাই সেই পরিমাণে চিন্তার ও সাধের পুত্তলিকাসম মানসপটে নৃত্য করে। পরে সেই সেই পুত্তলিকায় স্ব স্ব ইচ্ছাবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহা চিন্তা ও ইচ্ছানুযায়ী সু বা কু কর্ম্মফল প্রসব করে।

আত্মা ও দুই মুখ বিশিষ্ট মন মানবদেহে অবস্থিত। একটী কাঠির মধ্যস্থলে আর একটী কাঠিকে দাঁড় করাইলে উভয়ে যে অবস্থায় থাকে, আত্মা ও মন তদ্রূপ অবস্থিত। আত্মার সন্নিকটস্থ মনের মুখটী আত্মায় সংলগ্ন বলিয়া সুচিন্তাকরণে ও সুকর্ম্মসাধনে যত্নশীল। ইহার নাম সুধামুখো বা পাকা মন। মনের অপর মুখটী আত্মা হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া জীব প্রবৃত্তির দাস। ইহার

নাম গরলমুখো বা কাঁচা মন। আত্মা ও দুই মুখ বিশিষ্ট মন প্রকৃত জীববাচ্য। সুতরাং অস্থির পিঞ্জর ও চর্ম্মের আবরণ আত্মার ও মনের আস্তানা মাত্র। ফলতঃ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মবাচ্য হইবার সাধ পুষিলে বা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে দেহজনিত ভেদাভেদ জ্ঞান হৃদয় ও মস্তিষ্ক হইতে বিধৌত করা বিশেষ কর্ত্তব্য। সংস্কারের ও শিক্ষার দৌলতে মনকে সৎগুণে পূর্ণ করা, কিম্বা মন হইতে ভেদাভেদ জ্ঞান রহিত করা, কিম্বা মনকে আত্মায় পরিণত করা, কিম্বা আত্মাকে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া হিন্দুদিগের যাবতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তির উদ্ভাবনা। জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম বিহিত বিধানে এককালীন সাধনে সচেষ্ট হইলে কি প্রকারে দেহস্থিত আত্মাই সন্তানবৎসলা জননী আকারে জীবকে শিবত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করেন অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ হইতে ত্রিগুণাতীত করেন, এই রহস্যভেদের উদ্ভাবনার নাম শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা।

জল হইতে তরঙ্গ উদ্ভূত, জলেই অবস্থিত ও পরিশেষে জলের সহিত মিলিত হয়। যাঁহা হইতে উদ্ভূত তিনি জনকবাচ্য, যাঁহার ক্রোড়ে স্থিত তিনি জননী-বাচ্য, যাঁহার সহিত মিলিত হইতে হয় তিনি স্বামিবাচ্য। অতএব তরঙ্গের পিতা, মাতা ও স্বামী একমাত্র বারি। এই বিধানে মনোরূপ তরঙ্গের জনক, জননী ও স্বামী একমাত্র দেহস্থিত আত্মা। আত্মা পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ, সুতরাং জ্ঞানের, প্রেমের, শক্তির, শান্তির ও আনন্দের ভাণ্ডার। জীব মন আত্মার তুলনায় জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে শিশুসম। সন্তানের প্রতি পিতাপেক্ষা জননীরই অধিক মমতা ও সাধারণতঃ সন্তানের টান পিতাপেক্ষা জননীর প্রতি। সুতরাং আত্মাকে জননী-পদে বরিত করা জীবের পক্ষে প্রথমাবস্থায় সহজসাধ্য সাধন। উক্ত কারণে জীবদেহস্থিত আত্মা শ্রীশ্রীদুর্গা আকারে কল্পিত ও পূজিত।

পূজা করণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। পূজিত উপাদান জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, শান্তি, আনন্দ প্রভৃতি সৎগুণে বিভূষিত ও তিনিই পূজারীর পিতা, মাতা বা স্বামী, এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া তাঁহার যাবতীয় গুণের আদর করাই প্রকৃত পূজাবাচ্য। এই প্রকার পূজার উপাদান পূজারীর দেহস্থিত আত্মা ও উহার পূজারী পাকা মন। পূজার উপকরণ মনের যাবতীয় গুণাগুণ। ইহাই সাত্ত্বিক পূজা। এম্ববিধ পূজা করণের ফলে দুই মুখবিশিষ্ট

মন আত্মার সৎগুণাবলীতে ভূষিত হইয়া আত্মা সম অবস্থায় পরিণত হয় ও দেহান্তে আত্মাও চৈতন্যময়ী মন একজুটী হইয়া পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হয়। ইহাই সচ্চিদানন্দময় সাগরের সঙ্গম। সুতরাং ইহা ধারণাগম্য যে, পূজারী হইতে হইলে নিজ মনকে সৎগুণে পূর্ণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। সেই প্রকার মহাজন কর্ত্তৃক একখণ্ড প্রস্তর বা কোন মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইলে পূজারীর মন চৈতন্যযুক্ত হওয়া প্রযুক্ত উহা তাঁহার স্থূলদেহভার রক্ষণে ও প্রতিমা পূজা করণে এককালীন সমর্থ হয়। সেই অবস্থায় সেই মহাজনের আত্মা তাঁহার চৈতন্যযুক্ত মন কর্ত্তৃক বাবা বাবা, মা মা, বা প্রাণবল্লভ প্রাণবল্লভ প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইলে যে কোন নির্জীব উপাদানে তাঁহার আত্মা প্রভাসিত হইয়া উহার সজীবত্ব প্রতিপাদন করে। একমাত্র এই উপায়ে যে কোন প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সাধিত হয়। ইহাই আত্মার সন্দর্শন লাভের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বিধান-কারণ দেহস্থিত আত্মায় লক্ষ্য রাখিয়া আত্মদর্শন বা উহা উপলব্ধি বা উপভোগ করা অপেক্ষা কোন প্রতিমায় বা চিত্রে নিজ নিজ মনকে কেন্দ্রীভূত করা ও তৎপরে ভক্তি বা প্রেম বলে উহার সজীবত্ব প্রমাণিত করা অজ্ঞ সাধকেরও পক্ষে সরল পন্থা। এই মহান্ উদ্দেশ্যে হিন্দুজাতির মূর্ত্তিপূজা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের চক্ষে শূলসম বিঁধিলেও উহা এতকাল আদৃত ও মনে হয় প্রকৃততত্ত্ব আরও উদ্ঘাটিত হইলে ও উক্ত প্রকারের পূজারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অধিকতর আদৃত হইবে। আত্মা শ্রীশ্রীদুর্গাকারে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা ও দশভুজা। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, বাণ, ঢাল, তরবারি, শূল ও ফণী। চোরা আখ্যাত অসুরের কেশগুচ্ছ ও ফণী দেবীর এক হস্তেই ধৃত। দেবী সিংহোপরি দণ্ডায়মানা ও সেই সিংহ কর্ত্তৃক অসুর দংশিত হইতেছে। দেবীও শূল দ্বারা অসুরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। প্রতিমার চালচিত্রে নানা মুনি, ঋষি ও দেবদেবী সহ দেবাদিদেব শঙ্কর মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। দেবীর সন্নিকটস্থা বীণাপাণি ও লক্ষ্মীঠাকুরাণীদ্বয়। উক্ত ঠাকুরাণীদ্বয়ের সকাশে আসীন ময়ূরবাহন কার্ত্তিকেয় ও মূষিকবাহন গণপতি ঠাকুর। গণপতি ঠাকুরের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা কলাবধূ ঠাকুরাণী।

জননী স্বভাবতঃ প্রেমময়ী। প্রেম মাধুর্য্যপূর্ণ বা মধুময়। যে যে পদার্থে মধু বিদ্যমান, যথা ফুলের অন্তঃস্থল, গুড়, আম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি উহারা প্রায়শঃ হরিদ্রাবর্ণ। শশাঙ্ক হরিদ্রা বর্ণের চক্র দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া উহা মাধুর্য্যপূর্ণ। স্থূলচিন্তায় অভিভূত জীবকে কোন গুণের ধারণা করিতে

হইলে স্থূল নিদর্শন দ্বারা এই কার্য্য সহজসাধ্য। শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা এই হেতু তপ্তকাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিতা। জীব-জগতের কেবলমাত্র গুণের আদর করিতে অভ্যাস করিলে তবেই জীবমাত্রেরই গুণবান্‌-গুণবতী হওয়া নিতান্ত সম্ভব।

সাধক মাত্রই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন যে, সাধনকর্ম্মে ঐকান্তিকতার সহিত নিরত থাকিলেও গরলমুখো মনের চোরা-গোপ্তা কদাচরণের জন্য অনেক সময়ে নিস্ফলতাই প্রাপ্য গণ্ডা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধনকর্ম্মে সফলকাম হইতে হইলে কোন অদৃশ্য সহায়তার বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সময়ে আত্মারূপী গুরুকে মা, বাবা বা প্রাণবল্লভ পদে বরিত করিলে ও সাধকের দেহ, প্রাণ, মন ও সংসার সকলই সেই প্রেমময়ের বা প্রেমময়ীর এই ধারণা বদ্ধমূল করিলে আত্মা সেই চৈতন্যময় চৈতন্যময়ী মনকে গরলমুখো মন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দশ-ভুজাকারে সহায়তা করেন। প্রতিমায় গরলমুখো মন চোরাগোপ্তা আচরণের জন্য চোরা বা অসুর বলিয়া অভিহিত। গরলমুখো মনের জাগতিক যাহা কিছুতে দারুণ আসক্তি। এই আসক্তি সমূহের ছেদনোপায় রোগ, শোক, তাপ, অর্থকষ্ট, ও যাবতীয় অভাব অশান্তি। এই আসক্তিগুলি ছেদিত হইলে জীব-হৃদয়ে শূল বা ভীষণ দংশনসম বিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু নিদারুণ [illegible]নায় কোন [illegible] সান্ত্বনা না পাইয়া দারুণ মহা-মোহে নিমজ্জিত [illegible] নিজ [স]ংস্কারানুযায়ী চৈতন্যময়ের শরণাপন্ন হয়। জীব রোগ, শোক, তাপাদিকে বিধাতার নির্ম্মমতার নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিলেও অপেক্ষাকৃত চৈতন্যযুক্ত জীব এই প্রকার এক-একটী অবসাদকে নিয়ন্তার করুণা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, চোরারূপী গরলমুখো মন হইতে পাকা মনরূপী সাধককে নিস্তার দিবার জন্য দেবী অসুরের বক্ষ শূল দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন ও সেই চোরা মনকে চৈতন্য দিবার জন্য জ্ঞান সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া তাহাতে জ্ঞান সঞ্চার করিতেছেন।

দেবী চৈতন্যদায়িনী। অসুরের কেশগুচ্ছ অর্থাৎ 'চৈতন' ধরিয়া এই কার্য্য সাধিতেছেন। জীবের মন হলাহলে পূর্ণ। 'বিষে বিষে বিষক্ষয়' হইয়া থাকে। এই হেতু গরলে পূর্ণ সর্পাকারে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী আকারে মনের গরল দেবী নাশ করিতেছেন। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কলঙ্ক-রটনা ও নানা প্রকার নির্যাতন প্রকৃত সাধক-সাধিকারও অনিবার্য্য প্রাপ্যগণ্ডা। এই সময়ে যাঁহারা স্থির ও ধীর থাকেন, আত্মা জননীসম মাভৈ মাভৈ রবে সান্ত্বনা প্রদান করেন ও বিপজ্জাল হইতে অভাবনীয় উপায়ে সন্তানকে নিস্ক্রান্ত করেন। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য

দেবীর হস্তে ঢাল ও তরবারি। জীবের দেহ ও প্রাণ সতেজ বা কার্য্যকারী অবস্থায় থাকিলে তবে মন একলক্ষ্য হইয়া যে কোন কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করে। আত্মার শক্তিতে শক্তিমান্ হইলে তবেই দেহরূপ বাঁকারি, প্রাণরূপ তাঁত ও মনোরূপ বাণ একলক্ষ্য হইয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে সক্ষম হয়। দেবীর হস্তে ধনুর্বাণ। অর্থাৎ আত্মাই এই দেহের, প্রাণের ও মনের অধিনেত্রী। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছায় জীবের মন ও আত্মা সম্মিলিত হইয়া চালচিত্রে অবস্থিত শিব-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে। জ্ঞানের ও প্রেমের নিদর্শন—পদ্ম। পদ্মের বহিরাবরণ অর্থাৎ পাতাগুলি শুভ্রবর্ণ। শুভ্রবর্ণ অন্ধকারকে বিদূরিত করে। অন্ধকার বা কালো বর্ণ অজ্ঞানতা-নির্দ্দেশক। সুতরাং শুভ্রবর্ণ জ্ঞান-নিদর্শক। এইজন্য জ্ঞানময় হরের ও জ্ঞানময়ী সরস্বতীর বর্ণ শ্বেত। হরিদ্রা প্রেম-নিদর্শক বর্ণ। এই হেতু শ্রীশ্রীদুর্গার ও লক্ষ্মীঠাকুরাণীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চন। দেবীর হস্তে পদ্ম, অর্থাৎ দেবী একাধারে জ্ঞানময়ী ও প্রেমময়ী। সুতরাং দেবীর জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিনির্দ্দেশক গদা প্রভৃতি গুণের ধারণা করিলে সাধক-সাধিকার উক্ত যাবতীয় গুণে ভূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

দেবীর [illegible] হস্তে শঙ্খ ও অপর হস্তে সুদর্শনচক্র। মঙ্গল বা আনন্দ নির্দ্দেশক [illegible]—শঙ্খধ্বনি—কারণ এই ধ্বনি দিব্যজ্ঞানোদ্দীপক ওঁকার [illegible] প্রতিরূপ। হিন্দুশাস্ত্র মতে ওঁকার শব্দ হইতে এই বিরাট বিশ্বের বিকাশ। সুতরাং চৈতন্যময় হইতে উদ্ভূত প্রথম শব্দ আর আর শব্দ হইতে অধিকতর চৈতন্যযুক্ত। যে ধ্বনির দ্বারা জীবের বিশেষ ভাবে চৈতন্য উদ্দীপন হইবার সম্ভাবনা, উহা নিঃসন্দেহ মঙ্গল বা আনন্দ-নিদর্শক ধ্বনি। দেবী সুদর্শন-চক্রের অর্থাৎ উত্তম বা দিব্যদৃষ্টির অধিকারিণী। সুতরাং দেবী দিব্যজ্ঞানের ও দিব্যদৃষ্টির একমাত্র অধিকারিণী। ফলতঃ তিনিই চৈতন্যদায়িনী।

জীবে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় চৈতন্যশক্তি বিদ্যমানা। এই শক্তিবলে জীবদেহ আনন্দ বা শান্তি-ঘটে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই কর্ম্ম সাধিতে হইলে বৎসরের মধ্যে তিন দিন মাত্র নির্জ্জনবাস নিতান্ত আবশ্যক। এই হেতু উদ্বোধন প্রথা প্রচলিত। মানবসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া ও জাগতিক কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দিবসত্রয় উদ্বোধনের পর আরও তিন দিন আত্মারূপী জননীর চিন্তায় বা পূজায় নিরত থাকিলে আত্মা জননী আকারে সেই জীবের গরলমুখো মনকে বিধ্বস্ত করিয়া সাধিকাকে লক্ষ্মী বা বীণাপাণি পদে বরিতা করেন ও সাধককে কার্ত্তিকেয় বা গণপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। যে ব্রহ্মণী

নিজ দেহ, প্রাণ, মন ও সংসারে আত্মারূপী জননীর এই জ্ঞান প্রোথিত করিয়া জাগতিক যাহা কিছু কর্ম্ম, কর্ত্তব্য বা দেনাচুক্তি হিসাবে সহাস্যবদনে সাধন করেন ও পরে অসত্য, ক্রোধ, দম্ভ, অভিমান ও স্বার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া দশজনের সেবায় নিরতা থাকেন ও বিলাসিতাকে বর্জ্জন করিয়া গৃহ বস্ত্রাদি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন, তিনি জপধ্যানে বা তীর্থদর্শনে কালাতিপাত না করিলেও লক্ষ্মীপদে বরিতা হয়েন। যে রমণী মায়ামোহের উপাদান হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া আত্মার ধ্যানে ও তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্তা থাকেন, তিনি বীণাপাণি পদে অধিষ্ঠিতা হয়েন। যে যুবক সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী হইয়া আত্মাকে জননীজ্ঞানে তৎচিন্তায় নিজ মনকে প্রবৃত্ত করেন, আত্মার কৃপায় গরলমুখো মন প্রভুপদ হইতে স্খলিত হইয়া ময়ূররূপে দশ বাহক হয়। ময়ূর যেমন পুচ্ছ-বিস্ফারিত করিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করে ও দর্শকবৃন্দকে আনন্দে আপ্লুত করে ও পরে হলাহলে পূর্ণ বিষধর কুলের নিপাত সাধন করে, সেই ব্রহ্মচারী সাধকও আনন্দরসে লিপ্ত হইয়া জগৎকে আনন্দে ভাসান ও অবকাশ মত কাম, ক্রোধ, লোভাদি সম সর্পসমূহকে নিঃশেষিত করিয়া কমনীয়, অনুরাগনীয়, লোভনীয় ইত্যাদি হইয়া পড়েন। তৎপরে নিজ দেহ, প্রাণ ও মন একলক্ষ্য করিয়া জগতের চির কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এবম্বিধ কর্ম্মসাধনে তৎপর বলিয়া তিনি দেবলোক-যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত। দেবলোকে এইপ্রকার কর্ম্ম অহোরহঃ সাধিত হইতেছে। কিন্তু ইহলোকে জীব ঈর্ষার, কুৎসার, দম্ভের, ক্রোধের, কামের, লোভের ও মায়ামোহাদির ক্রীড়া-পুত্তলিকা সাজিয়াও আপনাদিগকে বিচক্ষণ-বিচক্ষণা নির্দ্ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

এক্ষণে গণপতি ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। গরলমুখো মনের প্রভাবে জীব হৃদয় ও মস্তিষ্ক সুতরাং তাহাদের কণ্ঠও 'আমি' ও 'আমার' বুলিতে পূর্ণ। যতদিন এই দেহভার বহন করিতে হইবে, গরলমুখো মন হইতে পূর্ণমাত্রায় অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব; কারণ ইহার প্রধান কর্ম্ম এই স্থূলদেহকে রক্ষা করা। পাকা বা সুধামুখো মনের কর্ম্ম সুচিন্তায় ও সুকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সুধাময় আত্মার সহিত ক্রমশঃ মিলিত হওয়া। এই গরলমুখো মনই মায়া। ফলতঃ মন থাকিতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মায়া বা অহংবুদ্ধি থাকিবেই থাকিবে। তবে এই অহংবুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ করিতে হইলে ধারণা বদ্ধমূল করা বিধেয় যে, আমি চৈতন্যময় বা চৈতন্যময়ীর সন্তান। সুতরাং আপন হিসাব কেবলমাত্র

চৈতন্য—উহা সবই সব। এই উপায়ে জাগতিক অহংবুদ্ধি পাহাড়-পর্ব্বতের মত উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে অবকাশ পায় না। বরং মূষিকসম ক্ষুদ্রাকারে সেই সাধকের পদতলে ন্যস্ত থাকে। সেই অবস্থায় সেই সাধক আপনাকে চৈতন্যযুক্ত মন, অর্থাৎ দেহী নয়, নির্দ্ধারণ করিয়া দেহস্থিত আত্মাকে কিম্বা আত্মায় অবস্থিত কোন মহাপুরুষের চিত্রকে গুরুপদে বরণ করেন। পরে সেই মহা-পুরুষকে ধ্যান জ্ঞান করিয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী নির্ব্বিকার ও নিঃশঙ্কচিত্তে **জাগতিক ও পারলৌকিক** কর্ম্ম এককালীন সাধনে তৎপর হয়েন। অর্থাৎ তিনি শঠতায়, দাম্ভিকতায় ও অন্যের মস্তকে হস্ত বুলাইয়া পাথেয় ও উদরান্ন সংস্থানের ব্যবস্থায় বা কোন প্রকার বাহ্যিক আচরণের বিশেষ বীতরাগ। বরং সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থপরতা, কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যপালনকে মূল ধর্ম্মজ্ঞানে **কর্ম্মই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মই কর্ম্ম** এই মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করেন। এবম্বিধ আচরণের জন্য তিনি শ্রীগুরুর কৃপায়—বিনা আবেদনে কালক্রমে হস্তিসম নানাগুণে বিভূষিত হয়েন। হস্তী অতি ক্ষুদ্র লোচনযুক্ত হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন। তদ্রূপ সেই সাধক চিত্তকে আত্মায় অধিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যত্নশীল থাকিয়া সূক্ষ্মদর্শী হয়েন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহার মনোভাব বিনায়াসে অবগত হয়েন। হস্তীর কর্ণদ্বয় কুলাসম বৃহৎ। এই হেতু উহারা বিশিষ্ট ভাবে শব্দগ্রাহী, অর্থাৎ শিকার কালীন আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দেয় শিকারীয় কোন্ প্রাণী কতটা সন্নিকটস্থ ও উহা কোন্ প্রাণী। তদ্রূপ সেই সাধক কোন ব্যক্তির একটী মাত্র কথায় বুঝিতে সক্ষম হয়েন, সেই ব্যক্তির চাল-চলন বা ধরণ-করণ কি প্রকার। সেই অবস্থায় তিনি **শ্রুতিধর** বলিয়া পরিগণিত হয়েন। গজদন্তদ্বয় যেমন মূল্যবান্ ও হস্তীর শোভাবর্দ্ধনার্থ উহা নিবিষ্ট জীবদেহস্থিত কাম, ক্রোধ, লোভাদি দন্তগুলি নিকৃষ্ট কর্ম্মে সংযমতার সহিত ব্যয়িত হইলে কামে কমনীয়, রাগে অনুরাগনীয়, লোভে লোভনীয় ও মায়ায় মায়াতীত করিয়া দয়াবান্ করে। সুতরাং সেই সাধকের নিকট নর-নারী দলে দলে উপনীত হয়েন ও স্বেচ্ছায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন। হস্তী বলী ও নিরামিষভোজী। সেই সাধকও নিরামিষভোজী হইলেও তাঁহার মনের বলের জন্য দেহের বল কম নহে। এই বলে বলীয়ান্ বলিয়া তিনি জাগতিক বা পারলৌকিক স্বার্থসাধনে কাহারও তোষামুদী করিতে কিম্বা সাধারণ জীবের মত মিষ্ট কথা অপব্যয় করিতে বিশেষ বীতশ্রদ্ধ। হস্তী বৃহৎ শুণ্ড-

যুক্ত বলিয়া বায়ু দ্বারা উহার বৃহৎ উদর পূর্ণ করিতে সক্ষম। বায়ুই চৈতন্যের প্রধান উপাদান, কারণ ইহা প্রাণ, শক্তি, শান্তি, আনন্দ ও এমন কি প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম-সমন্বিত। হস্তীর সংযততার সহিত উহার বায়ু পূর্ণ করিবার আধার সুবৃহৎ বলিয়া হস্তী সূক্ষ্মদর্শী ও শব্দগ্রাহী। প্রাণায়াম কর্ম্ম ও দেহ, প্রাণ ও মন বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিবার আয়োজন। নির্জ্জনতা ও সংযততাকে আশ্রয় করিয়া যে সাধক প্রাণায়াম (long breath) কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন, শিক্ষা ও কার্য্যকুশলতার জন্য তিনি কালক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও দ্বিদল দেহস্থিত এই ছয়টী চক্র ভেদ করিয়া সুদর্শন চক্রের অধিকারী হয়েন—অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন। অতঃপর নিজ অহংবুদ্ধিকে মূষিকবৎ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া গুরুপ্রীতিকর যাবতীয় জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সংযততার সহিত সাধেন বলিয়া শ্রীগুরু [illegible]ক পদ্মের অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকারী ও জীবসমক্ষে ভগবৎতত্ত্ব উদ্ঘাটনে যত্নশীল হয়েন। ফল-কথা, যথাসম্ভব নিঃসঙ্গ ও সংযত হইয়া দেহস্থিত আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধস্থাপনে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইলে গীতা, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল, উপনিষদ, ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র বা গ্রন্থ পাঠ করিবার আ[illegible] না। সাধক [illegible] হইলে, কলাবলরূপিণী খ্যাতি—ষোলকলায় [illegible] মহাত্মার সঙ্গিনী হয়, কিন্তু তিনি ঈর্ষা ও কুৎসান্বিত জীবের চিন্তার ও বাক্যের ভোজ্য-সেব্য হয়েন। যে জীবের যে যে অগুণগুলি নিজ হৃদয়ের স্তরে স্তরে লুক্কায়িত আছে, সেই ব্যক্তি অন্য জীবের বিশেষতঃ খ্যাতনামা ব্যক্তির সেই সেই অগুণ কীর্ত্তনে বিশেষ লোলুপ। নিন্দিত ব্যক্তি কিন্তু ভাগ্যবান্, কারণ তাহার কর্ম্মভার অন্ততঃ আংশিক মাত্রায় অযাচিত ভাবে নিন্দকগণ গ্রহণ করেন।

অতএব বুঝা গেল যে ঃ—

১। ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য, নিজ নিজ মনকে ক্রমশঃ সৎগুণসম্পন্ন করা।

২। নিজ মনকে সৎগুণসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলে শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া সম্ভব।

৩। ঈর্ষা, কুৎসা, দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, কাম, অসত্য, অধৈর্য্য, উচ্ছ্বাস, স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যপালনে ঔদাসীন্য প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিলে তবে পূজারী বা পুরোহিত হওয়া সম্ভব।

৪। সেই প্রকার মহাজন কর্তৃক কোন প্রস্তরখণ্ড বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইলে উহার সজীবত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব নহে।

৫। সৎগুণের অর্চ্চনা করিবার জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে শালগ্রামশীলা, শিবলিঙ্গ ও প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা। এই উপায়ে অজ্ঞ জীবও ক্রমোন্নতি বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

৬। জীব মনকে জাগতিক নানা মূর্ত্তি হইতে এক আদর্শ মূর্ত্তিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া সৎগুণসম্পন্ন করিবার এই-ই সরল পন্থা।

৭। চৈতন্যযুক্ত মনই প্রকৃত পূজারী ও দেহস্থিত আত্মাই পূজিত হইবার প্রধান উপাদান।

৮। আত্মাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহার সন্দর্শন লাভ করা অতীব দুরূহ বলিয়া কোন এক আদর্শ মূর্ত্তির সহিত আপন পিতা, মাতা বা প্রাণবল্লভ সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ও সেই মূর্ত্তিতে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদি গুণগুলি আছে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলে জীবের পক্ষে অভাবের ও অশান্তির পরপারে যাওয়া সম্ভব।

আরো বুঝা গেল যে, শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার পূজাকরণের উদ্দেশ্য ;—

১। সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ মনকে ক্রমশঃ সংযত করিলে ও বিহিত বিধানে অহংবুদ্ধিকে খর্ব করিয়া জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিলে মহিলাগণ লক্ষ্মীঠাকুরাণী ও পুরুষগণ গণপতিঠাকুর পর্য্যন্ত হইতে পারে।

২। সংসারত্যাগী হইয়া নিজ নিজ চিত্তের মলিনতা দূর করিতে সক্ষম হইলে রমণীগণ বীণাপাণি পদে বরিতা ও পুরুষগণ কার্ত্তিকেয়-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বৎসরের ৩৫৯ দিন নিজ মনের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য যে জীব যত্নবান্ থাকেন ও পরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রারম্ভে চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী এই তিন দিন নিঃসঙ্গ হইয়া ও নির্জ্জনে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াও, কখন বা বিচরণ করিয়া যথাসম্ভব একচিন্তায় নিজ মনকে দেহমধ্যে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহারই দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। তৎপরে পূজার তিন দিবস আরও সংযত হইলে সেই সাধকের আত্মাই কল্পিত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রেমময়ী জননী সম সন্তানকে জ্ঞানের বসনে ও প্রেমের ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বস্থানে তিনি বিরাজিত ইহা প্রত্যক্ষ করান। তখন সেই ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী নিজ দেহমধ্যে ইষ্ট বিরাজিত ইহা উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিয়া আনন্দের ঘট স্বরূপ শান্তিবারিতে পরিপূরিত হয়েন ও সমাগত নরনারীকে সেই বারি দ্বারা তৃপ্ত করেন। পরিশেষে অহংবুদ্ধি লোপ পাওয়াতে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, প্রভু-ভৃত্য, শিশু-বৃদ্ধ, সাধু-অসাধু, শত্রু-মিত্র, আপন-পর সকলের সহিত আলিঙ্গনে ও তাহাদের পদধূলি গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাই বিজয়া দশমীর আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য। হায় রে! কালের কুটিল গতির জন্য, দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতি নানা আচারের প্রভাবেও পুরোহিত আর গুরুঠাকুরদের দৌলতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভোপযোগী হিন্দুদিগের শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পূজা কি তামসিক পূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে!

পরলোকে অক্ষয়চন্দ্র।

[শ্রী...দাস চন্দ্র]

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটী ...স্ত খসিয়া পড়িল। বঙ্কিমযুগের প্রতিষ্ঠাবান লেখক ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আর নাই। বিগত ১৬ই আশ্বিন রাত্রি ২... ৫৫ মিঃ সময় বঙ্গসাহিত্যের এই উজ্জ্বল ভাস্কর পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের এমন কিছু ...ক্ষয় কীর্ত্তি নাই যাহা তাঁহাকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখিবে। তবে একথা সকলে... মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার ন্যায় সাহিত্যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা স্পষ্টবাদিতা আজকালকার দিনে দুর্লভ। তাঁহার গুণাবলীর আদর্শে আধুনিক সাহিত্যসেবীগণের চরিত্র গঠন হইলে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ ...শা করা যায়।

অক্ষয়চন্দ্র জীবনে অনেকগুলি দারুণ শোক ...াইয়াছিলেন এবং তাহা সহ্য ও উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুনিতে ...ই ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরচন্দ্রের মৃত্যুর পর দিবসে তি... বন্ধুবান্ধবের সহিত সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা, হাস্যপরিহাস করিয়াছিলেন। ভগ... তাঁহার উপযুক্ত ...কেও এই দারুণ শোক সহ্য করি... ...ন ...ন এই ... ...র্থনা।

....নরূপিণী

'বঙ্গবাসী' ও 'বাঙ্গালী' হইতে অক্ষয়চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও সাহিত্য-জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"১৮৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চুঁচুঁড়ার বাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। ইনি, খ্যাতনামা সদরালা স্বর্গীয় রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুরের একমাত্র পুত্র। ইঁহার শিক্ষা দীক্ষা স্কুল-কলেজে যথারীতি হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ইনি পিতার কাছেই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, ইনি বাল্যকাল হইতেই পিতার কাছে সঙ্গী ভাবে থাকিতেন এবং পিতা হইতেই বঙ্গভাষার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসর্গও ইঁহার চরিত্র গঠনের সহায়তা করিয়াছিল। ইনি বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে বি-এল পরীক্ষায় পাশ হইয়া মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান; কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার এতই অনুরাগ যে, কিছুদিন ওকালতী করিয়া আর তাহা ভাল লাগিল না; এ ব্যবসায় ছাড়িয়া সাহিত্যে তিনি মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। সেই সময় বঙ্কিমবাবুর যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত, তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে যতদিন বঙ্কিমবাবু জীবিত ছিলেন, ততদিন উহাঁদের মধ্যে সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল।

"বঙ্গদর্শনে" অক্ষয়চন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু বঙ্কিমবাবু নহেন, দেশশুদ্ধ লোকেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার "বঙ্গদর্শনে"র প্রবন্ধের মধ্যে 'গ্রাবু' চির-

প্রসিদ্ধ। চুঁচুড়ায় বসিয়া তিনি "সাধারণী" নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উহা সংবাদপত্র হইলেও সে সময়ের শিক্ষিতদের পক্ষে উহা সাহিত্য-চর্চ্চার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অনেক সময়ে উভয়ে একত্র বসিয়া, "সাধারণী"র জন্য নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সময় গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে প্রথম শ্রেণীর অনরারি মাজিষ্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ কার্য্য ইনি অনেক দিন করিয়াছিলেন।

বঙ্গের প্রাচীন কাব্যসমূহ প্রথম সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করায় বঙ্গদেশ চিরদিন তাঁহার কাছে ঋণী থাকিবে। ইহাঁর ক্ষুদ্র একখানি কবিতাপুস্তক,—"গোচারণের মাঠ" যুক্তাক্ষরহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ। বহুদিন পরে "সাধারণী" [illegible] করিয়া উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকা করিবার মানসে ইনি "নবজীবনে"র প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা "নবজীবন" পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, অধুনাতন অসংখ্য মাসিক পত্রিকার তুলনায় "নবজীবন" কিরূপ উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা ছিল। দুঃখের বিষয়, "নবজীবন" বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

প্রবীণ বয়সে তিনি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয় অবলম্বন করিয়া 'সনাতনী' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ তাঁহার চিন্তাশীলতার অক্ষয় নিশান। ইহাঁর পূর্ব্বে তিনি "আলোচনা" নামক এক ব্যঙ্গ-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থে ইনি 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে ইহাঁর পিতার ও ইহাঁর নিজের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন। ইহাঁরই লিখিত "চন্দ্রালোকে" নামক এক প্রবন্ধ বঙ্কিম [illegible] করিয়া তাঁহার "কমলাকান্তের দপ্তরে" গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া [illegible] ভাবে তাঁহাকে [illegible] পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লর্ড লিটনের প্রথম দিল্লী দরবারে ইনি সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে গবরমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দরবারে গিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র পুস্তকাদি বেশী কিছু না লিখিলেও, তাঁহার মত 'সাহিত্যিক' আর নাই বলিলেই হয়। * * * চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে ইনিই সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। 'আজ সেই আজীবন সাহিত্যিক, সূক্ষ্ম সমালোচক সাহিত্যপ্রাণ অক্ষয়চন্দ্রকে আমরা হারাইলাম এবং বঙ্গদেশ হারাইল। ইনি চিরকাল 'বঙ্গবাসী'র বন্ধু ছিলেন। "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং "বঙ্গবাসী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁর সাহিত্য-শিষ্য। ইনি প্রায় ২৬ বৎসর কাল বিপত্নীক ছিলেন। বর্ত্তমানে ইহাঁর দুই পুত্র বর্ত্তমান এবং উভয়েই কৃতী। * * *" বঙ্গবাসী।

* *
*

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একে একে সকলেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন ;— রহিলেন মাত্র জরাজীর্ণ দেহ লইয়া বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর। অক্ষয়চন্দ্রকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। বঙ্কিমের অন্যান্য সহচরগণ অবসরমত সাহিত্য সেবা করিতেন। কেবলমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্য সেবাকে জীবনের মুখ্যকর্ম্ম করিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের তিনি সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি যে সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন,

তাহা বঙ্কিমের সমালোচন শক্তির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। অনেকে অনেক সময় তাঁহার লেখাকে বঙ্কিমের লেখা মনে করিয়া ভুল করিত। সাহিত্য-সমালোচনায় মধ্যে তেমন করুণ কঠোর কশাঘাত করিতে এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তখনকার কালে আর কেহ তাঁহার সমতুল্য ছিলেন না। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ সমালোচক বাঙ্গালা দেশে আর একটী হইয়াছে কি না সন্দেহ। অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্যায় দেখিলেও তিনি তাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না; আবার পরম শত্রুর সুখ্যাতির কিছু পাইলেও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী লেখক এখন অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ লেখক এখন একটীও দেখিতে পাই না।

বাঙ্গালা ভাষায় রীতিমত রাজ-নীতির চর্চ্চা তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'সাধারণী'তে আরম্ভ করেন। 'বঙ্গদর্শনে' ও 'নবজীবনে', সাহিত্যালোচনা করিতেন, কিন্তু 'সাধারণী'তে রাজাপ্রজার কথা—দেশের সুখ দুঃখের কথাই বেশী আলোচিত হইত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যৌবনে সাধারণীতে যেরূপে রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলাম, সেরূপভাবে, সেরূপ কথার যদি এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র করি, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে শ্রীঘর বাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে"।—এ সাহস তখনকার কালে আর কোনও সাহিত্যসেবীর ছিল না। তখন বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া 'বঙ্গবাসী' পর্য্যন্ত সকলেই ভারতবাসীর রাজনীতিক আন্দোলনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। শুধু অক্ষয়চন্দ্রই কংগ্রেসের পক্ষ লইয়া লড়িতেন। বঙ্গবাসীর সংস্রবে থাকিয়াও তিনি কংগ্রেসকে কখনও আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভাবের ঘরে চুরি করিতে তিনি জানিতেন না।

শেষ জীবনটায় তিনি বরাবরই বাঙ্গালীর দরিদ্র বাঙ্গালার দুর্দ্দশা [illegible] গ্রামের দিকে [illegible] সাধারণ [illegible] উপদেশ দিয়া [illegible] নরকরূপিণী [illegible] বাঙ্গালীর [illegible] স্বাস্থ্যের ও দুরবস্থার জন্য রোদন দেখিতে পাইতাম। বঙ্কিম বলিয়াছিলেন,—"যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক, যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থে না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।"—সাহিত্যসম্রাটের এ উপদেশ তাঁহার শিষ্য-সহচরদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের মত আর কেহ শুনেন নাই। ইদানীং যখন কিছু লিখিয়াছেন, তখনই তাঁহার লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থেই লিখিত।

তাঁহার জীবন—জীবন যাত্রার প্রণালী বাঙ্গালীর আদর্শ হইবার যোগ্য। তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক ব্যবহার হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। আন্তরিকতার অভাব এ দেশে পদে পদে অনুভব করি। কিন্তু তাঁহাতে আন্তরিকতা বড় প্রবল ছিল। ভণ্ডামি বা মেকী তিনি দু'চক্ষের বিষ দেখিতেন। নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। এজন্য অনেকে তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত, অনেকে বলিত যে, তিনি 'ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া' করিয়া পাগল হইয়াছেন। কিন্তু তিনি লোকের মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না। প্রাণ যাহা বলিত, তাহাই বলিতেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াও তিনি দেশের স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহার প্রধান কথাই ছিল এই—"আমরা অস্বাস্থ্য তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও।"

সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা আমাদের আদর্শ হইয়া থাকুক। সে স্বজাতি-প্রেমের—সে স্বদেশ-অনুরাগের যদি আমরা উত্তরাধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে তিনি স্বর্গ হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।—তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য-সেবা সফল হইবে। * * * বাঙ্গালী।"

পরিমল।

[লেখক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

"বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল চললো বনে।
চললো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।"

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

মধুমাস চতুর্দ্দিগেই মধু। সমস্ত ঋতুর বায়ুগণ মধুময় হউক, নদীগণ মধুক্ষরণ করুক, ওষধি সকল মধুফল প্রদান করুক, রজনী মধুরূপ হউক, প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হউক, পৃথিবীর ধূলাও মধুময় হউক, আকাশ মধুময় হউক, পিতা মধুযুক্ত হউন, সূর্য্য মধুময় হউন এবং গো সকল মধুমতী হউক।

এ [illegible] বিশ্বকে তৃপ্ত [illegible] মধুর বসন্তে, সমস্তই মধুময়। পার্থিবং রজঃ মধুময় হউক বা না হউক; ফুলে ফুলে মধু; মধুলুব্ধ ভ্রমর ও অন্যান্য পতঙ্গের গমনে ও গুঞ্জনে, কোকিল ও অন্যান্য বিহঙ্গের কূজনে, মলয়ের নিঃস্বনে সর্ব্বত্রই সেই মধুমত্তা।

মানবের পক্ষে এই মধুমাসের মধুমত্তা;—প্রধানতঃ পুষ্পের সৌরভে; নব-কিশলয়ের ও লতাবল্লরীর শ্যাম-শোভায়, মলয়ানিলের মৃদু-ব্যজনে, বিহঙ্গকুলের যৌন সম্মিলনাকাঙ্ক্ষোদ্ভূত স্বর-লহরীতে, প্রকৃতির উন্মত্ততায় মানবের প্রাণেও উন্মত্ততা জন্মে, সেই উন্মত্ততাই কবিকুলের "বসন্ত বর্ণনা"য় সর্ব্বদেশে কাব্যকলা-মুখে উদ্গীত।

মধুমাসের মাধুরী বর্ণনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্যের দাবী রাখি না। তাহার সর্ব্বতোমুখিনী সম্পদ্ ও শোভার বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ ও সময় সকলের ভাগ্যে ঘটে না। হাটে, মাঠে, গোঠে; কাননে, প্রান্তরে, উদ্যানে, ভ্রমণ করিতে করিতে মধুমাসের যে মাধুরী আমার গদ্যময় চিত্তকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনায় উদ্যত হইয়াছি, যে সমস্ত ধীমানেরা শুধু কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে কাল কাটাইতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন না।

মধুমাসে বিশেষ ভাবে অসংখ্য পুষ্প-গন্ধই উপভোগ করি। প্রকৃতি-মাতা, যেন আমার উপভোগের জন্যই সর্ব্বত্র এই "সৌরভের" আয়োজন করিয়া রাখেন। তাই কি ঠিক্ কথা? মানুষ কি স্বার্থপর! মানুষ কি অহঙ্কারী! মানুষ "আপন" ভিন্ন কাহাকেও চিনে না। বিশ্ব-নিয়ন্তাকে এই ভাবেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে:—'হে ঠাকুর! তোমার কি দয়া! তোমার কি স্নেহ! আমার উপভোগের জন্য কতই না আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ! আমার আহারের জন্য যেমন নানা ফল মূল কন্দ ও শস্য-সম্ভারে বসুন্ধরাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, আবার আমার নয়নের তৃপ্তির জন্য, কতই রং বেরংএর সমাবেশে ভূলোক ও দ্যুলোককে সুসজ্জিত করিয়াছ! আহা, ফুলের কতই বর্ণ! কতই শোভা! এ ত আমারই জন্য, আর আমারই নাসিকার তৃপ্তির জন্য—পুষ্পে পুষ্পে কতই সৌরভের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, ইত্যাদি।' বটে? সমস্ত প্রকৃতিই মানবের ভোগের জন্য এই বিপুল আয়োজন করিতেছে? মানবের কত বড় অহঙ্কার! কত স্বার্থপরতা, কত আত্মম্ভরিতাই না এই আরাধনায় দ্যোতিত হইতেছে! ফুলগুলি আমারই জন্য, [illegible]দের বর্ণবৈচিত্র্য [illegible] তাহাদের সৌরভ আ[illegible] তাহাদের মধু [illegible]ই জন্য! [illegible]পর [illegible] রূপিণী [illegible]ত বড় স্পর্দ্ধা! ভ্রান্ত মানব! তুমিও প্রকৃতির যেমন একটি সামান্য সন্তান, ঐ নয়নাভিরাম, নাসিকা-তৃপ্তিকর পুষ্পটিও তেমন একটি সন্তান। তোমার দেহে, তোমার ইন্দ্রিয়-সমূহ, তোমার মনঃ, বুদ্ধি, চৈতন্য প্রভৃতিও যেমন তোমার মানব প্রকৃতি বা "মনুষ্যত্ব" ফুটনের বা বিকাশের উপায় মাত্র; আর ঐ পুষ্পের নয়নাভিরাম বর্ণ-বিভা, সৌগন্ধ ও অন্তর্নিহিত মধু, সমস্তই তাহার "পুষ্পত্বের" বা ঔদ্ভিদিক জীবন-বিকাশের উপাদান। তদ্দ্বারা যে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তিসাধন হয়, তাহা একটি আনুসঙ্গিক (accidental) ব্যাপার মাত্র। আমরা যেমন শস্যাদি উৎপাদন করিয়া আমাদের "মনুষ্যত্ব" বা মানব-জীবনের বিকাশেরই চেষ্টা করি, কুসুম সমূহও তাহাদের শোভা ও পরিমল দ্বারা তাহাদেরই "পুষ্পত্ব" বা ঔদ্ভিদিক জীবনবিকাশের বা উদ্বর্ত্তনেরই চেষ্টা করে। প্রকৃতি-সন্তান মানবে, চৈতন্য ও বুদ্ধি বিকশিত হওয়ায়, "নির্ব্বাচন" দ্বারা কখন কখন পুষ্পের "পুষ্পত্ব" বিকাশের সহায়তা করিতে পারে; এবং যদিও ভোগের জন্যই এই নির্ব্বাচন-ক্রিয়া (selection) সম্পাদন করে, কিন্তু তাহাতে পুষ্পের পুষ্পত্বই স্ফুটতর হয়। আমরা যদি কুসুম-গন্ধকে কেবল আমাদের নাসিকা তৃপ্তিকর বস্তু বলিয়া মনে না করি, এবং তাহাতে পুষ্প বা, উদ্ভিদ্ প্রকৃতির

বিবর্ত্তনই না দেখিতে পাই, তবে "সৌর[illegible]" কার্য্যকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা কি তাহাই আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। [illegible] আমরা ত 'বিষয়'ই উপভোগ করি, ইন্দ্রিয় সমূহ সেই উপভোগের উপায় বা [illegible]ন্ত্র। "রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দা অমী বিষয়াঃ" রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দই বি[illegible]য়। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়, রস আস্বাদনেন্দ্রিয় বা জিহ্বার বিষয়, গন্ধ[illegible] ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকার বিষয়. স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বকের বিষয়, আর শব্দ [illegible]ণেন্দ্রিয় বা কর্ণের বিষয়। পঞ্চ মহাভূতের (ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম) মধ্যে ক্ষিতি[illegible] ধর্ম্মই নাকি "গন্ধ"। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, ক্ষিতি-স্থিত সমস্ত [illegible]দার্থের একটা না একটা গন্ধ আছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি ও ক্ষমতা অনুসা[illegible] কোনও গন্ধ অনুভূত হয়, আর কোনও গন্ধ অনুভূত হয় না। কোন[illegible] গন্ধ নাসিকার তৃপ্তিকর, আবার কোনও গন্ধ নাসিকার অতৃপ্তিকর। স[illegible]প্রকার ভৌতিক পদার্থের যে গন্ধ তাহার আলোচনা হইতে বিরত থ[illegible]কলাম। সর্ব্ব পদার্থেরই একটা না একটা বর্ণ আছে। বর্ণও যেমন পদার্থতত্ত্বে[illegible] বিষয়ীভূত, গন্ধও তদ্রূপ পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।

পাশ্চাত্য ঋষি[illegible] ডারউইন্ প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদীগণ, পুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা [illegible] একটি কা[illegible] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাকে কো[illegible] স্থলে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" কোন[illegible] যৌন নির্ব্বাচন[illegible] বলা হইয়া[illegible] আর এই নির্ব্বাচন-প্রণালী জড় ও উদ্ভিদে সমভাবে ক্রিয়াশীল। অনেক পুষ্পের বর্ণ-বিভার উৎপত্তি নাকি ভ্রমরাদি পতঙ্গকুলের আকর্ষণের জন্য, তাহারা আকৃষ্ট না হইলে, অনেক পুষ্পের যৌন-সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, 'পুং'-পুষ্পের পরাগ-মাখা পতঙ্গ দেহ যোষিৎ-পুষ্পের পরিমলের সহিত সম্মিলিত না হইলে, ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা হয় না। ইহার বহু দৃষ্টান্ত মনস্বী ডারউইনের "পুষ্পাদির গর্ভাধান" (Fertilization of the orchids) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার অনেক সুগন্ধ পুষ্পের গর্ভাধান ব্যাপারে, ভ্রমরাদির ঘটকালির কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। গোলাপাদি বহু পুষ্প এই শ্রেণীর।

বর্ণবৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্যে যদি কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, তবে সুগন্ধে তাহারা আকৃষ্ট না হইবে কেন? পূর্ব্বকথিত "নির্ব্বাচন" যদি বর্ণ-বৈচিত্র্য ও তাহার ঔজ্জ্বল্যের প্রতি, 'কারণ' হয়, তবে "সুগন্ধই" বা না হইবে কেন?

ঘ্রাণেন্দ্রিয় না থাকিলে জীবজগতের কি ক্ষতি বা অসুবিধা হইত? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। পরন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন

উত্থাপিত হইতে পারে। দর্শনেন্দ্রি[illegible]-বিহীন বা অবিকশিত বা অর্দ্ধ-বিকশিত দর্শনেন্দ্রিয়যুক্ত জীবকুলও এই ধর[illegible] বক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়; ছুঁচো প্রভৃতি জন্তু ও অন্যান্য কীট যাহারা মৃত্তিকা [illegible]ধ্যে বাস করে, তাহারা নেত্রবিহীন অথবা অবিকশিত নেত্র-সম্পন্ন। কোনও কোনও প্রাণীর শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত অবিকশিত। ইন্দ্রিয় সমূহ "জ্ঞানের [illegible]ার-স্বরূপ" এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আত্ম-রক্ষা এবং বংশ-রক্ষা। খাদ্য-নি[illegible]াচনে, গ্রহণে, অনুসন্ধানে, দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, শত্রু হইতে আত্ম-রক্ষা বা [illegible]ায়নে ও দর্শনেন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা শ্রবণেন্দ্রিয় ও অনেক প্রাণীকে শত্রু [illegible]তে "আত্মরক্ষার" সহায়তা করে। জিহ্বার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। ঔদরিকেরা তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনও প্রশ্ন করিবেন না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেও অনেক প্রাণী খাদ্যাখাদ্য বিনির্ণয় করে এবং শত্রু-মিত্র বা[illegible]া লয় এবং সারমেয়াদি জন্তুর পক্ষে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণ হইতে [illegible]কানও অংশে ন্যূন নহে।

মানবের পক্ষেই বা নাসিকার প্রয়োজনীয়তা [illegible] কিসে?" পূতিগন্ধ দ্রব্যাদি মানবের হিতকর নয়। এক নাসিকাই মানবকে [illegible]র্গন্ধ হইতে দূরে [illegible]ক্ষা করে। আবার উপযোগী খাদ্য গ্রহণেরও সহায়তা ক[illegible] খাদ্যের সুস্বাদ [illegible] [illegible]রূপিণী [illegible]কে প্রচলিত কথায় 'তার' [illegible]স্বাদ বা (flavour) বলি, তাহা নাসিকা দ্বারাই উপলব্ধ হয়। রামানুজ লক্ষ্মণ-দেব, সূর্পনখার নাসাচ্ছেদন করিয়া যে কেবল তাহার অপমান করিয়াছিলেন, তাহা নয়; তাহার খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচনেরও যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিলেন। নাসারন্ধ্রের সাহায্যে শারীরিক অন্যান্য বহুবিধ ক্রিয়া, বিশেষতঃ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জ্জনাদি ব্যাপার সংসাধিত হয়, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। গন্ধ গ্রহণই নাসিকার মুখ্য-ক্রিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায়, শুধু জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ নয়, তাহারই প্রাণীর চিৎশক্তির উন্মেষ করে। সুখ ও দুঃখাদি (pleasure and pain) অনুভূতি দ্বারাই, প্রাণীর চেতনা জন্মে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা অন্ততঃ অপূর্ণ ভাবেও যে উদ্ভিদাদির চৈতন্য আছে, তাহাই প্রমাণিত হয়। এবং সেই অসম্পূর্ণ চৈতন্যও যে উদ্ভিদের অসম্পূর্ণ ও কিয়দ্বিকশিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ফুটিয়া উঠে, তাহা নিঃসন্দেহ। ঔদ্ভিদিক ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, এইমাত্র কথা কিন্তু তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্য কি ভাবে সম্পাদিত হয়, সেটি মনোবিজ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞানের কথা। বস্তু পদার্থনিচয়ের অণু পরমাণু বাত্যা সন্তাড়িত হইয়া নাসাভ্যন্তরস্থ ত্বক্ বিশেষ উত্তেজিত করিলেই ঘ্রাণোপলব্ধি হয়। এই মতানুসারে স্পর্শেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—অর্থাৎ এতদুভয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেই বাহ্যবস্তুর সহিত মানবদেহের সংস্পর্শ আবশ্যক। এই মতের সমীচীনতা, অসমীচীনতা সম্বন্ধে কোনও বিতর্ক উপস্থিত না করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর যে কোনও পরমাণু বা অণু সংস্পর্শেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় উদ্বোধিত হয়। বস্তুর কি জাতীয় অণু পরমাণুর সংস্পর্শে "ঘ্রাণ" পাই তাহা বলা বড় সুকঠিন, এ সম্বন্ধে আমার বিজ্ঞ বন্ধু শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার সুলিখিত 'গন্ধশীর্ষক' প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য ও জ্ঞাত, সমস্ত বিষয়ই অতি বিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। গন্ধবিকীরণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"গন্ধবিকীরণে solid particle ঘন কণা সমূহ বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক নহে। গন্ধ উৎপাদক বস্তু বাষ্পজাতীয় বা বায়বীয়।" তাহা হইলেও ইহা দ্বারা অণু পরমাণুর সংস্পর্শ অস্বীকৃত হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "ফরাসী পণ্ডিত [illegible]টে গন্ধবিকীরণে কি পরিমাণ অণু ক্ষয় হয়, তাহা নির্দ্ধারণ [illegible] জন্য এক গ্রেণ্ কস্তুরী ২০ বৎসর কাল [illegible] রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] ওজন করিয়া দেখা গেল, ঠিক্ এক গ্রেণই আছে, ওজনে ধরা পড়িতে পারে, এমন কিছুই কমে নাই। এ বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান আবশ্যক।" তবেই ত গোল। বায়বীয় বা বাষ্পজাতীয় পদার্থের ত ওজন আছে, তাহাও অণু পরমাণুর সমবায় বা সংহতি। আমার বোধ হয়, এই ঘ্রাণোৎপাদনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া এতই সূক্ষ্ম যে, তাহার ঠিক্ প্রকৃতি কোন যন্ত্রের সাহায্যে বা কৌশলে অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। বন্ধুবরের কল্পিত "microolfactrometor" সূক্ষ্ম-গন্ধ-মান যন্ত্র কবে আবিষ্কার হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। প্রাচীন এক মত আছে যে, জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে প্রতিনিয়ত গন্ধোৎপাদক কতগুলি অণু পরমাণু বায়ুর সহিত সর্ব্বদাই বিকীরিত হইতেছে, সেই অণু পরমাণুর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিলেই ঘ্রাণোপলব্ধি হয়, ইহাই "effluvia theory".

সমস্ত পদার্থের বর্ণও যেমন বিভিন্ন, গন্ধও তেমন বিভিন্ন। মানবের চরিত্রও যেমন বিভিন্ন, তাহার গন্ধও তেমন বিভিন্ন, উদ্ভিদ সম্বন্ধে যৌন-সম্মিলনে "সুগন্ধের" প্রয়োজনীয়তা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। পশ্বাদিরও যৌন-সম্মিলনে "গন্ধের" ব্যবহার অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; গন্ধই অনেকস্থলে

যৌন-সম্মিলনাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপক বা কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজক। মনুষ্যও এই পশু-ধর্ম্মেরই বশবর্ত্তী।

বিশ্ব-বিশ্রুত পাশ্চাত্য লেখক, মরিস মেটারলিঙ্ক, সুগন্ধ শীর্ষক এক প্রবন্ধে পুষ্পসার বা সুগন্ধ নির্য্যাস বহিষ্করণের প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গাজিপুরের গোলাপনির্য্যাস ও আতর বহিষ্করণ প্রণালীর বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন। সে প্রণালী পাশ্চাত্য প্রণালী হইতে অনেক বিভিন্ন। মেটারলিঙ্ক বর্ণিত প্রণালীটী এই—কারখানার গৃহটির মেজের উপরে পুরু জমাট্ চর্ব্বি থাকে। তাহার উপরে সহস্র সহস্র পুষ্প ছড়াইয়া রাখা হয়, ঐ জমাট্ চর্ব্বি কিছুকাল পুষ্পসার গ্রহণ করে, পরে সেই ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই প্রকার কয়েক বার পুষ্পসার গ্রহণ করার পরে, সেই চর্ব্বির আর পুষ্পসার গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। সেই পুষ্পসার-পায়ী চর্ব্বি হইতে, পুষ্পসার বহিষ্করণ ব্যাপার সহজ নহে, যে সে উপায়ে তাহা সংসাধিত হয় না, তদুপরি সুরা ঢালিয়া দিলে, সেই পুষ্পসার নিষ্কাসনোপযোগী হয়। চর্ব্বিও মদ মত্ত বা "মাতাল" না হইলে, সেই আভ্যন্তরিক পুষ্পসার পরিত্যাগ করে না। এমন অনেক সময়ে মানুষকে মাদক দ্রব্যের সাহায্যে [illegible] করিয়া গুপ্ত ও [illegible] বাহির করা [illegible] চর্ব্বি হইতে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন পুষ্পসার বাহির করা হয়।

দ্রব্যের গুণ যদি আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিকতার (spirituality) অনুরূপ বা কথঞ্চিৎ সমধর্ম্মাবলম্বী থাকে, তাহা "গন্ধ"। অপরের এই আধ্যাত্মিকতা (spirituality) অনুভব করিতে যেমন বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক, "সুগন্ধ" গ্রহণের ক্ষমতা তেমন মানসিক শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের উপর নির্ভর করে। অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকে অনেক সুগন্ধের আদর করে না, বা সৌরভ উপভোগ ও অনুভব করিতে পারে না, যে সমস্ত সুরভি পুষ্প শিক্ষিত ও সভ্যজনের চিত্ত আকর্ষণ করে, সে সমস্ত প্রাকৃতজনেরা উপেক্ষা করে। শিশুগণ যেমন রংএর ঔজ্জ্বল্যে ও গন্ধের তীব্রতায়ই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ, সূক্ষ্ম-বিভেদ বা গন্ধের কোমল মাধুরী ইত্যাদি দ্বারা তদ্রূপ আকৃষ্ট হয় না, অসভ্য ও অশিক্ষিত জনগণও তদ্রূপ বর্ণ বা গন্ধের সূক্ষ্ম বা কোমল মাধুরী উপভোগ করিতে পারে না। যদি কেহ এই প্রশ্ন করেন যে, কুকুরাদি জন্তুগণ যে গন্ধ অনুভব করে তাহা ত মানবকুল কখনও পারে না; তদুত্তরে এই বলা যায়, তাহারা যে সৌগন্ধ ও সৌরভ অনুভব করিয়া সুখী হয়, ইহার প্রমাণ নাই। ইহা সকলেই

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এক সময়ে মৃগ[illegible]ভি কস্তূরী ও তীব্র গন্ধ আতরের যে প্রকার আদর ছিল, গোলাপ যুঁই ম[illegible]তী বেল প্রভৃতি পুষ্পের মৃদু ও কোমল গন্ধে জনসমূহ সেরূপ আকৃষ্ট হয় [illegible]াই। সূক্ষ্ম মৃদু ও কোমল গন্ধ গ্রহণের শক্তি মানবের শিক্ষা-কর্ষিত মান[illegible]ক শক্তির উপচয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে [illegible]ক্ষুকর্ণাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিলে চলিবে কেন? ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্[illegible] সম্বন্ধে এই আপত্তিও হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা কোনও ললিত কলার উ[illegible]ভোগই সম্ভাবিত নহে। চক্ষুদ্বারা চিত্র, নৃত্য, নাট্য, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ক[illegible] উপভুক্ত হয়, কর্ণ দ্বারা সংগীত, কাব্য-কলা উপভোগ করা যায়, নাসি[illegible] দ্বারা ত কোনও ললিত কলাই উপভোগ করা যায় না। এই আপত্তির [illegible]বলতা ও যুক্তিমত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা ইহা কি মনে করিতে পারি না যে, নানা প্রকারের সুগন্ধি পুষ্পাদির সমাবেশে এক নূতন কলার সৃষ্টি হইবে? ইহাও কেহ বলিতে পারেন যে, "সুগন্ধ" ত বিলাস সামগ্রী, উহা পরিবর্জ্জনীয়। কঠোর যোগ-মার্গাবলম্বীরা "স্রক্[illegible]ন্দনাদি" গন্ধদ্রব্য পরিহার করিয়া থাকেন, কারণ উহা যোগবিঘ্নকারী এবং [illegible] জন্মায়। কিন্তু [illegible] উৎ-পাদনেই শিক্ষা ও সভ্যতার অধিকাংশ আয়াস ও প্রয়াস পর্য্যবসিত! যাহাকে আমরা ব্যবহারোপযোগী (useful) বলি, তদুদ্পাদনে আর মানবের কত বুদ্ধি প্রয়োগের আবশ্যক হয়? মাধুরী ও সৌন্দর্য্যোৎপাদনেই ত মানবের বিশেষত্ব! বিজ্ঞানবলে মানব যেমন নানা প্রকার কৃত্রিম রংএর সৃষ্টি করিতেছে, তেমন বহুবিধ কৃত্রিম গন্ধও উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কৃত্রিম কর্পূরই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

পুত্র-দায়।

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

(১)

আমড়াগাছির তারিণীবাবু শেষে পুত্রদায়ে ঠেকিলেন। লোকে কন্যাদায়ে ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু তারিণীবাবুকে পুত্রদায়ের অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইল।

আজি কালিকার দিনে এ দেশে কথাটা সম্পূর্ণ নূতন এবং নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হইতে পারে। সুতরাং ইহার একটু পূর্ব্বাভাস দেওয়া আবশ্যক।

পুত্র শিবনাথ যখন প্রবেশিকা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এফ-এ উপসাগরে পাড়ি জমাইতেছিল, তখন গাংপুরের অমর চৌধুরী অনেক সাধ্যসাধনার পর নগদ দেড় হাজার ও সাড়ে সাত শত টাকার গহনার সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া নলিনীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিয়া সংসার-সাগরের একটা প্রশস্ত খাড়ির কূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কূলে যে 'কণ্টক তরু' ছিল, তাহা তিনিও জানিতেন না, বৈবাহিক তারিণীবাবুও জানিতেন না; জানিতেন কেবল অদৃষ্টচক্রের নিয়ামক সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা।

তারিণীবাবুর বিষয় সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ, তেজারতী কারবার এ সকলই ছিল, ছিল না কেবল হৃদয় নামক অদৃশ্য পদার্থটা। তা না থাকিলেও গ্রামের মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক; তাঁহার মত ধনী গ্রামে আর কেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার গৃহিণী আশা করিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহে বৈবাহিকের নিকট একটা গোটা না হউক, অর্দ্ধেক রাজত্ব নিশ্চয়ই পাওয়া [illegible] নগদ [illegible] আড়াই হাজার টাকাও ঘরে আসিল না, এবং ফুলশয্যায় যে জিনিষ পত্র আসিল, শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশিনী-দিগের হিসাবে তাহার মূল্য সাড়ে এগার গণ্ডা টাকার এক পয়সাও বেশী হইল না। ইহাতে তাঁহার হৃদয় নিহিত ক্রোধরাশি বিষুবিয়াসের প্রচণ্ড অনলোদগারের ন্যায় তীব্র বহ্নিশিখা বমন করিতে লাগিল। সে অত্যুষ্ণ অনলশিখায় কোমল-প্রাণা নলিনী দগ্ধ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই চারিটা উত্তপ্ত শিলাখণ্ড উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া গাংপুরে অমর চৌধুরী ও তদীয় গৃহিণীর মস্তকে পড়িতে থাকিল।

ইহার উপর আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। বিবাহের চারি মাস পরে তারিণী-বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটা প্লীহার অতিরিক্ত স্ফীতিতে উদর মাত্র সার হইয়া চারি বৎসর বয়সেই সংসার-যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। তাহার এই অকাল-মৃত্যু জন্য দোষটা কিন্তু প্লীহার ঘাড়ে পড়িল না, পড়িল নববধূ নলিনীর ঘাড়ে। গৃহিণী কাঁদিয়া, কর্ত্তার পায়ে মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, কি রাক্ষসী বৌ ঘরে আনলে গো, আমার সোণার গোপালকে নিশ্বাসে ছাই করে দিলে।"

কর্ত্তা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায় হায়, তখন যদি কোষ্ঠীটা দেখাতাম!"

এক বৎসরের মধ্যে অমরনাথ অনেকগুলি [illegible] তত্ত্ব করিলেন। পাড়ার লোকে আপনা আপনি বলাবলি করিত, 'এমন স[illegible] জিনিষ তারিণীবাবুর বংশে কেহ কখন দেখে নাই।' কিন্তু গৃহিণী বলিতেন, এ সকল তাঁহার পাদস্পর্শের যোগ্য নহে। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি বৈবাহিক বৈবাহিকার নীচতা স্মরণপূর্ব্বক এমন সকল কথা বলিতেন, যে সকল কথা নলিনীর অন্তরে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত।

কেবল শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট নহে, স্বামীর নিকটেও নলিনী ঘৃণা ও বিরক্তি ব্যতীত আর কিছু পাইত না। মাতৃভক্ত শিবনাথ মাতার সন্তোষের জন্য নিরপরাধা নলিনীকে কথায় কথায় এমন মর্ম্মপীড়া প্রদান করিত, যাহাতে নলিনী এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই সংসারের সকল ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য লালায়িত হইত।

সোণায় সোহাগা মিশিল। বৎসরান্তে শিবনাথ এফ-এ পরীক্ষা দিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে তাহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শিবনাথের বন্ধুবান্ধবেরা ইহার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত যে, দিবসে কবিতা লিখিয়া, রাত্রে [illegible] কোনও সহৃদয় পরীক্ষকই পরীক্ষার্থীকে পাশের তালিকায় ফেলিতে পারেন না। কিন্তু শিবনাথের মাতাপিতা এত কথা বুঝিলেন না, তাঁহারা অলক্ষণা বধূর স্কন্ধেই পুত্রের এই অকৃতকার্য্যতা রূপ দোষের আরোপ করিয়া নলিনীর উপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন।

ক্রমে উৎপীড়ন এতই চলিতে লাগিল যে, সন্নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগেরও তাহা অসহ্য হইল। তাহারা গোপনে অমরনাথকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু অমরনাথ যখন আসিলেন, তখন সব ফুরাইয়াছে, নলিনী অহিফেনের প্রসাদে বঙ্গের দুর্ব্বহ বধূজীবন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

অমরনাথ অমনে ছাড়িলেন না, তিনি পুলিসে সংবাদ দিয়া একটা গোলযোগ বাধাইলেন। কিন্তু তারিণীবাবুর অর্থের মহিমায় সে গোলযোগ সহজেই মিটিয়া গেল। অমরনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন। আর তারিণীবাবু প্রতিবাসিগণের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের অনিষ্টকামনায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

(২)

পতিবিয়োগে পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান আছে, কিন্তু পত্নীবিয়োগে পতির

পুনরায় দারপরিগ্রহের নিষেধ কোন শাস্ত্রেই নাই। বিশেষ, বাঙ্গালীর ছেলের অন্নাভাবে দুই দিন উপবাস দিলেও চলিয়া যায়, কিন্তু বিবাহ না করিলে এক বেলাও চলে না। সুতরাং বধূর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তারিণীবাবু পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন।

চারিদিকে ঘটক ছুটিল। বাঙ্গালীর দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অভাব নাই। তাহারা দলে দলে আসিয়া সসম্ভ্রমে তারিণীবাবুর দ্বারস্থ হইতে লাগিল। তারিণীবাবু প্রতিবাসীদিগকে টিটকারী দিয়া বুক ফুলাইয়া আপনার যোগ্য কুটুম্বের নির্ব্বাচন করিতে লাগিলেন।

রূঢ় ব্যবহারে মর্ম্মাহত প্রতিবাসীরাও এই সময়ে একটা বড় রকমের প্রতিশোধ লইল। তাহারা কখন গোপনে, কখন প্রকাশ্যে আগন্তুক ভদ্রলোকদিগের নিকট তারিণীবাবুর প্রথমা বধূর মৃত্যুকাহিনী সালঙ্কারে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া পড়িল। কন্যাদায় দুর্ব্বহ হইলেও বধূহন্তার গৃহে, পত্নীঘাতকের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইল না। ঘটকেরা হাল ছাড়িয়া দিল, তারিণীবাবু প্রমাদ গণিলেন।

[illegible] ভ্রম যেন কতকটা বুঝিতে পারিল। তাহার উপর কন্যাপক্ষীয়দিগের নিকট বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া যখন সে প্রতিবেশীদিগের কাছেও দুই একটা টিটকারী খাইল, তখন অপমানে লজ্জায় অনুতাপে তাহার হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। মাতৃভক্ত পিতৃভক্ত শিবনাথ মাতাপিতার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পদার্পণ করিল।

তারিণীবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, এবং কিরূপে এই ভীষণ পুত্রদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন।

(৩)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তারিণীবাবুর তেজারতী কারবার ছিল। গ্রামের অনেকেই তাঁহার খাতক। ইহাদের মধ্যে বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় একজন। বিধুবাবু কলিকাতায় সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রথমা কন্যা লীলাবতী যখন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাকে তারিণীবাবুর নিকট শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদে চারি শত টাকার এক তমসুক লিখিয়া দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে হইল।

সে আজ তিন বৎসর আগেকার কথা। বিধুবাবু এই তিন বৎসরে বহুকষ্টে মাস মাস সুদ মিটাইয়া দিয়া আসলে দেড় শত টাকার ওয়াশীল দিয়াছেন।

সুদ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বিধুবাবু আশা করিলেন, আর দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি অঋণী হইতে পারিবেন। কিন্তু তার একটা বৎসর পার হইবার পূর্ব্বেই দেখিলেন, দ্বিতীয়া কন্যা বিমলা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আর বিবাহ না দিলে নয়। পুরাতন ঋণের উপর নূতন ঋণ-ভার চাপিবার উদ্যোগ হইল। কিন্তু সে ভারের আশঙ্কায় কোন্ পিতা নিরস্ত হইয়া থাকিতে পারে? থাকিলেও চলে না, সমাজের তীব্র কশাঘাত আসিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে।

বিধুবাবু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন। একটী দরিদ্র অল্পবিত্ত পাত্র মনোনীত করিলেন। কিন্তু তাহাও তিন চারি শত টাকার কমে নির্ব্বাহ হইবে না। বিধুবাবু ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া দেড় শত টাকার যোগাড় করিলেন, বাকী দুই শতের জন্য তারিণীবাবুর শরণাপন্ন হইলেন।

সন্ধ্যার পর তারিণীবাবু বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন; নিকটে ছিল রামরূপ ঘোষাল। তারিণীবাবুর ভাণ্ডে মধু ভরা ছিল, সুতরাং সকালে সন্ধ্যায় অনেক মক্ষিকা তাঁহার পাশে বসিয়া অবিরাম গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিত। আজি কিন্তু আষাঢ়ের দুর্য্যোগময়ী সন্ধ্যায় মক্ষিকার দল মধুর আশা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল, কেবল রা[illegible]ই একা [illegible] বসিয়াছিল। সে মধুর গুঞ্জনে তারিণীবাবুর শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছিল, এবং তাঁহার প্রসাদী তাম্রকূটের ভস্মাবশেষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছিল।

বিধুভূষণ আসিয়া নমস্কার করিয়া এক পাশে স্থান গ্রহণ করিলেন। এবং পরস্পর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তারিণীবাবুর নিকট আপনার কন্যাদায়ের ভীষণতা বিবৃত করিয়া দুই শত টাকা ঋণ-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া তারিণীবাবু ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "টাকা দিতে তো আমার আপত্তি নাই, কিন্তু শুধ্‌বে কিসে? সাবেক বাকী এখনও আড়াই শো।"

বিধুভূষণ অবনত মস্তকে বলিল, "তা হোক, আমি বেঁচে থাক্‌তে আপনার এক পয়সাও পড়বে না।"

রামরূপ বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়. নিশ্চয়। পয়সা নাই বটে, কিন্তু বিধুবাবুর মত ধর্ম্মভীরু লোক আজকাল প্রায় দেখা যায় না। তা' আপনার মেয়ের বিয়েটা কোথায় ঠিক করলেন?"

অতঃপর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া রামরূপ বরের গাঁইগোত্র. কুলশীল, বিষয় আশয়, এমন কি কোন্ দিনে কোন্ লগ্নে বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহা

পর্য্যন্ত জানিয়া লইলেন। সমস্ত জানিয়া লইয়া একটু চিন্তার পর তারিণীবাবুর মুখের দিকে ঈষৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রামরূপ বলিল, "কিন্তু বিধুবাবু, আপনার যেমন মেয়ে, তার উপযুক্ত পাত্র হইল না।"

একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "কি করব বলুন, আমার যেমন অবস্থা।"

রাম। কিন্তু এ যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা দেওয়া হল। বুঝলেন তারিণীবাবু, যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা।

রামরূপের হাতে হুঁকাটা দিয়া তারিণীবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি? মেয়েটী খুব সুন্দরী না কি?"

রামরূপ বলিয়া উঠিল, "পরমা সুন্দরী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ। সুন্দরী এবং বয়স্থা। আপনি যেমন খোঁজেন ঠিক তেমনটী।"

তারিণীবাবু মৃদু হাসিলেন, বিধুভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন।

রামরূপ বলিল, "এক কাজ করলে হয় না তারিণীবাবু? আপনি তো আজ এক বৎসর ধ'রে সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্চেন। আমি বলি, এই মেয়েটীকে ঘরে আনুন না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিধুবাবুর অবস্থা ভাল নয় বটে, তা আপনিও তো তেমন [illegible]ার প্রত্যাশা [illegible]। আর আপনার অভাবই বা কি! আপনি কি বলেন বিধুবাবু?"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বিধুভূষণ বলিলেন, "আমার তেমন ভাগ্য কোথায়?"

রাম। ভাগ্য! আপনার মত ভাগ্য কার? মেয়েটীকে তারিণীবাবু একবার দেখ্‌লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বলছি সব ঠিক। আপনার একটী পয়সা খরচ লাগ্‌বে না। তা হ'লে যে দিনটা ঠিক ক'রেছেন, ঐ দিনেই কাজ সেরে ফেলুন না?

ভীতিবিকম্পিত কণ্ঠে বিধুভূষণ বলিলেন, "তা হয় না রাম খুড়া।"

চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া রামরূপ বলিল, "হয় না? কেন, বাধা কি?"

বিধু। উনি স্বভাব, আমরা বংশজ।

রামরূপ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এই কথা! ওর জন্য আটকাবে না। কুলীন বংশজ তো শাস্ত্রের বিধান নয়, ওটা বল্লালের একটা শয়তানী। আজকাল আর ও সব কেউ মানে না, তারিণীবাবুও মান্‌তে চান না।"

শঙ্কিত নেত্রে তারিণীবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিধুভূষণ বলিল, "উনি না মানলেও আমি মানি। জেনে শুনে আমি ওঁর কুল নষ্ট কর্‌তে পারব না।"

সহসা সেস্থানে বজ্রপাত হইলেও রামরূপ এতটা স্তম্ভিত হইত কি না সন্দেহ, কিন্তু বিধুভূষণের তেজোগর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে সে তদপেক্ষা স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া নীরব হইল। তারিণীবাবুর মুখে আষাঢ়ের মেঘের ঘন ছায়া পড়িল। বিধুভূষণ উঠিয়া শুষ্ক মুখে একটা নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে তারিণীবাবু সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "মিছে এই অপমানটা করালে ঘোষাল ?"

অপরাধীর ন্যায় সভয় দৃষ্টিতে তারিণীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রামরূপ উত্তর করিল, "তা বটে। কিন্তু কে জানত যে, লোকটার এত অহঙ্কার।"

তারিণীবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রামরূপ বলিল, "এখন উপায় ?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "উপায় আছে। যখন কথাটা তুলেছ, তখন সহজে ছাড়চি না। কুঁদের মুখে পড়লেই সব সোজা হয়ে যাবে।"

(৪)

বিধুভূষণ বুঝিতে পারিলেন, [illegible] তারিণীবাবুর [illegible] ভীষণ বজ্ররূপে তাঁহার মস্তকে পতিত হইবে। কন্যার বিবাহ দূরের কথা, হয় ত পৈতৃক জমিজমা, বাস্তুভিটা সব ছাড়িয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে। এতটা বুঝিয়াও বিধুভূষণ সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সর্ব্বস্ব যায় যাউক, মেয়ে আজীবন কুমারী হইয়া থাকে তাহাও স্বীকার, তথাপি বধূঘাতী পাপিষ্ঠ তারিণীচরণের গৃহে কন্যা দিব না।

সমাজে বিধুভূষণের ন্যায় পিতার আধিক্য হইলে তারিণীবাবুর মত লোকের যথেষ্ট শিক্ষা হইতে পারে।

বিধুভূষণের অনুমান মিথ্যা হইল না, অচিরাৎ দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে নালিশ রুজু হইল, এবং এক মাসের মধ্যেই তারিণীবাবু মায় খরচা তিন শত তিয়াত্তর টাকা পাঁচ আনা তিন পাই ডিক্রী পাইলেন।

তারিণীবাবুর শুভানুধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ কেহ বিধুভূষণের মঙ্গল কামনায় আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল যে, এখনও যদি বিধুভূষণ তারিণীবাবুর পুত্রের হস্তে বিমলাকে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তারিণীবাবু তাহার সকল দোষ ক্ষমা করিতে পারেন ; এমন কি, তাঁহারা বলিয়া কহিয়া বিধুভূষণকে ঋণমুক্ত করিয়াও দিতে পারেন। ইহার অন্যথায় তাহার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।

বিধুভূষণ অবিচল ভাবে উত্তর দিলেন, "তারিণীবাবুর যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন ; আমি দেশত্যাগ করিব, তথাপি তাঁহার ন্যায় নারীহন্তার গৃহে কন্যা দান করিব না।"

শুভানুধ্যায়িবর্গ বিধুভূষণের একটা ভাবী ঘোরতর অমঙ্গল কল্পনা করিয়া ম্রিয়মাণ চিত্তে নিরস্ত হইলেন।

এদিকে বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনের আর বিলম্ব নাই। বিধুভূষণ বহু কষ্টে অন্যস্থান হইতে টাকার যোগাড় করিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন, অপর দিকে মর্ম্মাহত তারিণীবাবু ইহার প্রতিকূল চেষ্টায় প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বরপক্ষীয়ের নিকট দুই চারিটা মিথ্যা সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন তাহারা নিরস্ত হইল না, তখন আপনার মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য তারিণীবাবুকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইল। বিধুভূষণ অসহায়ের সহায় ভগবানকে স্মরণ করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিধুভূষণ শুনিল, গ্রামের জনপ্রাণীও আজ তাহার ঘরে আসিবে না। কারণ তাহার কন্যা অনূঢ়াবস্থায় রজস্বলা হইয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে বিধুভূষণ পা[illegible] তাহার কন্যা পতিতা। পাপীর গৃহে আসিয়া কে তাহার অন্ন গ্রহণ করিবে!

বিধুভূষণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ সকলই যে তারিণীবাবুর চক্রান্ত তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। বিধুভূষণ গিয়া গ্রামের অনেকের নিকট কাঁদাকাটা করিল, তাহাদের পায়ে হাতে ধরিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সকলের একই উত্তর, "পাঁচ জনকে বল, পাঁচজন ছাড়া তো হ'তে পারি না!"

কিন্তু সেই পাঁচ জন যে কে, তাহা কেহই দেখাইয়া দিতে পারিল না। অগত্যা বিধুভূষণ নিরস্ত হইয়া বিপদে বিপদ্‌ভঞ্জনের পদে আত্মসমর্পণ করিল।

(৫)

সন্ধ্যার পরেই বাজনা বাজাইয়া, রঙমসাল জ্বালাইয়া বর আসিল। বিধুভূষণ অন্তরে দুর্গানাম জপিতে জপিতে বরযাত্রগণের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু বরযাত্রীরা গ্রামের আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই চারিজন সুচতুর লোক গোপনে অনুসন্ধানের জন্য প্রতিবেশীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে যাহা শুনিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বরকর্ত্তাকে জানাইলেন। বরকর্ত্তা

শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। চারিদিকে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। বরকর্ত্তা ভাবী বৈবাহিককে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বর উঠাইয়া লইলেন। বিধুভূষণ অনেক কাঁদাকাটা করিলেন, এ সকলই যে তারিণীবাবুর চক্রান্ত তাহা বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু নরক-ভয়ে ভীত বরকর্ত্তা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। বিধুভূষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। বর লইয়া বরযাত্রীরা প্রস্থান করিল।

তারিণীবাবু রামরূপকে সঙ্গে লইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া বলিলেন, "কি হে বিধুভূষণ, বিবাহের বিলম্ব কত?"

বিধুভূষণ তাঁহার পায়ে আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এখনও রক্ষা করুন তারিণীবাবু, হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর ধর্ম্মনষ্ট করবেন না।"

শ্লেষের অট্টহাসি হাসিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "আমি কি হিন্দু? হিন্দু হ'লে আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহে কোন আপত্তি থাকত না।"

বিধুভূষণ তথাপি তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এখন কিন্তু আপনি না রাখলে আমার জাতিধর্ম্ম সব যায়।"

ভ্রূকুটী করিয়া তারিণীবাবু [illegible] "জাতিধর্ম্ম তো [illegible] তা'পর কাল ক্রোকী পরোয়ানার পেয়াদা এসে যখন বাড়ী ঘর দখল করবে, তখন বুঝবে, তুমি কার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েছ।"

বিধুভূষণ পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রামরূপ এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, "যা হ'বার হয়ে গেছে। এখন তারিণীবাবু, ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত। এক কাজ করুন, শিবনাথকে ডাকিয়ে এই লগ্নেই শুভকাজটা সেরে ব্রাহ্মণকে দায় হ'তে উদ্ধার করুন।"

ক্রোধে ক্ষোভে চীৎকার করিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "তা কখনই হ'বে না।" তারিণীবাবু ভূপৃষ্ঠে সদম্ভ পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "তবে তোমার মেয়েরও বিয়ে আর হ'তে পারবে না।"

"নিশ্চয়ই হবে।"

তারিণীবাবু সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অমরনাথ।

অমরনাথ বরের নিকট আত্মীয়। তিনি সপুত্র বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিলেন। যখন বিবাহে গোলযোগ উপস্থিত হইল, তখন তিনি ইহার সত্যাসত্য

নির্দ্ধারণের জন্য গ্রামের জনৈক পরিচিত ভদ্রলোকের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া তিনি ছুটাছুটী যখন বিধুভূষণের বাড়ীতে আসিলেন, তখন বরযাত্রী সকলেই চলিয়া গিয়াছে। তারিণীবাবু বিপন্ন বিধুভূষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় দিতেছে।

অমরনাথের দম্ভোক্তি শ্রবণে তারিণীবাবু বিকট ভ্রুভঙ্গী করিয়া অমরনাথের দিকে চাহিলেন। কিন্তু অমরনাথ তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া এক হাতে পুত্রের হাত অপর হস্তে বিধুভূষণের একটী হাত ধরিয়া বলিলেন, "এই লউন বিধুবাবু, আমার পুত্রকে; ইহাকে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া আপনার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

বাটীর ভিতর মঙ্গলশঙ্খ সশব্দে বাজিয়া উঠিল। তারিণীবাবু বজ্রাহতের ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। *

দীপালী।

স্বর্ণপিণ্ডী

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

মন্দিরে মন্দিরে আজি শোভে শ্যামাঙ্গিনী,
উৎসবের উপাচারে মহা কোলাহল,
সোহাগললিত ছন্দে স্তুতি পুরোহিত
অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে দিতেছেন জবা-রক্তদল।

গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর নিনাদ
তুলসীর বেদীমূলে মঙ্গল আরতি
দেউলে দেউলে শোভে সহস্র প্রদীপ
দীপালীর মহাধুম শ্যামাপূজা রাতি।

পথে পথে পূর্ণকুম্ভ পল্লবেতে ঘেরা
রক্তিম সিঁদুর তা'র জ্বলিছে উজ্জ্বল,
অদূরে গহনে বনে প্রতি শাখী শাখে—
দীপালীতে বাতি জ্বালে জোনাকীর দল!

গগন মগন ঘন ঘোর অমানিশা
তারকা জ্বালিছে দীপ নীল শাড়ী পরি'
মহোল্লাসে হৃদিপদ্ম ফুটি ওঠে মোর—
মুগ্ধনেত্রে হেরে অই দীপ্ত বিভাবরী!

প্রতিকোণে প্রতিদিকে আকাশে অনিলে
ঘাটে ঘাটে তটে মাঠে জাহ্নবীর নীরে,
জ্বালাইয়া লক্ষ দীপ অই মর্ত্ত্যবাসী—
পরিহাস করে সবে মহান্ তিমিরে!

জ্বলে মহা হোমানল সুপবিত্র হবি
রক্তমুখী অমানিশা পুলক বিহ্বল
হরষে হরষে জ্বলে ধমনীর শিখা
শ্যামাঙ্গী যোড়শী আজি কণক উজ্জ্বল!

---

* গল্পের প্রধানাংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

শ্রীশ্রীকালীপূজা রহস্য।

["ও-পারের কথা"র লেখক।]

নিজ নিজ সংস্কার, শিক্ষা ও অভিরুচি মত কোন কোন জীব ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকেন, আর কেহ কেহ এ কর্ম্ম সাধন করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধ করেন যে, ভগবান্ সশরীরে দেখা দিয়া তাঁহাদের যাবতীয় সাধ পূর্ণ করেন। আর যাঁহারা সাধন-ভজন কর্ম্মে বীতরাগ, ভগবান্ কর্ত্তৃক বা যে কোন উপায়ে তাঁহাদের যাবতীয় অভাব ও অশান্তি বিদূরিত হইলেই তাঁহারা আপাততঃ পরিতুষ্ট থাকেন। উভয় পক্ষের জীবেরা মর্ম্মে মর্ম্মে না হউক, মুখের কথায় বুঝেন যে ভগবান্ই জীবের মা, বাপ ও স্বামী ও তাঁহারই লীলায় জীবের যাহা কিছু দুর্গতি। জীবের দুঃখভার হ্রাস না হইয়া যখন তাঁহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে চলিয়াছে [illegible] অবস্থার প্রতিকারের কোন উপায় হইতেছে না, ইহাও প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তখন জীবের কি ভাবে চলা বিধেয়? যাঁহারা মুখের কথায় দায়িত্ব মোচন করিতে প্রয়াসী নহেন, তাঁহারা গোপনে জগতের কল্যাণকামনায় আপনাদিগকে বিক্রীত করেন।

এ বিশ্বের আদৎ মালিক ব্রহ্ম। এক ব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত—নির্গুণ ও সগুণ। পরমাত্মা নির্গুণ ব্রহ্ম। বিরাট প্রকৃতি, বিশাল মন ও মহামায়া—সগুণ ব্রহ্ম। শ্রীশ্রীকালী বিরাট প্রকৃতির বা সগুণ ব্রহ্মের সসীম বা ধারণাগম্য মূর্ত্তি। জীব সগুণ বলিয়া বিরাট প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। যতদিন দেহ-বুদ্ধি, জাতি ও বর্ণভেদ বুদ্ধি, আমি-তুমি-বুদ্ধি ইত্যাদি ভেদাভেদ বুদ্ধি জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান, তত দিন জীব কেবল মনের দ্বারাই পরিচালিত। যতদিন গড়া-ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা-গড়া কর্ম্মে জীব প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন যে কেবল বিরাট প্রকৃতির ধারায় চলিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

কর্ম্ম ও ক্রমবিকাশ জগতের বিধান। বিরাট প্রকৃতিরই এই দুই বিধান। সুতরাং জীবকেও এই দুই বিধানে চলিতে হইবে। জীব ইহজীবনে যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই সেই কর্ম্ম করিয়া ইহজীবনের ও পরজীবনের সুখ ও শান্তিলাভের প্রত্যাশা রাখেন। ইহজীবনের সুখ ও শান্তি চাহেন না—

এ প্রকার জীবের সংখ্যা অতি কম জীব যেমন অগুণে পূর্ণ, প্রত্যেক জীবেই কম-বেশী সৎগুণও বিদ্যমান। তবে ঘটনাচক্রে পড়িয়া বা সঙ্গ বা শিক্ষাপ্রভাবে প্রত্যেক জীবের অগুণ বা সৎগুণ বিকশিত হইতেছে। পবিত্রতার অভাবে জীবের দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব। দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাবে জীবের অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও কার্য্যকুশলতা নাই। অমুক-তমুক সামগ্রী না পাইলে চলিবে না, এ ধারণা যখন দৃঢ়ীভূত হয়, উহা লইবই লইব, এই সঙ্কল্প মানবহৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। একটী মাত্র সঙ্কল্প হৃদয়ে এককালীন প্রোথিত হইলে সেই প্রকার সঙ্কল্প প্রভাবে চিন্তার ও কার্য্যের উন্মেষ হয়। কিন্তু উচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে ধৈর্য্যকে সম্বল করিলে চিন্তা-কুশলতা হইতে কার্য্য-কুশলতা আসিয়া যায়। আলস্য, অধৈর্য্য, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও দারুণ মোহান্ধতায় নিমজ্জিত জীবের সঙ্গ করিলে চিন্তাশীলতা ও কার্য্যকুশলতা আনয়ন করা অলীক আশা মাত্র। বিহিত বিধানে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করিলে মানব মন অগুণাবলীর পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ যাবতীয় সৎগুণে নিঃসন্দেহে পূরিত হয়—এক মুখে নয়, শত শত কণ্ঠে প্রকৃতি-সেবক বলিতে সক্ষম। কিন্তু জাগতিক কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া সকলের পক্ষে বিশেষতঃ হিন্দুজাতি রমণীকুলের—প্রত্যহ [illegible] প্রকৃতির সঙ্গ করা দুষ্প্রাপ্য [illegible] অথচ নিজ নিজ চিত্তের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করা নিতান্ত আবশ্যক। জন-সাধারণের কল্যাণকামনায় এই জন্য বিরাট প্রকৃতির সসীম মূর্ত্তির আরাধনার, অর্থাৎ শ্রীশ্রীকালীপূজার ব্যবস্থা।

জগতের বিধান ক্রমবিকাশ, এ কথা বিস্মৃত হয়েন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু লাভ করা জীবের দারুণ আকাঙ্ক্ষা। মনে হয়, জীবের প্রধান দুর্গতির কারণ ইহাই। কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ঘটনাচক্রে পড়িয়া বিহিতবিধানে কর্ম্ম সাধিতে সুযোগ বা সুবিধা পান না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কর্ম্মসাধন করিয়াও সমুচিত ফল লাভ করেন নাই। যাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অবকাশ কম, তাঁহারাই প্রায়শঃ কর্ম্মশীল; কিন্তু যাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অবকাশ বেশী, তাঁহাদেরই অবকাশ অভাবের অভিযোগটা বেশী। মনের নিভৃত স্থানে 'সাধের' চিন্তার আসন পাতিয়া রাখিয়া জাগতিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা ততটা কষ্টসাধ্য নহে। বরং এই প্রকার বিধানে চলিতে সচেষ্ট হইলে হৃষ্টচিত্ততা ও কার্য্যতৎপরতা সেই জীব অল্পায়াসে লাভ করেন। যাঁহারা কোন কর্ম্ম সাধন করিয়াও সমুচিত ফল পান না, তাঁহাদের জানা বিধেয় যে, তাঁহাদের সংস্কার বা অভিরুচি মার্জ্জিত হয় নাই বলিয়া বা তাঁহারা যথাযথ

শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম বলিয়া তাঁহাদের 'হায়' 'হায়' বাণীই সম্বল করিতে হইয়াছে। ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, জাগতিক যাহা কিছু লাভের আশায় ভগবানের অর্চ্চনা অনেক সময়ে নিষ্ফলতাই আনয়ন করে। প্রথমাবস্থায় কেবল মাত্র চৈতন্য অর্জ্জনের জন্য সাধন ভজন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা বিধেয়। এই উপায়ে চলিয়া যে মাত্রায় চৈতন্য অর্জ্জন করা হইবে, জীবের জাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষুধা সেই মাত্রায় আপন হইতে মিটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ক্রমবিকাশ বিধানে প্রবৃত্তি-ব্যাধি হইতে জীবকে নিবৃত্তি অবস্থাপন্ন করা বিধাতার বিধি। এই ভবসংসার ভগবানের ও জীবের ঋণ মুক্ত হইবার বিশাল কারখানা। আত্মা মনের নিকট ঋণী, মন জীবনীশক্তির অর্থাৎ প্রাণের নিকট ঋণী, প্রাণ দেহের ও দেহস্থিত কীটাণুকীটের নিকট ঋণী, জীব পরিবর্গের নিকট ঋণী ও পরমাত্মা জগতের নিকট ঋণী। প্রত্যেকের কর্ম্ম—নিম্নস্থ প্রত্যেককে চৈতন্য প্রদান করা। এই চৈতন্যপ্রদান কর্ম্মই ঋণশোধের আয়োজন। এইজন্য ভগবান্ অবতার ও মহাজন আকারে এ ধরায় আসেন যান। ভেদাভেদ বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি নানা অগুণের গাঁটরি-পুঁটরি সাজিয়া থাকিয়া এত ঋণ শোধ করা সহজ কথা নহে। সুতরাং জীবের পক্ষে ঋণমুক্ত হইবার সাধ—তা আবার অল্প সময়ের মধ্যে দুরাশা মাত্র। কিন্তু জাগতিক কর্ম্মসমূহ হইতে অবকাশ লাভে উৎসুক থাকিয়া বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করিলে, বিরাট প্রকৃতির কর্ম্মাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ও তাঁহার গুণাবলী দ্বারা হৃদয়, মস্তিষ্ক ও মন পুরিত করিতে যত্নশীল হইলে চিত্তের যাবতীয় মলিনতা, বিক্ষিপ্ততা ও অবসন্নতা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বিদূরিত হয়। ফলে এই প্রকার কর্ম্মসাধন দ্বারা জীব শান্তভাবাপন্ন ও কর্ম্মঠ হইয়া জাগতিক অভাব ও অশান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া অল্প কথা, অদৃশ্য লোকের তত্ত্ব অবগত হয়েন ও পুস্তক পঠন বিদ্যার পরিবর্ত্তে প্রকৃত জ্ঞানে, আসক্তির পরিবর্ত্তে প্রেমে ও আসক্তির পরিবর্ত্তে ইচ্ছা ও কার্য্যকারিণী শক্তিতে বিভূষিত হয়েন। শ্রীশ্রীকালী-পূজার অপর মহান্ উদ্দেশ্য এই। ফল কথা, বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ করণই মানব-মনের উৎকর্ষতা সাধনের সহজসাধ্য উপায়। এই প্রকার উৎকর্ষতা সাধনে তৎপর হইলে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করা সম্ভবপর। মানুষের কিন্তু "ঘোড়া ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়া" রোগ!

বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগে উন্মুক্ত প্রকৃতির আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া কত সহস্র সহস্র জীব মহাজনবাচ্য হইয়া অদ্যাপিও জগতে পূজিত। প্রকৃতির

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া তাঁহারা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে স্ব স্ব হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিস্তারের অদ্ভুত গবেষণার, অতুলনীয় প্রতিভার ও অনুকরণীয় কার্য্যকুশলতার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ অধ্যাপক ও উচ্চ উপাধিধারিগণ তাঁহাদের গুণাবলীর তুলনায় অর্ব্বাচীন মাত্র। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য ও উদ্ভিদবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সৌরজগৎ প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞান তাঁহাদের চিন্তার, গবেষণার ও কার্য্যকুশলতার সুফল। কবি—প্রকৃতির কৌতুকশীল শিশু সন্তান, উদ্ভাবক—প্রকৃতির ধীর ও কর্ম্মঠ সন্তান, কিন্তু প্রকৃতির পূজারীগণ তাঁহার অমূল্য রত্নাধিকারী বা সেই রত্ন প্রাপ্তাভিলাষী সুসন্তান। এই শেষোক্ত সুসন্তানগণ জনসাধারণের কল্যাণকামনায় শ্রীশ্রীকালী মূর্ত্তি দ্বারা ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভাবের যৎকিঞ্চিৎ রহস্যভেদ করিয়াছিলেন। সেই রহস্য ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হইয়া পাঠকপাঠিকাবর্গের সমক্ষে আমরা উপনীত।

৺কালী শবভাবে শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মানা। তিনি বিবস্ত্রা, কিন্তু তাঁহার কটিদেশে নরকর সন্নিবেশিত। তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডমালা ও জিহ্বা রক্তপূর্ণ হইয়া নিষ্কাশিত। তাঁহার চারি হস্ত—দক্ষিণ ভাগে দুই হস্ত ও বাম ভাগে আর দুই হস্ত। এই দুই হস্তের এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে নরমুণ্ড। তিনি কালবরণা, ত্রিনয়না ও তাঁহার কেশদাম বিগলিত।

শবদেহের কর্ম্ম বা ক্ষুধা তৃষ্ণা বা সুখ দুঃখ বা ভেদাভেদ বুদ্ধি বা রূপ, রস, গন্ধাদির লালসা থাকে না; সুতরাং সেই দেহ থাকা বা না থাকা একই কথা। নির্গুণ ব্রহ্ম কি ইহা বুঝাইতে ইহাপেক্ষা সহজ ও সরল উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। শবের কেশভার গুচ্ছীকৃত, তাঁহার হস্তে ডমরু, কর্ণে ধুতুরা ফুল, স্কন্ধদেশে ফণী, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলে হাড়মালা, ও সর্ব্বশরীর ভস্মাবৃত। নির্গুণ ব্রহ্ম যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক্ষণে কর্ম্মজাল কেশগুচ্ছসম গুটাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাতেই সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারী ডমরুবৎ ওঁকার শব্দ নিহিত। জীবের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে গরলপূর্ণ ফণীসদৃশ প্রবৃত্তিকে, অলীক শোভাযুক্ত ধুতুরা ফুল সদৃশ 'আমি' 'আমার' বুদ্ধিকে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সদৃশ হিংসাকে ও হাড়মালা ও ভস্মসদৃশ জাগতিক বৈভবকে সাথের সাথী করিয়া রাখিতে হইয়াছে। এই প্রকার অসন ভূষণ রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবকে সগুণ অবস্থা হইতে নির্গুণ অবস্থাপন্ন হইতে হইলে ও বিরাট প্রকৃতি যথাসম্ভব চৈতন্য প্রদান করিলেও জীবমন প্রবৃত্তি বা অহংবুদ্ধি বা ঈর্ষা বা

জাগতিক বৈভবের স্মৃতিশূন্য হইতে পারে না; সুতরাং জীবাত্মা ও চৈতন্যময়ী মনকে একেবারে অব্যাহতি দিবার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মকেই উপরোক্ত অগুণাবলী লইতে হয়। তবে নির্গুণ ব্রহ্মে সেইগুলি বহিরাবরণের কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্মের শিরোপরি অবস্থিত—একটী ফণী ও গঙ্গাদেবী। ফণীই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যাহা বিরাট প্রকৃতি আকারে প্রকটিত। প্রত্যেক জীবে এই শক্তি বিদ্যমানা ও ইহারই পূর্ণবিকাশে জীব কালে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাদেবী জ্ঞানের ও প্রেমের সম্মিলিত বিশ্বব্যাপিনী শক্তি। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন দৃষ্টি সম্পন্ন হইলেও এক্ষণে সে শক্তি স্তম্ভিত রাখিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম যোগারূঢ়। এই অবস্থায় প্রাজ্ঞচক্ষুঃ অর্দ্ধস্ফুট থাকে বলিয়া উহা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ভালে অঙ্কিত। আর আর সর্ব্ববিষয়ে নির্গুণ ব্রহ্ম পূর্ণভাবে শবভাবাপন্ন হইলেও অর্দ্ধস্ফুট প্রজ্ঞাচক্ষুই তাঁহার সজীবত্ব প্রমাণিত করিতেছে।

এক্ষণে ৺কালীর কথা বলা যাউক। জলের উপর যেমন তরঙ্গ থাকে, কিম্বা বসিবার ও দাঁড়াইবার ভূমি থাকিলেই যেমন বসা বা দাঁড়ান সম্ভব, তেমনি নির্গুণ ব্রহ্ম-ভূমির উপর সগুণ ব্রহ্ম বা বিরাট প্রকৃতি ধারণাগম্য ৺কালী আকারে দণ্ডায়মানা। পরমাত্মাই বিরাট প্রকৃতি আকারে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন বলিয়া তাঁহার এক পদ শিবের বক্ষে ও অন্য পদ অন্যস্থানে রক্ষিত। 'প্রকৃতি' নারীবাচ্য বাক্য ও তিনি বিশ্বপ্রসবিনী। এই হেতু নারী আকারে চিত্রিত। এই প্রসব কার্য্য কিন্তু এরূপ ভাবে সাধিত হইতেছে যে, জগৎ উহার রহস্যভেদে অক্ষম। এই কারণে ৺কালী এমন ভাবে দণ্ডায়মানা যে, উৎপত্তিস্থান গোপনে রক্ষিত। ৺কালী বিবসনা। ইহার কারণ তাঁহাকে অষ্টপ্রহর প্রসব করিতে হইতেছে ও প্রকৃতি জগতের চক্ষে উন্মুক্তা। ৺কালী কালবরণী এই কারণে যে, বিজ্ঞান মতে যে পদার্থ বর্ণশূন্য—উহা কালবরণ। ইহা ব্যতীত বেদান্ত মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের ছায়া মাত্র। ছায়া একমাত্র কালিমা বর্ণেরই হইয়া থাকে। প্রকৃতি রসে পূর্ণ। বায়ু, জল, ফল ও যাবতীয় খাদ্য রসে পূর্ণ। রমণীর রস স্তনেই থাকে, এই হেতু স্তন দুটী উন্নত অর্থাৎ দুগ্ধে পূর্ণ। সংস্কারবশতঃ জীবের ধারণা যে, চিত্রগুপ্ত আখ্যাত কোনজন মানুষের কর্ম্মাকর্ম্ম লিখিয়া রাখিতেছেন। ব্যোম বা আকাশ ফটো-নেগেটিভের মত। ইহাতেই গুপ্ত ভাবে মানবের কর্ম্মাকর্ম্ম গুপ্ত বা অলক্ষিত ভাবে চিত্রিত হইতেছে। ব্যোম বা আকাশ প্রকৃতির বক্ষঃস্থল ও তৎনিম্নস্থল স্বরূপ। মানব যাহা কিছু কর্ম্মসাধন করিতেছে, উহা প্রায়শঃ

মস্তিষ্ক ও হস্ত দ্বারা সাধিত হইতেছে। যাবতীয় কর্ম্মাকর্ম্মগুলি একখানি ক্ষুদ্র চিত্রে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। এই হেতু যাহার দ্বারা কর্ম্মগুলি সাধিত হইতেছে, উহাই ৺কালী অঙ্গে ভূষণ স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। ৺কালীর লোল-জিহ্বা রক্তে রঞ্জিত। কাহারও খাইবার সাধ হইলে উহা লালায় পূর্ণ হয়। প্রকৃতিই বিশ্বপ্রসবিনী ও রক্ষয়িত্রী বটে, কিন্তু তিনিই বিশ্বের লয়কর্ত্রী। এই ভাব দেখাইবার জন্য ৺কালীর জিহ্বা রক্তে রঞ্জিত ও উহা নিষ্কাশিত। মৃত্যু সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিলে ইহাই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ শিশু, বালক-বালিকা, যুবা-যুবতী ও প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এ কয়েক শ্রেণীর জীবের সমষ্টিভূত মৃত্যুসংখ্যা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিশ্বের পাকা ফল স্বরূপ। কিন্তু আর আর জীবেরা বিশ্বের কাঁচা ফলসম—কাঁচা ফলেই আটা ঝুরে। প্রকৃতির তিনটী চক্ষু—সত্ত্ব, রজঃ ও তম তিন গুণ নির্দ্দেশক। তবে তিনটী গুণই সমভাবে বিদ্যমান থাকায় তিনি ত্রিকালজ্ঞী। ৺কালীর কেশদাম উন্মুক্ত ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে "আমার চুল যত, আমার কর্ম্ম তত।" প্রকৃতির কর্ম্ম অগণন ও চারিদিকে যাবতীয় কর্ম্ম বিস্তারিত। যাঁহারা তাঁহাকে "মা মা" বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন, তাঁহাদিগকে তিনি 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' রবে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। দক্ষিণ-দিকের উপরিস্থ হস্ত এই কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছে। যাঁহারা তাঁহার নিকট 'এ-তা' দাও বলিয়া ভিক্ষা যাচিতেছে, তিনি 'এই লও' বলিয়া তাহাই দিতেছেন। দক্ষিণদিকের নীচের হস্ত ঐ ভাবে চিত্রিত। বাম উপরিস্থ হস্তে খড়্গ দ্বারা তিনি মায়ামোহাদি যাবতীয় বন্ধন ছেদন করিতেছেন। চতুর্থ হস্তে নরমুণ্ড শোভিত। জীব নানা অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম সাধন করিয়া যখন দেহপাত করে, ও মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, তখন কেবল মাত্র বুদ্ধির (অর্থাৎ মস্তিষ্কের) সহায়তায় বিশ্বজননীর শরণাপন্ন হয়। তখনই কিন্তু প্রকৃতি সেই জীবকে আশ্রয় দেন। অর্থাৎ তখন তিনি চৈতন্যদায়িনী হইয়া সেই জীবের চৈতন্য উৎপাদনে সচেষ্টা হয়েন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে প্রত্যেক অবিকৃত মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীব (অর্থাৎ যাঁহারা দরকোচামারা বা এঁচোড়ে পাকা সমালোচক শ্রেণীভুক্ত নহেন) অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে :—

(১) ৺কালী অনার্য্য রমণীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইবার কারণ নাই ;

(২) নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, বিশেষতঃ জনসাধারণকে ইহাই অতীব সহজ ও সরল উপায় ;

(৩) জীবের একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য ;

(৪) ব্রহ্ম যে ভাবেই পূজিত হউন না কেন, তিনি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া পূজাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে জীবমন ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করে ;

(৫) পূর্ব্বকালের হিন্দুমহাজনগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ;

(৬) পরে তাঁহাদের অমূল্য জ্ঞান জগতের হিতকামনায় ৺কালী ও পূর্ব্বপ্রকাশিত শ্রীশ্রীদুর্গাকারে উপহার দিয়াছেন ;

(৭) বিরাট প্রকৃতির যথাবিহিত সঙ্গ করিলে জীব অভাব হইতে স্বভাবাবস্থা পাইতে পারে ;

(৮) বিরাট প্রকৃতির সঙ্গগুণে জীবের হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকশিত হয় বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য ;

(৯) আর আর ধর্ম্মাবলম্বীদের মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা কুসংস্কার বা হীনতাসূচক বলিয়া পরিগণিত হইলেও নিজ নিজ অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হিন্দুদিগের শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী ইত্যাদি মূর্ত্তিপূজাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা বিশেষ দাম্ভিকতার ও মূর্খতার লক্ষণ ;

(১০) ঈর্ষা, কুৎসা, ক্রোধ, দাম্ভিকতা, স্বার্থপরতা, ভেদাভেদ বুদ্ধি ও জাগতিক যাবতীয় আসক্তিকে সম্বল করিয়া, জীব মাত্রই কোন-না-কোন ভাবে মূর্ত্তিরই উপাসক ; সুতরাং জাগতিক নানা মূর্ত্তির ও স্বকল্পিত মূর্ত্তির উপাসক না হইয়া সুগঠিত ও অর্থপূর্ণ একটী মাত্র মূর্ত্তিতে স্ব স্ব চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করাই মনকে উন্নত করিবার সরল ও সহজসাধ্য পন্থা ;

(১১) জীবমনকে পাশব বা আসুরিক ভাব হইতে উদ্ধার করাই হিন্দুদিগের মূর্ত্তিপূজার একটী কারণ ; সুতরাং পশু বলিদান প্রভৃতি কর্ম্ম সাধন নিঃসন্দেহ অনার্য্য বা আসুরিক বিধান ;

(১২) হিন্দু দেব দেবীর আধুনিক ভাবে পূজা করণের জন্য যাজক ও গুরুশ্রেণী ও তৎসঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নিঃসন্দেহ দায়ী, সুতরাং ইহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অন্যের দোষ দেখা মানুষের এক বিষম ব্যাধি। এই ভাবে নিজ নিজ

মনকে গঠিত করিয়া মানুষ বাহ্যভাবে শিক্ষার ও সভ্যতার উচ্চ সীমায় উপনীত হইলেও দিনের দিন অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়িতেছে। মানুষকে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র গুণের আদর করিতে শিক্ষা দিয়া গুণগ্রাহী করাইবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগের যাবতীয় মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কালীমূর্ত্তির হস্তে খড়্গ ও নরমুণ্ড শোভিত। জীবের মায়া-মোহাদি বন্ধন ছেদন ও তৎপরে চৈতন্য প্রদান করা বিরাট প্রকৃতির মুখ্য কর্ম্ম। আসক্তি পূর্ণ জীবকে নূতন করিয়া গঠিত করাই বিরাট প্রকৃতির বীরা বলিয়া দেবীর লোলজিহ্বা। সুতরাং খড়্গ, নরমুণ্ড ও লোলজিহ্বা কোনটীই বিভীষিকার হেতু নহে, বরং এইগুলি জীবের প্রতি দেবীর প্রকৃত দয়ার নিদর্শন। জীবকে অভয়দান ও যে যাহা চাহে উহা দান করা বিরাট প্রকৃতির আর দুইটি কর্ম্ম। উক্ত যাবতীয় কারণে কোন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সমাজের কালীমূর্ত্তিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা—অকর্ম্ম বা কুকর্ম্মবাচ্য। এই প্রকার চালচলনের জন্য তাঁহারা আপনাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন ও তৎসঙ্গে সমাজের ও দেশের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে—ইহা বুঝা কর্ত্তব্য। তবে মনে হয়, পশু বলিদান প্রথা অবরোধ করিয়া ঈর্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভাদি যাবতীয় পাশব বৃত্তিকে বর্জ্জন করাই হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পঞ্চ-মকার সাধন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাউক। এই সাধনের প্রকৃত তত্ত্ব জিহ্বারূপ মাংসকে তালুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া (যাহা খেচরী মুদ্রা বলিয়া আখ্যাত) ও তৎপরে কোন একটী আসনের সহায়তায়—যথা বদ্ধ পদ্মাসন, অর্দ্ধ পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, গরুড়াসন, সুখাসন প্রভৃতি মনরূপ মৎস্যকে নিরুদ্ধ করিলে মন ক্রমশঃ চৈতন্যময়ী হইয়া জীবদেহস্থিত আত্মার সহিত মৈথুন কর্ম্মে নিরত হয়। এই সম্ভোগ কার্য্য দ্বারা জীব-মস্তিষ্ক হইতে সুধা (মদ্য) স্বরিত হয়। অতঃপর সাধক এই সুধা পান করিয়া অব্যক্ত আনন্দে আপ্লুত হয়েন ও জাগতিক সম্ভোগ সুখকে অতীব ঘৃণ্য প্রতীতি করেন। মানবের পাশবিক বৃত্তির আধিক্যবশতঃ, বা শিক্ষার দোষে বা প্রকৃত শিক্ষকের বা প্রকৃত ছাত্রের অভাবে এই উচ্চতম সাধন-কর্ম্ম হীনতম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই প্রকার সাধক-সাধিকার সংখ্যা এখন দিনের দিন হ্রাস হইতেছে।

সমালোচনায় বিড়ম্বনা।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

আজকাল বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করা এক মহা বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া দিলেই গ্রন্থকারগণ ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমালোচকের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা বাগ্‌বাজারের একজন 'তর্কতীর্থ' পণ্ডিত, তাঁহার এক ছাত্রের নাম দিয়া নব্যন্যায়ের অন্তর্গত "ব্যাপ্তিপঞ্চক" গ্রন্থের 'মাথুরী' টীকার বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের সমালোচনায় দেখাইয়াছিলাম যে, এই অনুবাদের প্রতি পৃষ্ঠা অশুদ্ধি-দোষে কলঙ্কিত। তর্কতীর্থ মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমালোচনার এক প্রতিবাদাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদাভাস তিনি নিজের নামে ছাপেন নাই—তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতষ্পুত্রকে 'উপাধ্যায়' সাজাইয়া প্রতিবাদটী তাঁহার নামে প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনার একটা কথারও প্রকৃত প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় আমাদিগকে কেবল গালাগালি করিয়াছেন। আমরা গালাগালিতে তত দুঃখিত হই নাই, কিন্তু প্রতিবাদকারী 'তর্কতীর্থ' উপাধিধারী হইয়াও যে এত ঘোর অশুদ্ধ কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিয়াছেন, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।

"ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।"

অনুবাদক "নব্যগণের মত এই যে—" এই ভাবে উপক্রম করিয়া "ভাব-পদার্থের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে"—এইরূপ লিখিয়াছেন। আমরা এই কথারই প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, নব্য নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের নানা গ্রন্থে ভাবপদার্থের অভাবাভাবকে প্রতিযোগীর স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন ; এমন কি, নব্য নৈয়ায়িক চূড়ামণি রঘুনাথ, "সিদ্ধান্ত লক্ষণে"র দীধিতির শেষে "অভাবত্বঞ্চেদমিহ নাস্তীদমিদং ন ভবতীতি প্রতীতি-সাক্ষিকো ভাবাভাবসাধারণঃ স্বরূপ সম্বন্ধ বিশেষঃ"—এই গ্রন্থাংশে অভাবত্ব যে ভাবাভাবসাধারণ, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ মথুরানাথ ও জগদীশও যে অভাবাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ স্বীকার করেন,

তাঁহাদের গ্রন্থসন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও দেখাইয়াছিলাম। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, এই সকল গ্রন্থাংশের কোনওরূপ মীমাংসা করিতে না পারিয়া অল্প দিন হইল "ভাষাপরিচ্ছেদে"র পরিবর্ত্তে যে অপ্রচলিত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নব্যন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে, সেই 'দীপিকা' হইতে এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অভাবাভাবোঽতিরিক্ত এব···ইতি নবীনাঃ।"

রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ-প্রমুখ নব্য নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠগণের লেখা কি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত 'দীপিকা'র কথায় উড়িয়া যাইবে? প্রতিবাদীর যদি ক্ষমতা থাকে, তবে উভয় লেখার সামঞ্জস্য রক্ষা করুন না! তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন,—আমাদের কাছে ত আর শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে আসিবেন না, আসিলে উক্ত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তদ্বয়ের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতাম। সংক্ষেপে এই স্থানে কিঞ্চিৎ লিখিলাম, বুদ্ধি থাকে ত বুঝিয়া লইবেন।

রঘুনাথ শিরোমণি, তাঁহার স্বাধীন গ্রন্থ "পদার্থখণ্ডনে" অভাবাভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লাঘবতঃই এই গ্রন্থে অভাবাভাবকে অতিরিক্ত বলিয়াছেন,—অভাবত্ববুদ্ধির প্রমাত্ব রক্ষা ইহার হেতু নহে। "পদার্থখণ্ডনে"র টীকায় রঘুদেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"ন চ ভাবাভাবসাধারণমভাবত্বমখণ্ডোপাধিরিত্যুক্তৌ নায়ং দোষ ইতি বাচ্যম্ এবং সতি লাঘবাদেব ঘটাভাবাভাবস্যাতিরিক্তত্বসিদ্ধেঃ।" (৫৫ পৃঃ)

এই জন্যই রঘুনাথ, "বিশেষব্যাপ্তি"র 'দীধিতি'তে—"ন হি ঘটভিন্নভেদো ঘটত্বাদতিরিচ্যতে, আবশ্যকক্লৃপ্তঘটত্বেনৈবোপপত্তৌ অতিরিক্ত কল্পনায়াং মানাভাবাৎ" (চৌং সং ৩১২ পৃঃ)—ইত্যাদি সন্দর্ভে ঘটত্বাদি অনুগত পদার্থের অভাবাভাবকে অতিরিক্ত না বলিয়া লাঘবতঃ অবশ্যক্লৃপ্ত ঘটত্বাদির স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। জগদীশও 'নব্যাস্ত' কল্পেই লিখিয়াছেন, "হিমাবৃত্তেরভাবত্বস্য ভাবইবাভাবেঽপি মত্বাৎ।" (চৌং সং ৩২৭ পৃঃ)

প্রতিবাদী এখন বিরুদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের মর্ম্ম বুঝিলেন কি? প্রচলিত গ্রন্থে এই সকল মতবাদ স্পষ্ট নিবদ্ধ থাকিলেও প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, কেমন করিয়া অধ্যাপনা করিলেন যে, নব্য নৈয়ায়িকেরা অভাবাভাবকে অতিরিক্ত বলেন, আর প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা প্রতিযোগীর স্বরূপ বলেন! তার পর প্রতিবাদকারী আর এক কথাও শিখিয়া রাখুন, অভাবাভাব যে অতিরিক্ত, ইহা প্রাচীনেরাও বলিতেন। মথুরানাথ, "ব্যাপ্তিপঞ্চকে"র দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"অভাবাভাবস্যাতিরিক্তত্বমতেন এতল্লক্ষণকরণাৎ।" অভাবাভাবের অতি-

রিক্তামতে এই লক্ষণ করা হইয়াছে। ব্যাপ্তিপঞ্চকের লক্ষণকার অবশ্য নব্য নহেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক, 'ন্যায়লীলাবতী'কার বল্লভাচার্য্যও অভাবাভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করিতেন।

"লীলাবতীকারাস্তু অভাবত্বধিয়ঃ প্রমাত্বানুরোধেনাভাবাভাবোঽতিরিক্ত এব। ন চানাবস্থা ঘটাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিকস্যাত্যন্তাভাবস্যাভাবো ঘটাত্যন্তাভাবানতিরিক্ত ইত্যাহুঃ।"—(পদার্থরত্নমালা, ২৪ পৃঃ)

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ মহাশয়ের অবশ্য এই সকল সূক্ষ্ম সন্ধান রাখা সম্ভবপর নহে। কেন না, তিনি মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে "যৎ পঠিতং তদ্‌গুরবে সমর্পিতম্" করিয়াই পাথুরিয়াঘাটায় পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন।

তর্কতীর্থ, মূলের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, "অনুমিতি-হেতু" পদের অর্থ— অনুমান যে প্রমাণ, তাহার যে অনুমিতি, তাহার হেতু, অর্থাৎ কারণ।" (২৩ পৃঃ)

আমরা এই অংশের সমালোচনায় বলিয়াছিলাম, "অনুমানে বর্ত্তমান যে প্রামাণ্য, সেই প্রামাণ্যের অনুমিতির হেতুই এখানে 'অনুমিতি-হেতু' পদের অর্থ।" ইত্যাদি।

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, ইহার কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া কেবল নিরর্থক চীৎকার করিয়াছেন যে, "* * * অনুমান যে প্রমাণ সেই অনুমিতি এইরূপ লিখিয়াছেন। শাস্ত্রীজী এখানে কোনও দোষ না পাইয়া কেবল উপদেশ দিয়াছেন যে, * * *। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যেমন কাকের অর্থ বায়স, বৃক্ষের অর্থ মহীরুহ, এইরূপ অনুবাদ না হইলে শাস্ত্রীর মতে ভাল হয় না।"

পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমরা অনুবাদের যে দোষ দেখাইয়াছিলাম, বাগাড়ম্বর ভিন্ন এই প্রতিবাদে তাহার কোন্ কথাটার উত্তর আছে। মথুরানাথ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'অনুমিতি-হেতু' পদের অর্থ অনুমাননিষ্ঠপ্রামাণ্যানুমিতি-হেতু, আর অভিনব পণ্ডিতেরা অনুবাদ করিলেন,—প্রমাণের অনুমিতি। তার পর—"অনুমানের প্রমাণের যে হেতু, তাহার কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান" (২৬ পৃঃ)—এইরূপ অনুবাদ কি উন্মত্ত-প্রলাপ নহে? মূল অনুবাদে ছাপা আছে, "অনুমান যে প্রমাণ, তাহার যে অনুমিতি"; এই দোষ উদ্ধার করিবার প্রত্যবায়ে প্রতিবাদী উল্টাইয়া লিখিয়াছেন, "অনুমান যে প্রমাণ সেই অনুমিতি"। এই পরিবর্ত্তনে প্রতিবাদীর বিদ্যা আরও প্রকটিত হইয়াছে।

উক্ত পরিবর্ত্তিত অংশের যে কোনও অর্থই হয় না! প্রতিবাদী, 'তর্কতীর্থ' উপাধি-মণ্ডিত, এইরূপ ঘোর অশুদ্ধ কথার প্রচার করিতে তাঁহার একটু লজ্জাও করিল না?

'ব্যাপ্তিজ্ঞান' লিখিতে 'জ্ঞান' পদটী পতিত হইয়াছে, 'ঘটত্বং নাস্তি' স্থলে 'ঘটো নাস্তি' ছাপার ভুল, ইহা বলিয়া প্রতিবাদী আর কত দোষ ঢাকিবেন? প্রতিবাদকারী, আমাদের প্রকাশিত সমালোচনার প্রুফ দেখিবার যে ভুল ধরিয়াছেন, সে ভুল পণ্ডিতেরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করিবেন না। 'জন্য মূর্ত্ত' স্থলে 'অন্য মূর্ত্ত' যে মুদ্রাকর-প্রমাদ, ইহা বালকেও বুঝে। কিন্তু 'ঘটত্বং নাস্তি' স্থলে যে কম্পোজিটার 'ঘটো নাস্তি' কম্পোজ করিতে পারে, তাহার ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আছে, বলিতে হইবে।

ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদের বক্তা তর্কতীর্থ, সংসর্গাভাবকে সংসর্গারোপ-জন্য প্রতীতি বিষয় অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই নির্দ্দেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, রঘুনাথ, জগদীশ-প্রমুখ তার্কিকগণের মতে ভেদ-ভিন্নাভাবত্বই সংসর্গাভাবের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। প্রতিবাদী ইহার কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া কাঁদুনী সুরে গাহিয়াছেন,—

"প্রত্যেক কথার (?) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে যে মহাভারত অপেক্ষাও বড় গ্রন্থ হইয়া পরে (?)"

তর্কতীর্থ মহাশয় রাশি রাশি অশুদ্ধ কথা লিখাইয়া পুস্তক পূর্ণ করিতে পারিলেন, আর শুদ্ধ কথাটা লিখিলেই বুঝি মহাভারত হইয়া পড়িত?

তর্কতীর্থ উপদেশ করিয়াছেন,—"কারণতা ও কার্য্যতা, যাহা কারণ ও কার্য্য, তাহার স্বরূপ হয়, সুতরাং পরমাণু পরিমাণ ভিন্ন সপ্ত পদার্থই হয়।" আমরা এই ঘোর অশুদ্ধ কথার খণ্ডন করায় প্রতিবাদী তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—

"* * * কার্য্যতা বা কারণতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসেন নাই, মোটামুটী সাধারণ ভাবে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এইরূপই লিখিয়াছেন।"

নব্যন্যায়ের সর্ব্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ বলিয়া ত প্রতিবাদীর দল খুব বিজ্ঞাপন জাহির করিয়াছেন। এইরূপ অশুদ্ধ কথার প্রচারই বুঝি সেই বিজ্ঞাপনের ফল? তর্কতীর্থ মহাশয়কে ত কেহ মাথার দিব্য দেয় নাই,—"ওগো, তুমি নব্যন্যায়ের বঙ্গানুবাদ কর।" যদি প্রকৃত সিদ্ধান্ত গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে বৃথা এ বিড়ম্বনা কেন? "ঘটং ভিন্দ্যাৎ পটং ছিন্দ্যাৎ—" এ উপায়েও ত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়! ব্যর্থ যশের প্রত্যাশায় বঙ্গরাণীর অঙ্গ

কলঙ্কিত করা কেন? এই আবর্জ্জনাপূর্ণ অনুবাদ অপেক্ষা নব্যন্যায়ের অনুবাদ না হওয়া ভাল ছিল। "বরং শূন্যা শালা ন চ খলু পুনর্দুষ্টবৃষভঃ।"

জগদীশের ন্যূনতা পরিহারের উদ্দেশে অনুবাদক বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছাদির অসমবায়ী কারণ নাই। আমরা ইহার সমালোচনায় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, বুদ্ধি প্রভৃতির অসমবায়ী কারণ, আত্মমনঃসংযোগ। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, ইহার উত্তরে বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াছেন যে,—

"প্রাচীনগণ আত্মমনঃসংযোগকেও জ্ঞানাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণই বলিয়া থাকেন, অসমবায়ী কারণের নাশে কার্য্যনাশ হয় বলিয়া অসমবায়ী কারণ বলেন না। * * * প্রাচীন মতানুসারে লিখিয়াছেন। সমালোচক ইহা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি? ন্যায়শাস্ত্রের প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ একটা না একটা মত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিতে হয়, ইহা সকল নৈয়ায়িকই জানেন। শাস্ত্রীজীর প্রদর্শিত শঙ্করমিশ্রাদির বাক্যগুলি যে নব্য মতসিদ্ধ তাহা কে না জানে?"

প্রাচীনের দোহাই দিয়া কেবল ধাপ্পা দিলেই ত হয় না,—প্রতিবাদী কোনও প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের লিপি উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন কি, প্রাচীনেরা আত্মমনঃসংযোগকে জ্ঞানাদির নিমিত্ত কারণ বলিতেন? আর প্রতিবাদী তর্কতীর্থ যে বলিয়াছেন, কার্য্যনাশের প্রতি অসমবায়ী কারণের নাশ কারণ, ইহা ঘোর অশুদ্ধ কথা। অসমবায়ী কারণের নাশ হইলেই যদি কার্য্যের নাশ হয়, তাহা হইলে শ্যেনের ক্রিয়ানাশের পর শ্যেনশৈলের সংযোগ নষ্ট হয় না কেন? শ্যেনশৈল-সংযোগের প্রতি ত শ্যেনের ক্রিয়াই অসমবায়ী কারণ। তার পর প্রতিবাদীর মতে জ্ঞানাদির নাশই বা হয় কেমন করিয়া? জ্ঞানাদির যখন অসমবায়ী কারণ নাই, তখন তাহার নাশও নাই। তাঁহার সিদ্ধান্তানুসারে ত কার্য্যনাশের প্রতি অসমবায়ী কারণের নাশই কারণ। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ শিখিয়া রাখিবেন, অসমবায়ী কারণের নাশ, কার্য্যমাত্র নাশের প্রতি কারণ নহে,—দ্রব্যনাশের প্রতিই কারণ। রঘুনাথ শিরোমণি "পদার্থতত্ত্বনিরূপণে" স্পষ্টই লিখিয়াছেন —

"দ্রব্যনাশে চ সর্ব্বত্রাসমবায়িকারণনাশ এব কারণম্ নিত্যসমবেতদ্রব্যনাশে ক্লৃপ্তত্বাৎ।"—(৩৯ পৃঃ)

প্রতিবাদীর প্রধান অবলম্বন "তর্কসংগ্রহ দীপিকা"তেও লেখা আছে,—

"সর্ব্বত্র অসমবায়িকারণনাশাদ্ দ্রব্যনাশঃ"—

(নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের ৪০ পৃঃ)

"মুক্তাবলী প্রকাশ" মহাদেবভট্টও লিখিয়াছেন,—

"অসমবায়িকারণনাশস্য দ্রব্যনাশজনকত্বাৎ।"—(১০৪ পৃঃ) ন্যায়শাস্ত্রের এই সকল সাধারণ কথা না জানিয়াও যাহারা নিজেকে 'তর্কতীর্থ'রূপে বিজ্ঞাপিত করিতে চায়, তাহাদের সাহস ও ধৃষ্টতাকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশকৃত "তর্কামৃতে"র অনুবাদাবসরে প্রাচীন মত অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাও এক হাসির কথা। মানিলাম, শঙ্করমিশ্র নব্য, কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীধরাচার্য্যও কি নব্য নৈয়ায়িক? তিনি যে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"সুখাদীনাং সমবায়িকারণমাত্মা তত্র সমবায়াদাত্মমনঃসংযোগস্তেষামসমবায়িকারণম্।"—(১০১ পৃঃ)

ব্যাধিকরণের ১৪টী লক্ষণই যে শিরোমণিকৃত বলিতে চায়, তাহার বিদ্যার দৌড় কতদূর, তাহা পণ্ডিতেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

'বিশেষে'র লক্ষণে 'অন্ত্য' শব্দের কোনও ব্যাখ্যা না থাকায় আমরা ত্রুটী দেখাইয়াছিলাম। নির্লজ্জ প্রতিবাদী ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—

"অন্ত্য শব্দের অর্থ যে সমালোচকের জানা নাই, তাহা......বুদ্ধিতে আসে নাই।"

সমালোচকের কি কি জানা আছে, না আছে, তাহা নবীন গোতম, তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রকে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিলে বুঝিতে পারিবেন। ব্যাপ্তি-পঞ্চকের এই বঙ্গানুবাদে প্রথম শিক্ষার্থীর মহা উপকার হইবে—এইরূপ সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন ত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদীকেই জিজ্ঞাসা করি, বিশেষের লক্ষণে 'অন্ত্য' শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কি সাধারণের অজ্ঞাত নহে?

ব্যাপ্তিলক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখাইতে গিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় অম্লানবদনে উপদেশ করিয়াছিলেন,—"প্রশস্তপাদভাষ্যে ব্যাপ্তিলক্ষণ নাই। ন্যায়কন্দলীতেও তাহাই।" আমরা বিদ্যাপ্রকাশের এই উপহাসকর চেষ্টা দেখিয়া প্রশস্ত-পাদভাষ্য ও ন্যায়কন্দলীর গ্রন্থসন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের অনুমোদিত ব্যাপ্তি-লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। লজ্জার মাথা খাইয়া প্রতিবাদী ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন, "প্রশস্তপাদের ভাষ্যাদিতে যে ব্যাপ্তিলক্ষণ আছে, তাহা ব্যাপ্তি-নিরূপণ প্রসঙ্গে নহে। ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রসঙ্গে ব্যাপ্তির লক্ষণ করা হয় নাই বলিয়াই ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই বলিয়াছেন।"

নিজের অজ্ঞতা যে বুঝিতে পারে, তাহারও বুদ্ধি আছে বলিতে হইবে—"ন বুধ্যতে ইত্যপি বুদ্ধিসাধ্যম্।" কিন্তু ইহারা ধৃষ্টতার এমনই মৌরসীপাট্টা লইয়া বসিয়াছে যে, ভুল দেখাইয়া দিলেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ব্যাপ্তি-নিরূপণ প্রসঙ্গে যদি ব্যাপ্তিলক্ষণ না থাকে, তবে যে ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রসঙ্গই হয় না। প্রতিবাদী কি 'নিরূপণ' শব্দের অর্থ জানেন না? আমরা প্রশস্ত-পাদভাষ্য ও ন্যায়কন্দলীর যে স্থান উদ্ধৃত করিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণ দেখাইয়াছি, তাহাও ব্যাপ্তিনিরূপণ-প্রসঙ্গ। তার পর যেখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধে অন্যান্য কথা নিবদ্ধ আছে, সেখানেও পূর্ব্বোপদর্শিত অবিনাভাব অর্থাৎ অব্যভিচরিতত্বই ব্যাপ্তিপদার্থ, তাহা কথিত হইয়াছে (১)। সূচীপত্র দেখিয়া কেবল কতকগুলি গ্রন্থের নাম মুখস্থ করিলেই হয় না, গ্রন্থ বুঝিবারও সামর্থ্য থাকা চাই।

"ন্যায়কন্দলী" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ও পরম ব্যুৎপন্ন নৈয়ায়িক ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 'শাস্ত্রার্থসংগ্রহে' স্পষ্ট যখন লেখা আছে, সমবায় স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, তখন "তর্কামৃতে" কেমন করিয়া কালাকাশাদির ন্যায় সমবায়কে অবৃত্তি বলা হইল, ইহা আমরা অনুবাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তর্কতীর্থ, ইহার কোনও উত্তর করিতে পারেন নাই। সম্বন্ধবিশেষে অবৃত্তি হইলেই যদি অবৃত্তি হয়, তাহা হইলে অভাবাদিও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া অবৃত্তি-পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হয় না কেন?

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (১।১।৩)—এই কণাদসূত্রের অশুদ্ধ অনুবাদ করায় আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। এই আপত্তির উত্তরে প্রতিবাদী কতকগুলা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিয়াছেন। "বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে" (৬।১।১)—এই সূত্রে কণাদ নিজে বলিলেন, ঈশ্বরের উচ্চারিত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য, আর নবীন মল্লিনাথ, ব্যাখ্যা করিলেন কি না—ধর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়া বেদ প্রমাণ।

জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট "ন্যায়মঞ্জরী"তে, ও মহাতার্কিক উদয়নাচার্য্য "আত্ম-তত্ত্ববিবেকে" নানা বিচার বিতর্কের পর আপ্ত পরমেশ্বরের প্রণীত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য অবধারণ করিয়াছেন (২)। [ক্রমশঃ।

(১) "সাধ্যাবিনাভূতত্বেন দর্শিতং লিঙ্গং"—(২৪৯ পৃঃ)

"অসিদ্ধাবিনাভাবস্থাদি ভ্রান্ত্যা ব্যাপ্তিবচনং দৃশ্যতে"—(২৫০ পৃঃ)

(২) "তস্মাদাপ্তোক্তত্বাদেব বেদাঃ প্রমাণমিতিসিদ্ধম্।"—ন্যায়মঞ্জরী, ২৫০ পৃঃ।

"তস্মাদ্ বিরুদ্ধাগমব্যুদাসেন বেদাঃ ... পরমেশ্বর প্রণীতত্বাদেব ... প্রমাণমেবেতি নিয়মঃ।"—আত্মতত্ত্ববিবেক, ৯৪ পৃঃ। (৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সংস্করণ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি, এ।]

কি যে এক দুঃসময় পড়িয়াছে, সাধারণতঃ নিরপেক্ষ ভাবে কেহ আলোচ্য গ্রন্থের দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধুতার খাতিরই দেখিতেছি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা শাসিত করে। ফলে অনেক পাঠকই কাঞ্চনভ্রমে কাচ খরিদ করেন। সমালোচকের দায়িত্ব কত অধিক এবং তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহারের ফল কিরূপ বিষময়, তাহা অধিক চিন্তার বিষয় নহে। তথাপি, দলাদলির উপর এখনকার সমালোচনা নির্ভর করে। লেখক সমালোচকের অজানা হইলে অনেকটা নিরপেক্ষতার আশা করা যায় বটে, কিন্তু সমালোচক মহাশয় সেরূপ নবীন লেখকের রচনা লইয়া বিশেষ ভাবে নাড়া চাড়া করিয়া সময় এবং মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে চান না।

বহুদিন পূর্ব্বে 'বান্ধব' মাসিকে একজন লেখক সমালোচনায় কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রচনার ছিদ্রান্বেষণ করাকে তিনি 'মাক্ষিক সমালোচনা' নাম দিয়াছিলেন। 'মক্ষিকাগণ যেরূপ ক্ষত স্থানেরই অন্বেষণ করে, এরূপ সমালোচনাতেও তদ্রূপ দোষের স্থান খুঁজিয়া প্রদর্শন' করা হয়।

সম্প্রতি গত ভাদ্র মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে 'বীরভূম বিবরণ' নামক গ্রন্থখানির একটী 'মাক্ষিক সমালোচনা' বাহির হইয়াছে। সমালোচক এই গ্রন্থের গুণ দেখিতে পান নাই। শুধু তাহাই নহে ; প্রকৃত দোষও তিনি দেখাইতে পারেন নাই। জোর করিয়া দোষ দেখাইতে গিয়া নিজেই কতকগুলা ভুলের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাহারই আমরা পরিচয় দিতেছি।

* *
*

"বীরভূম-বিবরণ" প্রথম খণ্ড—মহারাজ-কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্পাদিত এবং "বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতি" কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা। ইহাতে বীরভূমের কয়েকটী পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'ইহা খাঁটি ইতিহাস নহে, কিন্তু ইতিহাসের অনেক উপকরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই খণ্ডে হেতমপুর, ভদ্রপুর, সুপুর, ভাণ্ডীরবন, বক্রেশ্বর, মঙ্গলডিহি, জোফলাই, কেন্দুবিল্ব ও শ্যামারূপার গড়, এই নয়টী স্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক কথা আছে। এদেশে লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা মা সরস্বতীর সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। কিন্তু মহারাজ কুমার যে ভাবে মা সরস্বতীর সেবা করিতেছেন, এবং এ পুস্তকে যে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে রাঢ়-বঙ্গের ইতিহাসের একাংশ আলোচনা করিয়াছেন। কেন্দুবিল্বের নিকটবর্ত্তী ঢেকুর বা ইছাই ঘোষের শ্যামারূপার গড়ের প্রসঙ্গে সেনভূম সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিবরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভদ্রপুর কাহিনীতে মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা লিখিত হইয়াছে—ঐতিহাসিকেরা তাহাতে লাভবান হইতে পারিবেন। ভদ্রপুর, সুপুর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে গৃহীত দেবমন্দির ও মূর্ত্তির আলোকচিত্র সমূহ রাঢ়ের আনীত শিল্পনৈপুণ্য ও বৌদ্ধ, শাক্ত, প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচায়ক। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসার্হ হইলেও, বীরভূম সম্বন্ধে এখনও অনেক অনুসন্ধান করিবার আছে। আশা করি, ক্রমে ক্রমে সমগ্র বীরভূমের অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া বীরভূমের সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য করিয়া তিনি সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন।

* *
*

শ্যামারূপার গড়ের কাহিনী এ পুস্তকে কেন স্থান পাইয়াছে, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সমালোচক মহাশয় সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। আমাদের মতে কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ "শ্যামারূপার গড়ের" কথা কেন্দুবিল্ব-প্রসঙ্গ হইতে উঠিয়াছে। কেন্দুবিল্বের অনতিদূরেই অজয় নদীর উত্তর তীরে 'লাউসেন তলাউ' বীরভূম জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। 'শ্যামারূপার' গড় জয় করিতে আসিয়া লাউসেন এই স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করেন বলিয়া এই স্থানটি উক্ত নামে বিখ্যাত। সুতরাং "শ্যামারূপার গড়" বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হইলেও, কেন্দুবিল্ব কাহিনীর সহিত তাহার ইতিহাস জড়িত, এবং সে প্রসঙ্গের অবতারণা অবান্তর নহে। কাজেই, সমালোচক মহাশয় এক্ষেত্রে চমকাইয়া উঠিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এমন বলিতে পারি না। তার পর, 'ভদ্রপুর' সম্বন্ধে সমালোচকের আপত্তি যে ইহা পূর্ব্বে

মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং কুঞ্জঘাটার রাজবংশের বিবরণ অবান্তর হইয়াছে। আমরা এ যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করিতে পারিলাম না। ভদ্রপুর যখন বর্ত্তমানে বীরভূমের অন্তর্গত, তখন তাহার পরিচয় এ পুস্তকে অবান্তর হইবে কেন? এবং ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমারের বিবরণীর মধ্যে তাঁহার দৌহিত্র বংশের (কুঞ্জঘাটার রাজবংশের) কথঞ্চিৎ বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা মনে করি না। তার পর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন; "কুঞ্জঘাটার দুর্গানাথকে বলা হইয়াছে—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর। মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্রবংশের পোষ্যপুত্র হইয়াও নন্দকুমারের বংশধর—ইহা নূতন কথা বটে!" বংশধর অর্থে এখানে উত্তরাধিকারী, সমালোচক মহাশয় সেই টুকুই ভুল করিয়াছেন। পোষ্যপুত্র হইলে কি বংশধর হয় না? নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজা কি রাণীভবানীর বংশধর বলিয়া পরিচিত নন? কাশীমবাজারাধিপতি ভাগিনেয় হইলেও কি রাণী স্বর্ণময়ীর 'বংশধর' নন? বাস্তবিক আমরা বিস্মিত হইয়াছি, এই ছেলেমানুষী কাঁচা সমালোচনা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে স্থান পাইয়াছে দেখিয়া! উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচককে কি গুণে প্রশ্রয় দিয়াছেন, বুঝিতে পারি না।

তার পর, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার প্রণীত "হেতমপুর কাহিনী"র উল্লেখ করিয়া ৺মুরলীধর চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিষম ভ্রমাত্মক। কিশোরী বাবু হেতমপুর রাজবংশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত না থাকায় মুরলীধর হইতে আরম্ভ করিয়া তদ্‌বংশ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু কুলগ্রন্থ হইতে এবং বাঁকুড়া জেলায় অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, এই রাজবংশ অতি প্রাচীন এবং মল্লভূমাধিপতির নিকটে মুরলীধরের পিতৃপিতামহের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। মুরলীধর বর্গির হাঙ্গামে এবং তস্করের উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বীরভূম রাজনগরে পলাইয়া আসেন, সুতরাং তাঁহাকে আজন্ম দরিদ্র বলা যায় না। হেতমপুর রাজবংশ তালিকার পাদটীকায় মুরলীধরের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ রুদাই বা রুদ্র সম্বন্ধে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় সন্দিহান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যদি লালমোহন বিদ্যানিধি সঙ্কলিত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" (৩য় সংস্করণ) বিশেষ কাণ্ড ৪৭৮ পৃষ্ঠায় (ছান্দড় বংশ) উল্টাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর হাস্যাস্পদ হইতে হইত না।

'ঋণ করিয়া জমিদারী খরিদ' কার্য্য যতই 'কঠিন' হউক, রাধানাথ সেই

উপায়েই জমিদারীর মালিক হইয়াছিলেন। হেতমপুর রাজবাটীতে রক্ষিত পুরাতন তমসুকগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় ঋণদাতৃগণের নাম ও ঋণের পরিমাণ বিবৃত আছে—সমালোচক মহাশয় কি তাহা লক্ষ্য করেন নাই? লক্ষ্য করিবেনই বা কি করিয়া! নিন্দা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে কি কোনও দিকে লক্ষ্য থাকে?

তার পর, হেতমপুর-গ্রাম প্রতিষ্ঠার সময় লইয়া সমালোচক একটু টিপ্পনী কাটিয়াছেন। ৪৪ বৎসরে—বিশেষতঃ সেই অরাজকতার দিনে বর্গির বা তস্করের উপদ্রবে অথবা মড়কে—একখানি গ্রাম শ্রীহীন হওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং রেনেল সাহেবের মানচিত্রে তাহার নাম না থাকিলেও যে সে সময় এবং তৎপূর্ব্বে সে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না, এমন কথা প্রমাণ হয় না।

তার পর সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন "পুস্তকের পাঠ্য-বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশ হেতমপুরকাহিনী।" আপন জন্মভূমি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অধিক পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁহার স্বগ্রামের যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিবরণীই তাঁহার নিকট আশা করি। রাজবংশের বিবরণ বিস্তৃত হইলেও পুস্তকের সম্পূর্ণতার জন্য তাহা প্রয়োজনীয়। বিদ্বেষের ঠুলি চক্ষে দিলে অনেক জিনিসেই 'বিভীষিকা' জন্মায়—সে বিভীষিকার চিকিৎসা নাই।

* *
*

অপর কোন মাসিকপত্রের সমালোচনা লইয়া আমরা এত কথা বলিতাম না। কিন্তু সমালোচনার ছত্রে ছত্রে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের বাধ্য হইয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইল। গ্রন্থে যে কোনও ত্রুটী নাই এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু সে সব ত্রুটী মারাত্মক নহে। কয়েক বৎসরের চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ গ্রন্থকার যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুরাতত্ত্বের সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ, এবং উৎসাহ লাভের পাত্র। সুতরাং এরূপ গ্রন্থের সমালোচনায় সহানুভূতির প্রয়োজন। দেশের দুর্ভাগ্য, তাই মাসিকপত্রের সমালোচনার স্তম্ভে আজকাল অনুগ্রহ ও নিগ্রহের খেলা ও বিদ্বেষের কসরতের এত আধিক্য।

সাহিত্য-সমাচার।

প্রবাসীর প্রত্যাগমন—(কাব্য)—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, কিন্তু মূল্য কিছু অতিরিক্ত ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তিনি উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা। এই কাব্যখানি তিনি 'নয় বৎসর পূর্ব্বে' রচনা করিয়া এতাবৎ season করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি পরিপক্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির সমন্বয়ে 'রিপুকর্ম্ম' চালাইয়া তিনি এই কাব্যখানি পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। 'মুখবন্ধে' তাঁহার মুরুব্বিয়ানাটুকু উপভোগ্য।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, গত ১০ম বর্ষের অর্চ্চনায় 'কাব্য-কথা'য় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলেও তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—কাব্যের দুইটী উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন। এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার, কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশ স্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত ; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা ; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা কাব্যে স্থান পাইয়াছে ; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, 'যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই' সেই আত্মচিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক্ তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা শোধন বলিয়াছি।"

এই কাব্যখানির গুণের মধ্যে এই যে ইহা আগাগোড়া বুঝা যায় এবং ইহার ভাব সমস্যার জালে বেষ্টিত নহে।

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ।

[লেখক—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ।]

হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রে মাংসের গুণ নির্ণয় প্রসঙ্গে জীবজন্তুর যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিশেষ কৌতুকাবহ হইবে বিবেচনায় আমরা চরকসংহিতা ও বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় হইতে সেই শ্রেণীবিভাগ এস্থলে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

বাগ্‌ভটের শ্রেণীবিভাগই বিশেষরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া আমরা তাহাই প্রধান ভাবে অনুসরণ করিয়া চরকের বিভাগকে উহারই আনুষঙ্গিকরূপে গ্রহণ করিব।

বাগ্‌ভট প্রথমেই 'মৃগ' জাতিকে এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যথা :—

"হরিণৈণ কুরঙ্গর্ষ্য গোকর্ণ মৃগমাতৃকাঃ।
শশ শম্বর চারুষ্ক শরভাদ্যাঃ মৃগাঃ॥"

চরক মৃগজাতির নাম আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

"পৃষতঃ শরভোরামঃ শ্বদংষ্ট্রা মৃগমাতৃকাঃ।
শশোরণৌ কুরঙ্গশ্চ গোকর্ণঃ কোট্টকারকঃ॥
চারুষ্কো হরিণৈণৌচ শম্বরঃ কালপুচ্ছকঃ।
ঋষ্যশ্চ বরপোতশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ জাঙ্গলাঃ মৃগাঃ॥"

জাঙ্গল পশুদিগের নাম যথা—পৃষৎ, শরভ, রাম, শ্বদংষ্ট্রা, মৃগমাতৃকা, শশ, উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ, কোট্টকারক, চারুষ্ক, হরিণ, এণ, শম্বর, কালপুচ্ছক, ঋষ্য এবং বরপোত।

ইহার পর "বিষ্কির" নামক পক্ষিশ্রেণী; যথা :—

"লাববর্ত্তীক বার্ত্তীর রক্তবর্ত্ম ক কুক্কুভাঃ।
কপিঞ্জলোপচক্রাখ্য চকোর কুররাহ্বয়াঃ॥
বর্ত্তকো বর্ত্তিকাচেব তিত্তিরিঃ ক্রকরঃ শিখী।
কুক্কুটো বককঙ্কোচ গোনর্দ্দো গিরিবর্ত্তিকা।
তথা শারপদেন্দ্রাভ বারটাদ্যেশ্চ বিষ্কিরাঃ॥"

"লাব, বটের, বার্ত্তীর, রক্তবর্ত্মক, কুক্কুভ (অর্থাৎ বন্যকুক্কুট যাহার চক্ষুর পাতা রক্তবর্ণ) গৌর তিত্তিরি, চক্রবাক, চকোর, উৎক্রোশ, ভারুই, বর্ত্তিকা (বর্ত্তক ভেদ), তিত্তিরি, ক্রকর, ময়ূর, কুক্কুট, বক, কাঁক, সারসপক্ষী, গিরিবর্ত্তিকা, দাঁড়কাক, ইন্দ্রাভ (কাক বিশেষ) ও হংস, এই সকল পক্ষীকে বিষ্কির কহে।"

তৎপর 'প্রতুদ' নামক পক্ষিশ্রেণী, যথা :—

"জীবঞ্জীবক দাত্যূহ ভৃঙ্গাহ্ব শুকশারিকাঃ।
লট্বা কোকিল হারীত কপোত চটকাদয়ঃ। প্রতুদাঃ॥"

ইহার বিস্তার চরকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে :—

"শতপাত্রো ভৃঙ্গরাজঃ কোযষ্টির্জীবজীবকঃ।
কৈরাতঃ কোকিলো দাত্যূহো গোপপুত্রঃ প্রিয়াত্মজঃ॥
লট্বা লট্টষকো বভ্রুর্বটহা ডিণ্ডিমানকঃ।
জটীদুন্দুভিধাঙ্কোর লোহপৃষ্ঠ কুলিঙ্গকাঃ॥
কপোত শুকশারঙ্গাশ্চিরিটী কঙ্কুযষ্টিকাঃ।
শারিকাঃ কলবিঙ্কশ্চ চটকোঽঙ্গারচূড়কঃ॥
পারাবতঃ পাণ্ডবিক ইত্যুক্তাঃ প্রতুদাঃ দ্বিজাঃ॥"

"'প্রতুদ' পক্ষীদিগের নাম, যথা :—শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোযষ্টি, জীবজীবক, কৈরাত, কোকিল, ডাহুক, গোপপুত্র, প্রিয়াত্মজ, লট্বা (লাট), লট্টষক, বভ্রু, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দুভি, ধাঙ্কোর, লোহপৃষ্ঠ, কুলিঙ্গক, কপোত, শুক, সারঙ্গ, চিরিটী, কঙ্কু, যষ্টিকা, শারিকা, কলবিঙ্ক, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত এবং পাণ্ডবিক।"

চতুর্থ শ্রেণী 'বিলেশয়' নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা :—

"ভেক গোধাহি শ্বাবিদাদ্যা বিলেশয়াঃ॥"

চরক এই শ্রেণীর নাম 'ভূমিশয়' দিয়া, এই শ্রেণীর জন্তুদিগের এই সকল নাম উল্লেখ করিয়াছেন :—

"শ্বেতঃ শ্যামশ্চিত্রপৃষ্ঠঃ কালকঃ কাকুলীমৃগঃ॥
কূচিকা চিল্লিটো ভেকো গোধা শল্লক গণ্ডকৌ।
কদলীনকুলঃ শ্বাবিদিতি ভূমিশয়াঃ স্মৃতাঃ॥"

"শ্বেতবর্ণ, শ্যামবর্ণ, বিচিত্র বর্ণযুক্ত মৃগ, কৃষ্ণমৃগ, কাকুলীমৃগ, কুচিক অর্থাৎ কুঁচে, চিল্লক, ভেক, গোধা অর্থাৎ গোসাপ, শল্লক, গণ্ডক, কদলী অর্থাৎ হরিণ বিশেষ, নকুল ও শ্বাবিৎ এই সকল জন্তুকে ভূমিশয় বলে।"

পঞ্চম শ্রেণী 'প্রসহ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা :—

"গোখরাশ্বতরোষ্ট্রাশ্ব দ্বীপি সিংহর্ক্ষবানরাঃ।
মার্জ্জার মূষিক ব্যাঘ্র বৃকবভ্রু তরক্ষবঃ।
লোপাক জম্বুক শ্যেন চাষবান্তাদ বায়সাঃ।
শশঘ্নী ভাস কুরর গৃধ্রোলূক কুলিঙ্গকাঃ।
ধূমিকা মধুহাচেতি প্রসহা মৃগপক্ষিণঃ॥"

"গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, ঘোটক, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, ইন্দুর, ব্যাঘ্র, নেকড়িয়া বাঘ, বেজী, তরক্ষু, খ্যাঁকশিয়ালী, শৃগাল, শ্যেন অর্থাৎ বাজপক্ষী, নীলকণ্ঠ, কুক্কুর, কাক, হাঁড়িয়া বাজ, ভাস (শিখাবিশিষ্ট গৃধিণী), ক্রকণপক্ষী, গৃধ্র, পেচক, কালচটক, ফিঙ্গা ও পাপিয়া, এই সকল মৃগ ও পক্ষীকে 'প্রসহ' কহে।"

ষষ্ঠ শ্রেণী 'মহামৃগ' নামে কথিত হইয়াছে, যথা :—

"বরাহ মহিষান্যঙ্কুরুরু রোহিত বারণাঃ।
সৃমরশ্চমরঃ খড়্গী গবয়শ্চ মহামৃগাঃ॥"

"বরাহ, মহিষ, ন্যঙ্কু, রুরুনামক হরিণ, রোহিত (লালবর্ণ হরিণ), হস্তী, সৃমর (ঘোটকাকার হরিণ), চমর (যাহার চুলে চামর হয়), গণ্ডার ও গবয় ইহাদিগকে 'মহামৃগ' বলে।

সপ্তম শ্রেণী 'জলচর' পক্ষীর শ্রেণী, যথা :—

"হংস সারস কাদম্ব বক কারণ্ডবপ্লবাঃ।
বলাকোৎক্রোশ চক্রাহ্ব মদ্গু ক্রৌঞ্চাদয়োঽপ্চরাঃ॥"

চরকে ইহাদের সবিস্তার পরিসংখ্যা এইরূপ :—

"বক্ষ্যন্তেবারিচারিণঃ।
হংসঃক্রৌঞ্চো বলাকাচ বকঃ কারণ্ডবঃপ্লবঃ।
শরারী পুষ্করাহ্বশ্চ কেশরী মানতুণ্ডিকঃ॥
মৃণাল কণ্ঠো মদ্গুশ্চ কাদম্বঃ কাকতুণ্ডকঃ।
উৎক্রোশঃ পুণ্ডরীকাক্ষো মেঘরাবোঽম্বুকুক্কুটী॥
আরানন্দীমুখী বাটী সুমুখাঃ সহচারিণঃ।
রোহিণী কামকালীচ সারসো রক্ত শীর্ষকঃ।
চক্রবাকস্তথাচান্যে খগাঃ সন্ত্যম্বুচারিণঃ॥"

"জলচর পক্ষীদিগের নাম, যথা—হংস, ক্রৌঞ্চ, বলাকা, বক, কারণ্ডব, অর্থাৎ খড়হাঁস, প্লব অর্থাৎ পানকৌড়ী, শরারি, পুষ্করাহ্ব অর্থাৎ সারসপক্ষী, কেশরী, মানতুণ্ডিক, মৃণালকণ্ঠ, মদ্গু, কাদম্ব, কাকতুণ্ড, উৎক্রোশ, পুণ্ডরীকাক্ষ,

মেঘরাব, জলকুক্কুটী, আরা, নন্দীমুখী, বাটী, সুমুখা, সহচরী, রোহিণী, কামকালী, সারস, রক্তশীর্ষক এবং চক্রবাক প্রভৃতি।”

অষ্টম শ্রেণী ‘মৎস্য’ শ্রেণী, যথা :—

"মৎস্যারোহিত পাঠীন কূর্ম্ম কুম্ভীর কর্কটাঃ।
শুক্তি শঙ্খোদ্র শম্বুক শফরী বর্ম্মিচন্দ্রিকাঃ॥
চুলূকী নক্র মকর শিশুমার তিমিঙ্গিলাঃ।
রাজী চিলিচিমাদ্যাশ্চ মাংসমিত্যাহুবষ্টধা॥"

"রুইমাছ, হাঙ্গর, কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাঁকড়া, ঝিণুক, শঙ্খ, উদ্বিড়াল, শামুক, পুঁটীমাছ, বাঁইন, চাঁদা, চুলূকী, নক্র (কুম্ভীর বিশেষ—ঘড়িয়াল), মকর, শুশুক, রাজী (সামুদ্র মৎস্য) ও চিলিচিমাদি, ইহারা জলোদ্ভবত্বহেতু মৎস্যজাতি। শাস্ত্রকারেরা মৃগ হইতে মৎস্য পর্য্যন্ত এই আট প্রকারকে মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।”

এই অষ্ট শ্রেণী আবার ‘জাঙ্গল’, ‘আনূপ’ ও ‘সাধারণ’ এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা :—

"আদ্যন্তা জাঙ্গলানূপা মধ্যৌ সাধারণৌ স্মৃতৌ॥"

"উপরি উক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে আদ্য তিনটী (মৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ) ‘জাঙ্গল’, অন্ত্য তিনটী (মহামৃগ, জলচর ও মৎস্যবর্গ) আনূপ এবং মধ্য দুইটী (বিলেশয় ও প্রসহ) উভয়চর নামে অভিহিত।”

এই বিভাগত্রয়ের নামানুসারেই ‘স্থলচর’, ‘জলচর’ ও ‘উভয়চর’ এই সাধারণ ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে।

জীব জন্তুর প্রাগুক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাকরণের অতীব সুন্দর ব্যাখ্যা ‘চরক সংহিতা’য় এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"প্রসহ্যভক্ষয়ন্ত্যেতে প্রসহাস্তেন সংজ্ঞিতাঃ।
ভূশয়া বিলশায়িত্বাদানূপোঽনূপসংশ্রয়াৎ॥
জলেনিবাসাজ্জলজা জলচর্য্যাজ্জলেচরাঃ।
স্থলজা জাঙ্গলাঃ প্রোক্তা মৃগা জঙ্গল চারিণঃ॥
বিকীর্য্য বিষ্কিরাচৈব প্রতুদ্য প্রতুদাস্তথা।
যোনিরষ্টবিধাত্বেষাং মাংসানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

"যে সকল পশু ও পক্ষী জন্তুদিগকে সহসা বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে ‘প্রসহ’ বলে। গর্ত্ত মধ্যে যে সমুদায় পশু ও পক্ষী বাস করে, তাহাদিগকে ‘ভূমিশয়’ বলে। জলার নিকট যে সমস্ত জন্তু বাস করে,

তাহাদিগকে 'আনূপ' জন্তু বলে। জলে বাস নিবন্ধন বিশেষ বিশেষ জন্তুকে 'জলজ' জন্তু কহে। যে সমুদায় প্রাণী জলে বিচরণ করে, তাহারা 'জলেচর'। যে সমস্ত জন্তু জঙ্গলে বাস করে, তাহারা 'জাঙ্গল' জন্তু নামে অভিহিত হয়। আর যে সমস্ত প্রাণী পদদ্বারা আহার্য্য দ্রব্য—সমুদায় বিক্ষেপ করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে 'বিষ্কির' জন্তু কহিয়া থাকে। আর যে সমস্ত প্রাণী আহারীয় দ্রব্য সমূহ ঠোঁট দিয়া খুঁটিয়া খায় তাহারা 'প্রতুদ' জন্তু নামে কথিত হইয়া থাকে। মাংস সকলের উৎপত্তি স্থান এই অষ্টবিধ উল্লিখিত হইল।"

ইহাদের মাংসের গুণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"প্রসহাভূশয়ানূপ বারিজা বারিচারিণঃ।
গুরূষ্ণ স্নিগ্ধমধুরা বলোপচয়বৰ্দ্ধনাঃ॥
বৃষ্যাঃপরং বাতহরাঃ কফপিত্তবিবৰ্দ্ধনাঃ।
হিতা ব্যায়ামনিত্যেভ্যোনরা দীপ্তাগ্নয়শ্চযে॥
প্রসহানাং বিশেষেণ মাংসং মাংসাশিনাং ভিষক্।
জীর্ণার্শোগ্রহণী দোষশোষার্ত্তানাং প্রযোজয়েৎ॥"

"এই আট প্রকার পশু পক্ষীর মাংসের মধ্যে প্রসহ, ভূশয়, আনূপ, জলজ, ও জলচর প্রাণিগণের মাংস গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বল ও পুষ্টিবৰ্দ্ধক, শুক্রবৰ্দ্ধক, অত্যন্ত বায়ুনাশক, কফ ও পিত্ত বৃদ্ধিকারক, এবং যাহারা নিত্য ব্যায়াম বা পরিশ্রম করে, অথবা যাহাদের জঠরাগ্নির বিলক্ষণ দীপ্তি আছে, তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। মাংসাশি প্রসহ প্রাণীর মাংস, জীর্ণরোগ-পীড়িত, অর্শ রোগী, গ্রহণী ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।"

"লাবাদ্যো বৈষ্কিরোবর্গঃ প্রতুদা জাঙ্গলামৃগাঃ।
লঘবঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া হিতা নৃণাম্॥
পিত্তোত্তরে বাতমধ্যে সন্নিবাতে কফানুগে॥
বিষ্কিরা বৰ্ত্তকাদ্যাস্তু প্রসহাল্লান্তরা গুণৈঃ॥"—চরক সংহিতা।

"লাব প্রভৃতি বিষ্কির জাতীয় জন্তুর, প্রতুদ জন্তুসমূহের এবং জাঙ্গল পশুগণের মাংস লঘু, শীতল, মধুর ও কষায়-রস বিশিষ্ট। এই সকল জন্তুর মাংস পিত্ত প্রধান, বায়ুমধ্যম, এবং কফানুগ সন্নিপাতে বিশেষ উপকারী। বিষ্কির ও বৰ্ত্তকাদি জন্তুগণের মাংস প্রসহ প্রাণিগণের মাংস অপেক্ষা গুণবিষয়ে অল্পই বিভিন্ন।"

"গুরূষ্ণ স্নিগ্ধমধুরা বর্গাশ্চাতোযথোত্তরম্।
মূত্রশুক্রকৃতো বল্যা বাতঘ্নাঃ কফপিত্তলাঃ॥"—বাগ্ভট।

"ইহার পর হইতে বিলেশয়াদি যে পাঁচটী বর্গ আছে, তাহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর গুরু, স্নিগ্ধ ও মধুর রসবিশিষ্ট, অধিকতর মূত্র, শুক্র ও বলকারক, অধিকতর বাতঘ্ন এবং অতিশয় কফ ও পিত্তবর্দ্ধক"। অর্থাৎ বিলেশয় বর্গ অপেক্ষা প্রসহবর্গ অধিক পরিমাণে গুরু, মধুর ও স্নিগ্ধাদি গুণবিশিষ্ট, প্রসহবর্গ অপেক্ষা মহামৃগ অধিক পরিমাণে উপরি উক্ত গুণবিশিষ্ট ইত্যাদি।"

"শীতা মহামৃগাস্তেষু ক্রব্যাদাঃ প্রসহাঃ পুনঃ।
লবণানুরসাঃ পাকে কটুকা মাংসবর্দ্ধনাঃ।
জীর্ণার্শো গ্রহণী-দোষ শোষার্ত্তানাং পরং হিতাঃ।"—বাগ্‌ভট।

"উক্ত বর্গ সকলের মধ্যে মহামৃগ (বরাহাদি) শীতবীর্য্য। প্রসহগণ মধ্যে ক্রব্যাদ সকল (যাহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে, যথা মার্জ্জার, গৃধ্র, পেচক প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ লবণ রস, কটুপাক ও অতিশয় মাংসবর্দ্ধক। ইহারা জরা, অর্শঃ, গ্রহণী ও যক্ষ্মারোগে বিশেষ হিতকর।"

জন্তুদিগের অষ্ট প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইতে মেষ ও ছাগ পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে :—

"যোনিদ্বয়চারী ব্যামিশ্র গোচরত্বাদনিশ্চিতে।"—বাগ্‌ভট।

"ছাগল ভেড়ার আবাস স্থানের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন উহাদিগকে উক্ত প্রকার বর্গের মধ্যে স্থির করা যায় না। যেহেতু ছাগল ও ভেড়া জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশেই বাস করে।"

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা হইতে জীবজন্তুদিগের আহার বিহার আবাস প্রভৃতি যেমন হিন্দুদিগের সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণের বিষয় হইয়াছিল—ইহাদিগের মাংস পর্য্যন্তও যে তেমনই সবিশেষ পরীক্ষার বিষয় হইয়াছিল এবং এই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবেই যে জীবজন্তুদিগের শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়াছিল; তাহার বিশেষ প্রমাণই আমরা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি।

সমালোচনায় বিড়ম্বনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

শঙ্করমিশ্র "যদ্বা—" বলিয়া যে ব্যাখ্যা কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যায় যে তাঁহার আস্থা নাই, ইহা বৈশেষিক দর্শনের সর্ব্বশেষে পুনরভিহিত

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্মিতি" (১০।২।৯)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা দেখিলেই জানিতে পারা যায়।

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ লিখিয়াছেন—"বরং শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদিষ্ট 'ঈশ্বরোচ্চরিতত্ব প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য বলিলেই অন্যোন্যাশ্রয় হয়। কারণ ইহাতে বেদবোধিত বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি হয় এবং সেই ঈশ্বর বাক্য বলিয়া বেদেরই প্রামাণ্য স্থির হয়। অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিয়া এ দোষ নিবারণ করিতে যাইলে ব্যভিচার হয়। কারণ ঈশ্বরাবতার বুদ্ধ বাক্যও তাহা হইলে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলে জৈন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অনাস্তিক পদবাচ্য হইতেন না।"

'তর্কতীর্থ'রূপে পরিচয় দিয়াও যে প্রতিবাদী এমন ঘোর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিলেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। ঈশ্বরোচ্চরিতত্ব প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য অবধারণ করিলে অন্যোন্যাশ্রয় হয়, এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যে অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারে, তাহাকে—"অয়ং গৌরবিতো মহান্" বলিয়াই অভিনন্দিত করা উচিত। তর্কতীর্থ মহাশয় যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, নিত্য নির্দ্দোষত্বরূপে বেদের প্রামাণ্যবাদী মীমাংসকেরা অনেক দিন পূর্ব্বে নৈয়ায়িকদিগের নিকটে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিল।—

"বেদাৎ কর্ত্তৃবোধে তু স্পষ্টমন্যোন্যসংশ্রয়ম্।
ততো বেদপ্রমাণত্বং বেদাৎ কর্ত্তুশ্চ নিশ্চয়ঃ॥"

কিন্তু "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট যে এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিয়াছেন, প্রতিবাদী তর্কতীর্থের এই বৃদ্ধ বয়সেও কি তাহা জানিবার সুযোগ হয় নাই? জয়ন্তভট্ট সমাধান করিয়াছেন;—"যদপীতরেতরাশ্রয়মভাষি পুরুষোক্তে বেদে প্রামাণ্যং বেদপ্রামাণ্যাৎ পুরুষসিদ্ধিরিতি তদপি ন সম্যক্, পূর্ব্বং পরিহৃতত্বাৎ। অনুমানাৎ প্রসিদ্ধে কর্ত্তরি বেদবাক্যৈস্তৎ প্রতীতেরুপোদ্বলনমিষ্যতে ন ত্বাগমৈকশরণ এব কর্ত্তৃবগমঃ।"—(ন্যায়মঞ্জরী, ২৩৮ পৃঃ)

"ঈশ্বরোচ্চরিত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য এবং বেদের প্রামাণ্য প্রযুক্ত ঈশ্বরসিদ্ধি—এইরূপে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছ, তাহা ঠিক নহে। কেন না, অনুমান প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ হন, তথাপি বেদবাক্য দেখাইয়া সেই সিদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করা হয়,—একমাত্র বেদই ঈশ্বর সিদ্ধির প্রমাণ নহে।"

"মুক্তাবলীপ্রকাশে" মহাদেব ভট্টও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১)।

(১) "এবঞ্চোক্তানুমানেনেশ্বরসিদ্ধৌ তদুচ্চরিতত্বেন বেদস্য প্রামাণ্যনিশ্চয়াদ্ বেদোহপীশ্বরে প্রমাণম্।"—মুক্তাবলীপ্রকাশ, ৩৬ পৃঃ।

তার পর প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিলে ব্যভিচার হয়, ইহা সত্যই হাসির কথা। বেদে ঈশ্বরের পরিচয় থাকিলেও যে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইবে, আজ পর্য্যন্ত কি এ কথা তর্কতীর্থের শ্রুতিপথেরও পথিক হয় নাই?

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" ইত্যাদি বেদবাক্যে ব্রহ্মের পরিচয় থাকিলেও ইহাতে নিঃসংশয়রূপে ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারিত হইতে পারে না। কারণ, "নিগুর্ণং পরমং ব্রহ্ম" ইত্যাদি পরম বাক্যে ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম নিগুর্ণ হইলে গুণের অন্তর্গত কৃতির অভাবও ব্রহ্মে সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই ব্রহ্মে জগতের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব—এই উভয় বোধক বাক্যই পাওয়া যাইতেছে। এখন ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা না অকর্ত্তা—এই সংশয় উপস্থিত হইল—বেদবাক্যের সহায়তায় জগৎকর্ত্তৃত্বাদিরূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইল না; এইজন্যই অনুমানরূপ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইবে। অনুমানশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত কেবল আপ্তবাক্যের দ্বারা তত্ত্বাবধারণ হয় না। এই জন্যই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

"তত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাম্॥"

(মোক্ষ, ৩১৮।৩৪)

আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ অনুমান-নির্ব্বাহক তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই উপনিষদাদির প্রকৃত মর্ম্ম আবিষ্কার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ গুরু প্রভৃতি মীমাংসকগণ বিধিপ্রত্যয়শূন্য বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরবোধক বেদবাক্যগুলি স্তুত্যর্থবাদের মধ্যেই পরিগণিত। কাজেই অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ না করিলে নিরীশ্বরবাদিগণকে পরাজিত করিতে পারা যায় না। মদীয় অধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺ রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত "অদ্বৈতবাদখণ্ডনপরিশিষ্টে"র প্রথমাংশে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার লিপিবদ্ধ আছে। কেবল শ্রুতিস্মৃতির দ্বারা যে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না—ঈশ্বর সিদ্ধির জন্য যে অনুমানরূপ প্রমাণের অবতারণা করিতে হইবে, ইহা অতি স্পষ্টভাবে "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে—" (৩।১)—ইত্যাদি কেনোপনিষদের শঙ্করাচার্য্যকৃত বাক্যভাষ্যে ও আনন্দগিরিকৃত ভাষ্যটীকায় অভিহিত হইয়াছে (২)।

(২) "তৎসিদ্ধির্জগতো নিয়তপ্রবৃত্তেঃ। শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিভির্নিত্য সর্ব্ববিজ্ঞান ঈশ্বরে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বশক্তৌ সিদ্ধেঽপি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ার্থমুচ্যতে।"—শাঙ্করভাষ্য, ২২-২৩ পৃঃ, আনন্দাশ্রমসং

প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, ঈশ্বরোচ্চরিত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য হইলে ঈশ্বরাবতার বুদ্ধের উপদেশও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে—এ আপত্তি আপত্তিই নহে। বুদ্ধ কি জগৎকর্ত্তা? ভগবান্, যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবাদৃষ্টের বৈচিত্র্য অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শরীরেই বেদ রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা প্রমাণ। সেই জগৎকর্ত্তা পুরুষোত্তমের উপর নির্ভর করিয়াই লোকে বেদবাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যে সকল বাক্য এই জগৎকর্ত্তা ভগবানের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, অথবা তৎকৃত বেদবাক্যের বিরুদ্ধ, শিষ্ট সম্প্রদায় তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট এই কথাই পরিস্ফুটভাবে লিখিয়াছেন,—

"কর্ত্তা য এব জগতামখিলাত্মবৃত্তি
কর্ম্মপ্রপঞ্চপরিপাকবিচিত্রতাজ্ঞঃ।
বিশ্বাত্মনা তদুপদেশপরাঃ প্রণীতা
স্তেনৈব বেদরচনা ইতি যুক্তমেতৎ।
আপ্তং তমেব ভগবন্তমনাদিনীশ
মাশ্রিত্য বিশ্বসিতি বেদবচঃসু লোকঃ।
তেষামকর্ত্তৃকতয়া ন হি কশ্চিদেবং
বিস্রম্ভমেতি মতিমানিতি বর্ণিতং প্রাক্॥"

(ন্যায়মঞ্জরী, ২৪০ পৃঃ)

"অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলে জৈনবৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অনাস্তিক পদবাচ্য হইতেন না"—ইহা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন, আর জৈন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আস্তিক হইয়া গেলেন—এ কার্য্যকারণ ভাব মন্দ নহে।—"বিষং বিষধরৈঃ পীতং মূর্চ্ছিতাঃ পথিকাঙ্গনাঃ।" জৈন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বেদনিন্দক, এই জন্যই তাঁহারা নাস্তিক—"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।" ঈশ্বর স্বীকার করিলেই আস্তিক বা ঈশ্বর অস্বীকার করিলেই নাস্তিক হয় না। তাহা হইলে নিরীশ্বরবাদী মীমাংসক ও সাংখ্যাচার্য্যেরা আস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। দার্শনিক এই সকল স্থূল সিদ্ধান্তগুলিও যাহাদের জানা নাই, তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

"কথং তর্হীশ্বরসিদ্ধিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তৎসিদ্ধিরিতি। নন্বু শ্রুত্যাদিভিরেবেশ্বরে সিদ্ধে ক্ষিমিতি জগতো নিয়তপ্রবৃত্তিলিঙ্গকানুমানং সূত্রিতং তত্রাহ—শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিভিরিতি। যাবৎ তর্কেণ সম্ভবো নানুগৃহ্যতে তাবচ্ছাস্ত্রপ্রতিপন্নোঽপীশ্বরো ন নিশ্চীয়তেঽর্থবাদত্বশঙ্কাপ্রতিবন্ধাদতঃ শাস্ত্রার্থস্যেশ্বরস্য নিশ্চয়ায় নিয়মায় সামান্যতোদৃষ্টমনুমানং শাস্ত্রানুগ্রাহকরূপং সূত্রেণোচ্যতে।"—আনন্দগিরি কৃত টীকা, ২২-২৩ পৃঃ।

তার্কিকপুঙ্গব তর্কতীর্থ মহাশয়ের উপদেশে নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য অধ্যায়ে ঘোষিত হইয়াছিল যে,—"এই মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে বেদে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয়, এবং এই পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।"

আমরা সমালোচনায় এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (৪।৫।৬)—এই বৃহদারণ্যক উপনিষৎস্থিত আত্মপদের অর্থ জীবাত্মা। সুতরাং পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয় এবং এই পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্‌বিষয়ক শ্রবণাদি আবশ্যক, ইহা নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য নহে। এ সম্বন্ধে আমরা বিশ্ব-বিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের রচিত "মুক্তিবাদ" গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছিলাম। ইহার উত্তরে প্রতিবাদী উদয়নকৃত "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের—"স্বর্গাপবর্গয়োর্ম্মার্গমামনন্তি মনীষিণঃ।—" ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—"এ শ্লোকটায় কি বলে না যে পরমাত্মার জ্ঞান ও মোক্ষার্থ প্রয়োজন ?"

হরিদাস-কৃত কুসুমাঞ্জলি-বিবৃতি দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, জীবাত্ম-সাক্ষাৎকারের উপযোগী বলিয়াই এখানে উদয়ন ঈশ্বর-মননকে মুক্তির হেতু বলিয়াছেন। হরিদাস স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"ঈশ্বরমননঞ্চাদৃষ্টদ্বারা স্বাত্মসাক্ষাৎকারদ্বারা বা মুক্তৌ হেতুঃ।"

"কুসুমাঞ্জলি"র প্রধান টীকাকার বৰ্দ্ধমানোপাধ্যায়ও এই কথা বলিয়াছেন (৩)।

সুতরাং জীবাত্মার জ্ঞানই মুক্তির কারণ, জীবাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই পরমাত্ম-জ্ঞানকে মুক্তির হেতু বলা হয়—ইহাই "স্বর্গাপবর্গয়োর্ম্মার্গম্—" ইত্যাদি কারিকার প্রকৃত মর্ম্ম। তার পর পরমাত্মার জ্ঞান মুক্তির হেতু, ইহা উদয়নাচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহা নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য হইল কেমন করিয়া ? উদয়নাচার্য্য কি নব্য নৈয়ায়িক ?, তর্কতীর্থ মহাশয় যে এত তালকাণা, তত্ত্বাই ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রতিবাদী বলিয়াছেন, "যাঁহারা উত্তর মীমাংসার মত মানেন, তাঁহারা দেখিবেন উপক্রমোপসংহারাদি উপায়ে আত্মা

(৩) ঈশ্বরমননঞ্চ যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানোন্মূলনদ্বারা নোপযোগি, তথাপি স্বাত্মসাক্ষাৎকার এব উপযুজ্যতে। যদাহঃ "সহি তত্ত্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকারস্যোপকরোতি" ইতি।"—প্রকাশ, ১০ পৃঃ।

এখানে পরমাত্মা বলিয়াই উত্তর মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—" এখানে আত্মপদের অর্থ পরমাত্মা—ইহা উত্তর মীমাংসার সিদ্ধান্ত হউক বা পূর্ব্ব মীমাংসার সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে ত আমাদের আপত্তি নাই। আমরা বলিয়াছিলাম, এখানে আত্মপদের অর্থ পরমাত্মা—ইহা নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য নহে। লেখক যদি স্বাধীন ভাবে বা নব্যন্যায় ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অনুবর্ত্তনে বলিতেন, পরমাত্মার জ্ঞান মুক্তির হেতু, তাহা হইলে আমরা কোনই আপত্তি করিতাম না। অপরের সিদ্ধান্ত—যে সিদ্ধান্ত রঘুনাথ-প্রমুখ নব্য নৈয়ায়িকেরা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন—নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য বলা হইয়াছিল, এইজন্যই আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। উত্তর করা দূরে থাকুক, প্রতিবাদী তর্কতীর্থ যে আপত্তিটা বুঝিতেও পারিলেন না, ইহাই দুঃখের কথা।

কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী এবং কণাদ-মতে অভাব অধিকরণ স্বরূপ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় আমরা সমালোচনায় প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার খণ্ডন করিয়াছিলাম। শ্রীধরাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, শঙ্করমিশ্র, অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বর প্রভৃতির সুস্পষ্ট লিপি হইতে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী নহেন, অভাবও তাঁহার মতে পদার্থান্তর। এমন কি, নবম অধ্যায়ের প্রথমে মহর্ষি কণাদ স্বয়ং প্রাগভাব, ধ্বংস, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাবের নিরূপণ করিয়াছেন। এই সকল স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াও প্রতিবাদী অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন,—"কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়া......সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয়ই দিয়াছেন।" তথাস্তু।—"জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।" তার পর আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, "কণাদের মতে আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসের নাম মুক্তি এবং এই মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কারণ। এমন অভাব যদি অধিকরণ স্বরূপ হয়, তাহা হইলে দুঃখ-ধ্বংসরূপ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না।" ইহার উত্তরে প্রতিবাদী লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রী মহাশয় যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা যায় না।" প্রতিবাদী তর্কতীর্থ যেরূপ উন্মত্ত-প্রলাপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে অকারণ হাসিবেন বা কাঁদিবেন, ইহা বিন্দুমাত্রও বিচিত্র নহে। অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিলে মুক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না—এ যুক্তি আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে;—"ভাষারত্ন" ও "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী"তে এ কথা বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তর্কতীর্থ মহাশয় কি ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থগুলিও দেখেন নাই?

প্রতিবাদী লিখিয়াছেন, "দুঃখনিবৃত্তিকে যে মোক্ষ বলা হয়, তাহা অনাগত দুঃখের নিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমান দুঃখ ক্ষণকাল পরে নষ্ট হইতে বাধ্য।" কি বুদ্ধি! যে দুঃখ উৎপন্নই হইল না, তাহার ধ্বংসও হইয়া গেল! অনাগত দুঃখের নিবৃত্তি যে সম্ভবপর নহে, এ কথা উদয়নাচার্য্য "দ্রব্যকিরণাবলী"তে ও শঙ্করমিশ্র "উপস্কারে" স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন (৪)। আমরা প্রতিবাদী তর্কতীর্থের হিতের জন্যই বলি, তিনি যখন তর্কশাস্ত্রের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থগুলিও পড়েন নাই এবং যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাও বিস্মৃতির অতল জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন, তখন পাণ্ডিত্য প্রকটনের উদ্দেশে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কেন আর লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হন? প্রতিবাদী আরও বলিয়াছেন যে, "যদি আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসই মোক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে এই তত্ত্বজ্ঞানটী সেই আত্যন্তিকত্বরূপ বিশেষণাংশের প্রয়োজক হইবে।" ইহা যে খণ্ডিত মত, তাহা কি প্রতিবাদী জানেন না? মহাদেব ভট্ট, "মুক্তাবলীপ্রকাশে"র প্রথমাংশে 'বদন্তি'-কল্পে উক্ত প্রাচীন মত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "মুক্তাবলীপ্রকাশে"র টীকায় রামরুদ্র এই কল্পের অস্বরস দেখাইয়াছেন যে, 'বিশেষ্যের অপ্রয়োজক হইলেও যদি বিশেষণাংশের প্রয়োজকতা লইয়া বিশিষ্টের প্রয়োজকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'বহ্নি ধূমের প্রয়োজক'—এই ব্যবহারের ন্যায় 'বহ্নি ধূমবৎ পর্ব্বতের প্রয়োজক'—এই ব্যবহারেরও আপত্তি হয়। (৫)

আমরা বলিয়াছিলাম, কণাদের মতে অভাব অধিকরণ স্বরূপ নহে। প্রতিবাদী ইহার উত্তরে "সিদ্ধান্তলক্ষণ" হইতে প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, নৈয়ায়িকেরাও সম্প্রদায়ভেদে কোনও কোনও অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলেন। অভাবাধিকরণক বা অভাব প্রতিযোগিক অভাবকে যাঁহারা অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতানুসারে শিরোমণি, লক্ষণবাক্যস্থ 'অত্যন্ত' পদের সার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এক ত ইহা নির্দ্দোষ পক্ষ নহে। জগদীশ লিখিয়াছেন,—"সম্প্রদায় ইত্যস্বরসঃ"। তার পর এটী যে নৈয়ায়িকদিগের মত, তাহা প্রতিবাদীকে কে বলিল? আমরা বলি, উহা মীমাংসকবিশেষেরই

---

(৪) "অনাগতস্য নিবর্ত্তয়িতুমশক্যত্বাৎ"—কিরণাবলী, ৯ পৃঃ।

"অনাগতদুঃখনিবৃত্তেরশক্যত্বাৎ"—উপস্কার, ৬ পৃঃ।

(৫) "স্বসমানাধিকরণদুঃখাসমানকালীনত্বরূপবিশেষণাংশে তত্ত্বজ্ঞানস্য প্রয়োজকত্বাৎ... ইতি বদন্তি।"—মুক্তাবলীপ্রকাশ, ৪০ পৃঃ।

"বদন্তীত্যস্বরসোদ্ভাবনং তদ্বীজন্তু—" রামরুদ্রী, ৪১ পৃঃ।

মত। নৈয়ায়িকেরা যে স্থলবিশেষে মীমাংসক মতেরও অনুবর্ত্তন করিতেন, প্রতিবাদী তাহা "সিদ্ধান্তলক্ষণে"ই "নিত্যসুখাভিব্যক্তের্মুক্তিত্বমতে"—এই গ্রন্থাংশে দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বত্র উক্ত সিদ্ধান্ত, স্বীকৃতও হয় নাই; জগদীশ পরে লিখিয়াছেন,—"ইদমপি অভাববৃত্তিরভাবো ন অধিকরণ স্বরূপঃ… …ইতি মতেন"।—(২৯ পৃঃ জীঃ সং)

প্রতিবাদী বলিয়াছেন, কপিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি, কণাদকে ষট্পদার্থ-বাদী বলিয়াছেন। কণাদ যে ভাব পদার্থ ছয়টীই স্বীকার করিতেন,—শক্তি সাদৃশ্যাদি যে তাঁহার মতে পদার্থান্তর নহে, ইহা ত আমরাও বলি। কিন্তু কণাদ, অভাবের পদার্থান্তরতা স্বীকার করিতেন না, ইহা কি প্রতিবাদী কপিল ও শঙ্করের লিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারেন? ভাব পদার্থের নির্ব্বচন-অভিপ্রায়েই যে কাণাদ তন্ত্রের প্রথমে ছয় পদার্থের 'উদ্দেশ' করা হইয়াছে,—অভাব যে বৈশেষিক মতে পদার্থান্তর, ইহা বরদরাজ কৃত "তার্কিক রক্ষা"য় স্পষ্ট লিখিত আছে (৬)।

কোটালীপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়কে 'সিদ্ধান্তরত্ন' বলিয়া উল্লেখ করায় প্রতিবাদীর মতে না কি কোনও দোষই হয় নাই। এখন হইতে কেহ যদি তর্কতীর্থ মহাশয়কে 'রচনানুবাদে'র কাব্যতীর্থ বলিয়া স্থির করে, তাহা হইলে তিনি যেন আর ক্রুদ্ধ না হন।

"অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপাথোজযুগং পুরদ্বিষঃ।"—ইত্যাদি গদাধরকৃত মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী "পদপঙ্কজযুগং"—এইরূপ বিকৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করায় আমরা ত্রুটী দেখাইয়াছিলাম। প্রতিবাদী ইহার উত্তরে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"পদপঙ্কজযুগং" পাঠ যে কোনও পুথিতে নাই, তাহা কি শাস্ত্রী মহাশয় খড়ি পাতিয়া দেখিলেন না কি?" তর্কতীর্থ মহাশয়ের কি এটুকুও বুদ্ধি নাই যে 'পদপাথোজ' স্থলে 'পদপঙ্কজ' করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়? ইহা কি গদ্য—যে একটা যা' তা' পাঠান্তর কল্পিত হইবে?

---

(৬)—"কাণাদতন্ত্র মনুসৃত্য লক্ষণমীরিতমিহ ইতি। তানিদানীং পদার্থানুদ্দিশতি।

দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম জাতিশ্চৈতৎত্রয়াশ্রয়া।
বিশেষঃ সমবায়শ্চ পদার্থাঃ ষড়িমে মতাঃ॥"

—তার্কিকরক্ষা, ১৩০ পৃঃ।

"এবং লক্ষিতা ষট্পদার্থা. এতস্তামেব ভাবাত্মকং বিষয়মন্তর্ভবতি। ভাবব্যতিরিক্তোঽভাব ইতি তেনসহ সপ্তৈব পদার্থা ইতি নিয়মঃ।"—ঐ, ১৬৩ পৃঃ।

"প্রসন্নরাঘব" নাটকে "যেষাং কোমলকাব্য-কৌশলকলালীলাবতী ভারতী —" ইত্যাদি শ্লোকটী লিখিত আছে, তথাপি প্রতিবাদী না কি প্রবাদানুসারে উক্ত শ্লোকটী রঘুনাথ-রচিত বলিয়াছেন। এই 'প্রকৃষ্ট বাদ' কি তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিজেরই মুখারবিন্দ নিঃসৃত ?

রঘুনাথ শিরোমণিকে অদ্বৈতবাদানুরাগী পণ্ডিত বলায় আমরা তাহার খণ্ডন করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, রঘুনাথ কেবলান্বয়ি-গ্রন্থের "অত্র বদন্তি"-কল্পে ব্যতিরেকী অনুমান খণ্ডন করিয়া অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন,—অতএব তিনি অদ্বৈতবাদী। প্রথমতঃ 'অত্রবদন্তি'-কল্প যে শিরোমণির নিজস্ব, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। নিজের মত হইলে 'বয়ন্তু ব্রূমঃ' থাকিত। বরঞ্চ ইহা যে ভট্টমতের শঙ্কা, তাহা জগদীশ-প্রদর্শিত— "শঙ্কেয়ং নব্যনৈয়ায়িকানাং ভট্টানাং বা"—এই আভাসে বুঝিতে পারা যায়। 'অত্রবদন্তি'-কল্পে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' লক্ষণ যে মীমাংসক-মতানুসারে পরিষ্কার করা হইয়াছে, "কেবলান্বয়ী"র প্রথমাংশের গাদাধরী টীকা দেখিলেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গদাধর লিখিয়াছেন,—"তাদৃশহেতোঃ অন্বয়ব্যতিরেকিত্বে তাদৃশহেতুকানুমানস্য মীমাংসকৈরভ্যুপগন্তব্যতয়া তেষাং সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বস্য ব্যাপ্তিত্বাভ্যুপগমবিরোধাৎ।" তা'র পর অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেই যদি অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী শবর স্বামী, কুমারিল ভট্ট, প্রভাকর-প্রমুখ মীমাংসকগণও অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়েন। অর্থাপত্তির প্রামাণ্যবাদী বলিয়া মীমাংসকেরাই অধিক প্রসিদ্ধ। মথুরানাথ, "তত্ত্বচিন্তামণি"র 'অর্থাপত্তি' প্রকরণের 'রহস্য' নামক টীকার প্রথমে লিখিয়াছেন,—"অর্থাপত্তেরতিরিক্তপ্রমাণত্বং মীমাংসকাভিমতং নিরাচষ্টে।" মীমাংসা দর্শন হইতেই বেদান্তীরা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভূমিকায় একাধিক বার 'বিদ্যালয়গৃহকোণে' লিখিত ছিল বলিয়া আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী তাহার উত্তরে "দৈনিক বসুমতী" হইতে প্রমাণ দিয়াছেন—"বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে।" হা অদৃষ্ট! প্রতিবাদীর শেষে সংবাদপত্রের সংবাদ খুঁজিয়া প্রমাণ বাহির করিতে হইল! প্রতিবাদী আবার বৈয়াকরণ সাজিয়া গৃহের বিশেষণরূপে অন্বয়ের জন্য 'বিদ্যালয়' শব্দের একটা অর্থও বাহির করিয়াছেন,—"বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের লয় অর্থাৎ শেষ হয় যেখানে।" তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহই এই অর্থানুসারে 'বিদ্যালয়'। তাঁহার কাছে পড়িতে গেলে যে পূর্ব্বোপার্জ্জিত বিদ্যারও লয় হয়, ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদই তাহার নিদর্শন।

"দুর্গেশনন্দিনী"র গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে তাহার অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?" ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "রামকান্ত।" তর্কতীর্থ মহাশয়ও সেইরূপ ছয় মাস ভাবিয়া আমাদের প্রত্যেক আপত্তির উত্তরেই 'কিছু' বলিয়াছেন। তবে একটা কথার উত্তর দেন নাই। তর্কতীর্থ উপদেশ করিয়াছিলেন,—মূর্ত্ত মাত্রেরই দিগুপাধিত্ব স্বীকার করা হয়। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিয়া "ব্যধিকরণ", "সিদ্ধান্তলক্ষণ" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছিলাম, মূর্ত্তমাত্রেরই দিগুপাধিত্ব স্বীকার করা হয় না,—জন্য মূর্ত্তই দিগুপাধি হইয়া থাকে। তর্কতীর্থ যে এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না, তাহা নহে। বোধ হয় আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই ইহার উত্তরে 'কিছু' বলেন নাই।

তর্কতীর্থ, বিনামার অন্তরালে থাকিয়া লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রী মহাশয় পরম পূজনীয় তর্কতীর্থ মহাশয়কে পর্য্যন্ত জড়াইয়াছেন, এটা কি ভদ্রতা! ইহা কি শিষ্টাচার?"

দুই শত টাকা গুরুদক্ষিণা লইয়া তর্কতীর্থ মহাশয় ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—যশের প্রত্যাশায় বিজ্ঞাপনে নিজের নামও ছাপিয়াছেন, তবে এখন আবার ধরা পড়িবার ভয় কেন? যদি এতই ভয়, তবে নাম না ছাপিলেই পারিতেন।

পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার অধ্যাপক, ইহা জানিয়াও তর্কতীর্থ লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রী মহাশয়ের গুরুর গুরু স্থানীয় সার্ব্বভৌম মহাশয়, তর্কবাগীশ মহাশয়, তর্কভূষণ মহাশয়, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে পুস্তক দেখিয়া—"

সার্ব্বভৌম মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয়, পূজ্যপাদ গুরুদেব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র, তর্কবাগীশ মহাশয়ও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অধ্যাপকের ন্যায় সম্মান করিতেন, সুতরাং তর্কতীর্থ প্রদত্ত উক্ত অযাচিত প্রশংসাবাদে সার্ব্বভৌম মহাশয়, তর্কবাগীশ মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয় প্রীতি লাভ করিবেন না, প্রত্যুত লজ্জিতই হইবেন।

প্রতিবাদী তর্কতীর্থ, উপসংহারে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—"তিনি (সমালোচক) এখন যদি এরূপ পুস্তকরত্নের প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে।" আমরাও তর্কতীর্থ মহাশয়কে উপদেশ করিতেছি যে, তিনি কীর্ত্তিলাভের দুরাশায়—"প্রাংশুলভ্যে ফলে

লোভাদ্বাহুরিব বামনঃ”—উপহাসাস্পদ না হইয়া এই জাতীয় ‘পুস্তক রত্নে’র প্রচার-চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। তর্কতীর্থ মহাশয় কি পশ্চাদুদ্ধৃত শ্লোকটী জানেন না ?

"জ্যোতিরিঙ্গন কথং ন লজ্জসে
যৎ তমঃ শময়িতুং সমীহসে।
এতদেব বহু কিং ন মন্যসে
যৎ তমত্র তিমিরেষু লক্ষ্যসে ॥"

তর্কতীর্থ মহাশয় যে প্রতিবাদাভাস প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা বেশ বুঝিয়াছি, “সাহিত্যে” প্রকাশিত সমালোচনা, তাঁহাদের গায়ে লাগিয়াছে। তাই ক্রোধান্ধ প্রতিবাদী, সমালোচকের প্রতি ভদ্রজনবিগর্হিত অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া স্বীয় শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। তর্কতীর্থ আরম্ভেই লিখিয়াছেন, “গত মাঘের সাহিত্য-পত্রিকায়······ব্যাপ্তিপঞ্চকের অনুবাদ গ্রন্থে অযথা কতিপয় দোষারোপ করিয়া কোনও এক শাস্ত্রী এক সন্দর্ভ লিখিয়া স্বকীয় বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।” “সাহিত্যে” প্রকাশিত সমালোচনায় অযথা দোষারোপ করা হইয়াছিল—কোনও বিশেষজ্ঞের লিখিত এইরূপ পত্রের সহিত প্রতিবাদী তর্কতীর্থ মহাশয় যদি নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাদের এই লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তবেই ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর দিব,—নচেৎ নহে।

“বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অপ্রিয় আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

“লেখক মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে ‘আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয় * *।” সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। * * * সভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে তিনি সে রাগ গায়ে মারেন ; দুই একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালি অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হউক না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহে। সমালোচনায় অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়। * * * ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপন আপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। * * * কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ সকল রহস্যে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলির ভাল মানুষকে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ।

অতএব বঙ্গীয় গ্রন্থসমালোচনা আমাদিগের অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদের হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখকসমাজকে জানাই যে আমরা বিশ্বনিন্দুক নহি। * * *"

বজ্রলেপ।

[লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

সংস্কৃত সাহিত্যে বজ্রলেপের নাম অতি সুপরিচিত। বজ্রলেপ শব্দটা শুনিলেই আপাতত যেন একটা দৃঢ়তর পদার্থের কথা মনে উদিত হয়। কারণ, বজ্রের দৃঢ়তা মানব সমাজে অতি সুপরিচিত। যদিও বজ্রের স্বরূপ কি? তাহা সকলের নিকটই অপরিচিত, অর্থাৎ বজ্রের স্বরূপদর্শী বর্ত্তমান সময়ে কেহই নাই, তথাপি কোন একটা দৃঢ় পদার্থের তুলনা করিতে হইলে সকলেই প্রায় বলিতে অভ্যস্ত যে, উহা বজ্রের মত শক্ত। বজ্রমুষ্টি ইত্যাদি শব্দও বজ্রের দৃঢ়তাই প্রকাশ করিয়া থাকে। বজ্রের মত অবিনশ্বর লেপ বজ্রলেপ শব্দের যৌগিক অর্থ বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির উত্তর রামচরিতে সীতার মুখে বজ্রলেপ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রেও উহার অবিনশ্বরতা কথিত হইয়াছে। "বারানসীতে অন্তর্গেহে কৃতপাপ" বজ্রলেপের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অবশ্য সাহিত্যের এবং স্মৃতির বর্ত্তমান পঠন পাঠন প্রণালীতে বজ্রলেপের স্বরূপ জানিতে ছাত্র অধ্যাপক কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। কারণ, পরীক্ষা দিয়া দলিল হস্তগত করিতে পারিলেই ছাত্র কৃতার্থ এবং অধ্যাপকও পুরস্কৃত হন। পরীক্ষক মহোদয়গণ বজ্রলেপ টেপের খবরও রাখেন না, প্রশ্নেও এ সমস্ত কথার প্রসঙ্গ থাকে না, সুতরাং বজ্রলেপ বজ্রলেপই যথেষ্ট।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কৌতুহল নিবৃত্তির পক্ষে শিল্প সংসৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় একান্তই প্রয়োজন। অতএব আমরা উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব। খ্যাতনামা বরাহমিহির এই বজ্রলেপের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে চারি প্রকার বজ্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বজ্রলেপের উপাদান—কাঁচা তিন্দুক ফল (গাব) কাঁচা কদবেল, শিমুল ফুল, সাল্লকি বৃক্ষের বীজ, ধন্বণ বৃক্ষের ছাল, এবং বচ। এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া এক দ্রোণ পরিমিত জলে ক্বাথ করিতে হইবে। অনন্তর

অষ্ট ভাগাবশিষ্ট কাথ নামাইয়া তাহাতে শ্রীবাসক (প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্য্যাস) রস (বোল) গুগ্‌গুল, ভেলাগোটা, কুন্দুরুক, ধুনা, অতসী (মসীনা) এবং বেল এই সকল পদার্থের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। অনন্তর এই পদার্থ তপ্ত অবস্থায় প্রাসাদ (দেবালয় বা রাজভবন) হর্ম্ম্য (ধনীদিগের দালান) বলভী (বারেন্দা বিশেষ) শিবলিঙ্গ, প্রতিমা, ঘরের মেজে ও কূপ (ইন্দারা) এই সকলের উপরে ঢালিয়া দিলে এই লেপ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় বজ্রলেপ—লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগ্‌গুল, গৃহধূম, কদবেল, বেলের মধ্যভাগ, নাগ ফল, নিম্বফল, গাব, মদনফল, মৌয়াফল, মঞ্জিষ্ঠা, ধূনা, রস এবং আমলা, এই সকল পদার্থের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বজ্রলেপ প্রস্তুত করিলে পূর্ব্বোক্তের মত গুণশালী হয়।

তৃতীয় বজ্রলেপ—ইহার উপাদান গো, মহিষ ও ছাগল ইহাদের শৃঙ্গ, গাধার লোম, মহিষের চর্ম্ম, গো-শৃঙ্গ ও গো-চর্ম্ম, নিম্ব ও কদবেল ইহাদের রসের সহিত কথিত গো মহিষ শৃঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে কল্ক প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার নাম বজ্রতল।

চতুর্থ বজ্রলেপের উপাদান—আট ভাগ সীস, কাঁস দুই ভাগ, ও এক ভাগ পিত্তল। এই লেপ বজ্রসঙ্ঘাত নামে অভিহিত, এবং উহা ময়-কথিত।

বরাহমিহিরের উক্তিতে কেবল উপাদানেরই পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গো মহিষাদির শৃঙ্গ লোম প্রভৃতি কি ভাবে গালাইয়া তরল করিতে হইবে, তৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ যে গালাইয়া লেপের উপযোগী করা হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ময়কথিত বজ্রলেপের উপাদান কেবলই ধাতু পদার্থ—উহাদিগকে কিসের দ্বারা গালাইয়া কি ভাবে লেপের উপযুক্ত করা হইত, তাহাও কথিত হয় নাই। বহু শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমস্ত প্রস্তর মূর্ত্তি বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে নিহিত বজ্রলেপ বরাহমিহির-বর্ণিত লেপের অবিনশ্বরতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু কি উপাদানে, কি রীতিতে উহা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের উপদেষ্টা বহু আচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্যের বাহুল্য সত্ত্বেও মোটামুটি উহা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় বিশ্বকর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত অপরটি ময়কথিত। বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পিরূপে এবং ময় অসুর শিল্পিরূপে পরিচিত। বরাহমিহির প্রভৃতির গ্রন্থে উভয় মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্ম মতেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন।

["ও-পারের কথা"র লেখক।]

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৺পুরীধামে যাইবাব সাধ আমাদের প্রাণে দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য কর্ম্ম হইতে অবসরও পাইয়াছিলাম। তখন রেলওয়ে কোম্পানীর কৃপায় পুরী যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় আমাদের সাধের বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। পাথেয় সংগ্রহ ও আবশ্যক যাহা কিছু একত্র করিয়া আমরা সেই দিনই পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইলাম। কাহারও মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়া কর্ম্মসাধন করা আমাদের বহুকালের অভ্যাস বলিয়া কেহই 'হাঁ-না' বলিতে সাহসী হন নাই। তবে ৺পুরীধামের কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থান করিবার জন্য কোন কোন আত্মীয়-আত্মীয়া অনুরোধ করিতে ভুলেন নাই। যথাসময়ে ৺পুরী-ধামে পৌছিয়া বাসাবাটী অন্বেষণে নির্গত হইলাম। অল্প সময়ের মধ্যে শকটচালক এক সুবৃহৎ অট্টালিকার গেটের সম্মুখে গাড়ি থামাইল। অনু-সন্ধানে জানিলাম, উহাই আমাদের আত্মীয়ের বাটী। গেট ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পার হইয়া আত্মীয়ের একজন ভৃত্যের মারফৎ আমাদের আগমনবার্ত্তা জানাইলাম। অনুমান পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের আত্মীয় ও আত্মীয়া উভয়েই দেখা দিলেন ও যথাবিহিত অভিবাদন করিলেন। অন্যত্র—বিশেষতঃ এক বাসাবাটীতে থাকিতে ইচ্ছুক, এই মত প্রকাশ করায়, আমাদের আত্মীয়া বাষ্পপূরিত লোচনে বলিলেন, "তা হ'লে আমরা আপনার পর!" এই কথা বলিয়াই তিনি ম্লানমুখী হইলেন। যাঁহাকে এক সময়ে 'কোলে পিঠে' করিয়া মানুষ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার আঁখিবারি আমাদের সঙ্কল্প শৃগালের যুক্তিতে পর্য্যবসিত হইল। 'যখন ইচ্ছা ও যথা ইচ্ছা যাইব ও আসিব ও বহির্বাটীর একটী নিভৃত গৃহে থাকিব' এই প্রস্তাবে সম্মত করাইয়া আমরা তাঁহাদের বাটীতেই অবস্থিতি করিলাম।

স্নান, আহারাদি সমাপন ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, বাটীর সন্নিকটস্থ সমুদ্রের লীলাদর্শনে ও বায়ু-সেবনে পুরীধামে প্রথম দিবস অতিবাহিত করিলাম। পর দিবস প্রাতে আমাদের আত্মীয়ের নির্ব্বাচিত একজন পাণ্ডা

ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ৺জগন্নাথদেব-দর্শনে নির্গত হইলাম। প্রায় দশ মিনিট পদব্রজে যাইয়া জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দিরের সুবৃহৎ সিংহদ্বারের নিকট উপনীত হইলাম। তখন কি এক অভিনব ভাব অহংবুদ্ধিতে স্ফীত এই মন-প্রাণকে অভিভূত করিল। সোৎসুকে বিস্তীর্ণ রাজপথ বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল, চক্ষুর্দ্বয় বারি সম্বরণ করিতে পারিল না। সার রবীন্দ্রনাথের "মুচড়ে দিও মাথা আমার সকল গর্ব্বের তলে" এই গানটী তখন প্রকাশিত না হইলেও এই পোড়া প্রাণ ও মন একবাক্যে সেই কথাই বলিয়া সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তখন স্মৃতি, পুরাতন চিত্রগুলি জাগরূক করাতে, নির্ব্বাক হইয়া গম্ভীরভাবে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর জগন্নাথদেবকে দর্শন করাইয়া ৺ঠাকুরের চারিধারে প্রদক্ষিণ করাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। পূজাদি দেওয়া ও আর আর স্থান দর্শন করা বিধেয়, এই কথা উত্থাপন করাতে পাণ্ডাঠাকুরের কোন প্রস্তাবই অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং পাণ্ডাঠাকুর যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমরা মন্দিরের অপেক্ষাকৃত এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলাম, পরে জানিলাম, গরুড়-স্তম্ভের নিকট বসিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিবার সাধটুকুও দেখা দিল। সেই সময় প্রাণ ও মন এক সাথে বলিয়া উঠিল, "তোমার ঐ বীভৎস মূর্ত্তি ও ঐ খত্তালের মত চোখ দুটী দেখবার সাধ থাকলে তোমার ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতাম, কিম্বা কুষ্ঠাশ্রম-বাসীদেরকে প্রাণ ভ'রে দেখ্‌তাম। তা হ'লে কষ্ট ক'রে এখানে আসবার দরকার ছিল না।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনুমান এক ঘণ্টাকাল বসিয়া থাকার পর এক অদৃশ্য শক্তির কার্য্যকারিতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই দেহ, সেই প্রাণ ও সেই মন আর নাই। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণের অবস্থাও অন্যরূপ হইয়াছে। মনে হইল, আমরা যেন সে রাজ্যে নাই। কিন্তু উপবিষ্ট সেই স্থানে, যথায় গোষ্ঠবেশধারী অনুমান ১৫।১৬ বৎসরের দুইটী বালক দণ্ডায়মান। নির্ব্বাক হইয়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রাণ-মন কি-যেন-কি এক আনন্দে ও কি এক অব্যক্ত নেশায় মাতোয়ারা ভাবে ডুবিল, মজিল ও পরিশেষে আপনহারা হইল। কোন্ শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বা কোন্ পুণ্যফলে দর্শনলাভ করিলাম তাহা বলিবার সাধ্য নাই। তবে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া বা মুক্তকণ্ঠে বলিতে

সাহসী যে,আমরা বাল্যকাল হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘোরতর বিদ্বেষী ছিলাম। মনে হয়, আমাদের দর্প উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিয়াই দর্পহারী এই খেলা আমাদের সহিত খেলিলেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমরা দেবদর্শন লাভ করিবার বা তাঁর কথা শুনিবার কোন সাধই প্রাণে ঠাঁই দিই নাই। আহা মরি মরি! উভয়ের কি মনোলোভা রূপ, কি সুন্দর ঠাম, কি অপরূপ সহাস্য বদন, নূপুর সুশোভিত কি কমনীয় চরণযুগল ও কি নয়নানন্দকর ও জ্যোতিপূর্ণ লোচনদ্বয়। একজনের বর্ণ কতকটা উজ্জ্বলতম ব্লুব্লাক কালির মত ও আর জনের বর্ণ গৌর। অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই মূর্ত্তিদ্বয় এখনও হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। কতক্ষণ এইরূপ মাধুরী দেখিতে অবকাশ দিয়াছিলেন তাহা জানা নাই; কিন্তু সে সুখ স্বপন ভাঙ্গিলে পর দেখি আমরা মন্দিরেই উপবিষ্ট আছি ও হস্ত-পদ শূন্য মূর্ত্তিদেরই সম্মুখে। পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মীয়দের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। সেই দিন তাঁহাদের সহিত সদলে সমুদ্র-স্নান হইয়াছিল। বৈকাল না হইতেই পূর্ব্বদিন-বৎ সায়ংকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে বিচরণ করিয়া কাটাইলাম।

দ্বিতীয় দিবস মন্দিরের দ্বার খুলিতে না খুলিতে সিংহদ্বারে প্রথম দিবসের মত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। পরে ৺ঠাকুরদিগকে সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বদিবসবৎ সেই স্থানে ও সেই ভাবে উপবিষ্ট হইলাম। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য শক্তির সহায়তায় তৎকালীন যে চিত্র মানস-চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা আজিও মানসপটে কখন কখন নৃত্য করিয়া থাকে। মস্তকমুণ্ডিত, কৌপীনধারী, নাতি কৃশ নাতি স্থূল দেহবিশিষ্ট ও দিব্যকান্তিসম্পন্ন এক গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ সদলে নৃত্য-গীতে বিভোর হইয়া ঊর্দ্ধতন রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, ইহাই সেই চিত্র। সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ কাটিয়া গেলে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। আঁখি মেলিবামাত্র দেখি যে, ৺ঠাকুরকে ভোগ দিবেন বলিয়া পাণ্ডাগণ মন্দির জনশূন্য করিতে ব্যস্ত। তৎপরে বাটী আসিয়া পূর্ব্ব দিবসের মত সমুদ্রস্নান ও যথাসময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া বৈকাল হইতে সন্ধ্যা অতীত হইলেও সমুদ্রতীরে কখন বিচরণ ও কখন উপবেশন করিয়া কাটাইলাম।

তৃতীয় দিবস আবার যথাসময়ে মন্দিরে উপনীত হইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলাম। সেই সময়ে পূর্ব্ব দিবসদ্বয়ের অদ্ভুত চিত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইয়া আপন মনে বলিয়াছিলাম, "কতকগুলি পুতুলনাচ দেখিয়েছ বটে, কিন্তু

ঐগুলি যে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য, যদি যেস্থানে ব'সে আছি এখানেই কেহ এসে উপরি-উপরি তিন দিন তোমার 'নাম'-গান শুনায়"। সে দিন কি জানি কোন্ লীলায় কোনও চিত্র দেখি নাই বা কোনও কথা শুনি নাই।

চতুর্থ দিবস পুনরায় যথাসময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম ও যথাস্থানে বসিলাম। স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবার অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে দুইজন বৈষ্ণব ভৈরোঁ স্বরে বৃন্দাবনলীলা গাহিতে গাহিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসে কাহাকেও এই ভাবে আসিতে দেখি নাই বলিয়া কৌতূহল-পরবশ হইয়া আঁখিদ্বয় খুলিলাম ও দুই ব্যক্তিকে দেখিলাম। প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রধান গায়ক, তিনি প্রৌঢ়, বলিষ্ঠকায় ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ, কৃশ ও কালবর্ণ। উভয়েরই হস্তে করতালি। আশ্চর্য্যের কথা, তাঁহারা, আমরা যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম, অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টাকাল মধুবর্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা কত গান শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ প্রকার সুমধুর গান ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। পুনরায় এরূপ গীত শুনিতে পাইব কি না,—যাঁহার লীলায় এ ভাগ্যোদয় হইয়াছিল—তিনিই জানেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও মন্দিরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঠিক সেই স্থানে উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় আসিলেন ও গাহিয়া চলিয়া গেলেন। তৎকালে আমাদের সন্দেহ ঘুচিয়াছিল বটে, কিন্তু মানবসুলভ অবিশ্বাস মাঝে মাঝে এই হৃদয়-রাজ্যটুকু সগর্ব্বে অধিকার করিয়া থাকে। এই জন্য বলিতে হয়—হায়! মানব জন্ম!

আমরা সাত দিবস মন্দিরে ও সমুদ্রতীরে কাটাইয়া অষ্টম দিবসে জগন্নাথ দেবের ও আত্মীয়দের নিকট বিদায় লইলাম ও তৎপর দিবস ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম।

ইংরাজি ১৯১৩ সালে আমাদিগকে আবার পুরীধামে ও অন্যান্য তীর্থে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু অর্থশালী-শালিনীদের সঙ্গত গুণে পূর্ব্ববৎ আনন্দের বা উৎফুল্লতার বিন্দুমাত্র লাভ হয় নাই। তাই বলিতে সাধ হয়—অর্থ! তুমি দেখিতে গোল, না থাকিলে গোল, ও থাকিলেও গোল।

এক্ষণে ৺পুরীধামে কি কি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, সেই কথা সংক্ষেপে বলা যাউক।

৺জগন্নাথ মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণাবস্থা একত্র সন্নিবেশিত। নির্গুণ

ব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য ও অরূপ। ব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য হস্ত-পদ যাহা কর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ-সৌষ্ঠব, উহা জগন্নাথ মূর্ত্তিতে নাই। তিনি অরূপ, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জগন্নাথ অন্যান্য দেবদেবীর মত আকারবিশিষ্ট নহেন। নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে ইহা ধারণা হয় যে, ঐ মূর্ত্তি কতকটা ওঁকারবৎ। সাধারণ জীবের পক্ষে নির্গুণাবস্থা ধারণা করা অসম্ভব বলিয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র এই তিন মূর্ত্তি কল্পিত ও পূজাকরণ, ভোগরাগাদি প্রথা প্রচলিত। এই তিন মূর্ত্তি সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে।

৺পুরীধামে চারিটী তরঙ্গ বহমান। সমুদ্রের তরঙ্গ, বায়ুর তরঙ্গ, জীবের ভক্তির তরঙ্গ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমের তরঙ্গ। এক স্থানে চারিটী তরঙ্গ বহমান থাকায় ইহা একটী অত্যুচ্চ তীর্থস্থান। বিরাট প্রকৃতির বিধানেই সমুদ্র তরঙ্গাকারে কখন দুরন্ত শিশুসম উঠিয়া-পড়িয়া ও নাচিয়া-দুলিয়া, কখন মত্ত হস্তিসম ভীষণ হইয়া ও কখন বা মদস্ফীত ও ক্রোধাভিভূত নরপশুবৎ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া অবিরাম কত ভাবে কত রঙ্গ দেখাইতেছে। তীর সন্নিকটস্থ বারিরাশিই এই প্রকার আচরণ করিয়া বালুকা, ফেনা, ঝিণুক ও নানাবিধ অপরিচ্ছন্ন পদার্থে পূর্ণ। কিন্তু সেই তরঙ্গগুলিই বিশাল বারিরাশির সহিত মিলিত হইবার অবকাশ পাইলে উহাদের মলিনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না। জীব অধীরতা, চঞ্চলতা, দাম্ভিকতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সংসার-সাগরে কত না বিধ্বস্ত হইতেছে ও নিজ নিজ মন-প্রাণকে কত না অগুণে পূরিত করিয়া আঁখিবারি বা হায় হায় বাণী কণ্ঠে লইয়া কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু যে জীব স্থূলাবস্থা হইতে চৈতন্যময়ের দিকে ধাবিত হন, তিনি ক্রমশঃ স্থির-ধীর হইয়া শান্তিনিকেতনের সুখ, বিহার ও আনন্দ উপভোগ করেন।

৺জগন্নাথধামে বায়ু সতত প্রবল বেগে হু হু করিয়া প্রবাহিত। সুস্থতা-অসুস্থতা, সরসতা-নীরসতা, আদর-অনাদর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সম্মান-অপমান, স্বচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, নির্ভয়-ভয়, মিলন-বিচ্ছেদ ইত্যাদি দুইটী ঘূর্ণ্যমান চক্র মধ্যে অবস্থিত অবস্থার নাম মানবজীবন। এই দুইটী চক্রের মধ্যে একটী চক্র সাধারণতঃ এককালীন বেশী মাত্রায় ঘূর্ণ্যমান। প্রথম চক্র যাহা কিছু প্রীতি-প্রদ উপাদানে ও দ্বিতীয় চক্র যাবতীয় অপ্রীতিকর উপাদানে গঠিত। কোন জীবের ভাগ্যবলে প্রথম চক্র যখন দ্বিতীয় চক্রাপেক্ষা বেশী মাত্রায় ঘুরিতে থাকে তখন সেই ব্যক্তি নিজ অভিরুচি বা সংস্কার বা শিক্ষামত কর্ম্ম সাধন করেন।

কিন্তু সেই জীবের ভাগ্য-বৈগুণ্যবশতঃ যখন দ্বিতীয় চক্র প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে তখন তাহার মন-প্রাণ অদৃশ্য সুখের ও শান্তির আশায় হু হু করিতে থাকে। সেই অবস্থায় সেই জীব "কি করি, কোথা যাই, কার কাছে গিয়া এ জ্বালা নিবৃত্তি করি" এই প্রকার মর্ম্মদাহ লইয়া ছট ফট করিতে থাকে। বিরাট প্রকৃতির প্রবল হু-হুকারের সহিত মানবের অল্প মাত্রায় হু হু যুক্ত মন-প্রাণ মিলাইয়া দিলে সেই অবস্থায় শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সচ্ছন্দতা আনয়ন করে বলিয়া সুচিকিৎসক সমুদ্রতীরে বাস বা সমুদ্রযাত্রা বিধান দিয়া থাকেন। যে উপাদানের সহায়তায় সুস্থতা ও চিত্ত-প্রফুল্লতা আনয়ন করে বা যাহা মন-প্রাণের উন্মুক্ততা বর্দ্ধন করে, তাহাতে নিঃসন্দেহ চৈতন্যশক্তি প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। এই উপায়ে চৈতন্যশক্তি সঞ্চিত হইলে স্থূল চিন্তা ও কার্য্য হইতে বিরত হওয়া প্রযুক্ত প্রাণে ও মনে অপ্রচ্ছন্ন ভাবে অদৃশ্য সুখের ও শান্তির পিপাসা বর্দ্ধিত হয়।

উপরোক্ত দুই বিধানে ৺পুরীধামে বিরাট প্রকৃতি (সগুণ ব্রহ্ম) জননী ভাবে জীবকে অনুক্ষণ ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে "জীব তোমরাও এক এক জন বিশাল সংসার সাগরের এক একটী ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ মাত্র ও তোমাদের উদ্বেলতাই তোমাদিগকে মলিন হইতে মলিনতর ও এমন কি মলিনতমও করিতেছে। অবকাশ মত তোমরা যদি আমায় নিঃসঙ্গ হইয়া উপভোগ কর, তাহা হইলে তোমাদের মন-প্রাণ ধৌত করিয়া উহাদের সহিত দেহেও শক্তি সঞ্চার করিব। তখন সেই শক্তিপ্রভাবে তোমরা ধৈর্য্যানুযায়ী বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জ্ঞানে ও আসক্তির পরিবর্ত্তে প্রেমে ভূষিত হইয়া আমার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য বিরাজ করিবে।"

বায়ুর প্রবাহ কতকটা প্রত্যক্ষ ভাবে বহমান, কিন্তু জীবের চিন্তার ও কার্য্যের প্রবাহগুলি অপ্রত্যক্ষ ভাবে সতত বহমান। এই প্রবাহ প্রবাহিত বলিয়া জীব উহাতে ভাসমান হইয়া ভৌতিক জগতে গবেষণার ও উদ্ভাবনার কার্য্যে কাল-ক্রমে অগ্রগামী হইতেছেন। এই প্রবাহ বহমান বলিয়া যে ব্যক্তি যখন যে ভাবে নিজ নিজ প্রাণের ও মনের মৌচাকবৎ অথচ নিভৃত কোষগুলি উন্মুক্ত করিতেছেন, সেই প্রভাবে কখন কুচিন্তার ও কখন বা সুচিন্তার স্রোতে পতিত হইয়া যাহা কিছু কর্ম্ম সাধন করিতেছেন। অধুনা ভৌতিক চিন্তার ও কার্য্যের প্রাচুর্ভাব হইলেও এককালে আধ্যাত্মিক চিন্তার ও কার্য্যের আধিক্য থাকায় এ যুগেও মানব হৃদয় ভক্তি বা প্রেমশূন্য হয় নাই। ইহা ব্যতীত

যখনই জীব চৈতন্ত হইতে স্থূল চিন্তায় ও কার্য্যে অভিভূত হয় তখনই এক একজন আদর্শ মহাপুরুষ এই সংসাররূপ লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক প্রবাহ পুনঃ প্রবাহিত করিয়া যান। রাজ্যবিপ্লব বা ভীষণ সমরানলও স্থূল চিন্তার ও কার্য্যের খরতর প্রবাহ রোধ করিবার জন্য বিধাতারই বিধান।

কতকাল হইতে কত লক্ষ লক্ষ নর-নারী ৺জগন্নাথদেব দর্শন মানসে আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। এক অপ্রচ্ছন্ন অথচ প্রভূত শক্তিসম্পন্ন আকর্ষণেই কেহ দাস-দাসী, কেহ সখা-সখী, কেহ বাৎসল্য ও কেহ বা প্রণয়িনী ভাবে ও প্রাণের আবেগে ৺পুরীধামে উপনীত হইয়াছেন ও হয়েন। সুতরাং সেই সেই জীবের চিন্তার ও কার্য্যের প্রবাহগুলি অদৃশ্য রাজ্যে গুপ্ত চিত্রসম প্রোথিত। জীবের চিন্তা ও কার্য্য ভিন্নতর। সুতরাং ভিন্নতর চিন্তার ও কার্য্যের প্রবাহে ঘাত-প্রতিঘাত অনিবার্য্য। ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গের উৎপত্তি। এই হেতু ৺পুরীধামে ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গের অভাব নাই। যে প্রবাহ কত কাল হইতে ক্ষীণ ভাবেই প্রবাহিত হইতেছিল, একমাত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক উহাই বিশালাকার ধারণ করাতে উহাতে কত শত তরঙ্গ শোভমান।

যিনি ধীর, কর্ম্মঠ, ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী ও প্রভূত ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন তিনিই প্রকৃত পুরুষবাচ্য। কেবলমাত্র মনে অবস্থিত বলিয়া জীবের অধীরতা, ভেদাভেদ বুদ্ধিযুক্ততা, দুঃখে ও চিন্তায় বিমুগ্ধতা ও ইচ্ছাশক্তিহীনতা সম্বল। ইহাই নারী-শ্রেণীভুক্ত জীবের লক্ষণ। এই হিসাবে একমাত্র পুরুষোত্তমই পুরুষবাচ্য ও জীবমাত্রই নারী-শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ণমাত্রায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া কোন দেবতা-স্থানে উপনীত হওয়া জীবের পক্ষে কতকটা অসম্ভব সাধন। তবুও যে জীব পুরুষোত্তমকে 'প্রাণবল্লভ' পদে বরিত করিয়া তাঁহাকে প্রাণের কথা প্রাণের ভাষায় জ্ঞাপন করেন, ৺জগন্নাথ সেই জীবের ভক্তির প্রতিদান স্বরূপ তাঁহার যাবতীয় কালিমা নিজ অঙ্গে লেপন করেন। এইজন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কালো বরণ। অতঃপর সেই জীবকে নিজ অভিরুচি মত সুসজ্জিতা ও হেমবরণী করিয়া তাহাকে সুভদ্রা ভাবে অর্থাৎ সৎগুণসম্পন্না করিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে স্থান দেন। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বলভদ্র ভাবে তাঁহার অসামান্য প্রভাব ও অপরূপ রূপমাধুরী সেই নব নাগরীকে দর্শন করান। সেই অদ্ভুত দর্শনের ও প্রেমের বিনিয়োগের পর জীব-মন কাঁচা বা গুরলমুখো মন হইতে পাকা বা চৈতন্যময়ী মন হইয়া যায়। তখন সেই জীব স্বীয় হৃদি-রথোপরি আত্মারূপ জগন্নাথের বা নিজ প্রাণপতির সন্দর্শন লাভ

করিয়া মানবজন্ম ধন্য করেন। ইহাই জগন্নাথদেবকে রথে দর্শন করা বলে। অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত রথে কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবতাকে দর্শন করিলে মানবজন্ম ধন্য হওয়া—বিশেষ প্রেম ও বিশ্বাস ব্যতীত অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব। এই সৌভাগ্যোদয় হইলে মানব মন আত্মার সহিত বিহার-সুখ উপভোগ করে। ইহাই আদিরসের প্রকৃত লীলা। ইহাই রাসলীলার প্রকৃত তত্ত্ব। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমোন্মত্ততার কারণ। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটী পন্থা। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ৺জগন্নাথই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাকারে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবই জীবের উচ্চতম রক্ষক (Guardian Angel) ভাবে ৺পুরীধামে অদ্যাপিও বিরাজমান। অন্য স্থানে ঐ প্রকার জাজ্জ্বল্য ভাবে বিরাজিত কি না, তিনিই জানেন। তবে এ অধমকে দেখাইয়াছেন তৎকালীন নবদ্বীপ এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত।

এক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অশ্লীল চিত্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। এ বিশ্ব সম্ভোগের বিরাট লীলাক্ষেত্র বা মন্দির। কোমল ও কঠিন দুইটী উপাদান এই লীলার উপকরণ। অপরিসীম জ্ঞানের ও অফুরন্ত প্রেমের সম্মিলন উচ্চতম সম্ভোগ। এই সম্ভোগই সচ্চিদানন্দময় বা হরদম তাজা অবস্থা। এই সম্ভোগের সুফল অনন্ত জীবন ও অপার আনন্দ। বিরাট আত্মার ও বিরাট প্রকৃতির বা বিশাল মনের সম্মিলন দ্বিতীয় স্তরের সম্ভোগ। এই সম্ভোগের ফল এই বিশ্বের সহিত যাবতীয় কার্য্যের ও চিন্তার উৎপত্তি। ক্ষুদ্র চৈতন্যময়ী মনের সহিত ক্ষুদ্র আত্মার সম্মিলন তৃতীয় স্তরের সম্ভোগ। মনের উৎকর্ষতানুসারে নির্বিকল্প সমাধি, মহাভাব, সবিকল্প সমাধি ও ভাব এই সম্ভোগের ভিন্নতর অবস্থা। সমাধি দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ, মহাভাব দ্বারা প্রেমের বিকাশ ও ভাব দ্বারা ভক্তির বিকাশ—তাহা আবার নিম্নস্তরের—হইয়া থাকে।

চতুর্থ বা নিম্নতম সম্ভোগ কোমল মনের সহিত কঠিন মনের। ইহা স্থূল দেহের সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে ও ইহাই মানবের ও প্রাণিজগতের সম্ভোগ সাধনের পন্থা। এই সম্ভোগে সুখের তুলনায় দুঃখের পরিমাণই অধিক। এই সম্ভোগের যে মাত্রায় আড়ম্বর, সুখটুকু কিন্তু সে মাত্রায় স্থায়ী নহে। এই সম্ভোগের প্রধান ফল সন্তানাদি উৎপাদন বা সৃষ্টিরক্ষা।

আত্মা হইতে জীব মন উদ্ভূত, আত্মায় স্থিত ও পরে আত্মায় মিলিত হয়। সুতরাং মনের সহিত প্রথমাবস্থায় আত্মার সম্বন্ধ জনক ও জননী ভাবে। শেষ

সম্বন্ধ স্বামী ভাবে। জীব-দেহই আত্মার ও মনের বিহার-মন্দির। যাঁহারা দেহের মধ্যে নিজ নিজ মনকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হয়েন তাঁহারাই এই সম্ভোগ সুখ উপভোগ করেন। এই সম্ভোগ সুখ জীবনের অবশ্য প্রাপ্য, কিন্তু উপরি-উক্ত দুই প্রকার সমাধি-মহাভাব ও ভাব দ্বারা। এই সম্ভোগের উচ্চতম ফল— সুশ্রুতি, সুদৃষ্টি, সু-ইচ্ছাশক্তি ও সু-কর্ম্মসাধন শক্তির বিকাশ। এই সম্ভোগের ফলে জীব মানবাকারে অবস্থিত থাকিলেও উচ্চতম দেবতা বা অবতার স্থান প্রাপ্ত হয়েন ও দেহান্তে ঊর্দ্ধতন রাজ্যে তাঁহাদের স্থিতি হয়। পরে কর্ম্মের আরও উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়েন। আভ্যন্তরিক সম্ভোগ কার্য্য সাধনের ইহাই ফল। কিন্তু মানবসুলভ বিহার কার্য্যসাধনের ফল আসক্তির প্রাদুর্ভাব, অবিরাম হায় হায় ধ্বনি ও প্রায়শঃ পুনর্জন্ম।

বিরাট বিশ্ব-মন্দিরের অভ্যন্তরে সংগোপনে উচ্চতম বিহার ও বহির্দেশের চতুষ্পার্শ্বে নিম্নস্তরের সম্ভোগ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, এই মহান তত্ত্বই স্থূল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝাইবার জন্য মন্দিরস্থ মূর্ত্তিগুলি ও বহির্দেশস্থ চিত্রগুলি সন্নিবেশিত।

শ্রীশ্রীযিশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন যে, যাহারা সম্বলশূন্য নহে তাহাদের ভাণ্ডার উত্তরোত্তর পূর্ণ হইবে, কিন্তু যাহারা সম্বলশূন্য বলিলেও হয়, তাহাদের সে সম্বল-টুকুও হারাইতে হইবে। মহাজন বাক্য বেদবাক্য। যাঁহারা ভক্তির, শ্রদ্ধার ও বিশ্বাসের কথঞ্চিৎ সম্বল লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে উপনীত হয়েন, তাঁহারা তত্রস্থ পূর্ব্বোক্ত ভক্তির ও প্রেমের প্রবাহে ভাসমান হইয়া অনুপম চৈতন্যধনে ক্রমশঃ ধনী হয়েন। কিন্তু যাহারা পাশববৃত্তিচয়কে হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রাখিয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে অতি অকিঞ্চিৎকর ভক্তি লইয়া কিম্বা মনোবৃত্তির বা চক্ষুর তৃপ্তির জন্য দেখা দেন, তাঁহারা মূর্ত্তি ও চিত্রগুলির আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা চিত্রগুলির যাবতীয় হাব-ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত চৈতন্য শক্তিটুকু হারাইয়া ফেলেন। এই প্রকার জীবের মধ্যে কেহ কেহ এই মন্দির কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে যত্নশীল হয়েন। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট এই শ্রেণীর জীব কত না বাহবা লাভ করেন।

আম্র-বাগানে প্রবেশলাভের সুবিধা পাইয়াও, এ বাগানটী কাহার, কি কি আম্রবৃক্ষ আছে ও কোন্‌টীতে কত ফল হয়, মনে হয় এই প্রকার তত্ত্ব আলোচনা করিবার জীবসংখ্যা অধিক।

তাহা হইলে এই প্রবন্ধ হইতে ইহা বুঝা গেল যে, তীর্থস্থানে যাইয়া যথাসম্ভব আত্মোন্নতি সাধন করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইলে নিম্নলিখিত বিধানে চলা বিধেয় :—

(১) তীর্থযাত্রা সাধটুকু যথাসম্ভব গোপন রাখা ;

(২) নিঃসঙ্গ হইয়া ও যৎসামান্য জিনিষ পত্রাদি লইয়া বাহির হওয়া ;

(৩) এমন স্থানে থাকা, যেখানে চিন্তায়, কার্য্যে বা বাক্যব্যয়ে সময়ের অপব্যবহার না হওয়া সম্ভব ;

(৪) শারীরিক সুস্থতা ও চিত্তপ্রফুল্লতা যাহাতে বৰ্দ্ধিত হয় তৎপ্রতি প্রথম লক্ষ্য রাখা ;

(৫) বাহ্যিক আড়ম্বর বা উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়া নিঃসঙ্গে দেব-দেবীর সমক্ষে উপনীত হওয়া ;

(৬) যাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে আসিয়াছি, উহা পাইলে তবে আর কিছু দেখিব, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করা ;

(৭) দেব-দেবী জাগ্রত, এই ভাব মর্ম্মে মর্ম্মে পোষণ করিয়া সেইস্থানে নির্ব্বাক ও নিঃসঙ্গ হইয়া উপবিষ্ট হওয়া ;

(৮) তাঁহাকে আপন পিতা, মাতা বা স্বামী, এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া প্রাণের ব্যথা সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করা ;

(৯) দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধারণা না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের গুণের ধারণা করা ;

(১০) তাঁহাদের যাবতীয় সৎগুণ দ্বারা নিজ দেহ, প্রাণ ও মন পূর্ণ করিতেছি, এই সিদ্ধান্ত করা ;

(১১) যে যে তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইলাম না, উহা স্থির ধীর ভাবে দিনের পর দিন নিজ মনে আলোচনা করা ;

(১২) সুপ্রবৃত্তি, সুদৃষ্টি, সু-ইচ্ছা ও সু-কর্ম্মসাধন শক্তি নিজে লাভ করিয়া ও পরে সেই সেই উপায়গুলি জগতে জ্ঞাপন করিয়া ঋণমুক্ত হইব, এই সাধ পোষণ করা।

বিচিত্র প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম-এ, বি-এল।]

কৃত্রিম রবর।—ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে—অভাবই আবিষ্কারের জনক। ইহা প্রকৃত সত্য কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিদ্রোহের প্রারম্ভে যখন ইয়ুরোপের সমুদয় দেশ ফ্রান্সকে আক্রমণ করে এবং বাহির হইতে সমুদয় আমদানী বন্ধ করে, তখন ফ্রান্স অভাবের তাড়নায় নিজ দেশেই কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী বাহির করে। জর্ম্মানীতেও বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে। আজ কাল নানা বিষয়ে রবরের একান্ত প্রয়োজন। বাইসিকল, গরুর গাড়ী হইতে চিকিৎসা ও বৈদ্যুতিক কার্য্যে পর্য্যন্ত রবর না হইলে এক দণ্ড চলে না, সেই রবরের আমদানী ইংলণ্ড জর্ম্মানীতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রকাশ—জর্ম্মানী কৃত্রিম উপায়ে রবর প্রস্তুত-প্রণালী বাহির করিয়াছেন, উহা আসল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রবর অপেক্ষা আদৌ হীন নহে। কৃত্রিম রং প্রস্তুত দ্বারা নীল প্রভৃতি আসল সমুদয় রংএর শিল্প জর্ম্মানী নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এইবার বা আসল রবর ঐ দশাপ্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় থিয়েটর।—আমোদ প্রমোদের রাজা ফরাসী জাতি। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় থিয়েটর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে। ইহার নাম প্যারিস অপেরা হাউস। ইহা ৯ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহার কেবল বাটী প্রস্তুত করিতে ৬০ লক্ষ টাকা লাগিয়াছে, ভিতরের অসাধারণ সাজসজ্জা সরঞ্জামের মূল্য স্বতন্ত্র।

৫ বৎসরব্যাপী সতরঞ্চ খেলা।—অন্য সকল খেলা অপেক্ষা সতরঞ্চ বা দাবাবড়ে খেলায় অধিক সময় লাগে, এমন কর্ম্মনাশা ও সময়নাশা খেলা আর নাই। তথাপি এক দান খেলায় ৫ বৎসর কাটিয়াছে, এরূপ কেহ শুনিয়াছেন কি? পৃথিবীর এক দিকে অষ্ট্রেলিয়ার অপর দিকে আমেরিকার দুই ব্যক্তির মধ্যে খেলা হয়। ডাকে পত্রযোগে পরস্পরের প্রতি খর পর চাল পরস্পরকে জানান হয়। এইরূপ এক দান খেলা পাঁচ বৎসরের পর সম্প্রতি শেষ হইয়াছে।

চিত্রের মূল্যবৃদ্ধি।—এদেশে সাধারণ লোকে জানে না যে এক একখানা চিত্রের মূল্য কত হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে চিত্রকরদের অঙ্কিত এক একখানা বিখ্যাত চিত্র লক্ষাধিক টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন কোন চিত্রের গুণ প্রথমে সকলে বুঝে না বা খ্যাতি হয় না। এ কারণে প্রথমে তেমন মূল্য হয় না, কিন্তু খ্যাতি বৃদ্ধি হইলে তদনুরূপ মূল্য বৃদ্ধিও হয়। ফ্রান্সের এক বিখ্যাত চিত্রকর (মেঁাসো ড্যোসে) নৃত্যকারিণী রমণীর এক চিত্র করেন এবং ৩০০৲ মূল্যে বিক্রয় করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি দেখিয়া যান, সেই চিত্র ক্রমে হাত বদলাইয়া পরিশেষে ২৬১০০০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন।—ইংলণ্ডে একটী ভদ্রলোকের বয়স ৮৬ বৎসর। তিনি এক কারখানায় প্রত্যহ দশটি ঘণ্টা কাজ করেন এবং ৮ মাইল দূরে নিজ বাটিতে প্রত্যহ ফিরিয়া যাওয়া আসা করেন। কচিৎ এরূপ শুনা যায়।

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা।

অনাথের মা।

[লেখক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।]

১

একদিন অপরাহ্নে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে দেখিলাম, গাছের তলায় একটী শীর্ণা রমণী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে; আর, একটী শীর্ণ শিশু রমণীর বাহুদেশে আপনার মস্তক রাখিয়া, ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত করিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না। তাহার নিকটে গিয়া শুনিলাম শিশু—অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে—বলিতেছে, "মা খাব—ম'রে গেলুম"।

বুঝিলাম, অনাহারে তাহাদের এই দশা।

আমি রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"হাঁ বাছা! তোমার কি কেউ কোথাও নাই?"

রমণী অতি কষ্টে চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবা গো, বাছাকে আমার

বাঁচাও গো—আজ দু'দিন থেকে—" তাহার কণ্ঠ রোধ হইল, আর বলিতে পারিল না।

এই অপূর্ব্ব করুণ দৃশ্যে পাষাণও গলিয়া যায়। আমার চক্ষুর্ব্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। বলিলাম,—"রাস্তায় কি করব,—আমার বাসায় যেতে যদি কোন আপত্তি না থাকে ত বল, তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাই।"

রমণী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে, তাহাদের বাসায় লইয়া আসিলাম।

কাশীতে আমি একাই আছি। স্ত্রীর কষ্টকর মৃত্যুর পর হইতে আমার সমস্ত বিষয়াদি দরিদ্র গুরু-পুত্রকে দিয়া এখানে আসিয়া, সংসারের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। গুরু-পুত্র আমাকে মাসিক এক শত টাকা পাঠাইয়া দেন। এই টাকায় এখানে দান ধ্যান করিয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতেই আমার বেশ চলিয়া যায়।

বাসায় পৌঁছিয়া আগে বালকের মুখে খানিকটা দুধ ঢালিয়া দিলাম। বালক যেন একটু সুস্থ হইল। তার পর সেই রমণীকেও কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, রমণী যে ঘরে শুইয়াছিল, সেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া দেখিলাম, রমণী পুত্রের মস্তক আপনার ক্রোড়ে লইয়া নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। বলিলাম—"কাঁদছ কেন বাছা, কি হ'য়েছে?"

আমাকে দেখিয়া তাহার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দেখুন না, বাছার বোধ হয় জ্বর হ'য়েছে, ছেলে আমার বাঁচবে ত? সে ছেলেও যে এমনি ক'রে আমার কোলের উপর মাথা রেখে কোথায় চ'লে গেছে; ওগো একে বাঁচাও গো, এও বুঝি তা'র মত পালিয়ে যাবে—"

আমি অগ্রসর হইয়া ছেলের নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, যথার্থই তাহার ভয়ানক জ্বর। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"ছিঃ বাছা, অত অধীর হ'লে কি চলে, এখনি আমি ডাক্তার আনছি।"

যথা সময়ে ডাক্তার আসিয়া ওষুধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জননী তিন দিন তিন রাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের সেবা করায় সে অনেকটা ভাল হইয়া উঠিল। এই তিন দিনের ভিতরে রমণীকে দিনান্তে এতটুকু দুধ খাওয়াইতে আমাকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব! কিছু [illegible] ভাল হ'ক, তার পর খাব। আহার

অভাবে সে ছেলে আমার মুখপানে চেয়ে ম'রেছে, এখন এও যদি সেবা অভাবে মারা যায়, তবে আর কি নিয়ে পোড়া প্রাণে বেঁচে থাক্‌বো ?"

আরও দুই দিন পরে ছেলে পথ্য পাইলে, জননী সুস্থ হইল। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এই পাঁচ দিন, কি জানি কেন, আমারও যেন আহারে রুচি ছিল না, নিদ্রায় শান্তি ছিল না। এই রমণীকে দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে আমার অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি যেন আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত।

৩

প্রায় পনর দিন অতীত হইলে প্রাণপণ শুশ্রূষায় রমণী ও তাহার পুত্র বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল।

এত দিনের মধ্যে রমণীর পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পাই নাই। আজ যেন আমার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া তাহার ঘরে গিয়া ধীরভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাছা, তোমার চেহারা দেখে ত বোধ হয় না—তুমি ভিখারিণী। আমার কাছে তোমার পরিচয় দিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তা হ'লে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার কৌতূহল দূর কর।"

রমণী লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া ধীর ভাবে বলিল—"আপনি আমার পিতার কাজ ক'রেচেন, আপনাকে না বলার কিছুই নেই। তবে হতভাগীর করুণ কাহিনী শুন্‌লে আপনি ব্যথা পাবেন ;—সে অনেক কথা।"

রমণী চুপ করিল।

আমি বিশেষ জিদ করায় রমণী বলিতে আরম্ভ করিল—"আমার স্বামী যখন চার বছরের ছেলে রেখে মারা যান, তখন এমন কিছু ছিল না, যাতে তাঁর সদ্গতি করি। পাড়া প্রতিবাসীরা দয়া ক'রেছিল তাই এ অভাগী তাঁর মুখ-অগ্নি করেছিল—"

বলিতে বলিতে অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। অনেক কষ্টে পূর্ব্ব শোক সম্বরণ করিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—"তার পর ছেলে নিয়ে কি করব, কোথায় যাব, কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লুম না। অনেক ভেবে শেষে মনে হ'ল, আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা আছেন। তিনি জমিদার। আমাকে মাসে কিছু কিছু ক'রে সাহায্য করবার জন্যে তাঁকেই একখানি পত্র লিখলুম। দু'চার দিনের মধ্যেই দাদা নিজে এসে আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন—"

রমণীর এই সকল কথা আমি বিভোর হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

সে বলিতে লাগিল—"'বৌদি' আমাকে পেয়ে কতই সুখী হ'লেন। তাঁর ছেলে পিলে ছিল না, আমার খোকাকে কোলে করে কত আদর কর্‌লেন। তার পর, অবেলায় স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'লেন। তাঁর ছেলে পিলে ছিল না ব'লে তিনি সব সময় শুদ্ধাচারে থাক্‌তেন।

"দাদা দান ধ্যান করতেন, বছর বছর বাড়ীতে পূজা আনতেন, সংসারের কোন কথায় তিনি থাক্‌তেন না। বৈকালে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের সহিত ধর্ম্মের আলোচনা কর্‌তেন।

"সেখানে গিয়ে আমার কোনই অসুবিধা হ'ল না, তবে একটী অসুবিধা হ'ল এই যে, ছেলের জন্যে বৌদির সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আধটু খুঁটিনাটি হ'ত। ঐ ছেলে কি ছুঁয়ে দিলে, এই সব নিয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে একটু আধটু ঝগড়া হ'ত, আবার মিটেও যেত।

"আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে, আমারই মত এক অভাগী ছিল। সেও বিধবা, তা'রও একটী ছোট ছেলে ছিল। কায়স্থের মেয়ে বিধবা, তা'তে আবার তা'র বড় একটা কেউ ছিল না; কাজেই তা'র বড় কষ্ট। সেই জন্যে আমি প্রায়ই তা'র সঙ্গে দেখাশোনা কর্‌তুম। এক দিন তার ভয়ানক জ্বর হ'ল। সে গরীব, কেবা দেখে, কেবা শোনে! আমি দাদাকে গিয়ে এই কথা বললুম। দাদাও আপনার মত সদাশয় ছিলেন। তিনি তা'কে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টা কর্‌লেন, কত টাকা খরচ কর্‌লেন; আমিও প্রাণপণে কত সেবা কর্‌লুম, কিন্তু কিছুতেই সে বাঁচল না। দশ দিনের দিন, তা'র এই ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে হতভাগী স্বর্গে চলে গেল। আর আমি?—সেই দিন থেকে বাছাকে বুকে করে—"

রমণী আবার কাঁদিল। আমার সন্দেহ ক্রমে সত্যে পরিণত হইতে লাগিল। আমারও চোক ফাটিয়া জল আসিল। অতি কষ্টে চাপা গলায় বলিলাম—"তার পর?"

রমণী চোক মুছিয়া বলিতে লাগিল—"সেই দিন থেকে বাছাকে নিয়ে মানুষ কর্‌তে লাগলুম। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। আগে ছিল একটী ছেলে, এখন দু'টী ছেলে হ'ল। বাড়ীতে আরও উপদ্রব বাড়তে লাগল। 'বৌদি' আমার উপর আরও বেশী বিরক্ত হতে লাগলেন। ছেলেগুলোকে কত মারধর কর্‌তুম, তবু তা'দের আঁটতে পারতুম না। দাদা কেবল জেনেছিলেন, আমি

চারুর ছেলেকে মানুষ করছি, কিন্তু তার জন্যে বৌদি'র যে কত ঝঞ্ঝাট বেড়েছে তা তিনি জানতেন না।

"একদিন বেলা ১১টার সময় বৌদি' আপনার ভাত বেড়ে খেতে ব'সেচেন। প্রথম গ্রাস মুখে তুলবেন, এমন সময় চারুর ছেলে একটা লাট্টু নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁ'র ভাতের থালায় ফেলে দিয়েচে। রাগে তিনি চীৎকার ক'রে ব'ললেন 'হারামজাদা ছেলে,আমাকে খেতেও দিবিনি'। আমি অন্য দিকে ছিলুম, দৌড়ে আসতেই বৌদি' আমাকে রেগে হাতমুখ নেড়ে চীৎকার ক'রে ব'ললেন—"এত উপদ্রব আর সহ্য হয় না। তুমি যা'ই বল ঠাকুরঝি, কিন্তু আমি আজ পষ্ট ক'রে বলছি, তোমার আর এক সঙ্গে থাকা হ'বে না—ওঁকে ব'লে আলাদা বাড়ী ক'রে থাক।" কাণ্ড দেখে আমার বড়ই ভয় হ'য়েছিল; তাতে আবার এই কথা শুনে. আমার মনটা যেন কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। সুর টেনে বললুম—"হ'তে ছেলের মা, তা' হ'লে বুঝতে ছেলের কেমন দরদ। অত অহঙ্কার ভাল নয় বউ—না হয় ভিক্ষে মেগে খাব, তার আর কি! মাথার উপর ভগবান্ আছেন।"

"তিনি গর্জ্জন ক'রে ব'ললেন—"তোমার ত বড় কড়া কড়া কথা ঠাকুরঝি, আমি কি মন্দ কথা বলিচি—তাই যাও না, ভিক্ষে ক'রে খাবার মজাটাই একবার দেখ না,—'আপনি খেতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে'। এই কথা শুনে আমি লজ্জায় ও দুঃখে কেমন হয়ে গেলুম।

"আমি খেলুম না ব'লে বৌদি'ও সমস্ত দিন কিছু খেলেন না। তার পর রাত্রে বৌদি' আমার কাছে এসে আমার হাত দু'টী ধরে ব'ললেন "ঠাকুরঝি, রাগের সময় কি ব'লিচি ব'লে কি আরও রাগ ক'রে থাকতে হয়? উঠ খাও, তুমি রাগ ক'রে আছ ব'লে তোমার যেন ক্ষিদে পায়নি; কিন্তু আমার পেট জ্বলে যাচ্চে—"

"এই কথায় অভিমানে আমার ঠোঁট দু'টা ফুলে উঠল। ব'লে ফেললাম—'না, আমি ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু যে লোক খাওয়ার খোঁটা দেয়, তার অন্ন আর স্পর্শ করব না।' এই কথা শুনে বৌদি'র মুখখানি সাদা হ'য়ে গেল। কোন-কথা না ব'লে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। হায়! কেন সে সময় তাঁ'র পায়ে ধরি নি? যদি ধরতুম তা' হ'লে বোধ হয় বাছা আমার মরত না। কি করব, পোড়া অভিমান আমায় পাগল ক'রেছিল। বাড়ীতে যে এত কাণ্ড হ'চ্ছিল দাদা তার গন্ধও পান নি।"

এতক্ষণে, আমার সন্দেহ যে সত্য, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। ব্যগ্রভাবে বলিলাম—"বল বল, তার পর কি হ'ল, তার পর কি হ'ল, তার পর তুমি বুঝি সেই রাত্রেই তোমার দুই ছেলেকে নিয়ে বাড়ী থেকে কোথায় পালিয়ে গেলে?"—আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল।

রমণীর মনে যেন খট্‌কা লাগিল। বলিল—"আপনি কি ক'রে জান্‌লেন? দাদার সঙ্গে আপনার চেনা আছে না কি?

আমি বলিলাম—"না, তা' নয়, তোমার কথায় আমার অনুমান।"

রমণী নিঃসন্দেহে পুনরায় বলিতে লাগিল—"সেই রাত্রে ছেলে দুটাকে কোলে ক'রে গোপনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সমস্ত রাত তা'দের কোলে ক'রেই রাস্তা হাঁট্‌লুম। জ্যোৎস্না ছিল বোলে অমন ক'রে হাঁট্‌তে পেরেছিলুম। তার পর বেলা প্রায় ৮টার সময় আপনারই মত একটী সদাশয় বৃদ্ধ আমাদের আশ্রয় দেন। বৃদ্ধের কেউ ছিল না, তাঁ'রই কাছে প্রায় এক বছর কাটাই। তার পর আমার কপাল ভাঙ্গ্‌ল,—বৃদ্ধ মারা গেলেন। আমরাও আবার যে পথিক, সেই পথিক হ'লুম।

"সেই দিন থেকে ভিক্ষে কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। গান গাইতে পারি নে ব'লে, ভিক্ষাও কেউ দেয় না; তবে কেউ না কেউ দয়া ক'রে যা' এক আধ মুঠো চা'ল দিত তাতেই যাহোক ক'রে ছেলে দু'টোকে খাওয়াতুম। নিজে প্রায়ই উপবাসে থাক্‌তুম। আগে চারুর ছেলেকে খাইয়ে তার পর যা' থাক্‌ত তা'ই নিজের ছেলেকে খাওয়াতুম। তা'র খেয়ে যদি কোন দিন দু'টি বাড়্‌ত তবেই নিজে খেতুম।

"এমনি ক'রে না খেয়ে খেয়ে, পথে পথে ঘুরে ঘুরে আমার দেহ ভেঙ্গে পড়্‌ল। আর তেমন ভিক্ষে কর্‌তে পার্‌তুম না। আমার জ্বর হ'ল। যা' কিছু অল্প স্বল্প পেতুম তা'তে এই বাছার একলারই কুলাত না, কি কর্‌ব, তা'ই যা' হোক্‌ ক'রে, বেশী কম ভাগ ক'রে দু'জনাকে খাওয়াতুম। না খেতে পেয়ে আমার ছেলেরও অসুখ হ'ল। তখন তা'র মাথাটি আমার কোলের উপর রেখে 'হা ভগবান্‌, হা ভগবান্‌' ছাড়া আর কিছু কর্‌তে পারতুম না। তার পর—তার পর সব শেষ!

"এক দিন সে আমার মুখপানে চেয়ে "মা মা, জল দে, জল দে" বল্‌তে বল্‌তে কোথায় চলে গেল। হায় হায়! মরণকালে বাছা আমার একটু জলও খেতে পেলে না!"

রমণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঘুমন্ত ছেলের মুখে চুমু খাইয়া আবার বলিতে লাগিল—"যাক্, তা'র মৃত্যু ছিল সে ম'রেচে, কিন্তু ভগবান এখনও আমায় মা ব'লে ডাকা বন্ধ করান নি। আমার এক ছেলে গেছে, এখনও এক ছেলে আছে। ম'শাই বল্‌তে কি, বাছাকে আমার চাকর ছেলে ব'লে একবারও মনে হ'য় না,—মনে হয় এ যেন আমারই গর্ভজাত। হাঁ, তার পর তা'কে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দেবার পর, আমার যা' যা' হয়েছিল, তা' আপনি জানেন।

"এই সময় আমার বুকের মধ্যে যে কি করিতেছিল, সে যে কত যন্ত্রণা তা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম—"মাধবী, অভাগী, তোর এই দুর্দ্দশা? ভগ্নি! এই হতভাগাই তোর যোগিন দাদা—"

মাধবী অবাক্ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমার মনে ভয় হইল। এই সময় এক প্রাণহীন বাতাস আসিয়া প্রদীপটী নিবাইয়া দিল। প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলাম, মাধবীর সংজ্ঞা নাই। ভাবিলাম, ভাল কাজ করি নাই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার জ্ঞান হইল। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "বল দাদা বল—তোমার এ দশা কেন—বৌদি' ভাল আছেন ত?"

আমি বলিলাম—"হা অভাগী! তুমি চলে আস্‌বার তিন মাস পরে হঠাৎ গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দেয়, গ্রাম প্রায় উজাড় হ'য়ে যায়। তোমার বৌদি'ও সেই রোগে মারা যায়। এখন বুঝ্‌তে পারছি কেন সে মর্‌বার সময় বলেছিল—"ওগো তোমরা যেমন কোরে পার একটিবার ঠাকুরঝিকে এনে দেখাও। তা' না হ'লে আমি সুখে মর্‌তে পারব না—অভাগী যে আমার কথার জ্বালায় দেশ ছাড়া হ'য়েচে—" হায়! বোন, সে সময় কত খুঁজেও তোমায় পাইনি, যদি পেতুম তা হ'লে বোধ হয় সে অত কষ্ট পেয়ে মরত না—"

মাধবী পুনরায় মূর্চ্ছা গেল।



অর্চ্চনা, ১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

মীমাংসা-দর্শনে অলৌকিকবাদ।

[অধ্যাপক—শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ।]

আমরা হিন্দু। বেদোক্তধর্ম্ম আমরা আচরণ করিয়া থাকি। কথায় কথায় বেদের দোহাই দিই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদের ধর্ম্মের উপর দোষারোপ করিলে আমরা বলিয়া থাকি, ধ্রুব সত্য স্বরূপ অপৌরুষেয় অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ বেদ যে ধর্ম্মের মূল, তাহা কি কখনও ভ্রমাত্মক হইতে পারে? কিন্তু ইহা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় হইলেও সত্য বলিতে বাধ্য যে, বেদ আমাদের ধর্ম্মের মূল হইলেও—সর্ব্বস্ব হইলেও—হিন্দু আমরা, বঙ্গবাসী আমরা—আমাদের অনেকেই—বেদ যে কি, কেনই বা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকে এবং এই অপৌরুষেয়বাদ বা অলৌকিকবাদের কতদূর প্রামাণ্য, আর বেদের শাসন-বাক্য অর্থাৎ বিধিবাক্য সমূহকে কি কারণে বিনা তর্কে নতশিরে মানিয়া চলি, তাহা জ্ঞাত নহেন। যে বেদ অলৌকিক—পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, দেবতা ও পিতৃলোকাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং তদনুসারে দেবতা ও পিতৃলোকাদির তৃপ্তিসাধন জন্য ত্যাগরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলেন, সেই বেদ উন্মত্ত প্রলাপবৎ উপেক্ষণীয় না হইয়া বরেণ্য ও পূজার্হ কেন? আর এক কথা, বেদ কর্ম্মভূত গ্রন্থ অথচ ইহার কর্ত্তা অর্থাৎ রচয়িতা কেহ নাই? ইনি স্বয়ম্ভূ, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহা বোধ হয় অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। অনেকে আবার এই বিষয়কে আরব্য উপন্যাসের মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না।

বাস্তবিক ইহা বিশেষ রূপে ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই যে, রচয়িতা নাই অথচ গ্রন্থ হইল, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? এই বিষয়ে "মীমাংসাদর্শনে" যতদূর সম্ভব হইতে পারে সুন্দররূপে যুক্তিজাল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দর্শনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া—কেন এই বেদ প্রামাণ্য, তাহার সিদ্ধান্তমুখে বেদ যে অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ-নির্ম্মিত নহে এবং ইহা যে পুরুষ-নির্ম্মিত হইতেই পারে না, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন

করিয়াছেন। অদ্য মীমাংসাদর্শনের এই অলৌকিকবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মীমাংসাদর্শন বলেন, বেদ কোনও লোক-নির্ম্মিত নহে। যদি ইহা লোক অর্থাৎ পুরুষ-নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে উহার অর্থবোধ করা একান্ত অসম্ভব হইত; তাহার কারণ বেদ আদি গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে যে, কোনও ভাষায় রচিত কোনও গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। ইহা সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে ও স্বয়ং বেদেও উক্ত আছে যে, বেদ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু সমূহের নামকরণ হইয়াছে। এখন এই বেদকে পৌরুষেয় বলিলে ইহা বুঝা যায় যে, কোনও লোক স্বীয় কল্পনাবলে জগতের তাবৎ বস্তু সমূহের সংজ্ঞা সংযোজিত করিয়া এই বেদ রচনা করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, ঐ ব্যক্তি যিনি স্বীয় কল্পনাবলে বস্তু সকলের নামকরণ করিয়াছেন, তিনি অন্যকে উহা কি প্রকারে বুঝাইতে পারেন? তখন এমন কোনও সাধারণ ভাষা ছিল না যাহার সাহায্যে তিনি এই সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-জ্ঞান অন্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে পারেন। আর যদি কোনও ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহাই বা কিরূপে সাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল? এইরূপে যাহাকেই মূল রূপে কল্পনা কর না কেন, শেষ স্বীকার করিতেই হইবে যে, এমন এক অলৌকিক অধুনাতন অজ্ঞাত ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থ ছিল, যাহা কেহই সৃজন করিতে পারে না। এখন এই পরিদৃশ্যমান বেদকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ অদৃষ্ট—অপরিচিত এবং অচিন্ত্য ভাষারচিত গ্রন্থের উপর এই অলৌকিকবাদ স্থাপন করিতে যাই কেন? যখন অপৌরুষেয়বাদ স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তরই নাই তখন পুরুষপরম্পরাক্রমে মনীষিবৃন্দ যাহাকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিব না কেন? হয় ত বলিতে পারেন, এই ভাবে জগতের সমুদয় ভাষার উপরই এই অলৌকিকবাদ স্থাপন করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, একমাত্র এই বেদ হইতেই জগতের যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মূল যখন সকলেরই এক, তখন ভাষা সকলের এরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, মানব রসনা স্বভাবতঃই অলস; জোর করিয়া প্রযত্ন করিয়া রসনা দ্বারা বাক্য সকল উচ্চারণ করাইয়া লইতে হয়। এমত অবস্থায় মানবগণ যত সংক্ষেপে ও সহজ কথায় মনোভাব অন্যকে বুঝাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। দেশভেদে, জল বায়ুর বিভিন্নতা হেতু, প্রকৃতিভেদে

একই শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন ভাব ধারণ করে। ইহা বুঝাইতে যুক্তিতর্কের অবতারণা নিরর্থক। এইরূপে বিভিন্ন হইতে হইতে ক্রমশঃ জাতিভেদে সম্প্রদায়ভেদে দেশভেদে মূলতঃ একই ভাষা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

আর এক কথা—যদি এই বেদকে কোনও পুরুষ-নির্ম্মিত ধরা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র প্রায় পৃথিবীর তাবৎ দুর্গম প্রদেশেও সেই একই শব্দের দ্বারা একই বস্তু আখ্যাত হইতে পারিত না। যেমন গো শব্দ—এই গো শব্দ পৃথিবীর যত ভাষা আছে, সমুদয় ভাষাতে প্রায় একই ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। (বাহুল্য ভয়ে ইহার বিশ্লেষণ ও অন্যান্য উদাহরণ প্রদত্ত হইল না) একজন লোক কখনই সমগ্র পৃথিবী এবং অতি দুর্গম প্রদেশাদিতে উপস্থিত হইয়া প্রতি ব্যক্তিকে স্বীয় মনঃ কল্পিত ভাষা শিক্ষা দিতে পারে না। আর এক কথা, যেখানেই হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেই খানেই দেখিবে হিন্দুদিগের আচার, ব্যবহার, জপ, হোম, দেবারাধনা, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি ঠিক একই ভাবে সুসাধিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, বেদ কখনও পুরুষবিশেষ প্রণীত নহে; কারণ, এই সার্ব্বজনীন সামঞ্জস্য পুরুষবিশেষের প্রযত্ন সাপেক্ষ হইতে পারে না।

আর এক কথা, যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিতে চাহেন, তাঁহারা "অর্থাপত্তি" নামক প্রমাণ দ্বারা উহা সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। "উভয় বাক্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তৃতীয় বাক্য অবলম্বন করিলে যাহার সমাধান সুসাধিত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে।" যেমন স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করে না। এখানে অভুক্ত ব্যক্তির স্থূলত্ব অসম্ভব, অতএব বিরোধ হইল, কাযেই এই স্থূলত্ব ও দিবসাভোজনত্বের বিরোধপরিহারার্থ অনুল্লিখিত তৃতীয় বাক্য রাত্রি ভোজনের কল্পনা করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ এই স্থলে, রচয়িতা ব্যতীত গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারা যায় না, এখানে গ্রন্থ আছে কিন্তু রচয়িতা নাই, এই বিরোধ হইল, এই বিরোধ পরিহার জন্য অজ্ঞাতনামা রচয়িতার কল্পনা করিয়া অলৌকিকবাদ প্রামাণ্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। বলা বাহুল্য যে, এই মতও বিচারসহ নহে। এখন দেখা যাউক, অর্থাপত্তির স্থল কোথায়? যে স্থলে উভয় বাক্যের সমাধেয় বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই অর্থাপত্তির স্থল। কিন্তু এই স্থলে বিরোধেরই সম্ভাবনা নাই। কেন না, দৃষ্ট প্রমাণ বলে আমরা দেখিতেছি যে, এই বেদ গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া না যাইলেও গুরুপরম্পরাক্রমে পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় গুরুর নিকট এই বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাকে কেহই গ্রন্থকারের নিকট হইতে পায় নাই। কাযেই

এখানে গ্রন্থ দেখিয়া রচয়িতার কল্পনারূপ অর্থাপত্তির স্থল দৃষ্ট প্রমাণ বিরুদ্ধ হেতু হইতে পারিল না। কেন না, দৃষ্ট প্রমাণ অন্য সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ হইতে বলবত্তম।

ইহার উত্তরে অন্য পক্ষ বলেন, যদি কর্ত্তার উপলব্ধি না হইলেই অপৌরুষেয় হয়, তাহা হইলে দুর্গম গিরিসঙ্কুল প্রদেশে অথবা গভীর অরণ্যমধ্যে যে-কূপ আরাম প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও তাহা হইলে অপৌরুষেয় বলিতে হয়। কারণ ঐ সকল কূপাদিকর্ত্তার উপলব্ধি হয় না, এবং উহারাও লোকপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সিদ্ধান্তবাদী ইহার উত্তরে বলেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ ঐ সকল কূপ আরামাদির কর্ত্তা কেহ না কেহ ছিল; দেশোৎসাদন নিবন্ধন অথবা অন্য কোনও কারণ প্রযুক্ত লোকবাসের উচ্ছেদ হওয়াতেই ঐ সকল কূপ আরামাদি কর্ত্তাকে লোকে জানিতে পারে না; কিন্তু এই বিচার্য্যমাণ বেদ সম্বন্ধে ঐরূপ লোকপরম্পরার উচ্ছেদ অর্থাৎ সম্প্রদায় বিচ্ছেদ কখনই কোনও সুদূর অতীতেও হয় নাই। অর্থাৎ এমন কোনও সময় ছিল না, যে সময় এই বেদের পঠন পাঠনা রূপ সম্প্রদায়ের প্রচলন ছিল না। অতএব বর্ত্তমান সময়ে কর্ত্তার বিস্মরণ সম্ভবপর হইলেও যদি ইহা পুরুষবিশেষের সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে যৎকালে উহা বিরচিত হইয়াছিল, তৎকালে উহার কর্ত্তাকে "পানিনি" প্রভৃতির ন্যায় কেহ না কেহ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন। ভারতবর্ষ এতদূর অকৃতজ্ঞ ছিল না যে, নিখিল তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানরত্নভাণ্ডার এই বিশাল বেদ প্রণেতাকে অনাদর ও উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতি জলধিজলে বিসর্জ্জন দিতে পারে।

আর এক কথা বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয় আছে যে, এই বেদ কখনই পুস্তকাকারে লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই, পরমমেধাসম্পন্ন দ্বিজাতিগণ অতি পবিত্রভাবে সম্মান ও যত্ন সহকারে শোণিত ধারার ন্যায় ইহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং উপযুক্ত শিষ্যদিগকে মুখে মুখে উদাত্তাদি স্বর বিশেষের সহিত অভ্যাস করাইতেন। কাজেই ইহা ইদানীন্তন দুর্গম প্রদেশাদিতে প্রাপ্ত পুস্তকাদির ন্যায় তৎকালে গুরুপরম্পরা ব্যতীত প্রাপ্তির সম্ভাবনাই ছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা জ্ঞাতসত্ত্বে বেদ-প্রণেতার নাম, শিষ্যবর্গের নিকট গোপন করিয়া গিয়াছেন, ইহা সম্ভবপরই হইতে পারে না।

যাক, এখন এই ভাবে বেদের অলৌকিকত্ব সুদৃঢ় করিয়া মীমাংসাদর্শনকার এই অলৌকিকবাদের উপর প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়াছেন।

এখন আমাদের বিশেষরূপে জানিবার বিষয়, মীমাংসাদর্শনের এই অলৌকিকবাদের উপর আমাদের আর্য্যধর্ম্ম কিরূপ ঋণী। এই অলৌকিকবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের এই ধর্ম্ম কখনই "সনাতন" আখ্যাপ্রাপ্ত হইতে পারিত না; এবং হয়ত চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদিগণের প্রবল তর্কে তথা বিধর্ম্মিদিগের একান্ত নিষ্পেষণে এতদিন কোন অতল কাল-বারিধি গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত।

এই ধর্ম্ম অলৌকিক বলিয়া, সনাতন বলিয়া ইহা একটুও ভ্রম প্রমাদাদি পুরুষদোষ দুষ্ট নহে। ইনি যাহা বলেন তাহাই ধ্রুব সত্য, খাটি-সোনা, সর্ব্বতোভাবে শ্যামিকাদি দোষ বর্জ্জিত।

আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ব্যতীত সমুদয় ধর্ম্মই পৌরুষেয়, সুতরাং পুরুষদোষ দুষ্ট। আমরা যে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করি, তাহা কোন পুরুষবিশেষকে আপ্তত্ব স্থির করিয়া, তাহাকে দ্বার করিয়া নহে। শুদ্ধ ধর্ম্মকে দ্বার করিয়াই ধর্ম্মকে বিশ্বাস করি, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ভাবি, ধর্ম্মের জন্য তুচ্ছ প্রাণকে অনলে আহুতি দিই। এ বিষয়ে একটুও দ্বিধা করি না, একটুও সঙ্কোচ বোধ করি না।

আমরা জন্ম জন্মার্জ্জিত কোটী পুণ্য ফলে এই অলৌকিক সনাতন ধর্ম্ম-পরায়ণ গৃহে উদ্ভূত হইয়াছি, এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমরাই ধন্য, আমরাই কৃতকৃত্য। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ওঁ।

সত্যের আবরণ।*

[লেখক—শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।]

জেরাল্ড হাইডেন লক্ষপতির সন্তান; কিন্তু ধনীর পুত্রগণ যেমন সাধারণতঃ পিতৃ-সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য ভোগবিলাসে ক্ষয় করিয়া থাকেন, তিনি তাহা না করিয়া সেই সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিয়মের এমন বাঁধাবাঁধি ছিল যে, প্রাত্যহিক কোন কাজে কোন দিন এক চুল ইতর বিশেষ হইত না। তিনি সুপুরুষ ছিলেন এবং সচ্চরিত্র, দাতা ও বিনয়ী বলিয়া সমাজে

* ইংরাজী হইতে।

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন একটা বিমর্ষ ভাব তাঁহার মুখে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে, সেটা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতেন—"কৈ এমন ত কিছু নয়।" স্ত্রীকেও তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখিয়াছিলেন; তাহার সামান্যতম সাধেও বাধা দিয়া তিনি তাহার মনোকষ্টের কারণ হইতেন না।

স্ত্রী পেট্রিশিয়া হাইডেনও মধুর স্বভাবাপন্না ছিলেন। স্বামীকে সুখে রাখা যে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—একথা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। মিশুক বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণের অন্ত ছিল না। যে নিমন্ত্রণ তাঁহার স্বামীর গৃহে অবস্থানকালীন সঙ্গদানে অন্তরায় হইত না, তিনি শুধু তাহাই গ্রহণ করিতেন।

স্বামীও বাঁধা নিয়মে আফিস যাইতেন এবং বাটী ফিরিয়া আসিতেন। পেট্রিশিয়া সে সময় অবগত ছিলেন বলিয়া তৎপূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এমন একদিনও হইত না যে জেরাল্ড বাটী ফিরিয়াছেন কিন্তু পেট্রিশিয়া বাটীতে নাই। তিনি যেমন গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে নিপুণা তেমনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। কাহারও পীড়ার সংবাদ কর্ণগোচর হইলে আনন্দের সহিত তাহার সেবা করিতেন এবং দরিদ্র হইলে নিজ ব্যয়ে তাহার পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। তাই আনন্দের নিমন্ত্রণ অপেক্ষা পীড়িতের পরিচর্য্যায় নিমন্ত্রণ তাঁহার অধিক জুটিত।

একদিন জেরাল্ড আফিস হইতে ফিরিলেন কিন্তু পেট্রিশিয়াকে গৃহে দেখিতে পাইলেন না। বাঁধা নিয়মের এই ব্যতিক্রমে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; শেষে সূপকারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, হাঁসপাতালের একটী লোক আসিয়া আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য তিনি বার্ক লিভিংষ্টোনদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া সূপকারকে টেলিফোনি দ্বারা লিভিংষ্টোনদের জানাইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পেট্রিশিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জেরাল্ড বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় তিনি পেট্রিশিয়ার বদনে একটী গভীর বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করিলেন। পেট্রিশিয়া জেরাল্ডের ভাবে তাঁহার প্রশ্ন বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "ও কিছু নয়। আমি শীঘ্রই ভোজনের বেশ পরিধান করিয়া আসিয়া তোমার সহিত একত্র ভোজন করিতেছি; ভোজন করিতে করিতে হাঁসপাতালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিব।"

যখন ভোজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন পেট্রিশিয়া বলিলেন, "কতকগুলি নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়া সবে ফিরিয়াছি, এমন সময় হাঁসপাতালের একটী লোক আসিয়া বলিল যে, একটী যুবতী মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া আহত হইয়াছেন। যুবতীর যে নাম বলিল, তাহা কখনও শুনি নাই, কিন্তু——"

জেরাল্ড কথা লুফিয়া লইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন "কিন্তু তুমি গেলে।" এমন ভাবে এই কথাটা বলিলেন, যেন এ সংবাদ পাইয়া পেট্রিশিয়া যে ছুটিবে তাহা তাঁহার বিশেষ জানা ছিল।

পেট্রিশিয়া কহিলেন "হাঁ, যাইলাম তো বটেই। যখন আমি হাঁসপাতালে পৌঁছিলাম, তখন হাঁসপাতালের লোকেরা আমাকে বলিল যে, আহতা যুবতী বোধ হয় অল্পক্ষণই বাঁচিবে; কারণ বাহিরে আঘাতের কোন গুরুতর চিহ্ন না থাকিলেও ভিতরের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে, কিন্তু ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে গেলে বলিতেছে, পেট্রিশিয়া অগডেন হাইডেনের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমি ঔষধাদি গ্রহণ করিব না। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার এত আগ্রহ কেন? নাম জিজ্ঞাসা করায় হাঁসপাতালের লোকেরা বলিল—নাম ক্যালভার্ট—জর্জ্জিয়া ক্যালভার্ট।"

জেরাল্ডের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, কিন্তু আলোর আবছায়ায় পেট্রিশিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। পেট্রিশিয়া যখন এই ঘটনাটা বলিতেছিলেন, তখন কি জানি কেন 'জর্জ্জিয়া' নামটাই কেবল জেরাল্ডের মনে উঠিতেছিল। যেই পেট্রিশিয়া নামটা উচ্চারণ করিলেন, আর যেন জেরাল্ড সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি উঠিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া পুনরায় আসনগ্রহণ করিলেন।

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন "হাঁসপাতালের লোকেরা আমাকে যুবতীর নিকট লইয়া গেল। দেখিলাম—জগতের সৌন্দর্য্য গায়ে মাখিয়া যুবতী নির্জীব ভাবে শয়ন করিয়া আছে; আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার চিহ্ন-স্বরূপ কেবল মাঝে মাঝে মুখ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র যেন তাহার সকল যন্ত্রণা দূর হইল; ধীরে ধীরে কহিল যে, সে তোমাকে ভালবাসে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতে সাহস করিয়াছে। তাহার কথায় বুঝিলাম যে, তুমি যখন অসুস্থ হইয়া সাউথকোষ্টের একটি পল্লীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গমন কর তখন তাহার সহিত তোমার পরিচয় হয়। তাহাকে তোমার মনে পড়ে কি জেরি?"

প্রশান্তভাবে জেরাল্ড উত্তর করিল, "পড়ে।"

পেট্রিশিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তাঁহার কথায় ভাবে বুঝিলাম সে সেইস্থানে তাহার পিতামহ দ্বারা পালিত হইত এবং সেই নির্জ্জন সাসেক্স পল্লীতে সে জীবন্মৃত হইয়া বাস করিত। তোমার তথায় গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে জীবনের সুখ বা ভালবাসা কাহাকে বলে, জানিত না। অদৃষ্টক্রমে তোমাদের একত্রাবস্থানের সুযোগ ঘটে এবং যত দিন যায় ততই সে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তোমরা প্রায় প্রত্যহই, হয় অশ্বারোহণে নয় পদব্রজে বেড়াইতে যাইতে। এ সব কথা তোমার মনে পড়ে ?"

জেরাল্ডের স্মৃতি তখন সেই শান্ত সাসেক্স-পল্লীকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতে-ছিল—সেই কুঞ্জ-ঘেরা কুটীর, সেই কুসুম-কিঞ্জল্কসমা যুবতী, সেই গোলাপবাগে কত জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল বাক্যগর্ভ কত নিশি, বাক্যহীন মুহূর্ত্ত, শিরায় শিরায় কত তড়িৎ-প্রবাহ—পেট্রিশিয়ার প্রশ্নে তাঁহার সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ; মস্তক আন্দোলিত করিয়া উত্তর দিলেন "মনে পড়ে।"

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন "সে বলিল—তুমি কখনও তাহাকে একটী প্রেমের কথাও বল নাই ; তুমি কেবল মাত্র তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে এবং কার্য্যে তোমার সৎসাহসের পরিচয় দিতে। সে কিন্তু যৌবন-সুলভ অজ্ঞানতার বশে স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, তুমি তাহাকে ভালবাস এবং একদিন না একদিন তুমি তাহাকে মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিবে। সেই নির্জীব পল্লীতে বাস করিয়া তোমার সঙ্গপ্রাপ্তিতে সেই সময় জীবনে প্রথম তাহার মনে হইয়াছিল যে, সে প্রকৃতই বাঁচিয়া আছে—তাহার জীবন ব্যর্থ নহে। তার পর একদিন রাত্রিতে তুমি তাহাকে জানাইলে যে, তুমি তথা হইতে চলিয়া আসিতেছ এবং সত্বরেই তোমার বিবাহ হইবে ; আরও বলিয়াছিলে যে, তোমার সেই নির্জ্জন নির্ব্বাসন তাহার সঙ্গপ্রাপ্তিতে সুখকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে জন্য চিরজীবন তুমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তার পর সেখাম হইতে তুমি চলিয়া আসিলে, এবং আমাদের বিবাহ হইল। কিন্তু জেরি! সেই বালিকার সুখ কাড়িয়া লইয়া আমি ভোগ করিতেছি—এটা নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যাপার বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

এক প্রকার বিষাদপূর্ণ মৃদুহাস্যে জেরাল্ডের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু সে আমাকে বলিল যে, বহু চেষ্টা করিয়াও সে তোমাকে ভুলিতে সক্ষম হয় নাই। ভালবাসাই তাহার জীবনের

ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিন থাকিতে থাকিতে তাহার এমন একটা ধারণা হইয়া গেল যে, তোমার কথা নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করা তাহার পক্ষে বোধ হয় পাপ নহে। বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ যে ভালবাসা তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম;—আমি বোধ হয় সমস্ত ভাল ভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু সেই মুমূর্ষু বালিকা যখন বলিয়াছিল, তখন আমি সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি বলিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, তুমি সব বুঝিতে পারিতেছ কি না।"

"আমি বুঝিতেছি, সব বুঝিতেছি"—জেরাল্ড অস্বাভাবিক গাঢ়স্বরে এই উত্তর করিলেন।

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ধারণাটাই তাহার শূন্য হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর তাহার পিতামহের মৃত্যুতে সে দারিদ্র্যের সর্ব্ব-নিম্নস্তরে পতিত হয়। তাই আজ তিন দিন পূর্ব্বে সে এই নির্দ্দয় হৃদয়হীন সহরে আসিয়াছিল। পল্লী-নিবাসিনী সে, সহরের জনতায় অভ্যস্ত নহে, তাই রিজেণ্ট ষ্ট্রীট অতিক্রমের সময় একটী মোটর, গাড়ী চাপা পড়িয়া বিষম আহত হইয়াছে।"

উদ্বেগপূর্ণ ভগ্নস্বরে জেরাল্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার জীবনের কি কোনই আশা নাই?"

পেট্রিশিয়া কহিলেন, "বিন্দুমাত্র না। হাঁসপাতালের লোকেরা ইহা জানাইবার পূর্ব্বে সে নিজেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। হাঁসপাতালের লোকেরা তাহাকে তাহার দুরারোগ্য আঘাতের কথা জানাইতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ, সময়ে সে সংবাদ না জানাইলে যদি সে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় তবে তাহাও ঘটিয়া উঠিবে না। কিন্তু এমন আত্মীয় বা বন্ধু তাহার কেহই ছিল না। একবার ভাবিয়া দেখ প্রিয়তম,—কি তাহার অবস্থা! কপর্দ্দকহীন, বন্ধুহীন ভাবে হাঁসপাতালে মরিতেছে,—আর এত বড় জগতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে, তাহার দুঃখে একবার মুখেও 'আহা' বলে। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল। সাধ্বী সে—তাই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে দেখিতে চাহিল না, কিন্তু আমাকে না ডাকিতে পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। আমার মনে হয়, তোমার বিবাহের পরও তোমাকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়া সে অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং নীরবে যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল। সে সরল ভাবে তাহার এই মানসিক পাপ আমার

নিকট ব্যক্ত করিয়া, তোমার নিকট তাহার প্রণয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অতি সহজ ভাবে আমাকে বলিল। বলিল—"ভাই! তোমার স্বামীর জীবন সুখে, সম্পদে, তোমার প্রণয়ে পূর্ণ হইলেও, অপর একটী নগণ্যা রমণী তাঁহাকে যে আজীবন লুকাইয়া কত ভালবাসিয়াছিল—ইহা জানিলে তিনি অল্প—অতি অল্প আনন্দ পাইতেও পারেন; কারণ তিনি সচ্চরিত্র হইলেও,—পুরুষ।"

জেরাল্ড একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"হে দয়াময়!"

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে তাহার ভালবাসার কথা জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলে সে অনেকটা শান্ত ভাব অবলম্বন করিল। ক্ষণেক পরে সে অতি ক্ষীণস্বরে কতকটা অস্পষ্টভাবে বলিল, "মিসেস্ হাইডেন! আমার মনে হয়—আমার জীবনটা একবারে ব্যর্থ হয় নাই, কারণ আমি ঈশ্বরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে ভালবাসিয়াছি; তবু মনে হয়—জীবনটা আমার আদৌ ব্যর্থ হইত না যদি তিনি তাঁহার মনের এক কোণে আমাকে একটুও স্থান দিতেন। আজ যদি শুধু এইটুকুমাত্র জানিয়া যাইতে পারিতাম যে, তিনি আমাকে অতি অল্প একটুখানিও ভালবাসেন, তবে এই অন্তিম দিনে স্মরণ করিবার মত একটু কিছু পাইতাম, আর সেই স্মৃতিটুকু আজ আমার এই ভয়াবহ মৃত্যুকেও আনন্দে মণ্ডিত করিয়া তুলিত। তার পর—"

জেরাল্ড ব্যগ্রভাবে যেন প্রতিধ্বনি করিলেন—"তার পর?"

পেট্রিশিয়া বলিতে লাগিলেন, "তারপর তা'র জীবন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; দেখিয়া আমার বোধ হইল—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। একটী নির্ম্মল জীবন সুখের স্মৃতিটুকু লইয়াও মরিতে পাইবে না—ইহা ভাবিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। অকস্মাৎ আমি বলিয়া ফেলিলাম, "সে তোমাকে ভালবাসে জর্জ্জিয়া! তোমাদের পরিচয়ের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে সে তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সে আমাকে বাক্‌দান করিয়াছিল, তাই সে তোমাকে তাহার প্রণয়জ্ঞাপন করিতে পারে নাই। করিলে, আমার নিকট অবিশ্বাসী হইত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে।" জর্জ্জিয়ার আয়ত নীল চক্ষু স্বর্গীয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাচ ধীরে ধীরে বলিল 'না, না, ইহা হইতে পারে না, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না।' আমি উত্তর করিলাম, 'ইহা সম্পূর্ণ সত্য; জেরাল্ড আমাকে ভালবাসে না—তাহা আমি জানি, কিন্তু সে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসে, তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভালবাসিবে।'

জেরাল্ড! তুমি জান, আমি কখনও মিথ্যা বলি না এবং সে জন্য য... গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু সেই মৃত্যু-দ্বার সমীপস্থা বালিকার সম্মুখে আমি নির্জ্জলা মিথ্যা বলিয়াছি এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই মিথ্যা বলার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। তারপর যখন সে নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িল, যখন সকলে বলিল—এই শেষ, তখন আমি তাহার সেই মৃত্যুচ্ছায়া সমাকীর্ণ পাণ্ডুর বদনে চাহিয়া দেখিলাম, তাহা এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তখন আর কোন কথা আমার মনে হইল না, কেবল মনে হইতে লাগিল 'আমি তাহাকে সেই শান্তি দিয়াছি, আমি তাহাকে সুখী করিয়াছি।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে প্রকৃত কথা আর জানিতে পারিবে না।

জেরাল্ড! তাহাকে এই প্রতারণা করায় কি আমার পাপ হইয়াছে?

জেরাল্ড শান্তভাবে বলিলেন, "ঈশ্বর বাইবেলের লেখককে যে পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বাইবেল লিখাইয়াছিলেন, ঠিক সেই পবিত্রভাবেই তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়া আজ তোমার মুখ দিয়া মিথ্যা বলাইয়াছেন।" তার পর জেরাল্ড এক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলেন —"শেষে যে সে প্রকৃত কথাটা জানিতে পারিয়াছে, এজন্য ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ।"

মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী।

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

দীনা ভারতমাতার অঙ্ক হইতে আর একটী মহার্ঘ রত্ন কাল-সাগরের অতল গর্ভে চির দিনের জন্য বিচ্যুত হইল। সেই দিগন্তবিশ্রান্তযশাঃ অসাধারণ মনীষাশালী, কাশীবাসী ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী আর ইহলোকে নাই। গত ২রা ভাদ্র শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭৷৷ ঘটিকার সময়ে এই মনীষি-চূড়ামণি সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে অনেক পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীজীর মতন এমন সর্ব্বশাস্ত্রপারগামী, সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আজ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার নিকটে এই মহাপুরুষের পবিত্র প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিব।

মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী, ১৯০৪ সম্বতের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতে জন্ম লাভ করেন। কাশীর চারি ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী 'উন্দী' নামক গ্রাম, শাস্ত্রীজীর পৈতৃক বাসভূমি। তাঁহার পিতার নাম রামসেবক মিশ্র, মাতার নাম মতি রাণী দেবী। ইঁহারা সরযূপারীন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রীজীর পিতামহের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামসেবক মিশ্রই সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। রামসেবক ভগবান্ শঙ্করকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি শিব পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। শাস্ত্রীজীর পূর্ব্বে তাঁহার পিতার চারিটী সন্তান হইয়া নষ্ট হয়, শাস্ত্রীজীই সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। শাস্ত্রীজী ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার ললাটে শ্বেত তিলক ও জিহ্বায় ত্রিশূল চিহ্ন লক্ষিত হয়। এই অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিয়া সূতিকাগৃহের স্ত্রীলোকেরা ভয় পায় এবং কোনও ভূতপ্রেত আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া এই নবজাত শিশুকে ফেলিয়া দিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু শাস্ত্রীজীর পিতা এই ব্যাপারে বাধা দিয়া বলেন যে, "আমার গুরুর ভবিষ্যদ্-বাণীতে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহার কোনও অলৌকিকত্ব আছে, তোমরা ইহাকে ফেলিতে পারিবে না।" শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম সময়ে দুর্ল্লভ 'চতুঃসাগর যোগ' ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয়, ৫ বৎসর বয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত, বেতিয়া মহারাজের তহশীলদার ছিলেন। শাস্ত্রীজীর ১১ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে বেতিয়ায় লইয়া যান। শাস্ত্রীজী বেতিয়ায় গিয়া প্রথমতঃ জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। তার পর বেতিয়া নিবাসী পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদ মিশ্রের পরামর্শে শাস্ত্রীজীকে ১৩ বৎসর বয়সের সময়ে লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ প্রারম্ভ করান হয়। তাঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক বেতিয়াবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাণীদত্ত চৌবে। ইনি অদ্যাপি বেতিয়াতে জীবিত আছেন। ১৪ বৎসর বয়সে শাস্ত্রীজী কাশীস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক সুলতানপুর নিবাসী দুর্গাদত্ত পণ্ডিতের নিকটে লঘু-কৌমুদীর 'এধ' ধাতু হইতে পাঠারম্ভ করেন। 'এধ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি ; শাস্ত্রীজী বলিতেন, "গুরুর অনুকম্পায় সেই অবধি আমার বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়।" শাস্ত্রীজী কলেজে পড়িবার সময়ে কাশীর তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোনও গ্রামে থাকিতেন। সেই স্থান হইতে প্রত্যহ কলেজে আসিতেন। পাঠ্যাবস্থায় শাস্ত্রীজী প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া বিশ্বনাথের মাথায় দিতেন। ১৮॥ বৎসর বয়সের সময়ে শাস্ত্রীজীর পাণিনীয় ব্যাকরণ সংক্রান্ত

ভাষ্য টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়া যায়। তার পর তিনি কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন প্রধান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক, বাঙ্গালী পণ্ডিত ৺কালীপ্রসাদ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে হেত্বাভাসান্ত নব্যন্যায় এবং নেপাল দেশীয় পরমব্যুৎপন্ন তার্কিক গণেশ শ্রোত্রীর নিকটে আদ্যন্ত "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" পড়িয়াছিলেন। স্বামী শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকটে শাস্ত্রীজী মীমাংসাদর্শন ও "অদ্বৈতসিদ্ধি" অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রীজী যখন কলেজে ন্যায়শাস্ত্র পড়েন, সেই সময়ে কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ৺বালশাস্ত্রী একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "তুমি বুদ্ধিমান্, আমার গুরু রাজারাম শাস্ত্রীর নিকটে তুমি যদি কিছু দিন ব্যাকরণশাস্ত্রের বিবিধ বিচারাদির অনুশীলন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তুমি অত্যন্ত উন্নত হইতে পারিবে।" শাস্ত্রীজী বিনীতভাবে উত্তর করেন যে, "তিনি বৃদ্ধ, আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।" বালশাস্ত্রী মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলে শাস্ত্রীজী দুই বৎসর কাল তাঁহার নিকটে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তথ্য সকল শিক্ষা করেন এবং শব্দখণ্ডের "ব্যুৎপত্তিবাদ" "শক্তিবাদ" পড়েন। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে তাঁহার ছাত্র-জীবন অতিবাহিত হয়। শাস্ত্রীজী বলিতেন, "আমি অনেকের কাছে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার সার শিক্ষা বালশাস্ত্রীর নিকটেই হইয়াছিল।"

শাস্ত্রীজী পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাশীর সংস্কৃত কলেজেই অধ্যাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও এক ঘটনায় ৪ বৎসর পরেই তিনি এই অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে কাশীতে দাক্ষিণাত্য-পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। সংস্কৃত কলেজেও তখন দক্ষিণী পণ্ডিতই অধিক ছিলেন। একবার শাস্ত্রীজীর অধিকাংশ ছাত্রই পরীক্ষা দিয়া অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তাহারা মনে করে—কলেজের দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীজীর প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে তাঁহার ছাত্রদিগকে অন্যায় ভাবে ফেল করিয়াছেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রীজীর ছাত্রবৃন্দ উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে পুনঃ পরীক্ষার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করে। কিন্তু এই ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অস্থায়ী অধ্যক্ষ রাইট্ সাহেবের মনে বিশ্বাস হয় যে, শিবকুমার শাস্ত্রীই কলেজের অসম্মান করিবার জন্য ছাত্রবৃন্দের দ্বারা এইরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তিনি শাস্ত্রীজীকে পদচ্যুত করেন। ভিনিস সাহেব প্রিন্সিপাল হইয়া কলেজে অধ্যাপনার জন্য শাস্ত্রীজীকে আবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর সম্মত হন নাই।

সহসা কলেজের কর্ম্ম নষ্ট হওয়ায় শাস্ত্রীজী একটু বিপন্ন হইয়া পড়েন। একটী বিবাহে বরযাত্রিক হইয়া তিনি দারভাঙ্গায় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে শাস্ত্রীজী, বিদ্যানুরাগী মহারাজ ৺লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের সহিত দেখা করেন। রাজসভায় তিনি নানা শাস্ত্রের বিচার এবং "পায়াজ্জটাঘনঘটা বৃষভধ্বজস্ত," "প্রবিশতি জলমধ্যে শীতভীতা মৃগাক্ষী" ইত্যাদি বহু সমস্যা পূরণ করিয়া প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শাস্ত্রীজীকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন। মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে ৫০৲ টাকা মাসিক বৃত্তিতে রাজসভা-পণ্ডিত-পদ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীজী এক বৎসরকাল সপরিবারে দারভাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে বলেন, "আমি দারভাঙ্গায় একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিব, সেই বিদ্যালয়ে আপনি অধ্যাপনা করিবেন।" কিন্তু ঘটনাচক্রে শাস্ত্রীজীর আবার কাশীতেই আসিতে হইল।

মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীকে মাসিক ৫০০৲ শত টাকা বৃত্তি দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামীজী মহারাজকে বলেন, "আমার টাকার কোনও প্রয়োজন নাই, তুমি ঐ টাকায় কাশীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর।" স্বামীজীর আজ্ঞানুসারে কাশীতে 'দ্বারবঙ্গ-পাঠশালা' নামক সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হয়। মহামহোপাধ্যায় ৺সুধাকর দ্বিবেদী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তাতিয়া শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিতেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবকুমার শাস্ত্রীজী, মহারাজকে বলেন, "দ্বারবঙ্গে আপনার সঙ্কল্পিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থাদির ত এখনও বিলম্ব আছে, ততদিন আমি আপনার কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে ইচ্ছা করি।" মহারাজ এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে শাস্ত্রীজী কাশীতে আসিয়া 'দ্বারবঙ্গ-পাঠশালা'য় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের দেহান্ত হইলে বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর, ৫০৲ টাকার স্থলে শাস্ত্রীজীর জন্য মাসিক ৭৫৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। যতদিন শরীর কার্য্যক্ষম ছিল— এই বিদ্যালয়েই তিনি অধ্যাপনা করিয়াছেন। শাস্ত্রীজী স্থানান্তরে গেলে অনেক টাকা পাইতে পারিতেন, কিন্তু কাশীবাসের প্রলোভনে তিনি ঐ অল্পবৃত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বারবঙ্গাধিপতি যখন তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদে লর্ড কর্জ্জনের অভিনন্দনার্থ গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করেন, সে সময়ে কাশী হইতে শাস্ত্রীজীও

নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই উৎসবস্থলে স্যার শ্রীযুক্ত আশুবাবুর সমক্ষে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রীজীকে বলেন, "আপনি মাসিক ৫০০৲ শত টাকা লইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটীতে আসুন না।" শাস্ত্রীজী কাশী-পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই।

শাস্ত্রীজীর ন্যায় আবাল্য তপস্বী, অতি অল্পই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি পাঠাবস্থায় প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরে আগুস্ত চণ্ডীপাঠ করিতেন। অধ্যাপক হইয়াও তিনি প্রতিদিন মনিকর্ণিকায় প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া বিদ্যালয়ে পড়াইতে যাইতেন। অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে প্রত্যহ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। শাস্ত্রীজী নিত্যশ্রাদ্ধ ও প্রতি অমাবস্থায় পার্ব্বণ করিতেন।

শাস্ত্রীজীর বিচার-মল্লতা পণ্ডিতসমাজে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "আমরা পাঠাবস্থায় সভাক্ষেত্রে দেখিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী, কাশীবাসী পণ্ডিত চক্রের মধ্যস্থলে বসিয়া সোৎসাহে শাস্ত্রার্থ করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইত, কবে আমরা এইরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতে অধিকার পাইব! সে দিন জীবন ধন্য হইবে।

শাস্ত্রীজী চিরদিন গুণবানের যথোচিত সমাদর করিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা ছিল। মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ই বলিয়াছেন, "যখন অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া কাশীতে আমরা একরূপ নিঃসহায় হইলাম, তখন শিবকুমার শাস্ত্রী যে আমার কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক, কিন্তু সভাক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় একটা সামান্য কথা বলিলেও তিনি সাগ্রহে শুনিতেন এবং অপর পণ্ডিতেরা গোলযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, 'ভট্টাচার্য্য ক্যা কহতা হায়, শুনো।' আমি সভায় পূর্ব্বপক্ষ করিলেই তিনি আমার সহায়তা করিতেন এবং যাহাতে আমার প্রতি কেহ অন্যায় ব্যবহার না করিতে পারে, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিতেন।" শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন প্রভৃতি কাশীস্থ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণও শাস্ত্রীজীর অনুকূল ব্যবহারে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অলোকসামান্য প্রতিভায় শাস্ত্রীজী এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, চিরদিন তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া আসিয়াছেন। প্রতিভার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কদাপি

তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। শাস্ত্রীজীর বিশ্বাস ছিল,—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" একজন বালকের গুণ দেখিলেও তিনি তাহাকে যথোচিত আদর করিয়াছেন।

শাস্ত্রীজী স্বামী ভাস্করানন্দের জীবনী অবলম্বন করিয়া "যতীন্দ্রজীবনচরিতম্" নামে একখানি অনতিবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্যে তিনি সংক্ষেপে ষড়্দর্শনের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া পরিশেষে অদ্বৈতবাদেরই প্রাধান্য স্থাপন করেন। শাস্ত্রীজী এই গ্রন্থের এক খণ্ড মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে উপহার দেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ পড়িয়া এতই সন্তুষ্ট হন যে, গ্রন্থ প্রাপ্তির ৩।৪ দিন পরেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শাস্ত্রীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহার কিছুদিন পরেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে শাস্ত্রীজী 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন।

"যতীন্দ্রজীবনচরিতম্" ব্যতীত শাস্ত্রীজী "লক্ষ্মীশ্বরপ্রতাপ" নামক আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে মহেশ ঠকুর হইতে দ্বারবঙ্গাধিপতিদিগের বংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই কাব্যরচনার জন্য মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, শাস্ত্রীজীকে দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন। মদীয় পরম বন্ধু ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্নকে পড়াইবার সময়ে শাস্ত্রীজী নাগেশভট্টকৃত "পরিভাষেন্দুশেখরে"র টীকা করিতে আরম্ভ করেন এবং মদীয় অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ, মহোদয়ের একান্ত অনুরোধে "মহিম্নঃ স্তোত্রে"র কতিপয় শ্লোকের টীকা লেখেন। এই উভয় টীকা গ্রন্থই তিনি সমাপ্ত করিয়া যান নাই। তবে "লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা" গ্রন্থের শাস্ত্রীজীর কৃত সম্পূর্ণ টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রীজীকে কেহ কখনও কোনও গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, ক্রমশঃ তাহারই অধ্যয়ন অধ্যাপনা হ্রাস পাইতেছে, নূতন গ্রন্থ আর পড়িবে কে?" শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিতেন, "যে ভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর আলোচনা ভারতবর্ষ হইতে ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত হইতেছে, তাহাতে আমার মনে হয় যে, আর ৫০ বৎসর পরে ব্যাকরণ পড়িবার জন্যও ভারতবাসীকে ইউরোপ প্রভৃতি দেশান্তরে যাইতে হইবে।"

শাস্ত্রীজী দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত "তত্ত্বচিন্তামণি"র অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, "তত্ত্বচিন্তামণি"র তুল্য নানাবিষয়-বোধক গভীরার্থক গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই।"

শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য্য, শাস্ত্রীজীকে "সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিতরাজ" এই উপাধি অঙ্কিত সুবর্ণ পদক উপহার দেন। বামরার মহারাজও তাঁহাকে 'অত্রৈব বিদ্যারসঃ' এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ করিয়া সোনার মেডেল দিয়াছিলেন। শাস্ত্রীজী কলিকাতার কান্যকুব্জ-সভা হইতেও 'বিদ্যামার্ত্তণ্ড' উপাধি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। শাস্ত্রীজী যখন লাহোরে যান, তখন পঞ্চনদবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ঘোড়া খুলিয়া ফেলিয়া শাস্ত্রীজীর গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করেন। লাহোরের ওরিএণ্টাল কলেজের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবদত্ত শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণও শাস্ত্রীজীর অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রীজী এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "এস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, সুতরাং আমি কখনই ঘোড়া খুলিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে দিব না। এ অনুষ্ঠান শাস্ত্রসঙ্গত নহে।" লাহোরের হিন্দুসভা, স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শাস্ত্রীজীকে অভিনন্দন-পত্র দেন। এই অভিনন্দন-সভায় জষ্টিস্ সাদিলাল, অনারেবল রায় রামশরণ দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লালা হংসরাজ প্রভৃতি পঞ্জাবের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের নানা স্থানে শাস্ত্রীজীর এতই প্রতিষ্ঠা ছিল যে, শাস্ত্রে কি আছে না আছে, তাহা জানিবার জন্য লোকে ব্যগ্র হইত না, ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রীজীর আদেশ শুনিয়াই তাহারা নিঃসন্দেহে কার্য্য করিত। গত বৎসর যখন আমাদের ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কতিপয় সৈন্য মেসোপটেমিয়ায় অবরুদ্ধ হয়, তখন অন্য খাদ্য সংগ্রহের উপায় না দেখিয়া উপরিতন সৈনিক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে অগত্যা ঘোড়ার মাংস খাইতে আদেশ করেন। কিন্তু হিন্দু সৈন্যেরা তাহাতে ঘোর আপত্তি করে। পরে তাহারা বলে, "কাশীর শিবকুমার পণ্ডিত যদি আমাদিগকে ঘোড়ার মাংস খাইবার ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে আমরা খাইতে পারি।" এই উপলক্ষে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে দুই জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী শাস্ত্রীজীর বাটীতে ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রীজী বলেন, "এইরূপ আপৎকালে প্রাণ রক্ষার জন্য ঘোড়ার মাংস খাইলে পাপ হইবে না।"

শাস্ত্রীজীর দিগন্তবিশ্রান্ত কীর্ত্তি—লোকোত্তর, পাণ্ডিত্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া মাসিক পত্রের কলেবরে সম্ভবপর নহে। ভারতের নানা স্থানে তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্রবৃন্দ জ্ঞানচর্চ্চা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যেও ৺গুরুচরণ বিদ্যা-ভূষণ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত

বহুবল্লভ শাস্ত্রী, ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি শাস্ত্রীজীর ছাত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকেরও তিনি বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতের দুর্ভাগ্য, জ্ঞান-গগনের এমন উদ্দীপ্ত মরীচিমালী, জীবনের একরূপ মধ্যাহ্নেই অস্তমিত হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেই শাস্ত্রীজীর পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায়। সেই অবধিই নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই তিনি শয্যাগত হইয়াছিলেন। যখন এই কাল ব্যাধি তাঁহাকে অত্যন্ত আক্রমণ করিয়া ফেলিল, তখন শাস্ত্রীজী গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাঁহার অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে মণিকর্ণিকায় আলোয়ারের মহারাজের শিবালয়-সংলগ্ন গৃহে আনয়ন করা হয়। এই স্থানে তিনি ১৬ দিন বাস করিয়াছিলেন। বর্ষাকালীন গঙ্গার বৃদ্ধিতে এই স্থান ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কায় অতঃপর তাঁহাকে কেদার ঘাটে তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়ের গঙ্গাতটস্থিত বাটীতে আনিয়া রাখা হয়। এই বাটীতে তিনি প্রায় দুই মাস কাল বাস করেন। এই সময় প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে কাঁদিয়া অধীর হইতেন। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "গঙ্গা বিশ্বেশ্বরঃ কাশী জাগর্ত্তি ত্রিতয়ং যদি। তত্র নৈশ্রেয়সী লক্ষ্মীর্জায়তে চিত্রমত্র কিম্॥" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেন।

মৃত্যুর বার দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। এই সর্ব্বনেশে জ্বর আর ছাড়ে নাই। ২রা ভাদ্র প্রাতঃকালে তাঁহার অল্প অল্প শ্বাস হইতে থাকে। রাজা শশিশেখরেশ্বরের বাটীর গঙ্গার ধারের দরজা দিয়া শাস্ত্রীজীকে তীরস্থ করা হয়। ভাদ্র মাসের পরিপূর্ণ গঙ্গা, তাঁহার ভক্তকে সাদরে কোলে লইবার জন্যই যেন রাজার গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভে নীত হইবা মাত্র "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্"—এই শ্লোকটী শুনিতে শুনিতে ৭১ বৎসর বয়সে শাস্ত্রীজী নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়স-লক্ষ্মী লাভ করিলেন। ভারতের গৌরব-চূড়া খসিয়া পড়িল।

সেকেন্দ্রিয়ার কুতবখানা ও উদ্দণ্ডপুর বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রবাদ।

[লেখক—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।]

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মোঃ মহম্মদ কে চাঁদ সাহেব শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের সহিত হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় সম্বন্ধে * বাদানুবাদ প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সেকেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত কুতবখানা দগ্ধ করার অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা ও "অনৈতিহাসিক" এবং তাহা "পুনরুল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগের প্রাণে ব্যথা দেওয়া বিদ্বোন্নত ব্যক্তিগণের উচিত নহে।" শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী সাহেব এইরূপ মিথ্যা কথা রটনার জন্য মধ্যযুগের খৃষ্টান এবং "ইশলামবিদ্বেষী" খৃষ্টান মিশনারীদিগের স্কন্ধেই কেবল দোষারোপ করিয়াছেন। এরূপ কাল্পনিক অপবাদ সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যতই দূরীভূত হয় ততই মঙ্গল, কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, বাদানুবাদ বা আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াও এতদ্দেশীয় সাহিত্যিকগণ অনেকস্থলেই ঐতিহাসিক প্রমাণাদির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা এই কষ্টটুকু স্বীকার করিলে সাধারণ পাঠকগণের যে বিশেষ উপকার হয় তাহা বলা বাহুল্য।

দেশীয় ঐতিহাসিকগণ এখন ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের কঙ্কাল-যোজনা করিতে ব্যস্ত। ভিন্ন দেশের ইতিহাস লইয়া তাঁহারা বড় মাসিক পত্রাদিতে আলোচনা করেন না। তাহার উপর মিশর দেশের ইতিহাস আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত নহে, সুতরাং কলেজে পঠদ্দশায় যাঁহারা ইতিহাস-চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেরই মিশরদেশীয় ঘটনা সম্বন্ধে ভালরূপ জানিবার অবকাশ ঘটে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সাহিত্যামোদী বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রণবদেব মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় আমাকে ষ্ট্যানলি লেন্-পুল্ (Stanly Lane-Pool) রচিত মিশরের মধ্যযুগের একখানি ইতিহাস পাঠ করিতে দেন। পুস্তকখানি ১৯১৩ সালের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১২ পৃষ্ঠায় সেকেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। লেন্-পুল্ খৃষ্টান হইলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক। তিনি স্পষ্টই স্বীকার

---

* গত শ্রাবণ মাসের অর্চনা, ২২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন যে, আরব সেনাপতি আমর (Amr) সেকেন্দ্রিয়ায় কোনরূপ লুটপাট বা অত্যাচার করেন নাই। আর করিবেনই বা কেন? সেকেন্দ্রিয়া কতকগুলি স্বর্ত্ত স্বীকার ফলে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যদি *Vi et armis* পরাভূত হইত তাহা হইলে সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া, শত্রুহস্তে, লুণ্ঠন বাজেয়াপ্তি প্রভৃতি অত্যাচারে নিপীড়িত হইত সন্দেহ নাই। প্রবাদ এই যে, মুসলমান-বিজয়কালে সেকেন্দ্রিয়ায় কম করিয়া প্রায় ৪০০০ হামাম বা সাধারণ স্নানাগার ছিল। বলা বাহুল্য, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উহা অতিশয়োক্তি বলিয়াই মনে করেন। এই ৪০০০ হামামের চুল্লি জ্বালাইয়া জল গরম করিবার জন্যই নাকি কুতবখানার যত্ন সঞ্চিত পুস্তকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল। গ্রন্থগুলি যে আরব দেশে নীত হইয়া রন্ধনকার্য্যের জন্য, ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে" বর্ণিত এই প্রবাদটি লেন-পুলের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। পূর্ব্বোক্ত ঘটনাদির উল্লেখ কোনও প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক ঐতিহাসিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জন্ অফ্ নিকিউ (John of Nikiu) বা মুসলমান লেখক ইব্ন আব্দেল্ হাকাম (Ibn-Abd-el-Hakam) বা তাবারী (Tabari) কেহই ঘুণাক্ষরে এ সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করেন নাই। জন্ অফ্ নিকিউ প্রজাদিগের রক্ষণ ভরণ সম্বন্ধে যত্নবান সেনাপতি আমরের শাসন-প্রণালী যেরূপ প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত এ প্রকার প্রবাদের কোন মতেই সামঞ্জস্য হয় না, সুতরাং মুসলমান জেতৃগণের প্রতি আরোপিত এ অপবাদটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে কোনও সংশয় নাই। লেন্-পুলের মতে পারস্য জয়কালে আরবগণ কর্ত্তৃক অগ্নি-উপাসকদিগের পুস্তকাদি বিনাশের কাহিনীই এই জনপ্রবাদের মূলে অবস্থিত। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই তথা-কথিত ঐতিহাসিক ঘটনার ৬০০ বৎসর পরে—খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আব্দেল লতিফ (Abd-el-Latif) এবং আবুল ফারাগ (Abu-l-Farag) নামক দুইজন মুসলমান গ্রন্থকার এই গ্রন্থাগার-বিনাশ বৃত্তান্ত প্রথমে জনসমাজে প্রচার করেন, সুতরাং কেবল মধ্যযুগের খৃষ্টান লেখক ও আধুনিক মিসনরীগণকে ইহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলে প্রকৃত ব্যাপারের যথাযথ বর্ণনা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে উদ্দণ্ডপুর বিহারে সঞ্চিত পুস্তকগুলি ধ্বংস হওয়ার কথা মনে

পড়িতেছে। তিব্বতীয় ইতিবৃত্তকার লামা তারানাথ মুসলমান আততায়িগণ কর্ত্তৃক উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা বিহারদ্বয়ের বিনাশ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন * কিন্তু তাহা মগধবিজয়ের প্রায় পঞ্চশত বর্ষ পরে। পুস্তক খানির রচনা-কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলিয়াই অনুমিত, সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে সুদীর্ঘকাল ব্যবধান হেতু ফারাগ ও আব্দেল লতিফের ইতিহাস রচনায় যেরূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছিল তারানাথের পক্ষে সেরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া যে একবারেই অসম্ভব, এ কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তারানাথের গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক অনুশীলন ফলে উহা, এক্ষণে, সত্য ঘটনা ও অলীক কাহিনীর বিচিত্র সমাবেশ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। আধুনিক মতানুসারে গ্রন্থখানি আর কেবল অবিমিশ্র ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদের সঙ্কলন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নহে। তারানাথ কর্ত্তৃক কয়েকটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ-নিহিত পালরাজগণের কল্পিত বংশাবলী প্রভৃতি—তাঁহার মারাত্মক ভ্রমসমূহের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে †। বৌদ্ধ "লামা" নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় Odium Theologicum এড়াইয়া যে কেবল প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে অবহিত ছিলেন, এ কথাও সকল ক্ষেত্রে বলা যায় না—তাই শুধু তারানাথের উপর নির্ভর করিতে হইলে উদ্দণ্ডপুর সঙ্ঘারামস্থিত পুস্তকাদি বিনাশের কথা হয়তো সহজেই আধুনিক ইতিহাসে পরিত্যক্ত হইত কিন্তু সত্যসন্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ তবকত্‌ নাসিরী গ্রন্থে নিতান্ত অকপট ভাবেই লিখিয়াছেন যে গিরিশীর্ষস্থিত উদ্দণ্ডপুর অধিকৃত হইলে "সেখানে বহুসংখ্যক পুস্তকাদি পাওয়া যায়। মুসলমানগণ—পুস্তকগুলি কি কি বিষয়ে লিখিত তাহা জানিবার জন্য কয়েকজন 'হিন্দু'কে ‡ ডাকিয়া পাঠান কিন্তু 'হিন্দু'গণ তখন কেহই জীবিত ছিল না। পরে জানিতে পারা যায় যে, সহর ও দুর্গ সমস্তই একটি বিস্তৃত শিক্ষাগার (কলেজ)। দেশীয় ভাষায় ইহাকে 'বিহার' বলে। § পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তটিতে মুসলমানেরা যে পুস্তকগুলি

---

* (Vide Indian Antiquary Vol. IV. pp. 366-367 and R. D. Banerjee's Banglar Itihash Vol. I. p, 322)

† (Vide Mr. S. Kumar in J. A. S. B. 1916 pp. 23-25)

‡ তবকত্‌ নাসিরীতে মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধগণ ভ্রমক্রমে হিন্দু বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

§ (Vide Raverty quoted by R. D. Banerjee in his Vol. I. p. 321)

ধ্বংস করিয়াছিলেন, এ কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত নাই। বিহারবাসীগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মুসলমান সৈনিকেরা অনাবশ্যক বোধে গ্রন্থসমূহ নষ্ট না করিলেও অন্ততঃ রক্ষক অভাবে—অযত্নের ফলে সেগুলি যে অল্প দিনেই ধ্বংস-মুখে পতিত হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় কষ্টকল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এক্ষেত্রে Error of Omission বা Error of Commission ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী আক্রমণকারিগণের প্রতি কি পরিমাণে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বিদ্বৎমণ্ডলী বিচার করিবেন।

প্রত্যাখ্যান।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল।]

(১)

গভীর নিশীথ। সংসারের অধিকাংশ জীবজন্তুই ঘুমে অচেতন। বাঙ্গালার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে একজন মুসলমান অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি-সেবার জন্য বিখ্যাত। মধ্য রাত্রে গৃহদ্বারে অতিথি দণ্ডায়মান শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া অতিথিকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ক্লান্তিবিনোদনার্থ বিশ্রাম করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, ব্রাহ্মণ তাঁহার পাকের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যথাসময়ে অতিথির আহার শেষ হইয়া গেলে, ব্রাহ্মণ স্বহস্তে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ধৌত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অতিথি বাধা দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমি মুসলমান, আমার উচ্ছিষ্ট আপনি স্পর্শ করবেন না।" ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—"আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে অতিথি, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক্, নারায়ণ স্বরূপ। আপনি অতিথি, নারায়ণ!"

আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া অতিথি বিদায়গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকারে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যাইবার সময় তাঁহার হাত হইতে একটি আংটি খুলিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, এই আংটিটি তুমি রাখ; কখনও কোন বিপদে পড়লে, দিল্লীতে গিয়ে এটি দেখালেই সবাই আমাকে চিনিয়ে দেবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"না, অতিথিসেবার পুরস্কার স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতে নাই। আংটি আপনি ফেরত নিন, আমি

ইহা নিতে পারলাম না।" অতিথি বলিলেন,—"না, ইহা তোমার অতিথি-সেবার পুরস্কার নহে। আমার আতিথ্যগ্রহণের স্মৃতিস্বরূপ এটি তোমার কাছে রাখ।" ব্রাহ্মণ এ প্রস্তাবে আর অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। অতিথি প্রস্থান করিলে, ব্রাহ্মণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, আংটির উপর অবোধ্য ভাষায় দু'চার কথা কি লেখা রহিয়াছে। তিনি সেটি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিলেন।

* * * * * *

কথিত আছে, বাঙ্গালা প্রদেশ জয় করিবার পর সম্রাট আকবর শাহ্‌ প্রজাগণের অবস্থা সম্যক অবগত হইবার জন্য বাগদাদের খালিফ হারুণ-অল-রসিদের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রে গ্রামের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকার গুণের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই তাঁহার কুটীর-দ্বারে অতিথির বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(২)

দু'এক বৎসর পরে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িল। ক্রমে দুইবেলা অন্ন জুটাও ভার হইয়া উঠিল। একদিন ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"দেখ, একটা কাজ করলে হয় না। আর কতদিন এমন করে উপবাস যাবে! সেই মুসলমান-অতিথির সন্ধানে একবার গেলে হয় না। তিনি ত বলে গেছলেন, দিল্লীতে গিয়ে কাউকে সে আংটিটা দেখালেই তাঁ'র পরিচয় পাবে। তিনি এ বিপদে আমাদের একটা কিছু উপায় করে দিতে পারবেন বোধ হয়।"

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ যুক্তি মন্দ নহে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি। পেঁটরা হইতে আংটিটি বাহির করিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে গিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিতেই একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ইনি সম্রাটের দরবারের একজন প্রধান ওমরাহ। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আংটি দেখাইতেই তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন,—একি, এ যে সম্রাটের নামাঙ্কিত তাঁহার খাস আংটি! ব্রাহ্মণ, এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?" সম্রাটের নাম শুনিয়াই ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া উঠিলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"দেখ বাবা, এক মুসলমান অতিথি আমার বাড়ীতে এ আংটিটি আমাকে উপহার দেন, বলেছিলেন বিপদে

পড়লে দিল্লীতে এসে কা'কেও দেখালেই তাঁ'র পরিচয় পাব। সম্রাটের নামাঙ্কিত কি না, তা ত আমি বলতে পারি না!"

ওমরাহ প্রথম মনে মনে ভাবিলেন হয়ত এ আংটি ব্রাহ্মণ চুরি করিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণ যাহা বলিল, তাহা সত্য হইতেও পারে, আকবরের লীলা বুঝা ভার! তিনি তখন প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল, আমি তাঁ'কে দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া এক মসজিদের সম্মুখে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সে দিন শুক্রবার, সম্রাট মসজিদের ভিতর নেমাজ পড়িতেছিলেন। ওমরাহ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। সম্রাট নেমাজ পড়ছেন; মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেই তাঁ'কে আংটি দেখিও।"

ব্রাহ্মণ মসজিদের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ভিতরে সম্রাটকে নেমাজ পড়িতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সে রাত্রের অতিথি বলিয়া ব্রাহ্মণ চিনিতে পারিলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু পরে সম্রাট নেমাজপড়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া সম্রাট হাসিমুখে সাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন,—"দয়া করে যখন এসেছেন, চলুন, আজ আপনাকে আমার বাড়ী অতিথি হ'তে হবে। পরে আপনার কথা সব শুনবো।"

ব্রাহ্মণ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"না, আপনার বাড়ী আর যাব না। আপনার কাছে আর আমার কোন দরকার নাই। আমি এসেছিলাম বটে, আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করবার জন্য, কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আমার দূর হয়েছে। আপনি যখন নেমাজ পড়ছিলেন, আপনি ত তদ্গতচিত্তে ভগবানকে ডাকেন নাই! আপনি কেবল তাঁহাকে বলছিলেন,—'আমার মেয়ের বড় অসুখ করেছে, তা'কে ভাল করে দাও, আমাকে ধন দাও, যশস্বী কর।' তা দিল্লীসম্রাট হয়ে আপনার যখন এত অভাব, তখন আমার অভাব আপনি দূর করবেন কি করে? কিছু মনে করবেন না। আমি চল্লাম।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আকবর শাহ নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কি অদ্ভুত শক্তি! ব্রাহ্মণ যা বল্লেন, তা'ত সবই সত্য! আমি ত যথার্থই আমার মেয়ের অসুখের কথাই ভাবছিলাম, ঈশ্বরকে ত ডাকি নাই!"

প্রতিবাদ।*

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'অর্চ্চনা'য় শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার বি. এ মহাশয়ের "সাহিত্য প্রসঙ্গে"র উত্তর না দিলে পাঠকগণ হয়ত মনে করিবেন সুধীর বাবুর কথার উপর আর কথা চলে না। তাই যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

লেখক মহাশয় যেমন সাহিত্য-প্রসঙ্গের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন "কি যে এক দুঃসময় পড়িয়াছে, সাধারণতঃ নিরপেক্ষ ভাবে কেহ. আলোচ্য গ্রন্থের দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধুতার খাতিরই দেখিতেছি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা শাসিত করে ইত্যাদি," আমিও তেমনই "সমালোচনার বিড়ম্বনা"র লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় বলিয়া লই 'আজকাল বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করা এক মহা বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া দিলেই গ্রন্থকারগণ (বা তাঁহাদের নিয়োজিত লেখকগণ) ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমালোচকের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন।"

লেখক মহাশয় অন্যত্র লিখিয়াছেন "সমালোচক এই গ্রন্থের গুণ দেখিতে পান নাই। শুধু তাহাই নহে; প্রকৃত দোষও তিনি দেখাইতে পারেন নাই। জোর করিয়া দোষ দেখাইতে গিয়া নিজেই কতকগুলা ভুলের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাহারই আমরা পরিচয় দিতেছি।" কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত লেখাটি পড়িয়া কোথাও সে পরিচয় পাইলাম না।

প্রথমতঃ "শ্যামারূপার গড়"এর কথাই ধরা যাউক। শ্যামারূপার গড় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ও ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল। শ্যামারূপাদেবী এখন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বরাকরের নিকটস্থ কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে "কল্যাণেশ্বরী" নামে পরিচিত। "কাঁদুনে ডাঙ্গা"ও অজয়ের দক্ষিণ তীরে বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। 'বীরভূম বিবরণে'র লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকের কোথাও লেখেন নি যে, এ স্থান তিনটী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। এমন কি ইছাই ঘোষের দেউলকে "বীরভূমের একটি দর্শনীয় সামগ্রী" বলা হইয়াছে। এ গুলিতে

---

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সমালোচক 'ব্রজরাজ' মহাশয় এই প্রতিবাদটী পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতিবাদটার প্রুফ সুধীরবাবুকে দিয়া তাঁহার বক্তব্যটুকুও অত্রসহ প্রকাশিত করিলাম।—অর্চ্চনা-সম্পাদক।

কি লেখকের কৌশল প্রকাশ পায় না? লেখক বলিয়াছেন "কেন্দুবিল্বের কথা উঠিলেই লাউসেন তলাওর কথা আসিয়া পড়ে। শ্যামারূপার গড় মনে পড়িয়া যায়।" আমি ইহাতেই লিখিয়াছিলাম "মনে ত অনেক কথাই উঠে, তাই বলিয়া কি অবান্তর কথা বলিতে হইবে?" সুধীরবাবু ইহাতে মহা খাপ্পা হইয়াছেন। বীরভূমের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বর্দ্ধমান জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলা ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কিয়দংশ দৃষ্টিপথে পতিত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে এই তিন জেলার ইতিহাসও মনে পড়িয়া যায়। সুতরাং এই তিন জেলার বিবরণও অবান্তর নহে। লাউসেন অজয়ের উত্তর তীরে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া চলে। কিন্তু যে শ্যামারূপার গড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত তাহার ছবি দেওয়া চলে না।

সুধীরবাবু বোধ হয় ছবিগুলির জন্মবিবরণ অবগত নহেন। আমি নিম্নে সেই বিবরণ লিখিতেছি। তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন কেন্দুবিল্বের কথায় সাধারণতঃ জয়দেবের কথা মনে পড়িলেও 'বীরভূম বিবরণে'র লেখকের মনে কেন শ্যামারূপার গড়ের কথা উঠিয়াছিল আর কেনই বা বর্দ্ধমান জেলার শ্যামা-রূপার গড়ের ছবি বীরভূম বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩২১ সালের পূজার অবকাশে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ শ্যামারূপার গড়ের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বাহির হন। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সহকারী সভাপতি ও বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি (অর্থাৎ বরের মাসি কনের পিসী) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্যামারূপার গড়ের ছবি তুলিবার জন্য ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া বীরভূমে অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুর সহিত মিলিত হইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। 'বীরভূম বিবরণে'র লেখক মহাশয় রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির সহকারী সভাপতির সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন সুতরাং তিনিও শ্যামারূপার গড় দর্শনকালে সঙ্গী হইলেন। মূল্য দিলে শ্যামারূপার গড়ের ছবিগুলি রাঢ় অনু-সন্ধান সমিতির সম্পত্তি হইবে এইরূপই কথা ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে রাঢ় অনু-সন্ধান সমিতির আঁতুড়ে মৃত্যু হইলে ছবিগুলি বে-ওয়ারিশ হইয়া পড়ে। তখন কাজেই সহকারী সভাপতি মহাশয়ের ইঙ্গিতে কেন্দুবিল্বের কথায় মহারাজ কুমারের শ্যামারূপার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাই বর্দ্ধমান সম্মিলনে পঠিত ৩॥ পৃষ্ঠার "শ্যামারূপার গড়" প্রবন্ধ, বীরভূম বিবরণে ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী হইয়া "কেন্দু-বিল্বকাহিনী"র অন্তর্গত হইয়াছে।

ভদ্রপুর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ছিল অর্থাৎ যখন নন্দকুমার জীবিত ছিলেন তখন এবং তাহার বহুদিন পর পর্য্যন্ত বীরভূমের সহিত ভদ্রপুরের সম্বন্ধ ছিল না। এখন ভদ্রপুর বীরভূমের স্বকীয় সম্পত্তি হইয়াছে একথা আমি স্বীকার করিয়াছি; কোন আপত্তি করি নাই। তবে বীরভূম বিবরণের লেখক মহাশয়ের ইহা উল্লেখ করা উচিত ছিল। দৌহিত্রের বংশকে সাধারণতঃ কেহ বংশধর বলে না, অন্ততঃ হিন্দু বলেন না; সেইজন্য দৌহিত্র থাকিতেও অনেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া বংশ অব্যাহত রাখেন, "কুঞ্জঘাটার রাজবংশ নন্দকুমারের দৌহিত্র বংশের পোষ্যপুত্রের বংশ" এই কথা লিখিবার সময় আমি "দৌহিত্র" কথাটায় জোর দিয়াছি; সুধীরবাবু দৌহিত্র কথাটা বাদ দিয়া "পোষ্যপুত্র" কথাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কোন রাজ বা রাজ্যের উত্তরাধিকারীকে সময়ে সময়ে বংশধর বলা যায়, কারণ সেই উত্তরাধিকারী প্রকৃত বংশের না হইলেও রাজ্যের নামেই পরিচিত হইয়া থাকেন। কলিকাতার "শীল" বংশের উত্তরাধিকারী "লাহা" হইলে, শীলবংশ নাম থাকিবে না, লাহাবংশই হইবে। কিন্তু কাশিমবাজার রাজের উত্তরাধিকারী কাশিমবাজার রাজবংশ বলিয়াই পরিচিত হইবে। কুঞ্জঘাটার রাজবংশ মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর ত নহেন, ঠিক উত্তরাধিকারীও নহেন, কারণ মহারাজের যে জামাতা জগচ্চন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় শত্রুতা-সাধন করিয়াছিলেন, সেই জামাতার পুত্র মহানন্দ রাণী জগদম্বার সমস্ত সম্পত্তি বলপূর্ব্বক হস্তগত করেন, এ কথা 'বীরভূম বিবরণ' পাঠেই অবগত হওয়া যায়। আর এই সম্পত্তিও সমস্তই অস্থাবর। কুমার দুর্গানাথ পোষ্যপুত্র না হইয়া ঔরসজাত পুত্র হইলেও বুঝিতাম যে তাঁহাতে মহারাজ নন্দকুমারের শোণিতের অংশ আছে। দৌহিত্রের বংশ হইতে মহারাজ নন্দকুমারের জলপিণ্ডের আশাও ছিল না। সুতরাং কুঞ্জঘাটার রাজবংশকে মহারাজ নন্দকুমারের উত্তরাধিকারী স্বীকার করিলেও বংশধর বলা চলে না। মহারাজ নন্দকুমারের কনিষ্ঠ কন্যার বংশের দৌহিত্র বংশে বরঞ্চ মহারাজ নন্দকুমারের শোণিত-সম্পর্ক আছে। সে বংশের কেবল নাম মাত্র দেওয়া হইয়াছে, অথচ কুমার দুর্গানাথের বংশের খুঁটিনাটি করিয়া বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কুমার দুর্গানাথ হেতমপুর রাজবংশের সহিত দুইটি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

হেতমপুর কাহিনী-প্রণেতা কিশোরীলাল সরকার বলিয়াছেন, "মুরলীধর অতি দরিদ্র ছিলেন এবং রাধানাথ হীনাবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করেন।" বীরভূম বিবরণের লেখক মহাশয় ৩৮ পৃঃ পাদটীকায় এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"কিন্তু অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা সরকার মহাশয়ের কথিত বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। যথাস্থানে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।" কিন্তু যথাস্থানে দেখিতেছি "চৈতন্যপত্নী (রাধানাথের জননী) দারিদ্র্যের পেষণে দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে অতিকষ্টে কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।" ইহাই কি বিপরীত বিবরণ? সুধীরবাবু রাধানাথের হীনাবস্থা সম্বন্ধে নীরব কেন? এখানে আমার ভুল, না বীরভুম বিবরণের সম্পাদক বা প্রকাশকের ভুল? মুরলীধর যে দরিদ্র ছিলেন এ কথা গ্রন্থকার ও প্রতিবাদকারী উভয়েই স্বীকার করেন। তবে গ্রন্থকার বলেন, "মুরলীধর তস্করের উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জীবিকা অন্বেষণে আসেন", আর সুধীরবাবু মাত্রা চড়াইয়া লিখিয়াছেন "মুরলীধর বর্গির হাঙ্গামে ও তস্করের উপদ্রবে সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়া"। সুধীরবাবু "বর্গির হাঙ্গামে" কথাটা কোথায় পাইলেন? তিনি প্রতিবাদের আক্রোশে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ১০৫৭ সালের পূর্ব্বে বর্গির হাঙ্গামা ছিল না। মুরলীধর রাজপুত্র হইলে তস্করের উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইতেন না, অনুসন্ধান ফলের এই দুর্ব্বল যুক্তিকে সবল করিবার জন্যই কি তিনি "বর্গির হাঙ্গামে" কথাটা জুড়িয়া দিয়াছেন?

বাঁকুড়া জেলায় অনুসন্ধানের ফলে কোন্ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পুস্তকে প্রকাশ নাই, সুধীরবাবুও তাহা প্রকাশ করেন নাই। সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থ কুলপঞ্জিকা নহে। কোন কুলপঞ্জিকার নামও পুস্তকে নাই। আমি যে সম্বন্ধ-নির্ণয় বইখানি দেখিয়াছিলাম, তাহা সম্ভবতঃ ১ম সংস্করণের এবং তাহা আমার নিকটে এখন নাই। ঐতিহাসিক পুস্তকে প্রমাণপতিত দিবার সময়ে সকলেই পত্রাঙ্ক দিয়া থাকেন, পুস্তক কোন্ সংস্করণের তাহারও উল্লেখ থাকে। এ সকলের অভাবে আমি যদি শ্লোকটী না পাইয়া থাকি, তজ্জন্য কি কেবল আমারই দোষ? আর শ্লোকটিতেই বা কি প্রমাণ হয়? শ্লোকটিকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমি শব্দকল্পদ্রুমে "রুদ্র" শব্দের অর্থ খুঁজিতে গিয়া-ছিলাম। "রুদাই" রুদ্র শব্দের অপভ্রংশ, প্রথমে এ কথা মানিতে হইবে। তৎপরে শব্দকল্পদ্রুমে রুদ্র শব্দের রাজা অর্থ না পাওয়া গেলেও তাহা সম্বন্ধ নির্ণয়-ধৃত শ্লোকের প্রমাণ-বলে স্বীকার করিতে হইবে। অবশেষে মানিতে হইবে, কাহারও নামের অর্থ যদি রাজা হয় তবে সে রাজাই ছিল। "এই রাজবংশ অতি প্রাচীন" এই মীমাংসা উপরের তিনটি স্বীকার্য্যের উপর নির্ভর করে। সুধীরবাবু যখন "বক্তৃতার খাতিরে" সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন, তখন তিনি এই

স্বীকার্য্যগুলি সহজেই মনিয়া লইবেন, কারণ পুস্তকের অনেক অতিরিক্ত প্রমাণ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা—"মল্লভূমাধিপতির নিকটে মুরলীধরের পিতৃ-পিতামহের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল," "মুরলীধর বর্গির হাঙ্গামে...সর্ব্বস্বান্ত হইয়া" ইত্যাদি। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা একথা মানিবে না।

রাধানাথ ঋণ করিয়া জমিদারী ক্রয় করিয়া কোন কৃতিত্ব দেখান নাই—আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য। যে লোক জমিদারী চালান ব্যাপার ভাল বুঝেন, ঘরে টাকা থাকিলে তিনি নগদ টাকা বাহির করিয়া জমিদারী কেনেন, নতুবা ধার করিয়া কার্য্যসাধন করেন, ইহার জন্য পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব-কাহিনীর প্রয়োজন হয় না। দিল্লীর বাদশাহের কোন বংশধরকেও অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বাবুর্চ্চিগিরি করিতে হইতেছে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী কোন কাজেই লাগিতেছে না। আবার যে "পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তী" তিনিও জমিদারী করিয়াছিলেন। সুতরাং ঋণদাতৃগণের নাম ও ঋণের পরিমাণ খুবই লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু সেগুলির সহিত আমার বক্তব্যের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

'বীরভূম বিবরণে' অনেক মারাত্মক ত্রুটী আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র আমি "অসাবধানতা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য রাখিলেই এ গুলি থাকিত না। প্রশংসা যে না করিয়াছি এমন নহে। আমি সমালোচনার একস্থানে লিখিয়াছি "এই সবল সত্যানুসন্ধিৎসা আজকাল নবীন ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিরল।" ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আমি আর জানি না। ভাবিয়াছিলাম আর কোন ত্রুটীর উল্লেখ করিব না, কিন্তু হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা লইয়া একটা ত্রুটী ভাল করিয়া দেখাইতে হইল। রেনেল সাহেবের ম্যাপ ১৭৬৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অনুমান করেন "১৭২৩।২৪ খৃঃ হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রেনেল সাহেব তাহার বহু পরে (১৭৬৯ খৃঃ) এ প্রদেশ জরিপ করিলেও তাঁহার মানচিত্রে হেতমপুরের নাম নাই।" "প্রতিষ্ঠিত হয়" ইহার পাদটীকায় আছে, "তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য"। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে হেতমপুর প্রতিষ্ঠার বৎসর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। বর্গীর হাঙ্গামে ৪৪ বৎসরের মধ্যে একখানি গ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ৪৪ বৎসর পরে—বহুকাল পরে কেমন করিয়া হয়? হেতমপুর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া একটা নগণ্য পল্লী হইল আর অদূরস্থিত কৃষ্ণনগর গণনীয় পল্লী বলিয়া রেনেলের ম্যাপে স্থান পাইল কেন? লেখক যেমন বলিয়াছেন "তৎপূর্ব্বে সে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না, এমন কথা প্রমাণ হয় না," আমিও তেমনই বলিব "তৎপূর্ব্বে সে

গ্রামের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথাও প্রমাণ হয় না।" মোট কথা, হেতমপুর গ্রাম যে ১৭২৩।২৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা অনুমানমাত্র। আর এই অনুমানের মূল এই যে, হাতেম খাঁ হইতে হেতমপুর নামের উৎপত্তি। আর সেই হাতেম খাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল গ্রন্থকার বলিয়াছেন ১৭২৮ হইতে ১৭৩০ হাতেমখাঁর জন্ম, মৃত্যু ও বীরভূমে আগমনের কাল সমস্তই গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অনুমানকে প্রামাণ্য করিয়া লইয়া যে অনুমান করা হয়, সে অনুমানের মূল্য কি?

আপন জন্মভূমি সম্বন্ধে লেখায় দোষ নাই, কিন্তু জন্মভূমির দোহাই দিয়া যদি আপনার বংশ, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকেই বড় করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে তাহা পারিবারিক বিবরণে স্থান পাইবার যোগ্য হয়, কিন্তু কোন অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন অংশের চিত্রগুলিও সেই কারণে এ গ্রন্থমধ্যে দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। গৌরাঙ্গ মন্দিরের "অভ্রভেদী" চূড়া বলিয়া গৌরব করাও উচিত হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থকারের অহমিকা প্রকাশ পায়। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের স্বীয় চিত্র প্রদান করাও অন্যায় হইয়াছে। যদি তিনি সাহিত্যজগতে বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় পাঠক তাঁহার চিত্র দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। তখন প্রকাশকগণ (যেমন কবীন্দ্র রবীন্দ্র সম্বন্ধে ঘটিয়াছে) গ্রন্থকারের চিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিলে সুশোভন হইত। অন্যান্য মহারাজকুমার ও কুমারগণের চিত্রও কোন অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থমধ্যে দেওয়া ঠিক হয় নাই (বিশেষতঃ যখন হেতমপুর রাজবংশে জন্ম ও গ্রন্থকারের সহিত সম্বন্ধ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কৃতিত্ব তাঁহাদের নাই)। হেতমপুর-রাজের ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন দেখাইতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন, "কোথাও কেবাটি, কোথাও টমটম জুড়ি, বাইসিকল ও মটর গাড়ী ছুটিতেছে, রাত্রিকালে কোথাও ইলেক্ট্রিক লাইট ও কোথাও গ্যাস লাইটের অত্যুজ্জ্বল আলোকে যেন রাত্রিকে দিন করিয়াছে, পূজা ও পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ, খেমটানাচ, বায়স্কোপ, সার্কাস" ইত্যাদি। এ সকল কথা যে ভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সকলই অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থের মারাত্মক ত্রুটী। সমালোচনা দীর্ঘ হইবে বলিয়া এ সকল কথার উল্লেখ করি নাই।

লক্ষ্মীর বরপুত্র যেদিন প্রথমে বাগ্‌দেবীর পীঠতলে সমাগত হইয়াছিলেন,

সেদিন খুব বাহাবা পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন যদি লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ধন্যবাদ চাহেন, তবে তাঁহাদিগকেও সাহিত্যিক কৃতিত্বলাভ করিতে হইবে। ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা যে, লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের তোষামোদকারীর অভাব হয় না, তাঁহারা স্পষ্ট কথা কখনও শুনিতে পান না। মহারাজকুমার বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন শুনিলেই করতালিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যেদিন এই সমিতি কিয়ৎ পরিমাণেও বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সমকক্ষতা লাভ করিবে, সেইদিন তিনি বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণের সমাদরলাভ করিবেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অকালে প্রশংসা করিয়া মহারাজকুমারের মাথা বিগ্‌ড়াইলে তাঁহার শত্রুতাসাধন করা হইবে।

ব্রজরাজ।

উত্তর

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।

উপরিলিখিত প্রতিবাদের উত্তরে আমি সংক্ষেপে দু' একটি কথা বলিতে চাই:—

প্রথমতঃ "শ্যামারূপার গড়ে"র কথা। 'কেন্দুবিল্ব কাহিনী'র শেষভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'কেন্দুবিল্বের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শেষ চিহ্ন আজিও অন্তর্হিত হয় নাই। পশ্চিমে 'বিল্বমঙ্গলের ঢিপি', পূর্ব্বে 'লাউসেন তলাও', দক্ষিণে অজয়ের অপর তীরে 'শ্যামারূপার গড়' তাহার মহিমান্বিত শ্রীকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়াছে। কেন্দুবিল্বের কথা উঠিলেই 'লাউসেন তলাও'এর কথা আসিয়া পড়ে। শ্যামারূপার গড় মনে পড়িয়া যায়। ইছাইএর উচ্চ দেউল নয়নপথে প্রতিবিম্বিত হয়। 'সেগুলিকে ছাড়িয়া দিলে কেন্দুবিল্ব-কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।' সেইজন্য শ্যামারূপার গড়ের বিবরণ কেন্দুবিল্ব-কাহিনীর পরিশিষ্টরূপে আলোচ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ইহা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হইলেও ইছাই ঘোষের অভিধান সূত্রে কেন্দুবিল্বের অনতি-দূরবর্ত্তী 'লাউসেন তলাও'র ইতিহাসের সহিত তাহার ইতিহাস অনেক জড়িত। কেন্দুবিল্বের সেবাইতগণই বহুদিন হইতে শ্যামারূপার পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং কেন্দুবিল্বের বর্ত্তমান রাধাবিনোদ বিগ্রহ শ্যামারূপার গড় হইতে আনীত, সুতরাং কেন্দুবিল্ব প্রসঙ্গে শ্যামারূপার গড়ের কাহিনী একেবারে অবান্তর নহে, এবং তাহার একটা সার্থকতাও আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমালোচক মহাশয় যদি

সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণা জেলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয় নাই কেন বলিয়া আক্ষেপ করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ নাচার। 'শ্যামারূপার গড়' যে সেন পাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত, গ্রন্থকার তাহা স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইছাই ঘোষের দেউলকে 'বীরভূমের একটি দর্শনীয় সামগ্রী' বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক সত্য না হইলেও উপরি উদ্ধৃত বক্তব্য বোধ হয় তাহার কৈফিয়ৎ।

সমালোচক মহাশয় এ পুস্তকে শ্যামারূপার গড়ের কাহিনী-নিবেশের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা আমি অবগত নহি, সুতরাং সে বিষয়ে আমি কোন উত্তর দিতে অক্ষম, তবে আমার মনে হয়, ইতিহাসের দিক হইতে এ কাহিনী অবান্তর নহে।

রুদ্র বা রুদাই সম্বন্ধে লালমোহন বিদ্যানিধি সঙ্কলিত 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' (ছান্দত বংশ) হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। এই রাজবংশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বাঁকুড়া জেলার অনুসন্ধানের ফলে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা 'বীরভূম-বিবরণে'র দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত হইবে।

'রাধানাথের জমিদারী ক্রয়' সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন—'আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে এই ধার করিয়া জমিদারী খরিদ কার্য্য অতি কঠিন।' ইহাতে যে সন্দেহ পরিস্ফুট হইয়াছিল আমি তাহারই প্রতিবাদে পুস্তকে নিবিষ্ট ঋণদাতৃগণের নাম ও ঋণের তালিকার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সমালোচক মহাশয় এখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কাহিনীর স্মৃতির যে কোন মূল্য নাই, হিন্দু সমালোচক মহাশয়ের কাছে আজ এই নূতন তথ্য শুনিলাম।

হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠার সময় লইয়া সমালোচক মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে 'হেতমপুর কাহিনী'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 'হেতমপুরে'র নামকরণ, বীরভূম-রাজ বাদিউজ্জমানের সেনাপতি হাতেম খাঁর নামানুসারে হয়। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ও এ কথা বলেন। এই বাদিউজ্জমান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন, তার পর ১৭৪৫ খৃঃ এই হেতমপুর দুর্গে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রঘুজী ভোঁসলার সহিত তৎকালীন দুর্গাধিপতি হাফেজ খাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়—এবং এই সময়েই উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা হেতমপুর

গড় সুরক্ষিত হয়। এই প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। আসদজ্জমানের পর হইতেই হেতমপুর ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া নগণ্য পল্লীরূপে পরিণত হয় এবং সেই জন্য রেণেলের (১৭৬৯ খৃঃ) মানচিত্রে তাহার উল্লেখ না থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

হেতমপুর রাজবংশের বিস্তারিত পরিচয় আমরা গ্রন্থকারের নিকট অবশ্যই প্রত্যাশা করি, তবে রাজৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক যে সমস্ত কথা তিনি বলিয়াছেন—তাহা কতকাংশে সঙ্গত নহে বলিয়া আমিও মনে করি, তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত অহমিকা-প্রকাশ বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

পরিশেষে সমালোচক মহাশয়কে আমি একটি কথা বলিতে চাই। আমি বীরভূমবাসী নহি। গ্রন্থকার বা তাঁহার স্বসম্পর্কীয় কাহারও সহিত আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষে কখনও পরিচিত বা ঋণী নহি এবং তাঁহাদের সহিত আমার উমেদারীর বা অনুগ্রহ-নিগ্রহের কোন সম্বন্ধ নাই, ও থাকিবার সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং আমার যাহা বক্তব্য, আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই বলিয়াছি। স্বার্থসিদ্ধির তোষামোদ বা প্রত্যাখ্যাতের নিস্ফল আক্রোশ তাহাতে নাই। তাঁহার সমালোচনা একদেশদর্শী এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ-ভাব-দুষ্ট ছিল বলিয়াই, আমি তাহার দু' একটী ত্রুটী দেখাইয়াছিলাম।

পাপের অধিকার।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

চিত্ত মোর চঞ্চল অধীর
　　নাহি মানে বিবেকের বাণী,
অনুতাপে নিয়ত অস্থির
　　বক্ষভরে রচে আত্মগ্লানি।

মন মোর অন্ধ মোহে ভরা
　　অবিরত সন্দেহ দোলায়,
ভাল বোঝে তবু মন্দ করা—
　　রীতি তার;—দুর্নীতি বিলায়।

এ জীবন সতত নশ্বর
　　তবু তা'র এত আস্ফালন,
অহঙ্কারে পূর্ণ এ অন্তর
　　বৃত্তি শুধু পাপে নিমগন।

সুখ চায় মোহান্ধ বাসনা
　　সুখ শুধু ভোগের বিলাস,
বিবেকের নাহি শোনে মানা
　　অধমের আত্ম অবিশ্বাস।

তৃষা যাচে বিষতিক্ত রস
　　—পয়োমুখ আপাত মধুর,
দুখ শোকে ক্ষণিক অবশ
　　পুনরায় মত্ত ভরপুর।

পাপ করে পুণ্যের বিচার
　　শ্রেষ্ঠ সে যে বুঝি অতুলন,
ধরমের আছে অধিকার
　　বুঝি সেটা অলীক স্বপন।

আদর্শ কোথায় ?

[শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।]

আদর্শ লইয়া সে দেশে এখনও মারা মারি চলিতেছে। তাহারা আদর্শ হারাইয়া তাহার কুহকে কেবলি ছায়ার অনুসন্ধানে দিশেহারা হইয়া বেড়াইতেছে। আদর্শ না পাওয়াটা নৈরাশ্যেরই কথা। সেই না পাওয়াটাই তাই, সে দেশে আদর্শের পূর্ণলক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Ideal পাওয়া যায় না, তাহা যেন একটা মায়া! সে দেশের প্রকৃতিতে Commercialism বা দেনা পাওনার মধ্যে উঁচু দিকে তাকাইবা মাত্র ঝাপ্‌সা দেখানো কোন বিচিত্র কথা নয়। তাই Idealএর মহামায়ায় সে দেশের ভাবুকগণ নানাভাবে ঘুরপাক খাইয়াছেন। ইহার অবশ্য প্রমাণের পরিমাণ নাই। অতএব কোটেসনের কণ্টকরচনা করিবার প্রয়াস অনাবশ্যক। কবিত্বের অবলম্বনে টেনিসনও "The Voyage" নামক কবিতায় এই ভাবেরই আভাস দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একমাত্র বক্তব্য যে, কবিদিগের দৃষ্টি যে সকল সময়ে দিব্য (Intuitive) হয় না, ইহাই কেবল একটা উত্তর হইয়া আছে।

আমাদের দেশে আদর্শকে কি ভাবে দেখা হইয়াছিল, "আদর্শ" শব্দটাই মনে হয় তাহার সঙ্কেত বহন করিতেছে। আদর্শ অর্থ দর্পণ। দর্পণে স্বরূপদর্শন হয়, দেহকে দেহরূপে দেখা যায়। দেহকে দেখিবার পক্ষে দর্পণের ন্যায় আদর্শের ন্যায় অন্য পদার্থ নাই। আমার শরীরের, আমার রূপের উন্নতি-অবনতির মাপকাঠী কেবল দর্পণ। ব্যায়াম করিয়া পেশীগুলি আদর্শে বা দর্পণে দেখিবার প্রথা আছে। আমার যেটুকু অবস্থা, তাহাই দর্পণে ধরা পড়ে। আদর্শে নিজের কথাই পাওয়া যায়। পেশীর অথবা সৌন্দর্য্যের সাধনা করিয়া যেটুকু বৃদ্ধি হইল, সেই টুকুই আদর্শে দেখিব, কল্পনায় মূর্ত্তিখানি স্ফটিকের আদর্শে উঠিবে না। নিজে বাড়িলে দর্পণ বাড়িবে না। আদর্শে স্বরূপদর্শনই হইবে; অপরূপ, উপরূপ, বা নীরূপ দর্শন ঘটিবে না। আদর্শে নিজের আদর্শই উঠিবে। বর্দ্ধনটা ক্রিয়ামাত্র, ক্রিয়ার কি ফোটো উঠে? স্বচ্ছ নয়নযুগল এক একখানি দর্পণ। নয়নের আদর্শে বা মাপকাটীতে সকল জিনিষ দেখা যায়। কিন্তু নয়ন নয়নকেই দেখিতে চায়। সে উপনিষদের অক্ষিপুরুষকেই দেখিতে চায়। "তুমি আছ নয়নে নয়নে"—এই হইল আদর্শ লাভ!

"অথ আধ্যাত্মিকম্।" এইবার দেহাতিরিক্ত বিষয়টার কথা ভাবা যাউক। সেটী যাই হউক, মনই হউক বা আত্মাই হউক (কোন কোন পূজ্যপাদ নৈয়ায়িক প্রমাণ করিয়াছেন—আত্মা ও মন এক), অথবা মনঃ আত্মার উপাধিযুক্ত ছায়াই হউক, তাহা লইয়া ঝগড়া করিবার প্রয়োজন নাই। সেটী যে একখানি দর্পণের ন্যায় পদার্থ তাহাই বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়। মনেতেও বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমার মনেতে অন্যের মনের ফোটোগ্রাফ উঠে, অবশ্য মনটী মালিন্যশূন্য হইলে। তাহাই যদি হয়, তবে মনটী মাজাঘসা হইলে, তাহাতে আরাধ্য বস্তুর স্বরূপদর্শন ঘটিবেই ঘটিবে। ক্ষুদ্র ভাবেও স্বরূপ হইতেই আদর্শ সৃষ্টি সম্ভবে। নিজের বা জাতির প্রকৃতি যেভাবে গঠিত হইয়াছে, প্রকৃত আদর্শ সেইরূপই হইবে। বণিকের আদর্শ বণিকের মতই হইবে। "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তোমায় রচনা", তাহাই ত স্বাভাবিক ও ভক্তজনের কথা। রামপ্রসাদ বিশ্বশক্তিকে নিজের মা রূপে দেখিয়া নিজে আদুরে ছেলে সাজিয়াছিলেন। কান্ত ভাব ও স্ব-ভাব। রুদ্রভাবের মন রুদ্রচণ্ডীই চাহিবে, বৈষ্ণবচিত্ত বিষ্ণুই চাহিবে। এই আদর্শের বা স্বাধিকারের গোলমালে সাধনার ও সিদ্ধির গোলমাল হওয়াও বিচিত্র নহে।

আবার আদর্শ নিত্য। আদর্শ কি পাওয়া যায় না? ভারতীয় ধারণায় ত ইহার নিরুত্তর আসে না। চিত্ত যদি আদর্শ বা দর্পণ হয়, চিত্তে যদি অহরহঃ অন্যের স্বরূপ দর্শন হয়, তবে আমার চিত্তে আমার স্বরূপ দর্শন হইবে না কেন? আমার চিত্তে আমার চিত্তই দেখিব। দুই সাম্‌না সাম্‌নি দর্পণের প্রতিবিম্ব অনন্ত Ad infinitum, বস্তুতঃ নিজের নিকট নিজের প্রতিবিম্বের সামর্থ্যই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় আদর্শও নাই চিত্তও নাই, এক হইয়া গিয়াছে; আদর্শ ভাঙ্গিয়া লীন হইয়া গিয়াছে। তখন চিত্ত নাই, দর্শী নাই, কোন দর্শন নাই, সব গিয়াছে—শুধু এক অদ্বিতীয় মহাজ্ঞান আছে, তাহারও সমস্ত বন্ধনের উপাধির ঝঞ্ঝাটটা চুকিয়া গিয়াছে। দর্শনগুলি এই পরম দর্শনের জন্যই রচিত হইয়াছে, শুধু খণ্ডজ্ঞানের একীকরণই ইহাদের সঙ্কল্প। ভারতের যুগযুগান্তরের সাধনা, সাহিত্য ও কর্ম—এই মহা আদর্শে আত্মনিবেদন করিয়াছিল। এই উৎসর্গই একটী বিরাট যজ্ঞ। আর যজ্ঞেশ্বর রূপে বিষ্ণুই সর্ব্বত্র নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

চিন্তা লহরী—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম-এ, বি-এল-প্রণীত। "অর্চ্চনা" "ভারত-বিজয়" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত একাদশটি সন্দর্ভ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহারা অযথা কোটেসান-সিক্তিত নহে। অবশ্য পরলোক, [illegible] প্রভৃতি প্রবন্ধে কোনও লেখক নূতন তত্ত্ব লিখিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন ঋষিদের [illegible] সেগুলিকে নিজস্ব করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্বগুলি ঠিক পরিপাক করিয়া নিজের প্রতিভায় বক্তব্যটুকুকে সরস করিয়া বলিতে [illegible] কৃতিত্ব আছে। শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু তাহাই করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধ "পরলোকে"—লেখক কেবল ভারতবর্ষের সনাতন মত প্রকটিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্যের অনেক [illegible] দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের ভিতর ভাব ও ভাষার অসি-যুদ্ধ নাই। বেশ সহজ সরল ভাষায় তিনি আপনার বক্তব্য বলিয়াছেন। "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" এবং "সৌন্দর্য্য ও তাহার অভিব্যক্তি" প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন—" 'আনন্দরূপং' বলিয়া যাঁহাকে [illegible] করা হইয়াছে, তিনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাঁহাকে ছাড়া কোন সৌন্দর্য্যই নাই। যাহা কিছু শোভা ও সৌন্দর্য্যশালী সকলই তাঁহার অনন্তরূপের সামান্য অভিব্যক্তি।" সকলে লেখকের এ কথায় বিশ্বাস করিবেন কি? "আনন্দরূপং"কে কেহ দেখে নাই—যিনি দেখেন তাঁহার আর কোনও ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং আনন্দরূপের আদর্শ লইয়া পার্থিব পদার্থের সৌন্দর্য্য নির্ণয় করিতে যাওয়া, ঘোঁড়ার ডিমের সহিত মিলাইয়া [illegible] পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিবার বিধির অনুরূপ। তাহার পর বিশ্বই তাঁহার রূপ। [illegible] স্বরূপ সকলই তাঁহার বিশাল দেহের অন্তর্গত, সুতরাং এ বিশ্বাস লইয়া সৌন্দর্য্য বিচার করিলে বিরাটপুরুষের দেহের তারতম্য করিতে হয়। এ যুক্তি ন্যায়ানুমোদিত নহে। বরং কথাটা লেখক যেদিক হইতে বলিয়াছেন তাহার উল্টা। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি—সেই সকলের রূপ একত্র করিয়া সাধারণ লোক ভগবানের রূপের ধারণা করে। Anthropomorphic God এর ধারণার মূলে এই বিশ্বাস। "সুখ" প্রবন্ধে লেখক "ভূমা [illegible] মহানের" অনুবর্ত্তী হইতে বলিয়াছেন। তাহা হইলেই—"আনন্দঘন সেই পরম পদার্থ লাভ হইবে।" আমরা বলি সাধু! অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারে অনেক পাশ্চাত্য মতের অসারত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "স্মৃতি" প্রবন্ধে হিন্দু-মনোবিজ্ঞান খুব সহজ ভাষায় বুঝান হইয়াছে। লেখকের এইটুকু বিশেষত্ব। অপর প্রবন্ধগুলিও দার্শনিক, অথচ কঠোর নয়—সুখপাঠ্য। এই সকল হলের মধ্যে "হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের তিরোভাব" নামক বক-রূপ প্রবন্ধটি [illegible] হইল, [illegible] লেখক দিতে পারেন, কিন্তু তাহার উত্তর যুক্তিযুক্ত হইবে [illegible] এই [illegible] পুস্তক লেখকের [illegible] জ্ঞান ও সরস লিখন-[illegible]।